ঝিবরী

বিভাবরী

দেব সাহিত্য কুটীর

উপহার

আমাদের কথা

রাত্রি অবসান……

নতুন দিনের সূর্য আজ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে শরৎ-প্রভাতকে।

গাছে গাছে নতুন পাতা নব-যৌবনে উদ্ভাসিত। চারদিকে সবুজের সমারোহ। মাথার ওপর নীল আকাশে পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের দল। নীচে কাশ বনে যেন তারই ঢেউ।

এসেছে নতুন দিন আগমনীর বার্তা বহন করে। তাই প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ সাজে। আনন্দময়ীর আগমন-বার্তা দুঃখে, কষ্টে, লাঞ্ছনায় জর্জরিত বাঙালী জাতির মনে জাগিয়েছে সাড়া। তাই সারা দেশ আজ উৎসব প্রাঙ্গণে পরিণত হয়েছে। আনন্দ, হাসি, গানে ভরে উঠেছে সকলের মন। মা আসছেন এখন আর দুঃখ কি, কষ্ট কি! তাই তো খুশির হাসি আজ সকলের মুখে।

ছোটদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে খুশির ডালি সাজিয়ে এসেছে বিভাবরী। 'দেব সাহিত্য কুটীরে'র অনবদ্য অবদান। অন্ধকার রাত্রির অবসানে 'বিভাবরী' বিশ্ব জননীর পূজায় আমাদের নৈবেদ্য। আজ যারা ছোট, কাল তারাই হবে রাষ্ট্র-নায়ক। জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে। তাই আমাদের প্রার্থনা, তাদের চিত্তজয়ের সার্থকতা যেন লাভ করে আমাদের নৈবেদ্য **'বিভাবরী'**……

জন্মাষ্টমী : ১৩৯০
আগষ্ট : ১৯৮৩

প্রকাশক

যে সব লেখা আছে

বিষয়		যাঁরা লিখেছেন		পৃষ্ঠা

হাসির কবিতা ঃ

ছড়া ঃ

অলৌকিক কাহিনী ঃ

ঐতিহাসিক কাহিনী ঃ

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ

বিদেশী সাহিত্য ঃ

রূপকথা ঃ

বিষয়	যাঁরা লিখেছেন	পৃষ্ঠা

সচিত্র রঙিন কাহিনী ঃ

সচিত্র পাদপূরণ ঃ

জলপরীরা আছে

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

অতল গহন নীল সাগরে
জলের বাড়ি জলের ঘরে
জলপরীরা ছড়িয়ে আছে
শঙ্খদ্বীপের চরে।

নানা রঙের রকমারি
পরে তারা জলের শাড়ি
উপুর-ঝুপুড় যেই না হাসে
মুক্তো-মাণিক ঝরে।

জলপরীরা নয়কো পরী
পাতালপুরীর প্রাণ-প্রহরী
সাত সাগর ও তেরো নদীর
জলকে শাসন করে।
নেইকো পাখা, নেইকো ডানা
জলেও তাদের যায় না টানা,
খুললে মুঠো জোয়ার আসে
মুড়লে ভাঁটা পড়ে।

জলপরীরা সত্যি বলছি আছে।

যেমন তাদের রূপের লহর
ছবির মতো গঞ্জ-শহর
তেমনি আছে হাঙর-তিমির
দুরন্ত নৌবহর।
আরও আছে জোড়া-জোড়া
সিন্ধু-সিংহ সিন্ধু-ঘোড়া
ঝড়ো মেঘের পাখায় ওড়া
ফৌজ-মৌসুমীর।

জলপরীরা, আবার বলছি, আছে।
ইচ্ছে হলেই দেখতে পেতে
কান পাতলেও শুনতে পেতে,
আসছে, যাচ্ছে, গান গাচ্ছে
জাহাজঘাটার কাছে।

জলপরীরা ছিল, আজও আছে।
আপন রঙ্গে জলতরঙ্গে
জলের সঙ্গে নাচে॥

পটলার বনভোজন

—শক্তিপদ রাজগুরু

পটলা ইদানীং বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। অবশ্য পটলা নালায়েক কোনদিনই ছিল না, তবে আজকাল একটু বেশি রকম চালু হয়ে উঠেছে।

ধ্যাড়ধেড়ে সাইকেল ছেড়ে এখন মাঝে মাঝে ওর বাবার বাতিল সেকালের অস্টিন গাড়িটা চালাবার চেষ্টা করে। ওদের নতুন বাড়ির দিকে এখনও ফাঁকা মাঠ, পথঘাট পড়ে আছে. আমরা 'পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব'ও সেই মাঠে খুঁটি পুঁতে খানিকটা জায়গায় হোগলার ঘর বানিয়ে একটা পতাকা তুলে ফেস্টুন লাগিয়ে জবর দখল করে ক্লাব করেছি।

অবশ্য এই নিয়ে তিন বার আমাদের ক্লাবকে রিফুইজি হতে হয়েছে। মালিক এসে হম্বিতম্বি করেছেন, আমরা হোগলার চালা মাথায় করে অন্যত্র এসে খুঁটি পুঁতেছি, শেষকালের মালিক অবশ্য তিনশো টাকা দিয়েছিলেন, কারণ ইদানীং ক্লাবের সভ্যসংখ্যা বেড়েছে, পাড়ার ছেলেদের চটাতে চায় না কেউ।

সেই তিনশো টাকা মূলধন করে আবার হোগলার চালা, বাঁশ, খুঁটি ঘাড়ে করে রিফুইজি হয়ে গেছি। ফটিক বলে—আর 'কেলাবে' দরকার নাই।

পটলা হোগলার ভ্রাম্যমাণ চালায় কাঁধ দিয়ে শ্মশানযাত্রীর মত আসছিল গুটি-গুটি বিরস বদনে। সে বলে ওঠে—নেভার। ক—ক্লাবঘর চাই!

হোঁৎকা আমাদের দলপতি, সে বলে—আলবৎ হইবো। ওই পুকুরের পাড়েই নামা বাঁশ খুঁটি—চালাঘর তুইলা ফ্যাল, আমি একখান প্ল্যান করছি।

হোঁৎকার দেহটাও বিরাট, আর বদ বুদ্ধিও কম নয়। হোঁৎকা এর মধ্যে পাড়ার জয়লক্ষ্মী বিলডার্সের নোটন সাহার আড়ত থেকে ঠেলাগাড়িতে করে কিছু জলদাগি ইট-বালি-সিমেন্ট এনে বলে—গাঁইথা ফ্যাল ঢিবির মত কইরা!

আমরা শুধোই—কি হবে এতে?

হোঁৎকা তখন কোত্থেকে গোটা পাঁচ-সাত কালো পাথর এনে হাজির করেছে। বলে সে—যা কইতাছি কর! তোগোর মাথায় আছে শুধু 'কাউডাং'—গোবর!

আমরা যো সো করে খানিকটা চাতাল মত করেছি। ন্যাড়া কোথা থেকে খানিকটা তেল সিন্দুর আর কোন পরিত্যক্ত মন্দির থেকে মরচে পড়া ত্রিশূল একটা এনে জম্পেস করে পুঁতে দিয়ে নুড়িগুলোকে প্লেস করে বলে—হালায়. পার্মানেণ্ট দেবস্থান বানাই দিলাম, ক্লাব আর দেবস্থান। কেডা এবার নড়ায় দেহি! বুঝলি—পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের এ্যাতদিনি একটা ডেরা হইল। এখন একখান বট আর অশথ গাছ আইনা পুতুম। কমপ্লিট—

ফটিক মাঝে মাঝে পুজো-টুজো করে। সেও মহাখুশি—হ্যাঁ। কাজ করেছিস বটে হোঁৎকা। আগে করলে এ ভাবে রিফুইজি হতে হতো না রে।

পরদিন শনিবার। মাইক ভাড়া করে ফটিকই সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে ঘোষণায় বের হলো। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের উদ্যোগে গ্রহরাজ পূজা—ভক্তবৃন্দ দলে দলে যোগ দিন!

গ্রহরাজের যে এত ভক্ত ছিল, জানা ছিল না। লাল নীল কাগজ দিয়ে ক্লাব-মাঠকে সাজিয়ে সকাল থেকে মাইকে হিন্দি গান বাজিয়ে পাড়া মাত করে সন্ধ্যার মুখে ফটিক মেকআপ্ নিয়ে বসেছে পুজোয়। থলিতে প্রণামী পড়ছে। হোঁৎকা ভলেনটিয়ারী শুরু করে, পটলা লাল চেলির কাপড় পরে পুজোয় বসেছে—ফটিক তন্ত্রধার। আমরা সব দিক সামলাচ্ছি।

রাত্রি হয়ে আসতে পুজোর পর প্রসাদ বিতরণও হয়ে গেছে। হিসাব করে দেখা গেল, এক সন্ধ্যায় খরচখরচা বাদ দিয়ে নগদ লাভ বাহান্ন টাকা।

হোঁৎকা তখনও শশা খেঁজুর পানিফল চিবুচ্ছে। আর সন্দেশ যা পড়েছিল তাও কম নয়। হোঁৎকা বলে—এবার যমরাজের পূজাই এস্টাব্লিশ কইরা ফেলি।

অবাক হই—যমরাজের পূজা?

হোঁৎকা বলে—যমরাজকে ডরায় না কে—ক'দিন? বুঝলি নতুন কিছু করার লাগবো!

যমরাজের পুজোও হয়ে গেল। তাছাড়া ফটিক এখন শনিবারের পুজো সাব-কমিটির সেক্রেটারি। সপ্তাহে ক্লাবের কিছু আমদানিও হয়। আরও আশ্চর্যের কথা, জায়গার মালিক সেদিন এসে অবাক হয়ে যায়। তখন সমারোহ করে শনিপূজা হচ্ছে।

হোঁৎকা এবার গলায় জোর এনে বলে—জায়গার দখল নিতি চান—ভাঙ্গেন শনি মহারাজকে! যান—চুরমার কইরা দ্যান ওরে।

ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন—ওগো! কি করছো?

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে একটু তর্জন-গর্জন করেছিলেন। হোঁৎকার ওই এক কথা! সকলেই ঘাবড়ে গেছি। আবার হোগলার চালা মাথায় করে সরে যেতে হবে। কষ্টও হয় ভাবতে।

হোঁৎকা বলে—ভাঙ্গেন! আমাগোর দ্বারা হইব না। আপনি দবতারে ভাইঙ্গা জলে ফ্যালাইয়া এ জাগার দখল নেন!

ভদ্রলোক বেশ অবস্থাপন্নই। মেজাজীও। তিনি বলেন—লোকজন এনে তাই করবো! মানি না দেবতা-ফেবতা।

ভদ্রলোকের স্ত্রী ধমকে ওঠেন—কি বলছো তুমি? এত জায়গা তোমার—একটু নিয়ে ছেলেরা মন্দির করেছে, জায়গা পবিত্র হয়ে উঠেছে। ওটা থাক।

হোঁৎকা আবেগ ভরে বলে ওঠে—তাই কন্ মাসীমা। দেবস্থান করছি—শিশুগোর জন্য খেলার মাঠ করছি, নিতে চান—ন্যান্!

মাসীমা বলেন—না। এ জায়গাটুকু বাদ রেখে বাড়ির প্ল্যান করাবো।

নিজেই পাঁচ টাকা প্রণামীও দেন!

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব এখন রম্‌রম্ করে চলেছে। নিজস্ব জায়গা-ঘর, আর রেগুলার ইন্‌কামের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে আমাদের। আর পটলাও ইদানীং তার বাবার বাতিল অযান্ত্রিক একটা অস্টিন নিয়ে মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়।

বলে সে—ড্রাইভিং শি—শিখছি! একদিন পিকনিক করতে যাবো আমাদের বাগানে!

পিকনিক্-এর নাম শুনে সকলেই খুশি। তাছাড়া গাড়ি যখন হাতেই আছে, যাতায়াতের খরচাও নাই, পটলাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর আমাদের ইতি-উতির সব ঘটা, মায় আলুকাব্‌লি, মালাই, ঝালমুড়ির খরচা তারই।

ফটিক বলে—শনিপূজা কমিটি থেকে শতখানেক টাকা দেব।

হোঁৎকা খুশিতে ফেটে পড়ে—ব্যস! তর শনি ঠাকুর বাঁইচা থাক্ ফটিক। তয় মেনুখান্ কইরা নিই?

হোঁৎকা কাগজ কলম নিয়ে বসবার আগেই ফরমাইশ করে—চা আর খান দুই টোস্ লই আয়। বুদ্ধিটা ওর কিছু না খেলে খোলে না।

ফটিক বলে—ম্যালা ঝামেলা করে কাজ নাই। ধর ভাত আর মুরগীর মাংস, শেষ পাতে দই মিষ্টি।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—মাছ হইব না? ওই মুরগী তো হইবই, মাছও চাই!

পটলা আশ্বাস দেয়—বাগানের পুকুরে মাছ আছে, জালও পাবি। মাছ হয়ে যাবে।

হোঁৎকা তখন রিভাইজ মেনু করতে বসে—মাছের মাথা দিই মুড়োঘণ্ট, বাঁধাকপি মাছ দিয়া, মাছের কালিয়া, সাথে টু পীস্ কইরা মুরগীর কারি, চাটনি, দই আর বারাসতে শুনছি কাঁচাগোল্লা বানায় ভালো, তাই থাকবো।

ফটিক বলে—এ যে বিয়ের ভোজ হয়ে গেল রে?

—সাট্ আপ্! হোঁৎকা গর্জে ওঠে। বলে সে—শুভকাজে ও সব কইবি না। খামু তো একদিন। পটলা এত কইরা কইছে না, খালি দুঃখ পাবে ব্যাচারি!

পটলা অবশ্য তখন বিপদেই পড়েছে। খাবার যা ফর্দ ধরেছে, তাতে ওদের একশো টাকার অনুদান সমুদ্রে ধুলো মুঠোর মত মিলিয়ে যাবে, বাকি টাকার যোগাড় তাকেই করতে হবে। নাহলে হোঁৎকার দল মাছের মাথার বদলে তার মাথাটাই চিবিয়ে খাবে।

এখন ঠাক্‌মার কাছেই কিছু বের করতে হবে, পটলা চুপসে গেছে সাত-পাঁচ ভেবে।

হোঁৎকা আমি ফটিক গদাই সকালেই তৈরী হয়ে ক্লাবে এসে গেছি। আজ সেই পিকনিকের দিন। কাঁধে সাইড-ব্যাগ, পটলা আবার মাথায় একটা টুপি পরেছে সুটিং পার্টির মত, এর মধ্যে বনমালীর দোকান থেকে পটলার একাউন্টে বার দুয়েক চা-পকৌড়া সেবা হয়ে গেছে। বেলাও বাড়ছে। শীতের দিন, তায় ছাব্বিশে ডিসেম্বর। ভোর থেকেই দেখছি রাস্তা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে ট্রাকে-টেম্পোতে করে এন্তার পিকনিক করতে চলেছে।

তীব্র সিটির শব্দ, ড্রুমড্রুম্ বাজনা বাজছে—আর উদ্দাম নাচের ছন্দ তুলে চলেছে একটা ট্রাকের উপর কিছু ছেলের দল। কেউ সজোরে শিঙে ফুঁকছে।

ফটিক বলে—বেলা হয়ে গেল। এখনও পটলার ছ্যাখা নেই। হোঁৎকা বলে—কখন গিয়া মাছ ধরুম, রান্নাই করুম! পটলা এ্যাক্খান ক্যাডাভারাস্!

আমি বলি—একবার খবর নোব বাড়িতে?

হোঁৎকাও ভাবছে, হঠাৎ আটাকলের মোটর চালু হবার মত বিকট শব্দটা কানে আসে। রাস্তায় ধুলো উড়ছে—দুটো ঘিয়েভাজা কুকুর চিৎকার করে রাস্তায় উঠে প্রাণ বাঁচালো। সশব্দে পটলা গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—এ্যাতো দেরী হইল ক্যান্? টাইম জ্ঞান নাই—এর লগ্যে বাঙালী জাতটা রসাতলে যাইব!

পটলা বলে—ম-ম্যানেজ করে বের হতে হবে তো? বাবা কারখানায় যেতে তবে পিছন দিয়া গাড়িখানা নিয়ে বের হয়েছি। পথে আবার ইঞ্জিন ট্রাবল।

হোঁৎকা বলে—এদিকে প্যাটের ট্রাবল শুরু হইয়া গেছে গিয়া!

পটলা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে। বলে সে—ব-বলিস কি? এঁ্যা—তাহলে পিকনিকে যাবি না? ওদিকে সব আয়োজন র-রেডি! তবে প-পেট খারাপ হলে কি আর করবি?

আমরাও অবাক হই। বিনা পয়সায় এমন ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া—এসব হবে না, তবে সাত-সকালে সেজেগুজে বের হয়েছি কেন? শুধোই—কি রে হোঁৎকা, যাবি না?

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—কে কইল যামু না?

পটলা শোনায়—তোর প-পেট খারাপ—পেট বেদনা—

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—কে কইল যামু না ? [পৃঃ ৪

হোঁৎকা বলে—ক্ষুধায় প্যাট ব্যথা করতিছে। সমী—কয়ে দে বনমালী রে মামলেট-টোস-চা দিতি। খালি প্যাটে থাকলি প্যাট ব্যথা করে আমার! জলদি দিতি ক! যাইতে লাগবো!

পটলা চুপসে যায়। হোঁৎকা গোগ্রাসে রুটি ডবল মামলেট গিলছে। আমরা টোস্ট-চা নিয়েই পটলাকে কিছুটা অব্যাহতি দিলাম! হোঁৎকা গিলে-কুটে লম্বা একটা ঢেঁকুর তুলে বলে—চল গিয়া। দেরী হইয়া গেল।

পটলার কেরামতি কিছু কিছু এর আগেও দেখেছি, এখন দেখছি অন্য ধরনের কসরত। পটলা গাড়ি নিয়ে চলেছে হাইওয়ে ধরে, সাঁ-সাঁ করে ট্রাক-বাস-প্রাইভেট গাড়িগুলো বের হচ্ছে, পটলার পৈত্রিক সেই অস্টিন চলেছে রাস্তার একপাশ দিয়ে গুড় গুড় করে।

ফটিক বলে—একটু জোরে চালা।

হোঁৎকা শোনায়—হঃ! পটলা—ই কি গাড়ি রে—বাঘের বাচ্চা! হতভাগায় হক্কলেরে তাড়াই লইয়া যায়।

পটলা এবার ফাঁকা পেয়ে গাড়িতে স্পীড তোলবা মাত্র মনে হয় গাড়িখানা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়বে। আর গাড়ি যেন ঝটকা মেরে লম্ফ দিয়ে চলেছে।

হোঁৎকা বলে—চেল্লাস ক্যান্! পক্ষীরাজ-এর বাচ্চা! লম্ফ দিয়া কদম চালে চলতিছে। সাবাস পটলা—

পটলা তখন দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে সামলাবার চেষ্টা করছে, যেন রাস্তা থেকে ছিটকে না পড়ে। সারা গাড়ি তখন নাচছে আর ভিতরে নাচছি আমরা।

—পটলা, থামা গাড়িখান্।

পটলা যেন কানে তুলো গুঁজে আছে। প্রাণপণে স্টিয়ারিং-এর উপর পড়ে তখন রাস্তার দিকে চেয়ে বলে—চ-চুপ করে থাক।

হঠাৎ একটা গাড্ডায় পড়েছে, সারা গাড়িটা শূন্যে উঠে সশব্দে আছড়ে পড়ে আবার ছুটতে থাকে, আর ভিতরে ফটিকের মাথাটা হুডের শিকে লেগেছে, আর্তনাদ করে ওঠে সে—অয় বাপ্!

পটলা বলে—চুপ করে থাক। আর এসে গেছি।

গাড়িটা এবার বড় রাস্তা ছেড়ে সরু রাস্তায় গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে। মাঝে মাঝে পুকুর-বাগান—ধানক্ষেত-নারকেল বাগান দেখা যায়। শান্ত পরিবেশ।

হোঁৎকা চিৎকার করে—বারাসত হইয়া যামু, কাঁচাগোল্লা দই কিনতে লাগ্‌বো।

পটলা শোনায়—এ গা-গাড়ি বারাসতের পথ চিনবে না, শুধু বাড়ি আর বাগানের পথ চে-চেনে।

অবাক হয়ে বলে—গাড়ি আবার পথ চিনবে কি রে? তুই তো পথ চিনিস। চালিয়ে নিয়ে যাবি!

পটলা হাঁপাচ্ছে। বলে সে—দেখলি না, স্টিয়ারিং সিধা রেখেছিলাম, এখানে এসে গাড়িটা আপনমনেই এই প-পথেই ঢুকে গেল!

হোঁৎকা আপশোস করে—তয় দই সন্দেশ হইব না? দু'খানা আইটেম—

পটলা আশ্বাস দেয়—বাগানের ওদিকেও বড় গ্রাম আছে, দই সন্দেশ ওখানেই মি-মিলবে। একদম পি-পিওর!

হোঁৎকা চাইল। বেলা তখন অনেক হয়ে গেছে। রুটি মামলেট সব ওই গাড়ির কুলোয় আছড়ানো অবস্থায় হজম হয়ে গেছে। কখন যে খাওয়া জুটবে কে জানে?

কোন বাগানে মাইকে গান বাজছে, কিছু ছেলেমেয়ের দল পিকনিক করছে। ওদিকে উনুনে কড়াই চেপেছে। খেলাধুলো করছে তারা বোধ হয় সকালের জলযোগ সেরে। মাংস রান্নার খোসবু ওঠে। কড়াই-এ গরম বেগুনি ভাজা হচ্ছে!

হোঁৎকা জিব দিয়ে জল টেনে বলে—চল্ জলদি। দ্যাখা যাক্—কি জোটে!

ফটিকের এতক্ষণে খেয়াল হয়। তার পকেটে শনি ঠাকুরের তহবিল থেকে ফিস্টের অনুদান বাবদ একশো টাকা নিয়ে এসেছে, তার থেকেই দই সন্দেশ হতো।

ফটিক বলে—শনি মহারাজের ফাণ্ড ভেঙ্গে দই সন্দেশ খাস্ নি আর হোঁৎকা ?

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—সাট্ আপ! শনি মহারাজ কত লোককে রাজা বানায়, তারা হালায় নিত্যি রাজভোগ সাটতিছে, আমাদের একদিন খালি যতো দোষ? থো ফ্যালাই তর শনি ঠাকুর! চল পটলা—

এবার পটলার গাড়ি ওই খোয়া ঢাকা রাস্তায় হঠাৎ বিকট গর্জনে ঝম্প দিয়ে চলেছে, যেন যুদ্ধের ঘোড়া ছুটছে। আর হঠাৎ বিকট শব্দে একটা আওয়াজও বের হয়, তবু দমে নি গাড়ি।

স্তব্ধ গ্রামের সবুজে রাইফেলের গুলির মত আওয়াজ উঠতে সেই পিকনিক পার্টির সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে, গাড়িখানা একরাশ ধুলো উড়িয়ে আর একটা লম্ফ দিতেই বিকট শব্দে নীচেকার জীর্ণ একজস্ট পাইপটা খসে পড়ল। গাড়ি থামার নাম নেই। পাইপ খসে পড়তে এবার কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মত—আর উড়ছে ধুলো—ছুটছে গাড়ি তীরবেগে।

আদ্যিকালের যন্ত্র-দেবতা এবার ধোঁয়ার পুঞ্জ ছেড়ে রকেটের মত চলেছে, যে কোন মুহূর্তে যেন মাটি ছেড়ে শূন্যপথেই উঠে যাত্রা করবে মহাকাশের দিকে।

কয়েকটা মুরগী চরছিল পথে—সেগুলো গাড়ির আগে আগে দৌড়চ্ছে প্রাণভয়ে। হোঁৎকার জিভে জল আসে নধর চিত্র-বিচিত্র মুরগী দেখে। বলে সে—ধর! চাপা দে ওরে পটলা!

তার আগেই মুরগীগুলো শূন্যে উড়েছে, আর হোঁৎকাও বাইরে হাত বাড়িয়ে একটা বড় মোরগকে খপ্ করে ধরেছে। ঝটপট করছে সেটা!

হোঁৎকা মাল ক্যাচ্ করে বলে—পটলা, ফুল ইস্পিডে গাড়ি চালাবি।

মুরগীটা ভিতরে ঝটপট করছে, আর বাইরে তখন কলরব ওঠে। কারা চিৎকার করছে—মুরগীটা লইয়া ভাগছে! ধর—ধর—

ধোঁয়া-ধুলোয় দৃষ্টি আড়াল করে পক্ষীরাজ ছুটে চলেছে বিকট শব্দে, রাস্তার এদিক-ওদিক জুড়ে। পিছনে কলরব-চিৎকার ওঠে। কয়েকটা কুকুর তেড়ে তেড়ে আসছে।

আমি বলি—ছেড়ে দে হোঁৎকা!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—সাট আপ!

কিন্তু এই মৌকায় মুরগীটাও ছাড়া পেয়ে জানলা গলিয়ে ফর্‌ফর্ করে উড়ে বের হয়ে যেতে হোঁৎকা হাঁক পাড়ে—দিলি তো ওটা রে ছাড়ায়ে?

মুক্ত মুরগী তখন ফিরে গেছে, আমাদের তবু ফেরার অবস্থা নেই, গাড়ি তখন ঝম্পক রথে পরিণত হয়েছে, হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে পটলা—

—স্—স্—সামাল!

ওর জিভটা যথারীতি আলটাকরায় লেগেছে আর গাড়িও এবার সিধে রাস্তা ছেড়ে ঢালু বেয়ে গড়িয়ে নামছে ঝন্‌ঝন্-দুড়দাড় শব্দে।

চিৎকার করে উঠি—পটলা ?

পটলা ঘামছে, কি বলার চেষ্টা করে, কিন্তু গাড়ি চলেছে নিজের মেজাজে, সামনে একটা নোনা আতার গাছ, ওটাতে ধাক্কা মারতে বোধহয় পছন্দ হল না—এড়িয়ে গিয়ে সবুজ সিমমাচার মধ্যেই সেঁধিয়েছে। মাচার বাঁশ কঞ্চি, ডালপালা ভাঙ্গছে মড়মড় করে, ওদিক থেকে এক বুড়ি বের হয়েছে ঝাঁটা হাতে, চিৎকার করে—কোন্ মুখপোড়া ড্যাকরা সব্বনেশে! ও মা, আমার সিমমাচা নে গেল!

গাড়ি কিন্তু থামে নি। বনেদী ইংরেজ কোম্পানীর গাড়ি, বুড়ো হলেও তেজ যায় নি, মাচা ফুঁড়ে এদিক থেকে ওদিকে বের হয়েছে, আর বনেট—গাড়ির ছাদ—গা সব ঢেকে জম্পেস হয়ে জড়িয়েছে বুড়ির ফলন্ত সিমমাচা।

একটা সবুজ সিমমাচা ফুল-ফল সমেত এবার ছুটে চলেছে। পটলা চিৎকার করে, তার জিভটাও সেঁটে গেছে আলটাকরায়, মনে হয় তোতলা লোকদের যেন পুলিস ড্রাইভারির লাইসেন্স না দেয়। লোককে বিপদের সময় হুঁশিয়ার করতেও পারবে না। পটলারও ঠ্যাং ফেল করেছে—তার গাড়িরও ব্রেক ফেল করেছে। গাড়ি চলেছে নিজের মেজাজে। আর এভাবে ঘিরে ধরেছে সিমের লতার বেষ্টনী যে বেরুবার উপায় নেই। বুড়ি পিছনে দৌড়চ্ছে ঝাঁটা হাতে। দল বেঁধে দৌড়চ্ছে ছেলের দলও।

আর দুটো গরুও পাশাপাশি দৌড়চ্ছে—তাদের নজর ছিল বুড়ির সবুজ সিমমাচার দিকে, এতদিন বাগে পায় নি। আজ চলন্ত সবুজের পিণ্ড থেকে গরু দুটো খাবলে খাবলে খাচ্ছে লতাপাতা আর দৌড়চ্ছে ধাবমান গাড়ির সঙ্গে সমান তালে।

পটলা চিৎকার করে—ব—ব—বাগান প—পার হয়ে গেল। ধ—র, বাগানকে কি কি ভাবে ধরা যায় জানি না, গাড়ি তখন একদিকে কাত মেরে চলেছে, আমরা কুপোকাত হয়ে আছি, হোঁৎকার ঠ্যাং দুটো বের হয়ে গেছে জানলা দিয়ে, সে পড়েছে পিপের মত।

পটলাদের বাগানও হড়কে গেল, গাড়ি থামে নি। গাড়ি নেচে নেচে কাত হয়ে দৌড়চ্ছে। হঠাৎ বাঁশগাছের ধাক্কায় বনেটটা উড়ে গেছে, আর বিকট শব্দে তখন মেশিনগান ফায়ারিং করে চলেছে ইঞ্জিনটা।

চিৎকার কলরব ওঠে পিছনে। গ্রামসুদ্ধ লোক চিৎকার করছে—ডাকাত! ডাকাত!

গাড়ি তবু থামে নি, পটলাও স্টিয়ারিং ধরে যুদ্ধ করে গাড়িকে রাস্তায় তোলার চেষ্টা করে চলেছে। গাড়িও এবার পথে উঠে বিকট শব্দে মেশিনগান ফায়ার করে দিগন্ত সচকিত করে চলেছে।

হঠাৎ পেছনে সাইরেনের শব্দ।

হোঁৎকা বলে—পুলিসের গাড়ি বোধ হয়। সারছে—থামা! পটলা! তরে খুন করুম!

ইংরেজ কোম্পানীর গাড়ি এবার তাক্ বুঝে রাস্তা দিয়ে হড়হড়িয়ে নেমে ছুটে চলেছে মজা ডোবার দিকে, বোধহয় এতখানি পথ দৌড়ে তারও জলতেষ্টা পেয়েছে। সর্বাঙ্গে সিমের লতা, একটা বাঁশ সিধে খাড়া হয়ে উঠেছে জয়ধ্বজের মত। বিচিত্র রথ এবার সিধে জলের টানে চলেছে, ডোবাতেই ফেলবে। নামবার পথ নাই। গাড়িতে নৃত্যবেগে দরজার লকটা জম্পেস হয়ে জমে গেছে। চিৎকার করছি। গাড়িখানা সিধে বাংলাদেশের সরস কাদার মধ্যে পড়েছে। এতক্ষণে ইংরেজের দফারফা শেষ। গাড়িখানা গর্জন করতে করতে কাদায় জলে এসে থামল। সামনে রেডিয়াটের দিয়ে তখন রেল ইঞ্জিনের মত স্টিম বের হচ্ছে। পেছনে এসে থেমেছে পুলিসের গাড়ি—আর তার পেছনে শ' চারেক মেয়ে-ছেলে লোকজনের জনতা।

টেনেটুনে বের করেছে আমাদের। কপাল ফুলে আমড়ার আঁটি কারো চোখ ঢেকে গেছে, মাথায় আব—জামা ছেঁড়া। আবৃত রক্তাক্ত পঞ্চপাণ্ডবকে বের করেছেন দারোগাবাবু! পটলা বলে ওঠে—পি—পি—পি—

দারোগাবাবু ধমকে ওঠেন—চোপ্!

হোঁৎকা বলে—সত্যি স্যার, পিকনিক কইরতা আসছিলাম—

দারোগাবাবু গর্জে ওঠে—পিকনিক না আর কিছু! কার গাড়ি?

পটলা বলে ওঠে এবার—বাবার!

লাইসেন্স আছে?

পটলার ওসব বালাই নাই। দারোগাবাবু গর্জন করেন—টেনে নিয়ে চল থানায়। তারপর দেখছি।

থানা থেকে পটলার কাকা গিয়ে ছাড়িয়ে আনলেন, তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। তারপর আর পিকনিক করা যায় নি।

পটলাকে তিন চার দিন দেখা যায় নি। ফটিক বলে—দেখলি তো, বললাম শনি ঠাকুরের পয়সা ভেঙ্গে পিকনিক করবি না—

হোঁৎকা বলে—ঠিক আছে! এই শনিবারই ঠাকুরের ভোগ দিই নরনারাণ সেবা কইরা ফ্যাল! উঃ—কি পিকনিক করতেই না গেছলাম। তর শনি মহারাজ সত্যিই জাগ্রত—খুবই জাগ্রত!

আরও কিছু বিপদ

—তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

এখন বেশ নাম হয়ে গেছে জায়গাটার। অথচ এই কিছুদিন আগেও বড় দুর্ভাবনায় রাত কাটাতে হতো এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের। তা হবে না কেন? ধারে-কাছে একটা হাসপাতাল নেই। ভাল একটা ডাক্তারখানা নেই। এমন কি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারও নেই এই চত্বরে।

সব ভাবনা দূর করল বিপদ এসে। বিপদ মানে বিপদবন্ধু। ও-ই মতলবটা দিল। বললে, আপনারা সবাই যদি মাসে মাসে কিছু করে টাকা চাঁদা দেন, তাহলে রাত্তিরের দুর্ভাবনাকে আমি একাই হটিয়ে দিতে পারব।

সকলেই আগ্রহ দেখালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ, তোমার প্ল্যানটা বল শুনি।

বিপদ বললে, প্ল্যান আমার করাই আছে। এখন আপনাদের সম্মতি পেলেই কাজে নেমে পড়ব। আপাতত একটা সাইকেল রিকশা কিনতে হবে। রাত্তিরে ধরুন কারুর বাড়াবাড়ি অসুখ করল। এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমি রিকশা নিয়ে রেডি থাকব। রুগীকে রিকশায় তুলে সাঁ-সাঁ করে পৌঁছে যাব হাসপাতালে। এইভাবে রাত্তিরে কোন বাড়াবাড়ি অসুখ হলে আর কারুর ভয় থাকবে না। আপনারা শুধু মাসে মাসে কিছু করে ডোনেশান্ দেবেন, তাহলেই হবে।

বিপদের কথায় প্রায় সবাই রাজী হলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, ছেলেটার বুদ্ধি খুব সাফ্। কেমন সোজা ব্যবস্থা। শুধু মাস গেলে গোটা কতক টাকা। তা সে তো দিতেই হবে। সরকারকে তো কত ট্যাক্সই দিতে হচ্ছে। এও তেমনি। অথচ এর বদলে আমরা হাতে হাতে কাজ পাচ্ছি। এমন নিশ্চিন্ত ভরসা দেবে কে?

অতএব সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। তবু দু'একজন গাঁইগুঁই করলেন চাঁদা দিতে। কিন্তু পাঁচজনের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন তাঁরাও। তবে যাদের অবস্থা খুবই খারাপ, তাদের রেহাই দিল বিপদ। তাদের জন্যে একটা কৌটো রাখল। মাসে মাসে সিকি আধুলি যে যেমন পারবে কৌটোতে ফেলে দেবে।

মোড়ের মাথায় বটগাছের তলায় টিনের ছাউনি দিয়ে একটা ঘর বানিয়ে ফেলল বিপদ। সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল 'রাতের বিপদ'। রাত্তিরে বিপদে পড়লে এখানে খবর দিলেই হবে। তাছাড়া রাত বারোটার পর রিকশা চালিয়ে পাড়ায় পাড়ায় একবার করে টহল দিতে লাগল বিপদ। রিকশার হর্ন বাজিয়ে জানান দিতে থাকল সবাইকে। তার মানে তখন কারুর দরকার পড়লে বিপদকে ঘরের সামনেই পেয়ে যাবে।

এই তো সেদিন বিপদ বেরিয়েছে টহল দিতে, এমন সময় সমরবাবুর বউ আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ডাকলেন, ও বিপদ, শীগ্‌গির এস বাবা। তোমার মেসোমশাই কেমন যেন করছেন।

বিপদ সঙ্গে সঙ্গে রিকশা থেকে নেমে ছুটে গেল ভেতরে। ইদানীং রুগী দেখে দেখে ওরও অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। দেখেই বুঝল হার্টের গোলমাল। অতএব আর দেরী না করে বললে, মাসীমা, এঁকে নিয়ে এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে। চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নিন।

ঠিক সময়ে সমরবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াতে তড়িঘড়ি চিকিৎসা করার সুযোগ পেলেন ডাক্তারবাবু। কিছুক্ষণ পরে আশ্বাস দিলেন, আর ভয় নেই। তবে আর একটু দেরী হলে কেস খারাপ হয়ে যেত।

সমরবাবু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পর সে কি খাতির বিপদের। সমরবাবুর বউ আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। কত আশীর্বাদ করলেন বিপদকে। বললেন, সত্যিই তুই বিপদের বন্ধু রে। তোর ভাল হবে বাবা।

এক একটা সময় আসে যখন রুগীর সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। তখন প্রায় রোজই কারুর না কারুর অসুখ। বিপদের তখন নাওয়া-খাওয়ার সময় হয় না। বারবার

হাসপাতালে ছুটতে হয় রুগী নিয়ে। কিন্তু তবু ওর মুখে হাসি লেগেই থাকে। কেউ যদি বলে, বিপদ, এত পরিশ্রম করে খুব কষ্ট হচ্ছে, না বাবা?

উত্তরে হেসে জবাব দেয় বিপদ, না না, এতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। এ খাটুনি তো মানুষকে বাঁচাবার খাটুনি। পাঁচজনের ভাল হলে ক্লান্তি আসে না, উলটে উৎসাহ বেড়ে যায়।

এ কথা শুনে বয়স্কা মহিলারা বলেন, তাই বল বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদকে কয়েকজন সহকারী নিতে হলো। তখন একা আর পেরে উঠছে না। একটা সাইকেল ভ্যানও কিনে ফেলল। কারণ খুব অসুস্থ রুগীকে সাইকেল ভ্যানে শুইয়ে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। এই সময় কয়েকজন বললেন, বিপদ, শুধু রাত্তিরের ভার নিলে চলবে না। দিনেও তোমাকে দরকার। এখানকার যা অবস্থা, তাতে দিনেও কাছে-পিঠে গাড়ি পাওয়া যায় না। তুমি বাপু দিনেও রুগীদের ভার নাও।

বিপদ হাসিমুখে রাজী। বললে, সে তো খুব ভাল কথা। আমি দু'জন ছেলে নিয়েছি, আরও দু'জন নিয়ে নেব। তাহলে আমরা ভাগাভাগি করে দিনেরাতে আপনাদের সার্ভিস দিতে পারব।

অতএব তখন চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি শুরু হল বিপদের। ছেলে চারটি খুবই কাজের। বিপদ এদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিল। এদের মধ্যে ডিউটি ভাগ করে দিল বিপদ। দু'জন রাত্তিরে আর দু'জন দিনে। আর বিপদের ডিউটি প্রায় সব সময়। রাত্তিরে বিপদ একাই একশো। দিনেও দরকার পড়লে কাজে লেগে যায়। ও শুধু দুপুরে একটা লম্বা ঘুম দিয়ে নেয়, যাতে রাত্তিরে একটুও না ঢুলুনি আসে।

পাড়ার বৌদিরা বিপদকে ডেকে বললে, তুমি ভাই থাকলে আমাদের ভরসা বাড়ে খুব। রুগী ঘেঁটে ঘেঁটে এখন তো তুমি হাফ ডাক্তার।

উত্তরে বিপদ বললে, আমি তো সব সময়ই আছি। ডাকলেই পাবেন। তবে এখন যা অবস্থা, তাতে আমার একার এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। তাই সঙ্গে আরও চারজনকে রেখেছি। ওরাও দেখবেন দু'দিনে এক্সপার্ট হয়ে যাবে। এখনই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। কোন চিন্তা করবেন না।

পাড়ার বৌদিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, কী-ই বা বয়েস অথচ দেখ কেমন পাকাপোক্তদের মতো সাহস দেয় মনে। সত্যি, বিপদের তুলনা নেই।

একদিন অনাথবাবুর বউ বিপদকে ডেকে বললেন, দেখ ভাই বিপদ, তোমার দাদার তো আমাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়ার সময় হচ্ছে না। ছুটির পরও ওঁকে আটকা থাকতে হচ্ছে আপিসের কাজে। এদিকে আমার শরীর তো দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। প্রেসার খুব বেড়েছে। তুমি আমাকে একটু নিয়ে চল না ভাই একজন ভাল ডাক্তারের কাছে।

এই কথা। কবে যাবেন? আজই চলুন শহরে ডাঃ মিত্রর চেম্বারে। খুব

অভিজ্ঞ ডাক্তার। আমাদের এখান থেকে খুব একটা দূর হবে না। ঘণ্টা দু'তিনের মধ্যেই আপনাকে ঘুরিয়ে আনবো।

তখুনি অনাথবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে গেল ডাক্তারের চেম্বারে বিপদ।

তখন প্রায় প্রতিদিনই এ-বাড়ি ও-বাড়ির বাসিন্দাদের সেবায় সব সময় হাজির বিপদ আর ওর সহকারীরা। এতটুকু গড়িমসি তো নেই, উল্টে কাজের সুবিধের জন্যে সব সময় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

এইভাবে একটা বছর পার হলো নির্বিঘ্নে। কিন্তু তারপরই শুরু হলো বিক্ষোভ। দোষের মধ্যে বিপদ প্রস্তাব করেছিল চাঁদার হার কিছু কিছু করে বাড়াতে। কারণ চারটে ছেলের খরচের জন্য যা চাঁদা সে পাচ্ছিল, তাতে ঠিক কুলিয়ে উঠছিল না।

প্রস্তাব শুনে অনেকেই তখন বেঁকে বসলেন চাঁদা দিতে। বিপদকে ডেকে বলতে লাগলেন, এই তো বাপু বছর ঘুরল, তা আমার তো একদিনও তোমাকে দরকার হলো না। আমরা টাকা দেব আর বারোমেসে রুগীরা সুখভোগ করবে। এ কেমন কথা?

এইসব অজুহাত দেখিয়ে অনেকেই চাঁদা দেওয়া বন্ধ করলেন।

বিপদ তবু হাল ছাড়ল না। ওঁদের বোঝালো, এটা আপনারা ঠিক করছেন না। একটু ভালভাবে ভেবে দেখলেই ভুল বুঝতে পারবেন। পাঁচজনের চাঁদায় যদি সকলের ভাল হয়, সেটাই তো সব মানুষের করা উচিত। অসুখ করলে তবে আমাকে দরকার। তা ধরুন যাঁদের অসুখ করছে না, সেটা তো তাঁদের ওপর ভগবানের অশেষ আশীর্বাদ। নাকি জোর করে অসুখ ডেকে আনবেন তাঁরা? তাছাড়া বলা তো যায় না কে কখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন? আজকাল তো হার্ট-অ্যাটাক লেগেই আছে।

বিপদের কথায় অনেকেই তেড়ে উঠলেন, থাক্, তোমাকে আর লেকচার্ ঝাড়তে হবে না। বসে বসে মোটা টাকা পেয়ে খুব মজা পেয়ে গেছ। ন'মাসে ছ'মাসে কারুর যদি অসুখ করে তখন নিজেরাই ব্যবস্থা করতে পারব। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?

এর উত্তরে ঠোঁটে বিদ্রূপ ফুটিয়ে বিপদ বললে, কিন্তু রাত্তিরে ভাত ছড়ালে কাকের ছায়াও দেখতে পাবেন না। যাক, আমার আর কি। বিপদে পড়লে বুঝবেন।

আর দাঁড়াল না বিপদ। রাগে জ্বলতে জ্বলতে চলে এল নিজের ডেরায়। তারপরই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

এই সময় পাড়ার এক বয়স্ক ভদ্রলোক, অশ্বিনীবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন বিপদের। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না বিপদ, চোখ মোছো। তোমার মতো ছেলের এভাবে ভেঙে পড়া উচিত নয়। মনের জোর কর। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিপদ চোখ মুছতে মুছতে বললে, আমি নিজের কথা ভেবে কাঁদছি না অশ্বিনীদা। আমার একটা পেট খেটেখুটে চালিয়ে নেব। কিন্তু এই চারটে ছেলের কী হবে? এরা যে বেকার হয়ে গেল এই বাজারে।

তখন অশ্বিনীবাবুই মতলবটা দিলেন। বললেন, ঠিক আছে, এবার অন্য পথ ধরতে হবে।

এমন সময় বিপদ এসে হাজির। [পৃঃ ১৭

তারপরই বললেন, এখানে একটা হোটেল নেই। বাস ড্রাইভার কণ্ডাক্টারদের খাবার জায়গা নেই। তার ওপর এখন ক্রমশ বসতি বাড়ছে। খদ্দেরের অভাব হবে না। খুলে ফেল একটা হোটেল।

অশ্বিনীদার প্রস্তাবটা সানন্দে লুফে নিল বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল মুখে। ওঁকে জড়িয়ে ধরে বললে, আপনি আমাকে বাঁচালেন। এ ঋণ আমি জীবনে ভুলব না।

তারপরই চৌরাস্তার ধারে হোটেল খুলে ফেলল বিপদ। অশ্বিনীবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। চারটে ছেলে আবার কাজে লেগে গেল। প্রথম প্রথম এদিক ওদিক থেকে খদ্দের ধরে আনতো ছেলেরা। তারপর ক্রমশ প্রায় সবাই জেনে গেল এর অস্তিত্ব। তখন নিজের থেকেই খদ্দের আসতে লাগল। ভিড় বাড়তে লাগল দিনে দিনে। সেই সঙ্গে আয়ও বাড়ল বিপদের। পরম নিশ্চিন্ত হলো বিপদ।

এই সময় ওই এলাকার স্বল্প আয়ের সংসারী লোকেরা এসে কেঁদে পড়ল ওর সামনে। বললে, আমরা তো কোন দোষ করি নি। আমাদের কী হবে বিপদ ভাই? আমরা তো সাধ্যমত চাঁদা দিয়ে যাচ্ছি তোমার কৌটোতে। আমরা গরিব মানুষ। বিপদে পড়লে কার কাছে যাব বল।

বিপদ ওদের আশ্বাস দিল, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। দরকার পড়লেই ডাকবেন আমাকে। আপনাদের জন্যে আমি চিরকাল রাত জাগবো।

ওঁরা সবাই প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তুমি শুধু বিপদের বন্ধু নও, গরিবের পরম বন্ধু। তোমার গায়ে কেউ যদি কোনদিন আঁচড় কাটে, তাহলে আমরা তার বদলা নেব।

বিপদের গল্প অশ্বিনীবাবুর মুখেই মাঝে মাঝে শুনলাম। অশ্বিনীবাবু আমার অফিস-

কলিগ্। একদিন তিনি বললেন, আসুন না কোন ছুটির দিন আমার বাড়িতে। বিপদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কথা বলে আনন্দ পাবেন। আপনি তো গল্প-টল্প লেখেন, বিপদের মধ্যে হয়তো আপনার লেখার কোন মাল-মসলা পেয়েও যেতে পারেন। দিনের পর দিন বিপদের কথা শুনে ওকে দেখার ইচ্ছেও হয়েছিল খুবই। তাই রাজী হয়ে গেলাম অশ্বিনীবাবুর কথায়।

এক রবিবার অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। উনি তো আমায় দেখে দারুণ খুশি। বললেন, যাক, কথা রেখেছেন তাহলে। খুশি-খুশি মনে বাড়িতে বসে অনেক আলাপ করলেন। তারপর বললেন, চলুন, বিপদের হোটেলে।

গেলাম ওঁর সঙ্গে হোটেলে। বিপদ নেই ওখানে। অশ্বিনীবাবুকে দেখে একটি ছেলে বললে, বসুন কাকাবাবু, বিপদদাকে ডেকে আনছি।

অশ্বিনীবাবু আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও বসলেন আমার পাশে। বসেই আবার শুরু করলেন বিপদের কথা। বললেন, এই হোটেলের রান্না কারা রাঁধে জানেন? এ পাড়ারই মেয়ে বউরা। ওই যে যারা বিপদকে ছাড়ে নি, সেই সব বাড়ির মেয়ে বউরা এগিয়ে এলো। বললে, কোন চিন্তা কোরো না বিপদ ভাই। আমরা টাকাপয়সা না দিতে পারলেও তোমার ঋণ গতরে খেটে শুধবো। হোটেলের রান্না আমরা রাঁধব।

এতে আরও খদ্দের বাড়ল বিপদের। যাদের ছোটো সংসার, তাদের অনেকে এখন বাড়িতে না রেঁধে দু'বেলার খাবার এখান থেকেই কিনে খায়। বলেই প্রাণ খুলে হাসলেন অশ্বিনীবাবু। তারপর আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিপদ এসে হাজির। বয়েস বছর ত্রিশ। সুন্দর স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। আমার সঙ্গে বিপদের আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, বিপদ, ইনি আমার আপিসের বন্ধু। গল্প লেখক।

বিপদ হাতজোড় করে নমস্কার করল। আমিও তাই করে বললাম, অশ্বিনীবাবুর কাছে আপনার সব কথা শুনেছি।

বিপদ হাসতে হাসতে বললে, অশ্বিনীদা আমার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেন। আপনি লেখক মানুষ। ওঁর কথা শুনে আমাকে নিয়ে যেন গল্প লিখে ফেলবেন না। উনি আমার সম্বন্ধে আপনাকে যতটা বলেছেন, আমি মোটেই তেমন কিছু নই। অতি সাধারণ একজন মানুষ। আমার মতো অনেক ছেলেই এমন করে থাকে।

অশ্বিনীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ধমকালেন, তুমি চুপ কর। খালি বিনয় আর বিনয়। এই-জন্যেই তো সবাই পেয়ে বসে তোমাকে। দিন নেই, রাত নেই, কেবল পরের উপকার। তা না হয় করলে, আর আমি বলেছি বলে দোষ হয়ে গেল।

বিপদ আবার হাসতে হাসতে বললে, আপনি যে বড্ড বাড়িয়ে বলেন অশ্বিনীদা। আমি কী এমন করেছি যা দেখে লোকে আমায় মাথায় তুলে নাচবে।

এর উত্তরে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বলা আর হলো না। এক ভদ্রমহিলা একটি চার-পাঁচ বছরের রক্তাক্ত শিশুকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন।

এসেই বিপদের সামনে ডুকরে উঠলেন, আমার এ কী সর্বনাশ হলো বিপদ ভাই। ছেলেটা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে দেখ কী কাণ্ড বাধিয়েছে। ও বিপদ, আমার যে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে ভাই। ও মাগো—বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

বিপদ সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ছেলেটাকে ওঁর কোল থেকে নিয়ে হোটেলের ছেলেটিকে বললে, পরেশ, শীগ্‌গির আমার ফার্স্ট এইড্ বক্সটা নিয়ে আয় তো।

তারপর ভদ্রমহিলাকে বললে, কোন চিন্তা করবেন না বৌদি। সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি চুপ করে বসুন।

পরেশ ফার্স্ট এইড্-এর বাক্সটা নিয়ে আসতেই বিপদ তুলোয় করে ডেটল নিয়ে কাটা জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দিল। তারপর ক্ষতস্থানগুলোর ওপর ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বললে, চলুন বৌদি, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা স্টিচ্ করাতে হবে।

তাড়া দিয়ে ভদ্রমহিলাকে রিকশায় তুলে ছেলেটিকে ওঁর কোলে শুইয়ে দিয়ে বললে, একদম ঘাবড়াবেন না। ভয় কি। আমি তো আছি।

এই বলে রিকশার সীটে বসে আমাকে বললে, আজ আর কথা হলো না। আর একদিন নিশ্চয়ই আসবেন।

ওর রিকশা চলে গেল। আমি তখন ওর কথাই ভাবছি। ভাবছি, বিপদের মতো যদি আরও কিছু বিপদ আমাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে পৃথিবীটা আরও বেশী বাসোপযোগী হয়ে উঠবে।

———
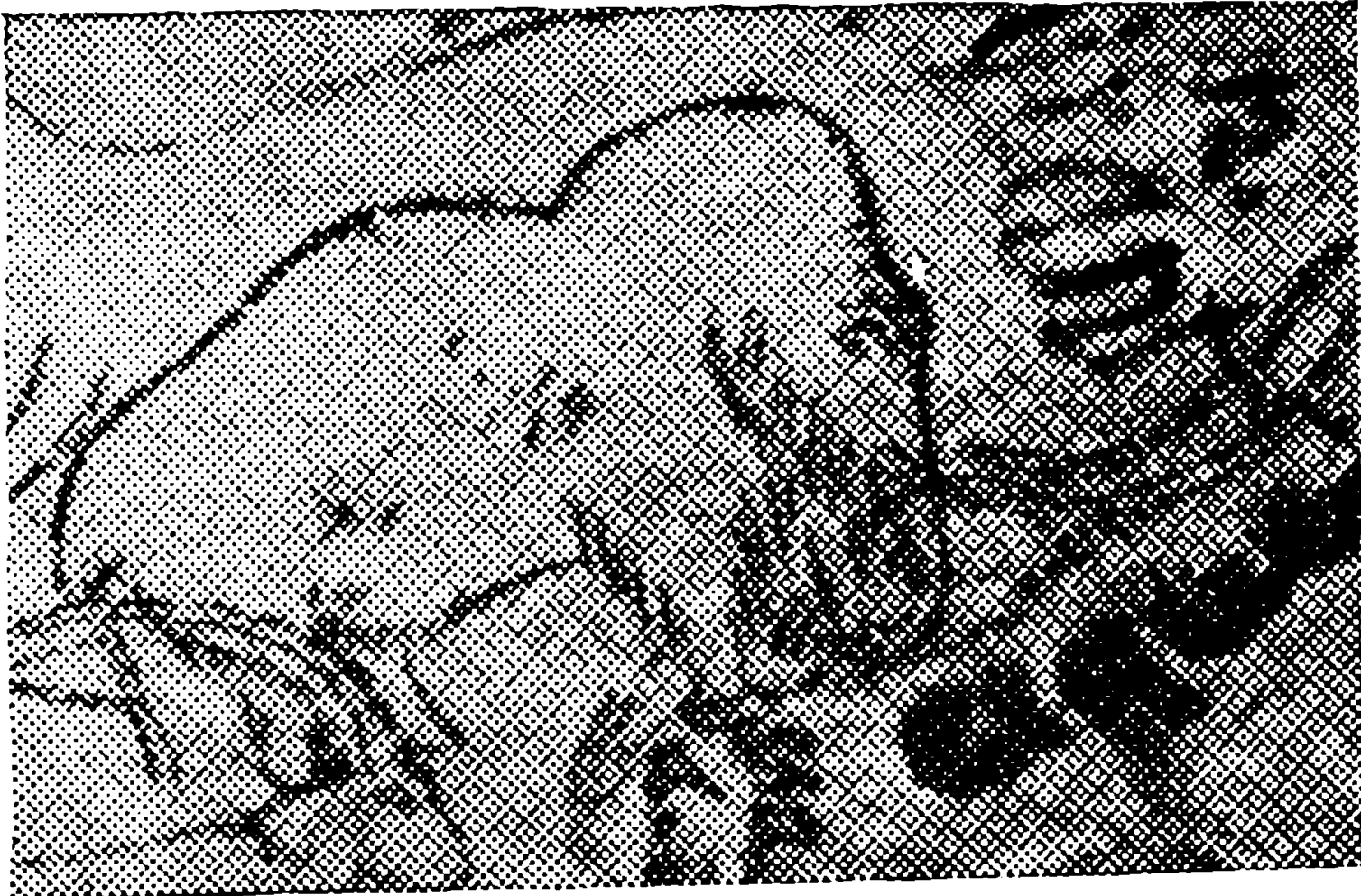
মণি ও মুক্তা

পাশের ছবিটি খ্রীস্টপূর্ব ২০,০০০ বছর পূর্বেকার কোন এক অজ্ঞাত শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত 'ম্যামথ'-এর অতি চমৎকার একটি গুহা-চিত্র, বিশ-বাইশ হাজার বছর অন্ধকারে থাকবার পর সম্প্রতি এটি আবিষ্কৃত হয়েছে ফরাসী দেশের রৌফিগনাক নামক স্থানের এক গুহার অভ্যন্তরে।

পদ্মার চরে ভয়ংকর

—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ডানপিটে বেপরোয়া মানুষদেরও অদ্ভুত অদ্ভুত কুসংস্কার থাকে। দুর্দান্ত শিকারী জিম করবেট মানুষখেকো বাঘ মারতে গিয়ে আগে একটা সাপ মারতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে একটা সাপ না মারতে পারলে তিনি কিছুতেই বাঘটা মারতে পারবেন না। ব্রিটেনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধুরন্ধর গোয়েন্দা কিলবার্ন কোনো হত্যা রহস্যের কিনারা করার আগে একটা ঘুঘুপাখি কিনে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে একটা ঘুঘুপাখিকে মুক্তি না দিলে তাঁর গোয়েন্দাগিরি ব্যর্থ হবে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ডানপিটে তো বটেই, তিনি শিকারেও যেমন দক্ষ, গোয়েন্দাগিরিতেও তেমনি ধুরন্ধর। কাজেই তাঁর ওই রকম একটা কুসংস্কার থাকা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, স্বাভাবিক। কিন্তু এতকাল তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করেও সেটা টের পাই নি, এটাই আশ্চর্য। আসলে আমি এখনও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বোকা, মুখে যতই চালাকির ভান করি নে কেন।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টে তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়। কোঠারিগঞ্জ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা পদ্মার চরগুলোর খবর নিচ্ছিলুম। ক্যাপ্টেন নটবর সিং বলছিলেন, এই ম্যাপটা বরং সঙ্গে রাখুন আপনারা। চিহ্ন দেওয়া এই চরগুলো আমাদের ভারতের। দিনের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারেন। তবে কখনো রাতবিরেতে

যাবেন না। ডাকাত আর স্মাগলারদের তখন গতিবিধি শুরু হয়। আমাদের জওয়ানদের সঙ্গে অনেক সময় সংঘর্ষও বাধে।

কর্নেল মন দিয়ে ম্যাপটা দেখছিলেন। দেখার পর বললেন, আচ্ছা হাবিলদার সায়েব, এই একটা প্রকাণ্ড চর আঁকা আছে দেখছি। এর গায়ে লাল চিহ্ন দেওয়া কেন?

নটবর সিং একটু হেসে বললেন, ওটা ডিসপুটেড অর্থাৎ বিতর্কিত চর। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ওই চরটা নিয়ে ঝগড়া আছে। অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মীমাংসা হয় নি এখনও। শুনছি আগামী মে মাসে দিল্লিতে আবার দু' দেশের মধ্যে বৈঠক বসবে। তখন 'পীরের চর' নিয়ে কথা উঠবে।

কী চর বললেন? 'পীরের চর' না কী যেন? কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন।

নটবর সিং বললেন, হ্যাঁ। পীরের চর। চরটা বেশ বড়। প্রায় সবটাই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলের ভেতর এক পীর বাবার কবর আছে। কবরের ওপর ভাঙাচোরা একটা দালান বাড়ি রয়েছে। আগে ওখানে পদ্মার ওপার-এপার দুই পারের হিন্দু মুসলিম ভক্তরা মানত করতে যেত। তারপর নাকি কী সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। ভয়ে লোকেরা পীরের থানে যাওয়া ছেড়ে দিল। জঙ্গল গজিয়ে গেল।

কর্নেল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অদ্ভুত ঘটনাটা কী?

নটবর সিং হাসতে লাগলেন—একজোড়া বাঘ।

বাঘ! কর্নেল অবাক হয়ে বললেন। বাঘ তো জঙ্গলেই থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা বলছেন কেন?

অদ্ভুত এ কারণে যে ওই একজোড়া বাঘ মাঝে মাঝে মানুষের গলায় শাসাত। নটবর সিং তামাশার ভঙ্গিতে বললেন। আমি স্যার পীরের চরে গোপনে বার দুই গেছি, কিন্তু বাঘ দেখা তো দূরের কথা, একটা শেয়ালও দেখি নি। এ তল্লাটের লোকের কাছেই ব্যাপারটা শুনেছিলাম। অথচ এ কিন্তু সত্যি, পীরের চরে আর ভুলেও কেউ পা বাড়ায় না।

আমি এতক্ষণ কান করে শুনছিলুম। এবার বললুম, কারা বাঘের চামড়া পরে বাঘ সেজে লোককে হয়তো ভয় দেখাত।

নটবর সিং বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি। স্মাগলারদের ঘাঁটির কথাও ভেবেছি। তারাই হয়তো ওভাবে ভয় দেখাত। কিন্তু লোকের মনে একবার আতঙ্ক ঢুকলে আর তো বেরোয় না। পীরের চরে যাওয়া সেই থেকে বন্ধ। আর এখন তো দু'দেশের সরকারই মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পীরের চরে কাউকে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

কর্নেল ম্যাপ থেকে মুখ তুলে কী দেখছিলেন। গঞ্জের বাইরে এই ক্যাম্প। আমবাগানের ভেতর কয়েকটা তাঁবু। নীচে পদ্মা বয়ে যাচ্ছে। বসন্তকালের সকালের রোদে নদীর জল আর মাঝে মাঝে ধু-ধু চর, কোথাও চরে ধূসর কাশবন, একটা বিরাট বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র আর মরুভূমি পাশাপাশি শুয়ে আছে।

কর্নেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ওহে! শোনো—শোনো!

ক্রাচে ভর করে একটা ভিখিরী গোছের নোংরা ছেঁড়াখোড়া পোশাকের লোক যাচ্ছিল গঞ্জের বাজারের দিকে। কর্নেলের ডাকে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দিকে আসতে থাকল।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার হ্যাণ্ডশেক করে সহাস্যে বললেন, গুড মর্নিং, মাই ফ্রেণ্ড!

খোঁড়া লোকটি তো হতবাক। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কর্নেল পকেট থেকে পার্স বের করে আস্ত একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। লোকটার চোখ আরও বড় হয়ে গেল। কর্নেল তার হাতে হাত রেখে ফের ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, গুড বাই, মাই ফ্রেণ্ড! আবার দেখা হবে।

লোকটি ক্যাপ্টেন সিং আর সেপাইদের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে যেভাবে টাট্টু ঘোড়ার মতো ক্রাচ খটমটিয়ে দ্রুত চলে গেল, বুঝলুম—এত বেশি টাকা সে জীবনে ভিক্ষে পায় নি এবং ভেবেছে, হাবিলদার আর সেপাইদের এ ব্যাপারটা মনঃপূত নয়—এক্ষুণি তাই ভাগ চেয়ে বসলেও বসতে পারে। অতএব কেটে পড়াই ভাল।

নটবর সিংও আমার মতো অবাক হয়েছিলেন। বললেন, ওই বজ্জাতটাকে দশ টাকা ভিক্ষে দিলেন স্যার, ও তো এবার নেশা-ভাঙ করবে আর জুয়ো খেলতে যাবে। ওকে আপনি চেনেন না!

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, ও কিছু না। আচ্ছা হাবিলদার সায়েব, বেলা বাড়ছে। আমরা তাহলে আসি। এস জয়ন্ত!

ক্যাম্পের সবাই তেমনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমরা চলতে থাকলুম পদ্মার পাড়ে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন, সচরাচর কেউ ভিখিরীকে দশ টাকা দেয় না। তাই ওরা অবাক হয়েছে। বুঝলে জয়ন্ত?

বললুম, অবাক আমিও কম হই নি।

ডার্লিং! কর্নেল সস্নেহে আমার একটা হাত হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তুমি ভালই জানো, ইচ্ছে থাকলেও খুব একটা দান-ধ্যানের ক্ষমতা আমার নেই। তবে কোনো শুভ কাজে বেরুনোর আগে হঠাৎ কোনো প্রতিবন্ধীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেটাকে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। বহুবার বহু ব্যাপারে ঠিক বেরুনোর মুখে অন্ধ, খোঁড়া কিংবা বিকলাঙ্গ মানুষ দেখতে পেলেই সে কাজটা সফল হয়েছে। তাই আমি এসব সময়ে তেমন কোনো মানুষ দেখতে পেলে দশ টাকা কেন, আরও বেশি দান করতে রাজী।

এ কিন্তু আপনার নিছক কুসংস্কার।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'কু' কিংবা 'সু' জানি নে—তবে এটা আমার সংস্কার। তাছাড়া এটা আমার বহুবার পরীক্ষিত।

হাসতে হাসতে বললুম, বাংলা প্রবাদ কিন্তু উল্টোটাই বলে। বলে কী জানেন? প্রতিবন্ধী দর্শনে যাত্রা নাস্তি। যাত্রারম্ভে হাঁচি-টিকটিকির বাধার মতো।

কর্নেল চুপচাপ হাঁটছিলেন। তাঁর মাথায় এখন ধূসর রঙের টুপি। কড়া রোদে টাক

জ্বলে যাবে। সাদা দাড়ি পদ্মার জোরালো হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। পিঠে হ্যাভারস্যাক, গলায় ঝুলছে সেই অত্যদ্ভুত ক্যামেরা—যা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ এবং একটি বাইনোকুলার।

আমার পিঠে বন্দুক, পকেটে কয়েকটা গুলিও আছে। জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়েছি। পিঠে একটা কিটব্যাগে কিছু জামাকাপড়, ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম ইত্যাদি।

বরাবর এভাবেই কর্নেলের সঙ্গে আমি বেরোই। এবার মার্চের শেষাশেষি মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পদ্মার পাড় ধরে এই অভিযানের উদ্দেশ্য বুনো হাঁস শিকার। নীতিগতভাবে পশুপাখিকে গুলি করে মারার আমি বিরোধী। কিন্তু হিমালয় পারের লক্ষ লক্ষ যাযাবর হাঁসের দু'চারজনকে মেরে সুস্বাদু মাংস ভোজনে এমন কিছু পাপ হবে বলে মনে করি নে।

কর্নেলের উদ্দেশ্য চিরাচরিত। বিরল প্রজাতির পক্ষী দর্শন এবং ফটো তোলা। পদ্মার চরে কী এক প্রজাতির জলচর পাখি আসে নাকি—যা হাঁস এবং বকের মাঝামাঝি গড়নের। ঠোঁট এবং মাথা হাঁসের মতো, পা এবং শরীর বকের মতো। এই কিম্ভূত বিদঘুটে পাখির নাম দিয়েছি বখাঁস। বক ও হাঁসের সন্ধি। কিন্তু কর্নেল তামাশায় কান দেন নি।

আমবাগান, ঝোপঝাড়ে ভরা জমি, কোথাও চষা ক্ষেত আর বাঁ দিকে পদ্মা রেখে আমরা হাঁটছিলুম। পাড় বরাবর একটা সরু পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চাষাভুষো লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তারা সবাই যাচ্ছে কোঠারিগঞ্জ বাজারে আনাজপাতি বেচতে।

একটা পুরনো মন্দির পড়ল পথের পাশে। একটু তফাতে একটা বসতি। মন্দিরের চত্বরে কয়েকজন লোক জাল বুনছে—কেউ জাল শুকোতে দিয়েছে। আমাদের দেখে তারা কাজ ফেলে তাকিয়ে রইল। কর্নেল ওদের উদ্দেশে ভদ্রতাসূচক হেসে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। ওরা হাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝলুম, আস্ত সায়েব দেখে ওরা ভড়কে গেছে। কর্নেলকে দেখে এমন ভুল তো সবাই করে। কিন্তু কর্নেল যখন বললেন, পদ্মায় কেমন মাছ হচ্ছে-টচ্ছে? ওরা সায়েবের মুখে বাংলা শুনে তখন খুশি হয়ে একসঙ্গে কলকল করে জবাব দিতে থাকল।

তা স্যার, মাছ হচ্ছে বৈকি কিছু কিছু। কিন্তু আজকাল বর্ডারের সেপাইরা বেশি দূরে যেতে দেয় না। তার ওপর চোর-ডাকাতও ওপার থেকে এসে হামলা করে। মাছ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কর্নেল বললেন, শুনেছি পীরের চরের ওদিকে পদ্মার একটা পুরনো খাদ আছে। সেখানে তো খুব মাছ পাওয়া যেতে পারে। তাই না?

ওদের সর্দার চোখ বড় করে মাথাটা জোরে দোলাল। তারপর ভয় পাওয়া গলায় বলল, না স্যার। সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। পীরের চর থেকেও ভয়ঙ্কর।

কেন বলো তো?

জেলে সর্দার বলল, ওই খাতের নাম রাক্ষুসীর বাঁওর। লোভে পড়ে ওখানে মাছ ধরতে গিয়ে আমাদের গাঁয়ের অনেক লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমার বড় ছেলে—নাম ছিল গণেশ। ইয়া বড় বুকের ছাতি—পেল্লায় চেহারা। তিন বছর আগে বারণ না মেনে রাক্ষুসীর বাঁওরে গেল—আর ফিরে এল না।

জেলে সর্দার ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে কান্না সামলে নিল। কর্নেল ম্যাপটা খুলে জায়গাটা দেখতে দেখতে বললেন, হুম! ভারি ভয়ঙ্কর জায়গা তাহলে।

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আমরা আপাতত যাব 'মহিমবাবুর চরে', কর্নেল বললেন। সেখানে নাকি প্রচুর বুনো হাঁস দেখা যায়।

তা যায় বটে! জেলে সর্দার বলল। কিন্তু হাঁসের দেখা বেশি মেলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে। শীত পর্যন্ত এত হাঁস দেখা যায়, পদ্মার জল কালো হয়ে ওঠে যতদূর চোখ যায়। এখন তো স্যার শীত ফুরিয়েছে, এখন তত বেশি নেই। তবে আছে—সারা বছর যারা থাকে, তারা আছে। তাদের সংখ্যাও কম নয়। দেখবেন গিয়ে?

কর্নেল বললেন, হুম! সে কথা আমিও শুনেছি। পদ্মার চর এলাকায় বারো মাস শুধু হাঁস কেন, কত রকমের পাখির আড্ডা। তাই না?

আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন।

লোকগুলোকে সিগারেট বিলি করলুম কর্নেলের আদেশে। কর্নেল তো চুরুট ছাড়া চলেন না। চুরুট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ খবরাখবর নিলেন। তারপর আমরা ফের হাঁটতে থাকলুম ওদের কাছে বিদায় নিয়ে। কথা আছে, মহিমবাবুর চরে গিয়ে ডেরা পাতব। ওখানে আগে থেকে একটা নৌকো নিয়ে লোক থাকবে।

নির্জন রাস্তা। বড় বড় গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। একটা বটগাছের তলায় পৌঁছেছি, পেছনে ক্রিং-ক্রিং সাইকেলের ঘণ্টি শুনতে পেলুম।

ঘুরে দেখি, কোঠারিগঞ্জে রাতে যাঁর বাড়িতে ছিলুম, সেই সদাশিববাবুর নাতি মোহনবাবু আসছেন সাইকেলে চেপে। পিঠে বন্দুক। ব্যাপার কী? উনি না আজ ভোরবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন?

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন, হ্যাল্লো মোহন! আমি জানতুম, তোমার কলকাতা যাওয়া হবে না।

মোহনবাবু বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী কর্নেল?

কতকটা। কর্নেল সহাস্যে বললেন। রাতে তোমার দাদুর সঙ্গে তোমার কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারছিলুম, আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে তোমার যতটা টান, দাদুর কাজে কলকাতা যাওয়ায় ততটা নেই। কাজেই ধরেই নিয়েছিলুম, তুমি ট্রেন ফেল করবে।

মোহনবাবু আমার সমবয়সী যুবক। খুব হাসিখুশি স্বভাবের। সাহসী বলেও মনে

হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন এই এলাকায় পাটকাঠি থেকে কাগজ তৈরির কারখানা গড়ার চেষ্টা করছেন। এ এলাকায় প্রচুর পাট চাষ হয়।

মোহনবাবু বললেন, দেখুন কর্নেল, দাদুর কাজ দু'দিন পরে হলেও চলবে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গ তো আর পাব না। আপনাদের দুজনের কীর্তিকথা এতকাল কাগজে পড়েছি। হঠাৎ কপাল গুণে আপনারা যে এই জঙ্গলে পাণ্ডববর্জিত এলাকায় এসে পড়বেন, কল্পনাও করি নি। তা আবার আমাদের বাড়িতেই!

কর্নেল সস্নেহে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার বাবা এ জেলার প্রখ্যাত শিকারী ছিলেন। ওড়িশার জঙ্গলে যখন মানুষখেকো বাঘ শিকারে গিয়ে প্রমথনাথ মারা যান, আমি তাঁর সঙ্গী ছিলুম। তোমার বয়স তখন খুব কম। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝে গেছি অবশ্য।

মোহনবাবু বললেন, মায়ের কাছে সব শুনেছি। দাদুও বলছিলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা আরও মাইলটাক এগিয়ে মহিমবাবুর চরের এলাকায় পৌঁছলুম। বাঁ দিকে পদ্মার জল অনেকগুলো বালির ঢিবির আনাচ-কানাচ ঘুরে বয়ে যাচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বুঝি মহিমবাবুর চর খুঁজছিলেন। সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে মোহনবাবু একটা খাড়ির ধারে গিয়ে কাদের ডাকতে থাকলেন।

একটু পরে ফিরে এসে বললুম, চলুন, নৌকো রেডি।

বালি-কাদা ভরা পিছল খাড়িতে একটা পানসি নৌকো নিয়ে মাঝিরা অপেক্ষা করছিল। নৌকোয় চেপে আমরা চললুম সেই চরের দিকে। চরটা দেখা যাচ্ছিল না। শুনেছি, মহিম হালদার নামে কেউ বহুকাল আগে ওই চরে গিয়ে বসতি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবার বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যেত। তারপর থেকে চরটা জনহীন হয়ে পড়ে আছে। শুধু মহিমবাবুর পুরনো একতালা ইটের বাড়িটা রয়ে গেছে। সেখানে মাঝে মাঝে সীমান্ত বাহিনী গিয়ে ক্যাম্প করে থাকে। এখন সীমান্ত এলাকা শান্ত বলে তারা ওখানে নেই।

ঘণ্টা তিনেক লাগল পৌঁছুতে।

মাঝিরা নৌকোয় থাকল। তারা রান্নাবান্না করবে এখন। আমরা যতক্ষণ থাকব, ওদেরও থাকতে হবে।

ঘন কাশবন আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা চর। উঁচু গাছের সংখ্যা খুব কম। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা জীর্ণ দালান বাড়ি। সীমান্ত বাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েকটা খাটিয়া রয়েছে ঘরে। জানলা-দরজা ফেটে রয়েছে। বারান্দায় একটা উনুন দেখতে পেলুম। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, ওটাই বুঝি সেই পীরের চর?

খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল, মাইলটাক দূরে পদ্মার বুকে একটা ঘন সবুজ দ্বীপ। চারদিকে জল। মোহনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ কর্নেল, ওখানেই নাকি দুটো বাঘ মানুষের গলায় কথা বলত।

আর রাক্ষুসীর বাঁওর কোন্‌টা?

মোহনবাবু আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন, তাও কানে গেছে? ওই দেখুন —পীরের চরের ডান দিকে পদ্মা খানিকটা ঢুকে গেছে বিলের মতো—দেখতে পাচ্ছেন? ওটাই সেই ভূতুড়ে বাঁওর।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে হঠাৎ বললেন, আশ্চর্য তো!

আমরা দুজনে এক গলায় বললুম, কী?

একটা স্পীড-বোট।

মোহনবাবু কর্নেলের কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন বাইনোকুলার। দেখতে দেখতে বললেন, তাই তো! আমাদের সীমান্ত বাহিনীর গোটা দুই স্পীড-বোট আছে বটে, সে তো সেই লালগোলা ক্যাম্পে। তাছাড়া এ স্পীড-বোটের গড়নও অন্যরকম।

আমি বললুম, বাংলাদেশের নয় তো?

কর্নেল বললেন, না। কারণ স্পীড-বোটে একটা স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা আছে। আর একটা মড়ার খুলি এবং তার তলায় আড়াআড়ি দুটো হাড়ও আঁকা। তার মানে, সাবধান! আমি সাক্ষাৎ মৃত্যু!

বলেন কী! অজানা ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার।

মোহনবাবু বললেন, স্পীড-বোটে জনা চার লোক বসে আছে। ওরে বাবা! একটা সাব-মেশিনগান ফিট করা আছে দেখছি। কর্নেল! কর্নেল! ওরা পীরের চরের দিকে এগোচ্ছে।

কর্নেল বললেন, যাক্ যার যেখানে খুশি। আমরা তো পাখির ব্যাপারে এসেছি! ইয়ে—ডার্লিং জয়ন্ত! তাহলে এবার সঙ্গের খাদ্যগুলোর সৎকার করে নিয়ে বেরুনো যাক। রোদ্দুরটা খাসা। আবহাওয়াও মোলায়েম। ওই দেখ, কত পাখি! জয়ন্ত! বিশ্বাস করো, একসঙ্গে এত বেশি জলচর পাখি কখনও দেখি নি! অভূতপূর্ব! বিস্ময়কর!

দুই

অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়করই বটে। এমন লক্ষ লক্ষ, নাকি কোটি কোটি জলচর পাখির সমাবেশ কোথাও দেখি নি। যতদূর চোখ যায়, খালি পাখি আর পাখি। তাদের চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। জল থেকে এখানে ওখানে বালির চর জেগে রয়েছে। সেইসব চরে অসংখ্য পাখি বিশ্রাম করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ছে। আবার ছল-ছলাৎ শব্দে জলে নামছে। মনে হচ্ছে একটা দীর্ঘ চাবুক আকাশ থেকে কেউ সপাং করে জলে মারল।

বন্দুকের আওয়াজ করলে কর্নেলের সেই 'বর্থাস' দর্শন হবে না। তাই উনি আমাকে আর মোহনবাবুকে দক্ষিণে যেতে বলে একা গেলেন চরের উত্তর দিকে। কাশবনের আড়ালে ওঁর টুপিটি দেখা যাচ্ছিল। আমরা চরের দক্ষিণ দিকে ঢালুতে নেমে আর ওঁকে দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোহনবাবুর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে আমরা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করলুম এবং নাম ধরে ডাকাডাকি চলল।

মোহন বলল, আজকাল এত বেশি জলচর পাখি নির্ভয়ে এ তল্লাটে এসে জুটছে কেন জানো? এদিকে কেউ পা বাড়ায় না বলে। এসব পাখি মারা বেআইনী। কিন্তু সেজন্যে নয়। প্রথম কথা, বর্ডার বাহিনীর নিষেধাজ্ঞা আছে। দ্বিতীয় কথা হল, পীরের চর আর রাক্ষুসীর বাঁওর সম্পর্কে লোকের ভীষণ আতঙ্ক। যারা এদিকে একা-দোকা এসেছে, তারা আর কেউ ফিরে যায় নি।

চরের এদিকটা ঢালু হয়ে জলে নেমেছে। সমুদ্রের বেলাভূমির মতো। একেবারে ফাঁকা এদিকটা, শুধু ধু-ধু বালি। আমাদের দেখামাত্র বুনো হাঁসের ঝাঁক উড়ে দূরে গিয়ে বসল। বন্দুকের পাল্লার বাইরে। অনেক ঘোরাঘুরি করেও গুলি ছোড়ার সুযোগ পেলুম না।

দেখতে দেখতে রোদ কমে এল। তারপর টের পেলুম, হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মোহন বলল, আমাদের বরাত মন্দ জয়ন্ত! পাখিগুলো দেখছি মহা ধড়িবাজ! কী আর করা! কাল ভোরবেলা অন্যদিকে বেরনো যাবে। এখন ফেরা যাক্।

মহিমবাবুর চর বেশ লম্বা-চওড়া। লম্বায় মাইলটাক না হয়ে যায় না। চওড়াতেও মনে হল প্রায় পৌনে এক মাইল। কাশবন, বালিয়াড়ি, কাঁটাঝোপের ভেতর ঘোরাঘুরি করে ধূর্ত পাখিগুলোকে যখন কিছুতেই বন্দুকের নাগালে পেলুম না, তখন ডেরায় ফিরে গেলুম।

কর্নেল ফিরলেন সন্ধ্যা নাগাদ। তখন পুবে মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা তাহলে। জ্যোৎস্না ফুটতে ফুটতে আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল। নৌকোর মাঝিরাও এসে জুটল। ওরা নৌকোয় রাত কাটাতে নারাজ। আগের ব্যবস্থা মতো লণ্ঠন আর রান্নার সরঞ্জাম নৌকোয় ছিল। সব বয়ে নিয়ে এল। ভেবেছিলুম, বুনো হাঁসের মাংসের ঝোল খেয়ে পদ্মার এই বেমক্কা ঠাণ্ডাটা ঠেকাব। হল না। তবে মাঝিরা বুদ্ধি করে জাল ফেলে কিছু মাছ ধরেছিল।

কর্নেলেরও আমাদের মতো মন ভাল নেই। অনেক হাঁটাহাঁটি আর জল-কাদা-বালিতে উপুড় হয়ে 'বখাঁস' দেখার চেষ্টা করেছেন। থাকলে তো?

কর্নেলের মতে, নিশ্চয় আছে। এক পক্ষীবিদ্ সায়েবের বইতে পড়েছেন। বোম্বাইয়ের নামকরা পক্ষীবিদ্ সেলিম আলিও লিখেছেন পদ্মার চরের এই আশ্চর্য জলচর পাখির কথা।

রাত আটটার মধ্যে শালপাতায় মোটা চালের ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়া হয়ে গেল। সায়েব মানুষ কর্নেলও খুব তারিয়ে তারিয়ে চেটেপুটে খেলেন এবং মাঝিদের রান্নার সুখ্যাতি করলেন।

তারপর এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। এখনই পীরের চরে যেতে চান। ইচ্ছে করলে আমরাও ওঁর সঙ্গে যেতে পারি।

কিন্তু যেতে হলে নৌকো চাই। মাঝিরা আতঙ্কে কাঠ হয়ে বলল, তারা প্রাণ গেলেও পীরের চরে যাবে না। দিনেই যাবে না, তো এই রাতের বেলায়! সায়েবের কি মাথা খারাপ! ওদিকে যে যায়, সে আর ফেরে না।

মোহন বলল, ঠিক আছে। আমি নৌকো বাইতে জানি। এ দেশের ছেলে। এ কাজটা ভালই পারি। জয়ন্ত, তুমি নৌকো বাইতে পারো তো?

জোরে মাথা নেড়ে বললুম, মোটেও না। কর্নেলও পারেন না।

কর্নেল বললেন, তুমি কি ভুলে গেলে জয়ন্ত? ভারত মহাসাগরের টোরা দ্বীপ থেকে একবার একা ভেলায় পাড়ি জমিয়েছিলুম প্রাণের দায়ে! আর এ তো পদ্মা!

তাও বটে। এ বুড়োর অসাধ্য কাজ কিছু থাকতে নেই। কিন্তু দ্বিধা জড়ানো গলায় বললুম, এই রাত-বিরেতে ওই জঙ্গুলে চরে কি না গেলেই চলে না? বরং সকালে যাওয়া যাবে।

একজন মাঝি ভয় দেখিয়ে বলল, স্যার, পীরের চরের জোড়া বাঘ এখনও শুনেছি আছে। তাছাড়া প্রচণ্ড সাপের উৎপাত আছে। কেউটে-গোখরো তো আছেই, আর আছে অজগর সাপ। স্যার, আমি দূর থেকে একবার দেখেছি, অজগর সাপটা মাথায় মণি নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর চারদিকে আলো ঠিকরে পড়ছে। জঙ্গল আলো হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করুন।

কর্নেল কানে নিলেন না। মোহনের মুখেও দ্বিধার চিহ্ন নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে টর্চ আছে। প্রত্যেকের পায়ে গামবুট আছে। দুটো বন্দুক আছে। কর্নেলও নিশ্চয় তাঁর রিভলভারটা সঙ্গে এনেছেন।

জ্যোৎস্নার রাতে পদ্মায় নৌকো করে যাওয়ার আনন্দ আছে। বারবার মনে পড়ছে সেই ভয়ঙ্কর স্পীড-বোটটার কথা। কারা ওরা? ওদের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওরা যে ভাল মানুষ নয়, তা তো বোঝাই গেছে। বোটের গায়ে মড়ার খুলি আঁকার মানে একটাই—তা হল, 'আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যু।' কর্নেল দাঁড়ে বসেছেন। মোহন একা আলতো হাতে বৈঠা বাইছে। আমরা যাচ্ছি স্রোতের ভাটিতে। তাই নৌকো তরতর করে এগোচ্ছে। আমি পানসির ছাদে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে উঁচু পাড়, অন্যদিকটায় জল। কিছুদূর যাবার পর নৌকো কোণাকুণি চলতে থাকল। পাড় থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলাম।

জ্যোৎস্নায় চারদিক কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছিল, ভুল করে বাংলাদেশের সীমানায় গিয়ে পড়ব না তো?

কর্নেলকে না বলে পারলুম না—পীরের চর তো দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে অন্য কোথাও নৌকো নিয়ে গেলেই মুশকিল।

কর্নেল পানসির পেছন থেকে জবাব দিলেন, এবার নাক বরাবর। তাছাড়া ওই দেখ আলো।

আলো মানে? চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলুম।

মোহনও মুখ ফেরাল। বলল, সর্বনাশ! ওটা তাহলে সেই স্পীড-বোটের আলো!।

কর্নেল বললেন, না। আলোটা উঁচুতে। তার মানে পীরের চরের জঙ্গলে।

আলোটা দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। বললুম, কর্নেল! জনমানুষহীন পীরের চরে কেউ নিশ্চয় আলো হাতে আমাদের বরণ করার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বরণ কীভাবে করবে, সেটাই একটু ভাবনার কথা।

কর্নেল কোনো জবাব দিলে না। ওদিকে আলোটা নড়তে নড়তে হঠাৎ যেন নিভে গেল। বন্দুকটা শক্ত করে চেপে ধরলুম।

তারপর টের পেলুম, আমাদের নৌকো বিশাল এক ঝাঁক পাখির দিকে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার পাখি ভয় পেয়ে উড়তে শুরু করল। অনেক বেপরোয়া পাখি তরতর করে জল কেটে দূরে সরে যেতে থাকল। চারদিকে প্রচণ্ড একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। জলের শব্দ, ডানার শব্দ, আঁক-আঁক টঁ্যা-টঁ্যা চিৎকার। একটু পরে সামনে কালো পাহাড়ের মতো আবছা ভেসে উঠল পীরের চর।

জলে ঝোপঝাড় ঝুঁকে আছে। ঘন কালো তাদের রঙ। অন্ধকার ওত পেতে আছে যেন আমাদের জন্য। নৌকো ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করে একস্থানে ফাঁকা বালির তট পাওয়া গেল। সেখানে নৌকো বেঁধে রাখা হল একটা ঝোপের সঙ্গে। তারপর আমরা ঢালু পাড় বেয়ে উঠে গেলুম পীরের চরে।

কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, কোনো কথা নয়। চুপচাপ আমার পেছন পেছন এস। দরকার হলে আমিই টর্চ জ্বালব—তোমরা জ্বেলো না যেন।

ওপরে মাটিটা শক্ত। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বড় বড় গাছ আছে। চাঁদের আলো পড়েছে চকরা-বকরা হয়ে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সাপের ফোঁস শুনতে পাব। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে ভয়টা কেটে গেল। বিষধর সাপ পায়ে ছোবল মেরে সুবিধে করতে পারবে না, পায়ে গামবুট রয়েছে আমাদের।

সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেখানে যেতেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম। ডাইনে সম্ভবত একটা বটগাছ। জ্যোৎস্নায় অজস্র ঝুরি দেখা যাচ্ছে মনে হল। ঝুরিগুলোর ভেতর একখানে জ্যোৎস্না পড়েছে। আর সেই জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো বাঘ আপন মনে খেলা করছে। তাদের লেজ দুটো খুব নড়াচড়া করছে। পরস্পর কামড়াকামড়ি আর জড়াজড়ি করে ওরা খেলছে।

কর্নেলের ইশারায় আমরা বসে পড়লুম। বন্দুক বাগিয়ে রইলুম, যদিও জানি, পাখিমারা কার্তুজে বাঘের একটুও ক্ষতি করা যাবে না। অবশ্য আওয়াজে ভড়কে যেতেও পারে।

তাহলে পীরের চরে জোড়া-বাঘের গল্পটা মিথ্যে নয়। এখন দেখা যাক, তারা মানুষের গলায় কথা বলে কি না?

বাঘ দুটোর খেলা আর শেষ হয় না। কতক্ষণ পরে এবার যা দেখলুম, চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবত যে আলোটা দেখেছিলুম, সেইটেই হবে। দুলতে দুলতে

কোত্থেকে এল। তারপর আলোর ছটায় আবছা দেখা গেল একটা অদ্ভুত চেহারার মানুষকে। কালো আলখেল্লায় ঢাকা আপাদমস্তক। নাকটা বাঁকা বাজপাখির ঠোঁটের মতো। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সে বাঘ দুটোর কাছে এসে লণ্ঠন নামিয়ে রাখল। তখন বাঘ দুটো তার পায়ে মাথা ঘষতে থাকল।

লোকটা বাঘ দুটোর পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল, খুব হয়েছে! এবার নিজের কাজে যাও বাবারা! চারিদিকে চক্কর মেরে নজর রাখবে। হুঁশিয়ার!

বাঘ দুটো পেছনের দু'পা গুটিয়ে সামনের দু'পা সোজা রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। আলখেল্লাধারী ফের বলল, হাঁ করে দেখছ কী বাবারা? আজ শয়তান কাশিম খাঁকে দেখেছি মোটর-বোট নিয়ে রাক্ষুসীর বাঁওরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খবরদার! শয়তানটা যেন এ পবিত্র মাটিতে পা রেখে নোংরা করে না।

বাঘ দুটো দুদিকে চলে গেল। ভাগ্যিস, আমাদের দিকে এল না। এলে কী হত, ভাবতেও গা শিউরে উঠল।

আলখেল্লাধারী আলো নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢোকা মাত্র কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, চলে এস। সাবধানে কিন্তু।

জঙ্গলের ভেতর জায়গায় জায়গায় জ্যোৎস্না পড়েছে। গাছগুলো সবই উঁচু। তাই এবার হাঁটতে অসুবিধে নেই। আলখেল্লাধারী আলো নিয়ে যেখানে ঢুকল, সেটাই তাহলে পীরের মাজার। একতলা জীর্ণ একটা বাড়ি। দরজা বন্ধ করে দিল সে।

আমরা বাড়িটা ঘুরে পেছনের দিকে গেলুম। ভাঙা জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে কর্নেল সেখানে উঁকি দিলেন। তারপর আমাকে ইশারা করলেন। ফাটলে চোখ রেখে দেখি, ঘরের মেঝেয় সেই আলখেল্লাধারী লোকটা বসে আছে। তার সামনে একটা কবর। কবরে পুরনো আমলের ছেঁড়াখোঁড়া একটা লাল ভেলভেট কাপড় ঢাকা। কবরের অন্যদিকে বসে রয়েছে তিনজন হিংস্র চেহারার লোক। তাদের পরনে প্যান্ট-শার্ট এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল, বুকে কার্তুজের মালা।

আলখেল্লাধারী বলল, হ্যাঁ, শয়তানটা আজ আবার এসেছে। কিন্তু ওর সঙ্গে লড়াই করে এঁটে ওঠা যাবে না। কারণ এবার হারামজাদা কাশিম খাঁ সঙ্গে একটা সাব-মেশিনগান এনেছে। কাজেই ওর সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি। বরং বাদশা-বেগমকে লেলিয়ে দিয়েছি। ওরা ওদের ভিড়তে দেবে না চরে।

ইতিমধ্যে কর্নেল আর মোহনও আমার পাশে মাথা গুঁজে ফাটলে চোখ রেখেছেন। আমরা থ বনে গিয়ে শুনছি ওদের কথাবার্তা। বুঝতে পারছি বাদশা-বেগম সেই বাঘ দুটোর নাম। কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না।

একজন অনুচর বলল, কিন্তু বাদশা-বেগমকে ওরা যদি গুলি করে মারে?

আমার এ জানোয়ার দুটোর বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর একটু আস্থা রেখো জনার্দন! আলখেল্লাধারী লোকটা বলল। তার মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। তুমি কি জানো না এ পর্যন্ত কত জন ওদের পেটে হজম হয়ে গেছে?

এবার নিজের কাজে যাও বাবারা। [পৃঃ ২৯

দ্বিতীয় অনুচর বলল, তারা নেহাত মাছমারা জেলে—নিরীহ মানুষ! কিন্তু কাশিম খাঁ—

কথা কেড়ে আলখেল্লাধারী বলল, হুঁশিয়ার রহিম বখ্শ! তোমার দেখছি ওদের ওপর বড্ড দরদ। তুমি জানো? ওরা সবাই কাশেমের টাকা খেয়ে পীরের চরে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল মাছধরার ছলে? জেলেপাড়ার গণেশ নামে এক ছোকরাকে বাদশা কামড় বসিয়েছিল। আমার খেয়াল হল, বাঘের পেটে যাবার আগে ওকে জেরা করে দেখি, সত্যি সত্যি মাছ ধরতে এসে পীরের চরে পা দিয়েছে নাকি। জেরা করে জানলুম, ওপার থেকে কাশেমের লোক গিয়ে ওকে টাকা খাইয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছে।

তৃতীয় অনুচর বলল, ওস্তাদজী! মহিমবাবুর চরে কারা এসেছে দেখেছি। তাদের মধ্যে একটা বুড়ো সায়েব আছে। সে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে পাখি দেখে বেড়াচ্ছিল।

ওস্তাদজী হাসল।—সায়েবদের পাখি দেখার নেশা আছে, গদাই। বুঝলে তো? পদ্মার চরে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে শিকারীরাও আসে। কাজেই ও নিয়ে ভেবো না।

তৃতীয় অনুচর গদাই চেহারাতেও তদ্রূপ। নাদুসনুদুস গড়ন। প্রকাণ্ড মাথা। অন্য সময়ে তাকে দেখলে হাসি পেতে পারে। কিন্তু এখন ওর হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

গদাই বলল, ওদের সঙ্গে কোঠারিগঞ্জের সদাশিববাবুর নাতি মোহনবাবুকেও দেখেছি।

ওস্তাদজী খিকখিক করে হেসে বলল, মোহন! মোহন বড় ভাল ছেলে। ছোটবেলায় কোঠারিগঞ্জে থাকার সময় ওকে দেখেছি। এখন খুব বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়।

জনার্দন বলল, এখন একটু চা পেলে মন্দ হত না ওস্তাদজী! বাইরে ঠাণ্ডাটা বাড়ছে। তাছাড়া সারা রাত জেগে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে চা দরকার।

ওস্তাদ ডাকল, ভূতো! এ্যাই ভূতো!

ওদিক থেকে সাড়া এল।—চা হয়ে গেছে ওস্তাদজী!

নিয়ে আয় ঝটপট!

চায়ের কেটলি আর গোটাকতক গ্লাস হাতে যে লোকটা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখেই চমকে উঠলুম। আরে! এ তো সেই সকালে বর্ডার বাহিনীর ক্যাম্পে দেখা খোঁড়া লোকটা! বগলে ক্রাচ এখনও রয়েছে। কর্নেলকে চিমটি কাটলুম। সাড়া পেলুম না।

ওরা চা খেতে থাকল। তারপর দূরে কোথাও বাঘের ডাক শুনতে পেলুম। কয়েকবার ডেকেই চুপ করে গেল। ভেতরের লোকগুলো নিশ্চয় শুনতে পায় নি। ওরা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলছে পরস্পর। কান পেতে আমরা শুনতে থাকলুম। মাঝে মাঝে পেছনে ঘুরে দেখেও নিলুম, বাদশা বা বেগমের জন্য মনে আতঙ্ক রয়েছে। পেছনের দিকটা ফাঁকা না হলেও উঁচু গাছের সংখ্যা কম। তাই পরিষ্কার নজর হচ্ছে অনেকটা দূর পর্যন্ত।

ওস্তাদ বলল, শয়তান কাশেম আসলে ভেবেছে, বুলবন পেশোয়ারীর সোনাদানায় তার ভাগ আছে। কেন? না, সে পেশোয়ারীর কর্মচারী ছিল। ভেবে দেখ তোমরা। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন ওপারে হাঙ্গামা লাগল, অবাঙালী মুসলিম বড়লোকেরা অনেকেই এই বর্ডার পেরিয়ে পালিয়ে আসছে—বুলবন পেশোয়ারী আর থাকবে কোন্ সাহসে? পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট নিয়ে ভাগল। হ্যাঁ, কাশেম খাঁ বলতে পারে বটে, সে বর্ডার পেরুতে তার ওই স্পীড-বোটটা দিয়ে পেশোয়ারীকে সাহায্য করেছিল। তাতে কি পেশোয়ারীর সোনার হিস্যে তার পাওনা হয়?

করিম বখশ বলল, পেশোয়ারী এই পীরের চরেই যে সোনা পুঁতে রেখেছিল, তার প্রমাণ?

ওস্তাদ চোখ পাকিয়ে বলল, করিম বখশ! তুমি বরাবর বড্ড সন্দেহপ্রবণ লোক!

করিম আমতা হেসে বলল, না ওস্তাদজী! ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার। নইলে খামোকা যেখানে-সেখানে মাটি খুঁড়ে লাভ কি?

জনার্দনও সায় দিয়ে বলল, ঠিক, ঠিক।

খোঁড়া লোকটা—ভূতো চায়ের এঁটো গ্লাসগুলো নিয়ে চলে গেল। গদাই বলল, হ্যাঁ ওস্তাদজী। সবটা আপনার মুখে শুনতে চাই। আর কতদিন ভুল পথে ছোটাছুটি করে মরব?

ওস্তাদ বলল, পেশোয়ারীকে তার মালপত্তর সমেত কাশেম এই চরে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। আমাকে বলে যায়, ওকে যেন নিরাপদে লালগোলা পৌঁছে দিই। রাতে

আমার এই আস্তানায় যত্ন করে পেশোয়ারীকে রাখলুম। আমি ভাবতেই পারি নি, ওর কাছে অত সোনা আছে। তবে হ্যাঁ, দেখে মনে হয়েছিল বটে বেজায় বড়লোক। টাকাকড়িও আছে সঙ্গে। ভাবলুম, ঘুমোলে স্যাঙাতকে শেষ করে সবটা হাতাব। লাশটা বাদশা-বেগমকে খাইয়ে দেব। কিন্তু ব্যাটা কীভাবে সব টের পেয়েছিল, জানি না। না কি কাশেমই আমার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল? রাতে আমি মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে উঠে দেখি পেশোয়ারী নেই। তখন সন্দেহ হল, ব্যাটা আমাকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। গ্লাস পরীক্ষা করে দেখলুম, সাদা গুঁড়ো কী সব জিনিস রয়েছে গ্লাসের তলায়।

গদাই বলল, বলেন কী! তারপর?

ওস্তাদ বলল, খুব রাগ হল। বুলবনকে খুঁজতে বেরুলুম। এ চর থেকে সাঁতার কেটে পালাতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গের বাক্স-পেঁটরা? খুঁজতে খুঁজতে একখানে দেখি, আমার বাদশা আর বেগম বুলবন হতভাগাকে থাবার ঘায়ে আধমরা করে ফেলেছে। ঘাড়ে কামড় বসাতে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। বাঘ দুটো আমাকে দেখে সরে দাঁড়াল। বুলবনের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। কাছে গিয়ে বসতেই অতি কষ্টে বলল, "আমার পাপের ফল। পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট। পীরের তলায় সোনাটা—" শুনেই চেঁচিয়ে উঠলুম, কোথায় পেশোয়ারীজী, কোথায়? বুলবনের দম আটকে গেল। তখন কী আর করি! বাঘ দুটোকে ডেকে বললুম, শীগগির এ ব্যাটাকে গিলে খা। পীরের চরে মড়া পড়ে থাকার বিপদ আছে। কখন বর্ডার পুলিস এসে দেখে ফেলবে।

জনার্দন বলল, ওস্তাদজী! আমার মাথায় একটা কথা এসেছে।

কী তা বলেই ফেলো বাপু! ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে বলল।

পেশোয়ারী নিশ্চয় কোথাও বালির মধ্যে সোনাটা পুঁতে রেখেছিল। জনার্দন বলল। এ জঙ্গলের ভেতর মাটিতে পুঁতলে তো আপনি খুঁজে পেতেন। সদ্য মাটি খোঁড়ার চিহ্ন থাকত। কাজেই বালিতে পুঁতেছিল ব্যাটা।

ওস্তাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, এ কথাটা তো এত দিন মাথায় আসে নি! তুমি ঠিকই বলেছ জনার্দন! বালিতে পুঁতলে জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। কী বোকা আমরা! এতকাল জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে হন্যে হলুম, অথচ—

কথা থামিয়ে আলখেল্লাধারী উঠে দাঁড়াল। ব্যস্তভাবে বলল, চলো তাহলে! আগে পুবের বালির চড়ায় যাই। একদিক থেকে খোঁড়া শুরু করি। যতদিন লাগে লাগুক—মাস বছর লাগুক।

এবার দেখলুম, কয়েকটা কোদাল আর ঝুড়ি রয়েছে ঘরের কোণায়। সেগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে তিন রাইফেলধারী আর ওস্তাদ বেরুল। ঘরে লণ্ঠনটা রইল। ওস্তাদের গলা শোনা গেল ওদিক থেকে—এ্যাই ভূতো! কোথাও যাবি নে। চুপচাপ ঘরে এসে শুয়ে থাক্!

ক্রাচে ভর করে ভূতো ঘরে ঢুকল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। লোকটার একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে কাটা। সে সেই কাটা পা নাচাতে থাকল শুয়ে শুয়ে। চোখ দুটো বোজা। নিশ্চয় গাঁজা টানছিল এতক্ষণ। এখন নেশায় চুর হয়ে গেছে।

তিন

আমরা নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করছিলুম। শুধু আতঙ্ক ওই বাঘ দুটোর জন্য। আমাদের দৈবাৎ দেখে ফেললে প্রচণ্ড বিপদে পড়তে হবে।

ওস্তাদ দলবল নিয়ে পুবের বালিয়াড়িতে চলেছে। এদিকে ফাঁকা বলে জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়ামূর্তি নজর হচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণে ঠাণ্ডাটা বেজায় বেড়ে গেছে। কাঁপুনি হচ্ছে। একখানে একটু থেমে কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, রাক্ষুসী বাঁওর পশ্চিমে। আমরা যাচ্ছি পুবে। কাজেই মনে হচ্ছে, বাঘ দুটোর আচমকা হামলার ভয় আর নেই। কারণ ওদের রাক্ষুসীর বাঁওরের দিকটায় পাহারা দিতে বলা হয়েছে। কাশেম খাঁ স্পীড-বোট নিয়ে ওদিক থেকেই আসবে কিনা!

একটা বালির ঢিবির ওপর ওস্তাদ আর তার তিন অনুচরের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছিল। তারা ওধারে নেমে অদৃশ্য হলে আমরা সেই ঢিবিতে গিয়ে বসে পড়লুম। বালির ঠাণ্ডা পোশাকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। তার ওপর পদ্মার হু-হু হাওয়া। নীচে ওস্তাদদের দেখা যাচ্ছে। এবার খোঁড়ার আয়োজন চলেছে।

আমরা ঘাপটি মেরে বসে রইলুম। মোহন বলল, ওদের বোকামি দেখে হাসি পাচ্ছে। ওরা কি গোটা বালিয়াড়ি খুঁজে সোনা আবিষ্কারের মতলব করেছে? তাহলে তো এক বছর লেগে যাবে।

বললুম, এ তো খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার সামিল!

কর্নেল বললেন, ওরা আসলে মরীয়া হয়ে উঠেছে সোনার লোভে। আচ্ছা মোহন, লোকগুলোকে কি চিনতে পেরেছ? তোমাদের এলাকার লোক বলেই মনে হচ্ছে।

মোহন বলল, চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। চিনতে পারলুম না।

হুম! আমার ধারণা, এরা আসলে একদল ডাকাত। আর আলখেল্লাধারী ওদের সর্দার, সেটা তো 'ওস্তাদজী' বলা শুনে বোঝাই যাচ্ছে। কর্নেল বললেন। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না, বাঘ দুটো কীভাবে ওর পোষ মানল? বাঘ সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানা আছে। কম বয়সে বাঘ মানুষের পোষ মানে বটে, কিন্তু বয়স হলে তারা তাদের বন্য হিংস্র স্বভাব ফিরে পায়। তখন তাদের আর পোষ মানিয়ে রাখা যায় না। তার ওপর বাঘ দুটো মানুষখেকো।

বললুম, কর্নেল! পীরের জঙ্গলে বাঘ দুটো খায় কী? কী খেতে দেয় ওস্তাদ?

কর্নেল বললেন, মানুষ।

মোহন ও আমি শিউরে উঠলুম। বললুম, মানুষ খেতে দেয়?

তাই বোঝা যাচ্ছে। কর্নেল বললেন। শুনেছি এই এলাকায় এ যাবৎ অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। তাই না মোহন?

মোহন উত্তেজিত ভাবে বলল, হ্যাঁ কর্নেল! এতদিনে তাহলে সে রহস্যের আস্কারা হল।

কর্নেল বললেন, প্রাণীবিদদের লেখা বইয়ে পড়েছি, সারা জীবন ধরে কোনো বাঘ যদি শুধু মানুষের মাংস খায় বা তাকে খাওয়ানো হয়, তাহলে এক সময় তার অবস্থা হয়ে ওঠে আফিংখোর মানুষের মতো। অর্থাৎ সারাক্ষণ নেশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ওই অবস্থায় তার স্বাভাবিক হিংসা লোপ পায়। আক্রমণ বৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। গৃহপালিত নেড়ি কুকুর হয়ে ওঠে বেচারা। অবশ্য জানি না, বাদশা-বেগমের সেই অবস্থাটা এসেছে কি না। এখনও না এসে থাকলে ভবিষ্যতে আসবে। তখন ওদের তাড়া করলে বা ঘুঁষি মারলেও দাঁত বের করে থাবা তুলে আক্রমণ করবে না।

সকৌতুকে বললুম, গজরাতে পারবে না?

কর্নেল বললেন, ওটা তো তার মাতৃভাষা। কাজেই জয়ন্ত, গর্জনটা তাকে করতেই হবে।

বলে কর্নেল ঢিবির আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন। ফের বললেন, ওরা সম্ভবত শেষ রাত পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করবে। কাজেই অকারণ এখানে বসে থেকে লাভ নেই। এস, আমরা পীরের মাজারে যাই। ভূতো এতক্ষণ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

কেনই বা তাহলে ওদের অনুসরণ করে আসা, কেনই বা ফের পীরের মাজারে যাওয়া—কিছুই বুঝলুম না। কর্নেলের গতিবিধির অর্থ খোঁজা বৃথা। কোনো কথা না বলে ওঁকে অনুসরণ করলুম। জঙ্গলে ঢুকে আবার বাঘ দুটোর জন্য আতঙ্ক জাগল।

কিন্তু কিছুটা এগোতেই পড়বি তো পড় একেবারে সেই বাঘ দুটোরই মুখোমুখি। সেই ঝুরিওয়ালা বটগাছটার তলায় ফাঁকা জায়গায় যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখানেই। তেমনি করে খেলা জুড়েছে হতচ্ছাড়ারা।

এবার কিন্তু আমাদের দেখতে পেল। পেয়েই পিলে চমকানো ঘড়ঘড় গর্জন করে তেড়ে এল। কর্নেল চাপা গলায় বলে উঠলেন, গাছে ওঠ! গাছে উঠে পড়ো।

সামনে যে ঝুরিটা ছিল, সেটা বেয়ে প্রাণপণে উঠতে শুরু করলুম। একটা বাঘ নীচে দাঁড়িয়ে সমানে গরগর ঘড়ঘড় করতে থাকল। মাটিতে লেজ বারবার আছড়ে আমাকে শাসাতে থাকল।

মোহনকে এক পলক দেখেছিলুম, দিশেহারা হয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। আরেকটা বাঘ একটু তফাতে আমার ডাইনে গর্জাচ্ছে শুনে বুঝলুম, মোহন ওখানেই একটা গাছে উঠতে পেরেছে।

কিন্তু কর্নেল কোথায় গেলেন?

গামবুট পরে গাছে ওঠা সহজ কথা না। লাখ টাকা বাজি ধরলেও প্যারতুম না। কিন্তু এ হল গিয়ে প্রাণের দায়। কে যেন ঠেলে বটগাছের উঁচু ডালে তুলে দিয়েছে।

বেচারা কর্নেলের জন্য ভয় হচ্ছিল। বুড়ো বয়সে গামবুট পরে গাছে চড়া কি সহজ কথা? আমরা যুবক বলেই পেরেছি!

বাঘটা নীচে ঝুরির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে আর ওপর দিকে মুখ তুলে যেন বেজায় গালমন্দ করছে। পস্তানি হচ্ছিল, যদি বুদ্ধি করে রাইফেলটা আনতুম! বন্দুকের ছররা গুলিতে ওর গায়ে আঁচড় পড়বে না। তবু বন্দুকের নল তাক করে আমিও বাঘটাকে ভয় দেখাতে শুরু করলুম।

মোহন বোকামি করে ছররা গুলি ছুড়ে বসবে না তো? তাহলে ওস্তাদরা টের পেয়ে দৌড়ে আসতে পারে।

মোহনের বন্দুকের আওয়াজ ভাগ্যক্রমে শোনা গেল না। ও বুদ্ধিমান ছেলে।

কতক্ষণ পরে বাঘটা একবার চাপা হালুম শব্দ করল। তখন দেখি, তার জোড়াটাও হালুম করে এসে গেল। দুটিতে আবার খেলা শুরু করল। গাছের ডালে বসে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এবার কর্নেলের মুণ্ডুপাত করছিলুম। কেন যে ওঁর সঙ্গে এমন করে চলে আসি যেখানে সেখানে। এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, বুড়ো গোয়েন্দা-প্রবর মোটেও বখাঁস দেখতে পদ্মার চরে আসেন নি। ভেতরে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

এক সময় পশ্চিমে দূরে সম্ভবত রাক্ষুসীর বাঁওরে কাশীম খাঁর স্পীড-বোটের গরগর শব্দ শোনা গেল। অমনি বাঘ দুটো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কান খাড়া করে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে সেদিকে চলে গেল।

সুযোগ বুঝে সাবধানে নেমে এলুম। জামা আর হাতের তালু ছিঁড়ে গেল। নেমেই চাপা গলায় ডাকলুম, মোহন! মোহন!

মোহনের সাড়া পাওয়া গেল একটু তফাতে গাছের ডগায়—এই যে আমি!

কাছে গিয়ে দেখি, একটা লম্বা গুঁড়িওয়ালা গাছের মগডালে প্রকাণ্ড হুতুমপ্যাঁচার মতো বসে আছে সে। বললুম, নেমে এস শীগগির! অল ক্লিয়ার!

মোহন করুণ স্বরে বলল, নামতে পারছি নে। পা পিছলে যাচ্ছে।

লাফ দাও বরং!

ওরে বাবা! হাড়গোড় ভেঙে যাবে যে!

ভাঙবে না। ঝটপট লাফ দাও। মাটিটা নরম।

মোহন বলল, একটা মই খুঁজে আনো জয়ন্ত!

মই? অবাক হয়ে বললুম। এই বনবাদাড়ে মই কোথায় পাব? চড়তে পেরেছ যখন, নামতেও পারবে।

পারছি কই? চেষ্টা তো করছি!

খাপ্পা হয়ে বললুম, তাহলে থাকো! আমি কর্নেলের খোঁজে চললুম।

মোহন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, যেও না জয়ন্ত, যেও না! ওরে বাবা! আমার বড় ভয় হচ্ছে।

ওকে না ডানপিটে ভেবেছিলুম! এত ভীতু, তা তো বুঝতে পারি নি। তাছাড়া

গ্রামের ছেলে। গাছে চড়ার অভ্যাস থাকা উচিত। তার চেয়ে বড় কথা, গাছে চড়াটাই কঠিন, নামা তো খুব সোজা।

রাগ করে কয়েক পা এগিয়েছি, পেছনে সড়্ সড়্ সড়্ ধপাস্ করে একটা শব্দ শুনে বুঝলুম, মরীয়া হয়ে বেচারা নেমে পড়েছে।

মোহন এসে সঙ্গ নিল। বলল, বাপ্‌স্! খুব শিক্ষা হল বটে! জীবনে এমন করে কখনও গাছে চড়ি নি।

দুজনে চারপাশে নজর রেখে হাঁটছিলুম। আর মাঝে মাঝে চাপা গলায় কর্নেলকে ডাকছিলুম। সাড়া নেই। তাহলে গাছে না চড়ে বুড়ো ঘুঘুমশাই পীরের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকেছেন?

পীরের বাড়ির দরজা খোলা। ভাঙাচোরা অবস্থা। ভেতরে একটা উঠোন। খাপচা খাপচা জ্যোৎস্না পড়েছে। বারান্দায় উঠে দেখি, সেই ভূতো ঘরের ভেতর তেমনি চিত হয়ে পড়ে আছে। তবে কাটা ঠ্যাংটা নড়ছে না। তার নাক সমানে ডাকছে। লণ্ঠনটা তেমনি জ্বলছে।

লাল ভেলভেটে জরির কাজ করা একটা প্রকাণ্ড চাদরে পীরের কবর ঢাকা। হঠাৎ দেখি, কাপড়টা নড়ছে একপাশে। ভীষণ নড়তে শুরু করলে আঁতকে উঠে এতক্ষণে টর্চ জ্বাললুম। মোহন অস্ফুট স্বরে 'ও কী' বলেই চুপ করেছে। ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আমারও। টর্চের আলোয় এই তাজ্জব কাণ্ড দেখলে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। কবরটা কি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে? ভয়ে দম আটকে গেল।

তারপর ঢাকনাসুদ্ধ কবরের মাথার দিকটা মৃদু ঢঙ শব্দ করে বাক্সের ডালার মতো উঠে গেল। তারপর একটা টুপি পরা মাথা বেরুলো। তারপর যিনি বেরুলেন, তিনি আমার বহু বছরের গুরু ও বন্ধু মহাপ্রাজ্ঞ কর্নেল সায়েব! তবে তাঁর সাদা দাড়ি কবরের গুপ্ত সুড়ঙ্গের ময়লায় কালো হয়ে গেছে। তাঁকে যুবক দেখাচ্ছে। প্রথমে বললেন, আলো

বাঘটা মুখ তুলে যেন বেজায় গালমন্দ করছে। [পৃঃ ৩৫

নেভাও ডার্লিং! চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তারপর কবরের ঢাকনা আগের মতো ঠিকঠাক করে দিয়ে বললেন, বুলবন পেশোয়ারীর পঞ্চাশ কিলো সোনার বাট ঠিক জায়গাতেই আছে। আপাতত ওখানেই থাক। কাল নটবর সিং তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে বরং এর কিনারা করবেন।

আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

কর্নেল বললেন, এখন সমস্যা হল ভূতোকে নিয়ে। ভূতো ঘুমের ভান করে পড়ে আছে কিনা জানা দরকার। ওকে কাতুকুতু দাও তোমরা। দেরি করো না।

আমি আর মোহন কাছে যেতেই ভূতো তড়াক করে উঠে বসে হাউমাউ করে বলল, ওরে বাবা! কাতুকুতু দিলে আমি মরে যাব! দোহাই হুজুররা! ওই কাজটি করবেন না।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, দেখছ? ওকে লক্ষ্য করে এরকমই সন্দেহ হয়েছিল। আমরা চলে গেলে ও কবরের গুপ্ত সুড়ঙ্গে ঢুকত আর সোনাটা হাতিয়ে কেটে পড়ত।

ভূতো নাক-কান মলে বলল, ছি ছি! সে কী কথা! সায়েব আমাকে সকালে দশ টাকা ভিক্ষে দিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন, বাবা ভূতো! আরও বখশিস পাবে, আমাদের সঙ্গে চলো!

ভূতো ভয় পাওয়া মুখে বলল, কোথায় যাব হুজুর? আমাকে তাহলে বাদশা-বেগমের পেটে পাঠিয়ে দেবে কাল্লু খাঁ!

কাল্লু খাঁ! মোহন চমকে উঠল। কাল্লু ডাকাত? এই পীরের থানের সেবককে বছর দশেক আগে সে খুন করে ফেরারী হয়েছিল না? কর্নেল, কাল্লু খাঁয়ের কথা দাদুর কাছে শুনেছি। আগে নাকি সে সার্কাসের দলে খেলোয়াড় ছিল। বাঘের খেলা দেখাত। আশ্চর্য, ব্যাপারটা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।

কর্নেল বললেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কাল্লু খাঁর পক্ষেই দুটো বাঘ পোষা সম্ভব। পীরের থানের সেবককে খুন করে সে এখানেই আস্তানা গেড়েছে এতকাল। বাঘ দুটোর ভয় দেখিয়ে ভক্তদের থানে আসা বন্ধ করেছে সে। দারুণ এলেমদার লোক! একটা বিতর্কিত চরে নিরাপদে ঘাঁটি গেড়ে বাস করছে।

বললুম, কিন্তু এই কবরের ভেতর গুপ্ত ঘর বা সুড়ঙ্গের কথা সে টের পেল না কেন?

কর্নেল বললেন, টের পায় নি, তা তো বুঝতেই পারছি। আসলে সে এমনটা ভাবতেই পারে নি। কিন্তু বুলবন পেশোয়ারী যেভাবেই হোক টের পেয়েছিল, কবরের তলায় গুপ্ত ঘর আছে। সোনাটা সেখানে রেখে সে পালাচ্ছিল। বাদশা-বেগমের পাল্লায় পড়ে বেচারার প্রাণ যায়। মরার সময় সে শেষবার বলতে পেরেছিল—'পীরের তলায় সোনাটা...।' তাই শুনে কাল্লু খাঁ ভেবেছে, পীরের চরের কোথাও পোঁতা আছে। পীরের কবর কথাটা মুখে আসে নি পেশোয়ারীর। যাক গে, এবার কেটে পড়া যাক্। ভূতো, আমাদের সঙ্গে এস।

ভূতোর আপত্তি টিকল না। আমি আর মোহন তাকে টেনে নিয়ে চললুম। শাসালুম, চেঁচালে বন্দুকের গুলিতে মুণ্ডু উড়ে যাবে। ভয়ে সে চুপ করে থাকল।

পানসি নৌকোয় উঠে বসলুম আমরা। এখন রাত বারোটা পনের। নৌকো ছাড়ার সময় পশ্চিমের জঙ্গলে বাঘ দুটোর প্রচণ্ড গর্জন শোনা যাচ্ছিল।

এক সময় আমরা পীরের চর ছাড়িয়ে পদ্মার স্রোতের উজানে পড়লুম। ভূতো আমার কষ্ট দেখে বলল, মেজ হুজুর! আমাকে দিন বরং। ঠ্যাং কাটা গেলেও হাত দুটো তো আছে। আর বৈঠা আমি দুবেলা বাই।

ভূতো আর মোহন বৈঠা বাইতে থাকল। মনে হল, ভূতো লোকটা আসলে ভাল। পেটের দায়ে কাল্লু খাঁর দলে ইনফরমার হয়ে ঢুকেছিল। রান্নাবান্না কাজকর্মও করে দিত। ভূতো সারাপথ সে কথা বলতে থাকল। শেষে বলল, একখানা ছিপ নৌকো লুকোনো আছে হুজুর। পশ্চিমের জঙ্গলের নীচে খাড়ির মধ্যে আছে। পুলিসকে বলবেন, খুঁজে বের করবে। আর হুজুর, দেখবেন, আমার যেন জেল হয় না। তাহলে আমার বউ ছেলেমেয়েরা বড্ড কষ্টে পড়বে। বরং, আমাকে বড় হুজুর একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন। তাহলেই হল।

মহিমবাবুর চরের কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা কর্নেল, আপনি কীভাবে জানলেন কবরের তলায় গুপ্ত ঘর আছে?

কর্নেল বললেন, কাল্লু খাঁ বুলবনের মরার সময়কার কথাটা যখন বলল, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। 'পীরের তলায় সোনাটা'—এর মানে কী হতে পারে? পীর যেখানে শুয়ে আছেন অর্থাৎ পীরের কবর, তার তলায়।

ধন্য আপনার বুদ্ধি! মোহন তারিফ করে বলল।

মহিমবাবুর চরে পৌঁছুতে রাত তিনটে বেজে গেল। যাবার সময় স্রোতের ভাটিতে গিয়েছিলুম। ফেরার সময় উজানে বলে এত বেশি সময় লাগল।

উদ্বেগে মাঝিরা ঘুমোতে পারে নি। আমাদের দেখে উঠে বসল। বলল, পীরের জঙ্গলে বাঘের ডাক শুনে আমরা খুব ভয় পেয়েছিলুম হুজুর। এখন ওই শুনুন! বন্দুকের আওয়াজও হচ্ছে। সবই ভূতপেরেতের কাণ্ড।

কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনছিলেন। বললেন, খুব গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে পীরের চরে। তাহলে কি কাশেম খাঁর সঙ্গে কাল্লু খাঁর লড়াই বেধে গেল?

আবছা গুলির শব্দ আর মাঝে বাঘের গর্জন ভেসে আসছিল পীরের চর থেকে। জ্যোৎস্নায় ওদিকটা ধূসর। পদ্মার বুকে ঘন কুয়াশা জমেছে। এক সময় কর্নেল বললেন, শুয়ে পড়া যাক। মোহন, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে যাবে। সাইকেলে করে ঝটপট নটবর সিংয়ের ক্যাম্পে যাবে। আমার চিঠি নিয়ে যেও।

* * * *

সকালে আবার আমরা পীরের চরে গেলুম। এবার বর্ডার বাহিনীর মোটর লঞ্চে চেপে। গিয়ে যা দেখলুম, গা শিউরে উঠল। এমন বীভৎস দৃশ্য কখনও দেখি নি।

কাল্লু খাঁ, জনার্দন, গদাই, রহিম বখশ মড়া হয়ে পড়ে আছে পুবের বালিয়াড়িতে। সারা গা গুলিতে ক্ষতবিক্ষত। পশ্চিমের জঙ্গলে বাঘ দুটো—বাদশা আর বেগমও তেমনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। কাশেম খাঁ কাকেও রেহাই দেয় নি। বেচারা ভূতো জোর বেঁচে গেছে।

কবরের ঢাকনা তুলে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট উদ্ধার করা হল। সোনাটা প্রাক্তন পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার। কাজেই ওটা ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ফিরিয়ে দেবেন।

মহিমবাবুর চরে আমরা আরও দিন দুই ছিলুম। কর্নেল 'বর্খাস' না আবিষ্কার করে কলকাতা ফিরবেন না। তাঁর বক্তব্য হলঃ এবার পদ্মার চরে সত্যি সত্যি বিরল প্রজাতির ওই পক্ষী দর্শনেই এসেছি। স্বপ্নেও ভাবি নি, পীরের চরে এত সব রহস্য আছে। দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলুম এবং সোনার কথা জানতে পারলুম কাল্লু খাঁর মুখে। তবে হ্যাঁ, নটবর সিংয়ের কাছে তো বটেই, সদাশিববাবুর কাছেও কাল্লু খাঁর গল্প শুনেছিলুম। সে সার্কাসে ছিল এক সময়, তাও শুনেছিলুম। তাই যখন পীরের জঙ্গলে জোড়া বাঘের গুজব শুনলুম, তখন মনে হল একটা যোগসূত্র থাকতেও পারে। সেজন্যে পীরের জঙ্গলে উঁকি মারতে গিয়েছিলুম।

আমি কিন্তু আজও একথা বিশ্বাস করি নি। এই ধুরন্ধর বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবরের সব ব্যাপারই রহস্যময়। এমন তো হতে পারে, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে হারানো সোনার জন্য ভারত সরকার গোপনে তদন্ত করছিলেন এবং সুযোগ্য ঘুঘুমশাইটিকেই এ ব্যাপারে পদ্মার চরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন?

আরও একটা কথা। খঞ্জ মানুষ ভূতোকে বেমক্কা দশ টাকা দান করাও কি কর্নেলের কুসংস্কার, না কোনো গোপন অভিসন্ধি ছিল, বলা কঠিন।

মণি ও মুক্তো

মনো-রেল। মাথার ওপরকার একটিমাত্র লাইনে ঝুলন্ত অবস্থায় এই ট্রেন বিপুল গতিতে যাতায়াত করে থাকে। ইয়োরোপ ও জাপানের কয়েকটি স্থানে মনো-রেল প্রচলিত রয়েছে।

নতুন যুগের ম্যাজিক

—জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

প্রত্যেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা প্রদীপ, তুমি সবাইকে ম্যাজিক শিখিয়ে দাও কেন বলো তো? এতে তোমার অনুষ্ঠানের কোনও ক্ষতি হয় না?" প্রশ্নটা শুনে শুনে আমার কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। সবার ধারণা, ম্যাজিক শিখিয়ে দিলে বোধ হয় ম্যাজিকের সবই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই? মোটেই না। আসলে ম্যাজিকের জগৎ এত বড় যে এর থেকে যতো ইচ্ছা প্রকাশ করে দিলেও এর রহস্যের সম্ভার একটুও কমবে না। সমুদ্র থেকে জল তুলে নিলে সাগরের জল কি আর কমে? আর শুধু তা নয়, পুরোন খেলাগুলো প্রকাশ করে দিলে তবেই তো নতুন খেলা আবিষ্কারের তাগিদ আসবে এবং জাদু জগতের উন্নতি হবে। তা না হলে ঐ পুরনো জিনিসগুলো নিয়েই আমরা আটকে থাকতাম। আরও একটা ব্যাপার হলো—ম্যাজিক দেখবার পর দর্শকেরা জাদুকরের প্রদর্শনীর কৃতিত্ব এবং মান যদি বুঝতেই না পারলেন তাহলে ভাল-মন্দের তফাতটাই বা বোঝা যাবে কি করে? সবাইকে একটু একটু করে ম্যাজিকের স্বাদ পাইয়ে দিলে তবেই তো সবাই বুঝবেন—কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ। কৌশল সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকলে কেউই তো আর আমাদের শিল্পী বলবেন না—বলবেন 'সাধু বাবা' এবং অলৌকিক শক্তি দিয়েই কাজগুলো

করছি। সেটা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষ যতই শিক্ষিত হোন না কেন, কৌশল দিয়ে তাঁকে জব্দ করা যায়। জব্দ করা বা মজা করার সঙ্গে তাঁকে ঠকিয়ে ভুল দিকে এগিয়ে 'নয়ে যাওয়াটা কিন্তু এক ব্যাপার নয়। আর সেজন্য আমরা ম্যাজিকের কৌশল গোপন রাখলেও পুরো ব্যাপারটাকে একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে রাখতে চাই না। আমরা চাই সবাই-ই কিছু কিছু ম্যাজিক জানুন, ম্যাজিক বুঝুন এবং জাদু অনুষ্ঠানের সৎ সমালোচনা করুন। শিল্পের দৃষ্টিকোণ দিয়েই আমরা নিজেদের চেহারা প্রকাশ করতে চাই—কুসংস্কারের নায়ক হিসেবে মোটেই নয়।

আজ তোমাদের মোট দুটো ম্যাজিকের কৌশল শিখিয়ে দেব। যদি ঠিকমতো দেখাতে পারো তো দেখবে সবাই কেমন তারিফ করছেন। আর শুধু তা নয়—এই ম্যাজিকগুলো দেখাবার সময় দেখবে তোমার নিজের চোখও কেমন খুলে গেছে। যাঁরা ম্যাজিকের কৌশল জানেন না, তা তাঁরা যতো শিক্ষিত ব্যক্তিই হোন না কেন, দেখবে তাঁদেরকে কেমন যেন অন্য জগতের লোক বলে মনে হচ্ছে। যাই হোক, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। প্রথম ম্যাজিকটা হলো খালি হাত থেকে পাউডার, চিনি, নুন বা ছাই—ঐ জাতীয় একটা কিছুর আবির্ভাব করানো।

জাদুকরের দু'হাত খালি। আংটি বা ঐ জাতীয় কিছুও নেই। এবার তিনি সবার সামনে খালি হাত দুটোকে নীচু করে হাওয়াতে ঘষতে লাগলেন। একটু পরে ঐ অবস্থাতেই হাত দোলাতে দোলাতে হাওয়া থেকেই কি যেন একটা ধরে মুঠো করলেন। মুঠোটাকে কিছুক্ষণ দুলিয়ে একটু পরে হাতটা ঘুরিয়ে দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন। কি আশ্চর্য! হাতের মুঠো ভর্তি পাউডার এসে গেছে। জাদুকর সেই পাউডার দর্শকদের হাতে একটু একটু করে দিলেন। সবাই গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন—সেটা সত্যি সত্যিই পাউডার! কোত্থেকে এলো এই পাউডার—জাদুকরের হাত তো খালি ছিল! সবাই অবাক !!

এবার কৌশলের পালা। তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছো—সত্যিই তো, পাউডার এলো কোত্থেকে? এতে নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র কিছু একটা আছে। মোটেই না। এই ম্যাজিকটা দেখাতে গেলে এক বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটু অভ্যাস করে দেখালে সত্যিকারের মন্ত্র শক্তি বলেই মনে হবে। এর জন্য চাই বেশ কিছুটা পাউডার, একটা রবারের বল, একটা হাত খানেক লম্বা ইল্যাস্টিক এবং লম্বা হাতাওয়ালা একটা ঢিলেঢালা পোশাক।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, রবারের বল যখন একটু ফেটে যায় তখন ফাটা জায়গাটার দু' প্রান্তে চাপ দিলে বলটা কেমন 'হাঁ' করে। চাপ ছেড়ে দিলে আবার তার সেই 'হাঁ' কেমন বন্ধ হয়ে যায় এবং আবার আস্ত বলের মতোই গোল হয়ে যায়। রবারের বলের এই বিশেষ গুণটার ওপরেই নির্ভর করছে এই ম্যাজিকের 'পাউডার' ধরে রাখবার কায়দাটা। একটা রবারের ছোট বল নিয়ে তার ওপর ছুরি বসিয়ে সিকি ভাগ কেটে দাও। বেশি কেটে ফেলো না—তাহলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। এবার

বলটার যেদিক কাটা হয়েছে, তার অন্য দিকে ইল্যাস্টিকটার একটা মাথা সেলাই করে ভালভাবে আটকে দাও। তারপর যে ঢিলে জামাটা তুমি পরবে, তার ডান হাতার ভেতর দিকে একদম বগলের কাছে ঐ ইল্যাস্টিকটার অন্য মাথাটা সেলাই করতে হবে। ইল্যাস্টিক সমেত ঐ বলটার দৈর্ঘ্য যেন জামার হাতার চেয়ে একটু ছোট হয়। এবার ঐ জামাটা গায়ে পরে নিলেই দেখবে ডান হাতার আস্তিনের তলায় বলটা চাপা পড়ে গেছে কিন্তু হাতটা ঝুলিয়ে একটু কসরত করে ভাঁজ করতেই ঐ বলটাকে ধরা সম্ভব হচ্ছে। বলটাকে ধরার সুবিধার জন্যই এই ঢিলেঢালা হাতাওয়ালা জামার প্রয়োজন। আর এই হচ্ছে এর গোপন কারসাজি। বলটার ফাটা জায়গায় দু'প্রান্তে চাপ দিয়ে মুখটাকে হাঁ করিয়ে আগের থেকে পাউডার ভরে রাখো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত ঝুলিয়ে দেখ—একদম খালি হাত মনে হচ্ছে। এবার হাওয়াতে হাত ঘষবার অছিলায় দোলাবার সময় বলটাকে ধরে একটু চাপ দাও—দেখবে তোমার মুঠোর মধ্যে পাউডার চলে এসেছে। হাতে ঐ পাউডার কিছুটা পাওয়া মাত্র বলটাকে ছেড়ে দাও—ইল্যাস্টিকের টানে দেখবে সেটা আস্তিনের ভেতর নিজের থেকেই লুকিয়ে পড়েছে। কেউ জানতেও পারবে না। এবারে হাত ঘুরিয়ে মুঠো খুলে সবাইকে পাউডার দাও—দেখবে সবাই কেমন জব্দ হয়ে গেছে।

বুঝতেই পারছো—ব্যাপারটা খুবই সহজ। তবে এটা দেখাতে গেলে ঠিকমতো অভ্যাস করতে হবে। বলটা ধরা এবং ছাড়ার সময় যেন কেউ দেখতে না পায়। এটা সম্পূর্ণ তোমার অভিনয় এবং অভ্যাসের ওপর নির্ভর করছে। পাউডারের বদলে নুন, চিনি, ছাই—যা ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারো।

* * * *

এবারে দ্বিতীয় ম্যাজিক। তোমরা প্রত্যেকেই জানো, ভারতীয় দড়ির খেলা জগদ্বিখ্যাত। অনেকের ধারণা, ওটা নাকি বানানো গল্প। ওরকম খেলা কোন দিনও হয় নি, হয় না এবং হবেও না। আমার মত কিন্তু অন্যরকম। ঐ দড়ির খেলা দেখানো হতো—তবে আজকাল দেখানো সম্ভব নয় এক বিশেষ কারণে। সত্যির চারদিক ঘিরে কিছুটা গল্পের রঙ তো আছেই—তবে ব্যাপারটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। আর কে পারলেন বা না পারলেন তা বড় কথা নয়, তোমাদের বলে রাখছি, ঐ খেলাটাকে দেখাতে আমি পারি। খুব শিগগিরই কোনও একদিন করে দেখাবো। এখন আমার প্রস্তুতি-পর্ব চলছে।

তা যাই হোক, ঐ দড়ির খেলার একটা ছোট্ট সংস্করণ আমি আজ তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এটার সঙ্গে অবশ্য আসল খেলাটার কোনও যোগাযোগ নেই, কিন্তু তবুও চমকের হিসেবে কিছুটা মিল আছে বলে আমি এটাকে ভারতীয় দড়ির খেলার ছোট্ট সংস্করণ বলছি। তোমাদের দেখাতেও খুব মজা লাগবে।

জাদুকরের কাছে একটা হাত চারেক লম্বা মোটা দড়ি রয়েছে। তিনি সেটাকে তুলে নাড়িয়ে দুলিয়ে এবং পাকিয়ে দেখালেন সাধারণ দড়ির মতই সেটা নরম। এবারে তিনি

সেটাকে দু-হাতে টেনে ধরে একটু ফুস্ মন্তর ক'রে দিয়ে একটা হাত আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলেন। অবাক ব্যাপার! দড়িটা বেঁকা লাঠির আকৃতি নিয়ে 'শক্ত' হয়ে গেছে! একটা ছোট্ট বালতি ঐ 'শক্ত' দড়ির প্রান্তে 'টাঙিয়ে' দেওয়া হলো, কি অদ্ভুত ব্যাপার—দড়িটা তবুও শক্ত লাঠির মতো হয়ে রয়েছে এবং বালতীটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। জাদুকর এবার বালতীটাকে নামিয়ে রেখে দড়িটাতে ফুঁ দিয়ে নাড়িয়ে দিলেন। অবাক ব্যাপার, দড়িটা আবার কেমন নরম হয়ে দুলতে লাগলো।
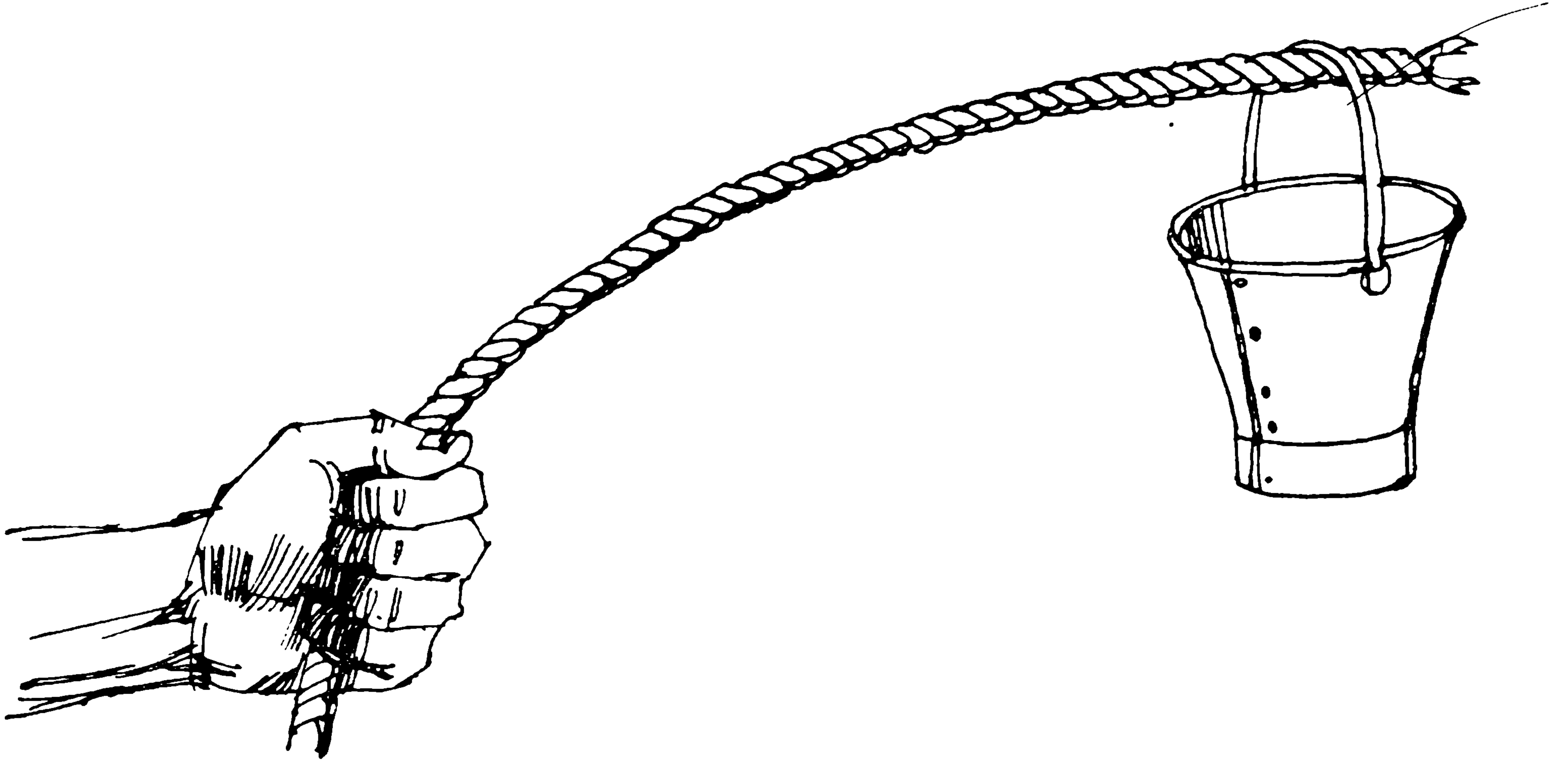
এর কৌশল ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ সহজ। দড়িটা মোটেই সাধারণ ছিল না। ওর মধ্যে আগের থেকেই একটা সাইকেলের চেইন ঢোকানো ছিল। সাইকেলের চেইন জিনিসটার খুব মজার একটা গুণ আছে। একটা চেইন নিয়ে হাতে লম্বা করে ধরে দেখ—একটা পাশে ওটা দড়ির মতই নড়াচড়া করতে পারে। কিন্তু অন্যপাশে মোটেই পারে না।
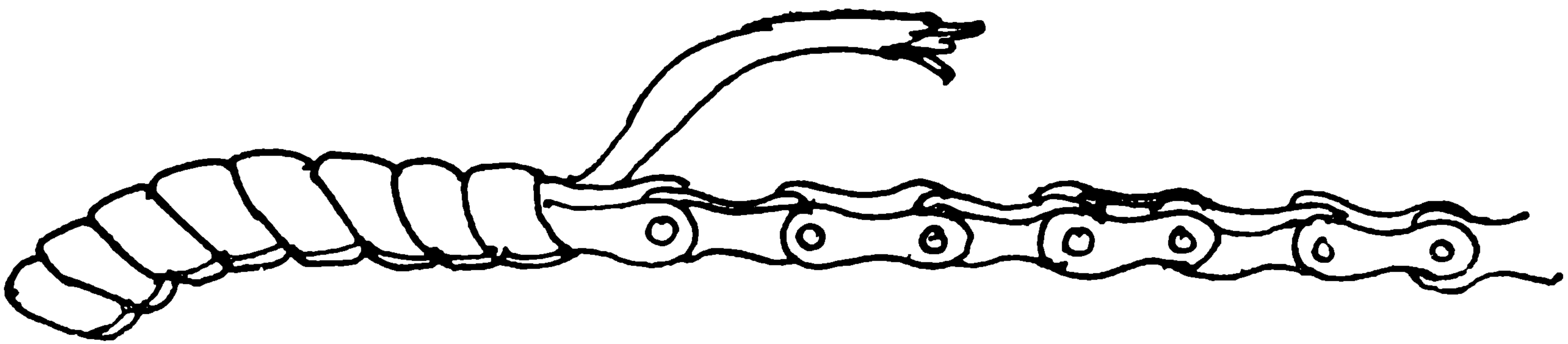
সাইকেলের চেইনের ওপর সরু দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে মোটা দড়িটা তৈরী করা হয়েছিল। এইভাবে একটা 'মোটা' দড়ি বানিয়ে দেখ—কি দারুণ মজার ব্যাপার হয়ে গেছে। মোটা দড়িটা ঐ সাইকেলের চেইনটার জন্য একপাশে দুলতে পারছে কিন্তু অন্য দিকে একদমই

পারছে না। দড়িটাকে দুলিয়ে দেখিয়ে লম্বা করে টেনে ধরে একটু পাশ ফিরিয়ে দিলে শক্ত লাঠির মতই হয়ে যাবে, ভীষণ সহজ ব্যাপার; একটু অভ্যাস করে বন্ধুদের দেখিও, দেখবে সবাই কেমন চমকে যাচ্ছে।

আগেই বলেছি—ম্যাজিকের রহস্যের কোন শেষ নেই। এক আলোচনা থেকে অন্য আলোচনা শুরু হয়। তার থেকে শুরু হয় আবার নতুন চিন্তার। আজ তোমাদের আমি যে ম্যাজিক দুটো শেখালাম, এর থেকে আরও কত নতুন আলোচনা বা নতুন চিন্তার শুরু হবে কে জানে? তোমরা যদি এই নিয়ে আরও আলোচনা করতে চাও তো আমার কাছে চিঠি লিখতে পারো। আমি সময় পেলেই তোমাদের চিঠির জবাব দেব।

——

মণি ও মুক্তো

ইংরেজিতে বলে 'সাইরেন' বা 'মারমেইড'। বাংলায় যাকে আমরা মৎস্যকন্যা বলে থাকি। যার উপরাংশ মানবীর মত, নিম্নাংশ মাছ আকৃতির, এরা সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। ঠোঁট দুটি অনেকটা খরগোসের মত, যার সাহায্যে এরা জলজ উদ্ভিদ গলাধঃকরণ করে থাকে।

সম্রাট ও সন্ন্যাসী

—মায়া বসু

নৃপতি বিবস্বান—
প্রজাবৎসল সংযত চেতা বড়ই ধর্মপ্রাণ।
ঘন অরণ্যে সারাদিন ধরে মৃগয়ায় অবশেষে
শ্রান্ত ক্লান্ত ফিরিতেছিলেন সন্ধ্যায় নিজ দেশে।
মাঝখানে তিনি শিবিকায়, আর সৈন্যেরা দুই দলে
আগে পিছে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র শিকার লইয়া চলে।
কিছুদূর এসে পাত্রমিত্র চেয়ে দেখে বিস্ময়ে,
গভীর বনেতে সন্ন্যাসী এক সমাধিমগ্ন হয়ে
মুদিত চক্ষে পথের উপরে একা বসে যোগাসনে,
পরমারাধ্য ইষ্ট মন্ত্র জপ করে এক মনে।

ত্যক্ত চিত্তে অমাত্য এক তাঁর কাছে গিয়ে কয়,
"ধ্যান করিবার জায়গাটি বেশ পেয়েছেন মহাশয়।
দেখুন চাহিয়া, পিছনে শিবিকা, নিজে রাজা সমাসীন,
মাঝপথ ছেড়ে সরে গিয়ে তাঁকে যাইবার পথ দিন।"

শুনে সেই কথা, চক্ষু মেলিয়া যোগীবর তাকে কয়,
"তোমার রাজাকে বল, হেথা এক মহারাজা বসে রয়।
সহস্র কোটি জপ মোর শেষ না হবে যতক্ষণ,
এক তিলও আমি নড়িব না জেনো, ছাড়িব না যোগাসন।"

শুনে তাপসের হেন নির্ভীক কথা,
পাত্রমিত্র, রাজার মনেও জাগিল চঞ্চলতা।
শিবিকা হইতে নামিলেন তিনি, বিচলিত অতিশয়
'এত বড় কথা বলে যে সাধক, সে তো সাধারণ নয়!'
প্রণমি তাপসে কহিলেন রাজা, "কে আপনি যোগীবর?"
মুনি বলিলেন, "তব প্রশ্নের পরে দিব উত্তর।
আগে বল মোরে, তুমি কোন্ জন, কিবা তব পরিচয়?"
বলিলেন রাজা; "আমি অভাজন সাধারণ নর নয়।
রাজা বলে মোরে জানে এই দেশবাসী!"
শুনিয়া সাধুর অধরে ফুটিল ঈষৎ মধুর হাসি।

"রাজার উপরে মহারাজা আমি, এ কথাও জেনো তুমি,
রাজ্য আমার এ তিন ভুবন, এই অরণ্যভূমি।"
মৃদু হেসে রাজা প্রশ্ন করেন, "মহারাজা যদি হন,
সেনাসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র তাহলে, কোথায় কন?"
বলিলেন যোগী শির করি উন্নত,—
"শত্রু থাকিলে সৈন্যে অস্ত্রে তবে প্রয়োজন হত।
এ জগতে মোর কোন শত্রুই নাই,
ও সব ঝামেলা—যন্ত্রণা জ্বালা, কিছুই রাখিনি তাই।"

পরাজিত রাজা তবু বলিলেন, "কোথা তব কোষাগার?
কোথায় প্রাসাদ, তোষাখানা আর অর্থের ভাণ্ডার?
কই রাজবেশ? কোথায় বা প্রজা? কোথায় সিংহাসন?
কমণ্ডলু আর কৌপীনে কেন ধুলি 'পরে বসে রন?"
শিশুর মতন সরল হাস্যে এবার বলেন যোগী;
"আমি সন্ন্যাসী হে মহারাজ, নহি তব সম ভোগী।
খরচ কোথায়? কী করিব টাকা দিয়ে?
কী করিব বল কোষাগার আর অর্থের বোঝা বয়ে?

প্রজাগণ মোর ছড়ায়ে রয়েছে সারাটি পৃথিবী ময়,
অরণ্যবাসী হিংস্র জীবেরা আমারে করে না ভয়।”

এই চরাচর অধিপতি আমি, এ মাটি সিংহাসন,
এর চেয়ে দামী কোন আসনেই নেই মোর প্রয়োজন।
এ মরদেহের সাজসজ্জার কতটুকু দাম আছে?
পরম রতন চিরসত্য সে লুকানো হৃদয় মাঝে।
তুমি তো জান না কত সম্পদে পূর্ণ এ বনতল,
কত স্রোতধারা, বৃক্ষ ও পাখি, কত ফুল কত ফল।
এর চেয়ে দামী আর কিছু আছে নাকি?
এ সাম্রাজ্য কোন দিনও রাজা, আমাকে দেবে না ফাঁকি।

আমার রাজ্যে চির প্রশান্তি, স্থায়ী রবে চিরদিন,
শত্রুর হাতে ধ্বংস হবে না, হবে নাকো ধূলি লীন।
তাই বলি শোন, তুমি যদি রাজা, আমি তবে মহারাজ,
বিলাস ব্যসনে তুমি তো ব্যস্ত, ওতে মোর কোন্ কাজ?

তাই বসে এই ধুলার সিংহাসনে,
সারাদিন ধরে ‘তাঁকেই’ যে আমি ডেকে যাই এক মনে।
সেই ‘একজন’ ছাড়া আমি আর শুনি নাকো কারও কথা,
অন্য কাহারও আদেশ শুনিলে, পাই মনে বড় ব্যথা।

সাধকের কথা শুনে শ্রদ্ধায় রাজা কর জুড়ি কন;
“অক্ষয় হোক হে প্রভু তোমার ধুলার সিংহাসন।
নড়িতে হবে না সরিতে হবে না, থাক তুমি অবিচল,
পদব্রজেই আমি চলে যাব, লয়ে মোর দলবল॥”

সোমা

—নটরাজন

ডব্‌লিউ. এম্. ই.—নয় আট সাত ছয়।

আকাশী রংয়ের সাধারণ এ্যাম্‌বাসাডর গাড়ি। এই সাধারণ গাড়িটাকেই হইচই, চিৎকার করে একেবারে অসাধারণ করে তুললো শশধর।

—দেখেছেন বাবু, গাড়ির গড়নটা একবার দেখেছেন? কেমন সুন্দর ছিম্‌ছাম্ চেহারা।

—এতে আর দেখবার কি আছে? সব এ্যাম্‌বাসাডারেরই এক রকম চেহারা।

—তা ঠিক। একই ছাঁচে গড়া যখন তখন তো এক রকম চেহারা হবেই। তবুও তার মধ্যে কিছু তফাৎ থাকবেই। একই বাপের পাঁচ ছেলে কি এক রকম দেখতে হয়?

শশধরের এই যুক্তির পরে আর কিছু বলা চলে না। কাজেই কিছু না বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে চুপ করে থাকেন মনোরঞ্জনবাবু।

মনোরঞ্জন ভৌমিক হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট। বেঁটে, ফর্সা, বেশ গোলগাল চেহারা। মাথার মাঝখানে মাঝারি গোছের একটি টাক। নাকের নীচে কাঁচা-পাকা গোঁফ। মোটামুটি ভালো রোজগার মনোরঞ্জনবাবুর। এতকাল বাসে-ট্রামেই কোর্টে যাতায়াত করতেন। ইদানীং বড় ছেলের চাপে পড়ে গাড়িটা কিনেছেন। বড় ছেলে বম্বে

থাকে। মস্ত বড় অফিসার। তার ইচ্ছে নয় এই বয়সে তার বাবা বাসে-ট্রামে কষ্ট করে কোর্টে যাতায়াত করেন।

ছেলের ইচ্ছে ছিল মনোরঞ্জনবাবু নতুন গাড়ি কেনেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়িই কিনলেন তিনি। ছেলেকে লিখলেন—নতুন গাড়ি কিনে অযথা পয়সা খরচ করে কি লাভ? সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডই ভালো।

মিথ্যে লেখেননি মনোরঞ্জনবাবু। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হলেও কণ্ডিশন খুবই ভালো। দামেও অনেক সুবিধে।

গাড়ি কেনার আগেই ঘোড়া কেনার মত গাড়িটা বাড়িতে আসার আগেই একজন ভালো ড্রাইভারের খোঁজ করতে লাগলেন মনোরঞ্জনবাবু। মোটর গাড়ির ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বোঝেন না তিনি। কাজেই একজন অভিজ্ঞ লোকের দরকার। সেই সুবাদেই শশধরের এই বাড়িতে আগমন।

শশধর মাইতি। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মাথায়ও যেমন একরাশ কাঁচা-পাকা চুল, তেমনি গালেও কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাসে দু'বারের বেশি দাড়ি কামায় না শশধর। পয়সা হাতে না থাকলে সারা মাসে একবারও নয়। মুখের দু'পাশের দুই কষে বারো মাসই হাজা। সামনের লম্বা দাঁতে পান-দোক্তার ছোপ্।

বাউণ্ডুলে না বললেও আধা-বাউণ্ডুলে বলা চলে শশধরকে। মেদিনীপুরের এক গাঁয়ে ওর বাড়ি। জমিজমা যা আছে, তাতে বছরের খোরাকের জন্যে ভাবতে হয় না। দুটো ছেলে-মেয়ে ও বৌ নিয়ে ওর সংসার। কিন্তু বাড়িতে মন টেকে না শশধরের। নেশা-ভাঙ করে ও রাতদিন এখানে ওখানে আড্ডা দিয়ে সময় কাটতো তার। নিজের জমি-জিরেত দেখাশোনায় মন না থাকলেও মোটর গাড়ি সম্পর্কে ছিল তার দারুণ উৎসাহ। শশধর তার বন্ধুদের প্রায়ই শোনাতো যে সে নাকি একখানা ট্যাক্সি কিনে কলকাতায় চালাবে। সেই আশায় মোটর ড্রাইভিংও শিখেছিল। কিন্তু গাড়ি কেনা আর হয়ে ওঠে নি। অবশেষে জেলাসদরে গিয়ে লাইসেন্স যোগাড় করে কিছুদিন কাঁথি অঞ্চলের এক বাস মালিকের বাস চালালো। কিন্তু নিজের ট্যাক্সি চালানো যার মনোবাসনা, তার বাসে মন ভরবে কেন? সবশেষে সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে একখণ্ড জমি বিক্রি করে হাজার দু'য়েক টাকা নিয়ে সে চলে এলো কলকাতায়। ঐ টাকা ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়ে সে ট্যাক্সি কিনবে।

কলকাতায় এসে ব্যাঙ্কের ধারের জন্যে কিছুদিন ঘোরাঘুরিও করলে শশধর। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ঋণের দেখা নেই। মাঝখান থেকে কলকাতায় নিজের খাইখরচ এবং নেশার ধাক্কায় ও ব্যাঙ্ক-ঋণের দালালের পেছনে তার জমি বেচা টাকাটা খরচ হয়ে যেতেই চৈতন্যোদয় হলো শশধরের। এখন সে কি করবে? অবশেষে ট্যাক্সি কেনার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে চাকরির খোঁজ করতে লাগলো সে। সেই সূত্রেই হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে তার আগমন।

গাড়ি তো নয়, যেন এক জীবন্ত প্রাণী। গাড়িখানার সঙ্গে তেমনি ব্যবহারই করে

শশধর। নিজের হাতে ধোয়-মোছে। গাড়ি ধোয়ার জন্যে একটি ছোকরা চাকর রাখার কথা উঠতেই শশধর মনোরঞ্জনবাবুকে সোজা বলে দিলে, ওসব হবে নি, বাবু। সোমাকে আমি অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারবো নি।

সোমা। সোমা আবার কে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর মনোরঞ্জনের।

লম্বা দাঁতগুলো বের করে একটু সলজ্জ হেসে জবাব দেয় শশধর। ও তো সোমবার এই বাড়িতে এসেছে, তাই ওর নাম রেখেছি সোমা।

শশধরের কথায় মনোরঞ্জন মনে মনে হাসলেও তাঁর স্ত্রী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একটু জোরেই হেসে ওঠেন। সেই দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে শশধর, হাসবেন নি মা-ঠাকরুণ। যন্ত্র হলেও ওর প্রাণ আছে। গাড়িকে ভালোবাসলে গাড়িও উল্টে মানুষকে ভালোবাসে। জানেন মা-ঠাকরুণ, যখন সোমাকে চালাই তখন ওর প্রতিটি শব্দের অর্থ আমি বুঝতে পারি। কোথায় ওর অসুবিধে কিংবা কষ্ট হচ্ছে তা আমি শব্দ শুনেই বলে দিতে পারি।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী শশধরের কথায় বেশ কৌতুক বোধ করেন। মুখের আঁচল সরিয়ে কৃত্রিম গম্ভীর সুরে তিনি বললেন, ভালো—ভালো। তা ছাড়া সোমা নামটাও বেশ ভালো। তবে কি না কেউ তো আর প্রাইভেট গাড়ির নাম রাখে না। তাই বলছিলাম—

মনোরঞ্জনের স্ত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে শশধর, কেন মা-ঠাকরুণ? বাসের যদি নাম থাকতে পারে তা'হলে প্রাইভেট গাড়ির নাম থাকলে দোষ কি?

না—না, কোন দোষ নেই। এবার মনোরঞ্জন বলে ওঠেন, তুমি ওকে সোমা বলেই ডেকো শশধর।

সোমা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই শশধরের। যতক্ষণ বাড়ি থাকে, ততক্ষণ সোমার পরিচর্যা ও অঙ্গসজ্জাতেই ব্যস্ত থাকে শশধর। মনোরঞ্জনকে দিয়ে সে গাড়ির চেহারাটাই বদলে ফেলেছে। সোমার গায়ে এখন নতুন রং, ওর প্রতিটি যন্ত্রপাতি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। এখন ওকে দেখলে চট্ করে বোঝাই যাবে না যে ওকে একদিন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হিসেবে কেনা হয়েছিল।

ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে সহিসের থাকার ঘরের মত সোমার গ্যারেজের পাশেই একটা ছোট্ট ঘরে থাকে শশধর। দেয়ালের মাঝখানে একটা ছোট জানালা। সেই জানালা দিয়ে সর্বদা সোমার দিকে নজর রাখে সে। এক মুহূর্তের জন্যেও রাস্তার কোথাও গাড়ি রেখে শশধর যায় না। যে গাড়ি-চোরের উৎপাত, তাতে হয়তো সোমাকেই তুলে নিয়ে যাবে, নিদেনপক্ষে ওর একটা পার্টস খুলে নিতে কতক্ষণ?

মনোরঞ্জনকে কোর্ট থেকে নিয়ে এসেই গাড়ির পরিচর্যায় লেগে পড়ে শশধর। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই আর একবার। অবশেষে বেলা ঠিক দশটায় দরজায় গাড়ি লাগিয়ে শশধর যখন এসে দাঁড়ায় তখন সেই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গাড়ির দিকে তাকিয়ে বাস্তবিকই খুশি হয়ে ওঠেন মনোরঞ্জন। গাড়ির সিটে ঠেস দিয়ে বসে আদালতের

পথে যেতে যেতে নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করেন, তোমার সোমার জন্যে আর কি চাই শশধর?

গাড়ি চালাতে চালাতে লম্বা দাঁতগুলো বের করে হেসে জবাব দেয় শশধর, এখন আর কিছু চাই না বাবু। দরকার হলে পরে বলবো।

সোমাকে নিয়ে শশধরের এমনি কাণ্ডকারখানা দেখে মনোরঞ্জনের কলেজে পড়া ছোট ছেলে হেসে বলে, লোকটা বাস্তবিকই পাগল। সেদিন দেখলাম, গাড়ি সাফ করতে করতে একা একাই গাড়ির সঙ্গে কথা বলছে।

ছেলের হাসির সঙ্গে কিন্তু যোগ দিতে পারেন না মনোরঞ্জন ভৌমিক। একটু সময় চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি জবাব দেন, প্রাণহীন মাটির পুতুলের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে যদি আমরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে পারি, তাহলে প্রাণহীন একটা যন্ত্রকে জীবন্ত ধরে নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি কোথায়?

এ্যাড্‌ভোকেট বাপের যুক্তির ওপর আর কোন যুক্তি চাপাতে না পেরে সেখান থেকে সরে পড়ে তাঁর ছোট ছেলে।

শশধরের চিন্তাভাবনাকে যতই কেন না সমর্থন করেন মনোরঞ্জন, সোমাকে জীবন্ত বলে কল্পনা করতে ঠিক পারেন না তিনি। সেদিন কোর্টে যাবার সময় গাড়িতে উঠতে গিয়ে মনোরঞ্জন লক্ষ্য করেন, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ আটকে আছে গাড়ির চাকার সঙ্গে। মনোরঞ্জন পা দিয়ে ঠুকে কাগজের টুকরোটা সরিয়ে দিতেই একেবারে হা-হা করে ওঠে শশধর। অন্য কেউ হলে বোধহয় সেই মুহূর্তে সে ধাক্কা দিয়েই তাকে সরিয়ে দিত। শশধর মনোরঞ্জনের সামনে এসে অনুযোগের সুরে বললে, আপনার মেয়ের গায়ে এমনি কাগজ আটকে থাকলে কি আপনি বাবু পারতেন পা দিয়ে ঠুকে তা সরিয়ে দিতে?

মনোরঞ্জন বুঝতে পারেন, অসাবধানে তিনি শশধরের মনে আঘাত করেছেন। তাই লজ্জিত মুখে নিঃশব্দে তিনি গিয়ে গাড়ির মধ্যে উঠে বসেন।

পথে চলতে চলতে মনোরঞ্জন এক্ সময় বললেন, আচ্ছা শশধর, তোমার সোমার চাকায় পা ঠুকে না হয় আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু রাস্তায় এত নোংরা আবর্জনার ওপর দিয়ে যেতে তোমার সোমার চাকা নোংরা হচ্ছে না? তা ছাড়া, এই যে আমরা গাড়ির মধ্যে পা রাখছি, তাতে তার অপমান হচ্ছে না?

গাড়ি চালাতে চালাতে একটু ম্লান হাসে শশধর। তারপর সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দেয়, আপনি বাবু বড় উকিল, আমি অশিক্ষিত ড্রাইভার। আপনার কথার কি জবাব দেব আমি? মা গঙ্গা তো কত নোংরার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেন, তাই বলে কি তাঁর জল কখনও অপবিত্র হয় বাবু? তা ছাড়া, গঙ্গাস্নানের সময় মানুষের পায়ে গঙ্গাজল লাগে বলে কি মা গঙ্গাকে অপমান করা হয়?

শশধরের জবাবে চমৎকৃত হন মনোরঞ্জন। এমন লাগসই যুক্তি তিনি নিজেও হয়তো চট্ করে দিতে পারতেন না।

সেদিন ছিল সাধারণ ধর্মঘট। পথে ঘাটে গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। কি একটা জরুরী কাজে সেদিন মনোরঞ্জনকে একবার যেতেই হবে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

বাড়ির সামনের গলি পেরিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে আসতেই একদল যুবক হই-হই করে ঘিরে ধরলে মনোরঞ্জনের গাড়ি। চেঁচিয়ে বলতে থাকে তারা, হরতালের দিন পথে গাড়ি বের করেছেন কেন?

বিব্রত মনোরঞ্জন যুবকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন নিজের জরুরী প্রয়োজনের কথা। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ছেলেদের স্পষ্ট হুকুম, গাড়িটাকে আগুনে পোড়াতে না চাইলে এখনই গাড়ির মুখ ঘোরান।

মনোরঞ্জনের নির্দেশে অগত্যা গাড়ির মুখ ঘোরাতে হলো শশধরকে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি উচ্ছৃঙ্খল ছেলে হাতের লাঠিখানা দিয়ে গ্যাড়ির বনেটের ওপর আঘাত করে বলে ওঠে, জলদি হঠো।

হঠাৎ কি যেন হলো শশধরের। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েই সে সেই ছেলেটির হাতের লাঠিখানা চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে, গাড়ির বনেটে ঘা দিলেন কেন?

ছেলেটি প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে যায়। অন্য যুবকেরা ঘিরে ধরে শশধরকে। একজন চেপে ধরে তার জামার কলার। শশধর চট করে নিজের গায়ের জামার পেছন দিকটা তুলে ধরে চিৎকার করে বলতে থাকে, হরতালের দিন পথে গাড়ি বের করে যদি অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমি করেছি। সেই জন্যে যদি মারতে হয় তো এই পিঠ পেতে দিচ্ছি, আমাকে মারুন। কিন্তু এই গাড়িটা কি দোষ করলো? একে লাঠি দিয়ে পেটালেন কেন?

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায় নি। শশধর রাগে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

একদিন সকালে শশধর গাড়ি নিয়ে চলেছে কালীঘাট। সঙ্গে মনোরঞ্জন ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরা চলেছেন কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে।

ফেরার পথে অ্যাক্সিডেণ্ট। না, তেমন জোর কিছু নয়। সামনের লরীটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেই সোমা গিয়ে ধাক্কা মারলে তাকে। লরীটার কিছু না হলেও সোমার একদিকে হেড লাইট ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়ে একটা পাশ দুমড়ে গেল।

স্টার্ট বন্ধ করে শশধর নেমে এলো গাড়ি থেকে। লরীটা ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। সোমার দুমড়ে যাওয়া একটা চোখের দিকে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শশধর। তার সারা মুখে জেগে উঠলো ব্যথার চিহ্ন। চোখ হারানোর ব্যথায় সোমা নিজে যতটা কাতর তার চাইতে ঢের বেশি কাতর শশধর নিজে। সেই মুহূর্তে সোমার দেহের ব্যথা শশধরের মনটাকে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিল। ছলছল চোখে সে ফিরে এসে বসল নিজের সীটে। মনোরঞ্জন কিংবা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটি কথাও বললে না। তারপর ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।
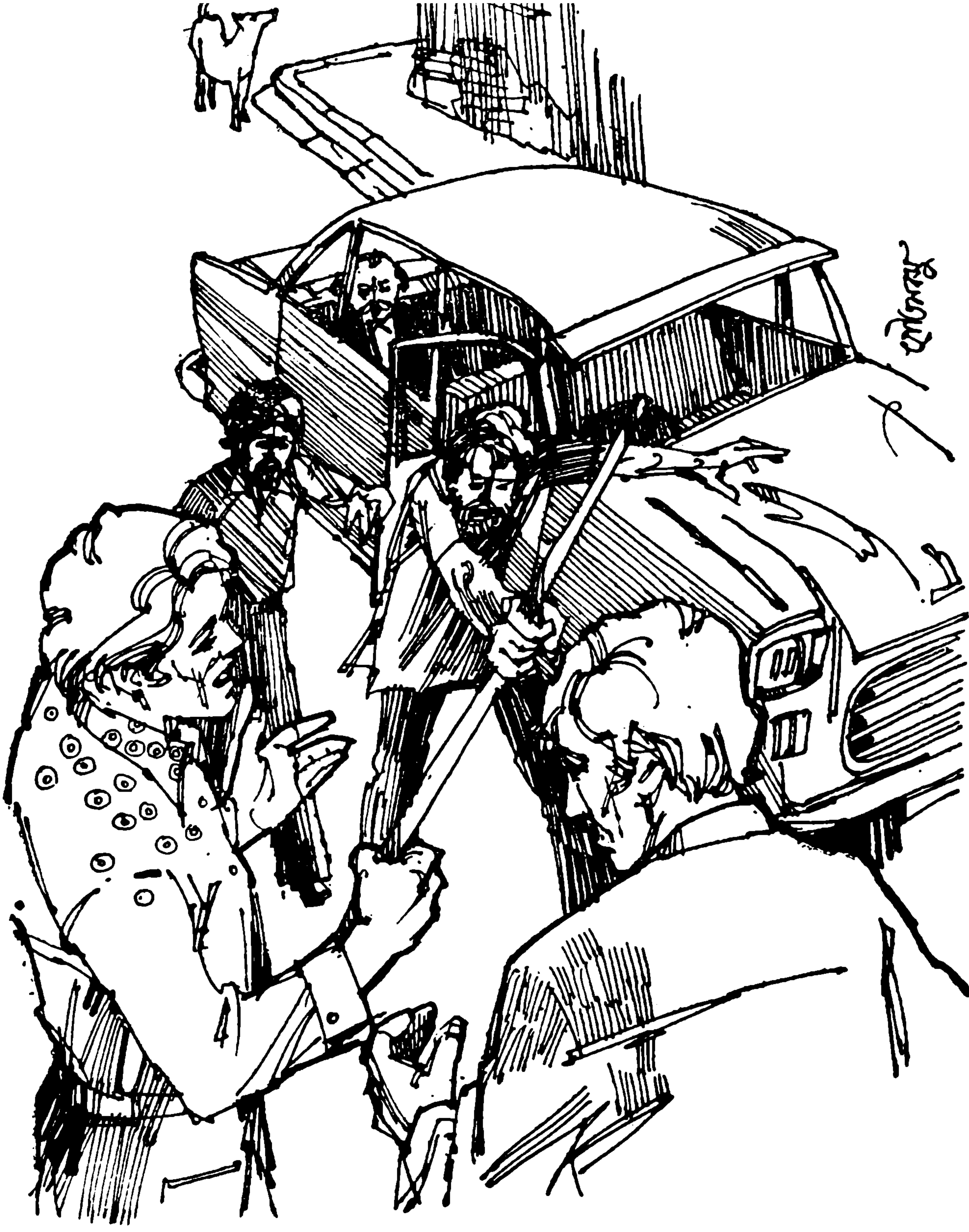
শশধর লাঠিখানা চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে। [পৃঃ ৫৩

গাড়ি থেকে নেমে ভাঙা হেড লাইটের দিকে একবার তাকান মনোরঞ্জন। শশধরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তিনি বললেন, তেমন কিছু হয় নি। গ্যারেজে নিয়ে গেলে একটা দিনেই মিস্ত্রীরা ঠিক করে দেবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শশধর কিন্তু একটা কথাও বলে নি। মনোরঞ্জনের কথায় এবার সে মৃদু কণ্ঠে বললে, আমি সোমাকে গ্যারেজে নিয়ে যাচ্ছি।

—সে কি! বলে ওঠেন মনোরঞ্জন, এই অবেলায় না খেয়ে-দেয়ে গ্যারেজে যাবে কেন? খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে তারপরে না হয়—

—না বাবু, আমি এখনই যাচ্ছি।

সারাটা দিন স্নান-খাওয়া ভুলে গ্যারেজে পড়ে রইলো শশধর। একচোখ কানা সোমার দিকে তাকাতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল তার। শশধরের কাতর অনুরোধে মিস্ত্রীরা সেই দিনই বাধ্য হলো কাজে হাত লাগাতে। গ্যারেজ তো নয়, যেন হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে সোমার। ছলছল চোখে যেন কন্যার চিকিৎসা দেখছে তার বাবা।

অবশেষে সন্ধ্যায় শশধর যখন সোমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো তখন তার মুখের ওপর থেকে থমথমে মেঘখানা সরে গেছে। ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিচ্ছে হাসি। রোগ-মুক্ত হয়েছে সোমা। ডাক্তারেরা সব কিছু ঠিকঠাক করে নতুন চোখ লাগিয়ে দিয়েছে তাকে।

শশধরকে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক দেখে মনোরঞ্জন এবার ঠাট্টার সুরে তাকে বললেন, কি শশধর, গাড়িকে ভালোবাসলে গাড়ি নাকি বেইমানী করে না? আজকের অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে ঘটলো কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের সঙ্গে জবাব দেয় শশধর, না বাবু, সোমা মোটেই বেইমানী করে নি। আমারই দোষ। আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল আমার।

সোমাকে নিয়ে বেশ ভালই দিন কাটছিল শশধরের। সহসা বম্বে থেকে মনোরঞ্জন-বাবুর বড় ছেলের একখানা চিঠি আসতেই একখানা দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এলো শশধরের মাথার ওপর।

ছেলে বাপকে লিখেছে—আমি আগামী মাসেই কলকাতায় বদলি হয়ে যাচ্ছি। আমার বিলিতি মোটর গাড়িটাও সঙ্গে নিয়ে যাবো। বাড়িতে দুটো গাড়ি রাখার কোন অর্থ হয় না। কাজেই এ মাসের মধ্যেই খদ্দের দেখে ভালো দামে তোমার এ্যাম্বাসাডর গাড়িটা বিক্রি করে দিও। কলকাতায় একখানা গাড়িতেই তোমার আমার দিব্যি চলে যাবে।

মনোরঞ্জন ভৌমিকের সংসারে তাঁর বড় ছেলের ইচ্ছের দাম অনেক। কেউ তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করে না। এমন কি মনোরঞ্জনবাবু নিজেও নন।

কথাটা কানে যেতেই নাওয়া-খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলে শশধর। ছুটির দিন কাছেপিঠে যে একটু-আধটু ঘুরে বেড়িয়ে আসতো তাও ছেড়ে দিলে। অবশেষে দরবার করতে আরম্ভ করলে মনোরঞ্জনের কাছে—দোহাই বাবু, সোমাকে আপনি বিক্রি করবেন না। আপনি বরঞ্চ দাদাবাবুকে লিখে দিন, দুটো গাড়িই থাকুক। কোন অসুবিধে হবে না।

জবাব দেন মনোরঞ্জন, না শশধর, তা হয় না। দু'খানা গাড়ি পোষা কি চাট্টিখানি কথা? তা ছাড়া খোকারও তা ইচ্ছে নয়। আজকাল পেট্রোলের যে দাম। তার ওপর দুটো গাড়ির জন্যে দু'জন ড্রাইভার।

—তা কেন বাবু? বলতে থাকে শশধর, দু'জন ড্রাইভারের দরকার নেই। আমি একাই দুটো গাড়ি চালাবো, যখন যেটা বলবেন।

—না শশধর, খোকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না। মনোরঞ্জন বললেন, আমি খোকাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এখানে তুমিই ঐ গাড়িটা চালাবে।

গাড়ি বিক্রির খবর পেয়ে খদ্দের আসছে, দালাল আসছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন মনোরঞ্জনবাবু। দরদাম নিয়ে টানাটানি চলছে। শশধর যেন কেমন নির্বিকার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই শরীর খারাপের অজুহাতে শুয়ে থাকে। খায়ও না, বিছানা ছেড়ে ওঠেও না। মাঝে-মধ্যেই মনোরঞ্জনকে ট্যাক্সি চেপে কোর্টে যেতে হয়।

শশধরের ধারণা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত মনোরঞ্জনের হয়তো মত পাল্টে যেতে পারে। সোমাকে বিক্রি করে দেবার ইচ্ছে বোধ হয় মনোরঞ্জনের নিজেরও নেই। তাই কোন খদ্দেরই তাঁর পছন্দ নয়। ভালো দাম না পাওয়ার অছিলায় শেষ পর্যন্ত সোমা হয়তো থেকেই যাবে। আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে থাকে শশধর।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বিরাট লটবহর নিয়ে বম্বে থেকে হাজির হয় মনোরঞ্জনের বড় ছেলে সুকান্ত। সঙ্গে সেই বিদেশী গাড়ি। সুকান্ত দেখতেও যেমন সাহেবের মত, মেজাজটাও তেমনি। বাপের সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড এ্যাম্বাসাডার দেখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সে বলে ওঠে, এ কি, গাড়িটা এখনও বিক্রি করোনি বাবা?

আমতা আমতা করে জবাব দেন মনোরঞ্জন, না, তেমন ভালো খদ্দের আর পেলাম না। তাই—

—ঠিক আছে—ঠিক আছে, বলে ওঠে সুকান্ত, এ নিয়ে আর তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই যা হয় করবো।

না, আর কোন সম্ভাবনা নেই। শশধরের মন থেকে শেষ আশার আলোটুকুও নিভে যায়। সোমাকে এবার যেতেই হবে।

সোমা না হয় চলে যাবে, কিন্তু যাবার আগে তার এই হেনস্থা কেমন করে সহ্য করবে শশধর? সুকান্তর ঐ বিদেশী গাড়িটা বাস্তবিকই চমৎকার। দেখতেও যেমন, কাজেও তেমনি। বেড়ালের মত নিঃশব্দ তার গতি। মৃদু গুঞ্জন তুলে সে স্টার্ট নেয়। কিন্তু তাই বলে নিজের জায়গাটুকু ঐ বিদেশী গাড়িকে ছেড়ে দিয়ে সোমাকে বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভিজতে হবে কেন? কিন্তু উপায় নেই। সুকান্তর তাই হুকুম। যেটা দু'দিন পরে চলেই যাবে, সেটাই না হয় বাইরে ভিজুক। তাই বলে দামী বিদেশী গাড়িটা তো আর জলে ভিজতে পারে না। গ্যারেজে যখন দুটো গাড়ি রাখার জায়গা নেই, তখন একটাকে তো বাইরে থাকতে হবেই।

সুকান্তর হুকুমে শশধর একদিন সেই বিদেশী গাড়িটা চালিয়েছিল। নিঃসন্দেহে ভালো গাড়ি। সোমার চাইতে অনেক ভালো। কিন্তু সোমা সোমাই। তার সঙ্গে অন্য কারুর তুলনা চলতে পারে না।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় শশধরের। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। জানালা খুলে বাইরে তাকায় শশধর। অসহায় সোমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। চোখ ফেটে জল আসে শশধরের। কিন্তু সে নিরুপায়। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে গ্যারেজ খুলে ঐ উড়ে এসে জুড়ে বসা গাড়িটাকে ঠেলে বের করে দিয়ে সোমাকে এনে তার নিজের জায়গায় রাখতে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। অগত্যা সারারাত বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তার।

সোমা যেদিন চলে গেল, সেদিন বিছানা ছেড়ে উঠলোই না শশধর। একবার দেখতেও গেল না তাকে। তবে শুয়ে শুয়েই সে টের পেল, সোমা চলে যাচ্ছে। ইঞ্জিন শব্দ করে উঠলো সোমার। বুকটা যেন কেমন করে ওঠে শশধরের। সশব্দে গিয়ার লাগালো সোমার নতুন মালিক লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী যোগীন্দর সিং। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে শশধরের। লোকটা তো গিয়ার লাগাতেই জানে না। এত জোরে শব্দ করে গিয়ার লাগাতে হয় নাকি? ঐ লোকটার হাতে পড়ে সোমার কপালে কত দুর্দশা আছে কে জানে?

সোমা চলে গেলেও শশধর কিন্তু বহাল রইলো মনোরঞ্জনের বাড়িতে। ঐ বিদেশী গাড়িটা তাকেই চালাতে হবে। সুকান্ত তার মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দিলে। সেই সঙ্গে শশধরের এক সেট ভালো পোশাকের জন্যে দর্জির দোকানে অর্ডারও গেল।

নতুন ব্যবস্থায় শশধরের খুশি হওয়াই উচিত, কিন্তু তা সে কিছুতেই হতে পারছে

না। এদেশে ভালো বিদেশী গাড়ির বাড়তি সম্মান। সেই সঙ্গে সেই গাড়ির ড্রাইভারের সম্মানও বেশি। কিন্তু শশধরের মন চলে গেছে সোমার সঙ্গে। বিদেশী গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত দিলে তার সোমার কথা মনে পড়ে। পা দিয়ে ক্ল্যাচ্ কিংবা এক্সিলারেটরে চাপ দিলেও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সোমার ছবি।

অবশেষে একদিন শশধর এসে দাঁড়ায় মনোরঞ্জনের সামনে। মাথা নীচু করে মৃদু কণ্ঠে সে বললে যে সে আর এখানে চাকরি করবে না।

—সে কি, চাকরি ছেড়ে দেবে কেন? বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন মনোরঞ্জন।

—না বাবু, ভালো লাগছে না।

—অন্য কোথাও বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছ না কি?

মনোরঞ্জনের কথায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসে শশধর। তারপর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, না বাবু, এর চেয়ে বেশি মাইনে আমাকে আর কে দেবে? তা নয়। আমার আর এখানে ভালো লাগছে না।

—কোথায় চাকরি করবে বলে ঠিক করেছো?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় শশধর, এইবার ড্রাইভারের চাকরিই আর করবো নি। দেশে চলে যাবো।

মনোরঞ্জন ও তাঁর স্ত্রী অনেক অনুরোধ করেছিলেন শশধরকে। শশধর জবাবে মনোরঞ্জনের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সামান্য ম্লান হেসে বলেছিল, না মা-ঠাকরুণ, আমাকে আর থাকতে বলবেন না। মন আমার ভেঙে গেছে। আর এখানে কাজ করতে পারবো নি আমি।

শশধর কিন্তু মিথ্যে বলেছিল মনোরঞ্জনের কাছে। ড্রাইভারের চাকরিও সে ছাড়ে নি কিংবা দেশেও ফিরে যায় নি। মনোরঞ্জনের বাড়ির চাকরি ছেড়ে সে সোজা এসে হাজির হয়েছিল সোমার নতুন মালিক যোগীন্দর সিংয়ের কাছে। সোমা তখন দাঁড়িয়েছিল তার দোকানের সামনেই। ড্রাইভার রাখে নি যোগীন্দর। সে নিজেই গাড়ি চালায়।

শশধরের কথা শুনে ঝানু ব্যবসাদার যোগীন্দর সিং একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর বললে, আমি তো ভেবেছি আমি নিজেই ড্রাইভ করবো।

সে তো ভালো কথা সিংজী। বলতে থাকে শশধর, তবে আমি আপনার এই গাড়ি অনেকদিন চালিয়েছি। এর নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি। আমার হাতে গাড়ি দিলে গাড়ি আপনার ভালই থাকবে।

তা তো বুঝলাম, চিন্তিত কণ্ঠে বললে যোগীন্দর, নিজেই যখন ড্রাইভিং জানি তখন শুধু শুধু ড্রাইভারের পেছনে খরচ করতে যাই কেন?

শশধর চুপ করে থাকে। এই কথার পরে সে আর কি বলতে পারে? তবুও নাছোড়বান্দা হয়ে সে আবার বললে, বেশ তো সিংজী, আমার জন্যে আপনাকে বেশি খরচ করতে হবে না। মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ি যা পেতাম, তার অর্ধেক আপনি দেবেন।

তাতেই আমি চালিয়ে নেব। অনেকদিন এই গাড়িটাকে চালিয়েছি বলেই একটু মায়া পড়ে গেছে। তাই এসেছি আপনার কাছে।

শশধরের দুর্বলতাটুকু বুঝতে পেরে ঝানু ব্যবসায়ী যোগীন্দর সিং আরও একটু চাপ দেয় তাকে। অবশেষে অতি সামান্য মাইনেয় কাজে বহাল করে শশধরকে।

বেশ কিছুদিন পরে আবার সোমার সঙ্গে দেখা শশধরের। তার মনে হলো,- সোমা যেন তার হেড-লাইটের চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। প্রথম দিন স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে শশধরের মনে জেগে উঠলো এক বিচিত্র অনুভূতি। অনেকদিন পরে যেন সে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে অনুভব করছে। মনটা আনন্দে নেচে ওঠে শশধরের। মেয়ের কাছে ফিরে এলো বাপ। আর কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে না তাদের।

শশধরকে কাজে বহাল করেও কিন্তু খুঁতখুঁতি যায় না যোগীন্দর সিংয়ের। গাড়িটাকে ভালোবাসে বলেই কি শশধর এত অল্প মাইনেতে চাকরি করতে রাজী হলো? নাকি, এর পেছনে অন্য কিছু উদ্দেশ্য আছে? একটা যন্ত্রকে ভালোবেসে যে কেউ এমন স্বার্থত্যাগ করতে পারে, তা ছিল ব্যবসায়ী যোগীন্দরের ধারণার বাইরে।

যোগীন্দরের কাছে ভালই কাজ করছে শশধর। কিন্তু যোগীন্দর মনোরঞ্জন নয়। শশধরের ইচ্ছেমত সোমার পেছনে দরাজ হস্তে খরচ করতেও রাজী নয় যোগীন্দর। এ নিয়ে মাঝে মাঝেই মনটা খুঁতখুঁত করে শশধরের। মনে মনে ভাবে, তার নিজের হাতে কিছু পয়সা থাকলে তা দিয়েই সে সোমার পরিচর্যা করতো। কিন্তু উপায় নেই। মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে শশধর কাজ করে চলে। মাঝে মাঝে আপন মনেই সোমার উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলে, কোন চিন্তা নেই তোর। দু'চার মাস পরে হাতে কিছু জমলে তা দিয়েই তোকে আমি ঝকঝকে করে তুলবো। ঐ কিপ্‌টে লোকটার পয়সার তোয়াক্কাই করবো না।

শশধরের কাজে কোনরকম ত্রুটিই খুঁজে পায় না যোগীন্দর, আর, যতই তা না পায়, ততই তার মনের সন্দেহ বাড়তে থাকে। একটা কিছু উদ্দেশ্য ঐ লোকটার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কি সেই উদ্দেশ্য, সেটাই বুঝতে না পেরে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। আবার বিনা দোষে লোকটাকে তাড়িয়ে দিতেও পারে না। তাই চোখ-কান খোলা রেখে সর্বদাই তক্কে তক্কে থাকে সে।

অবশেষে একদিন শশধরের এত অল্প মাইনেতে চাকরি করার রহস্যের সমাধান করে ফেললে যোগীন্দর সিং। শশধর পেট্রোল চুরি করে। মনে মনে হিসেব কষে সে বুঝতে পারে, শশধর নির্ঘাত গাড়ির পেট্রোল চুরি করে তার মাইনের ঘাটতি পূরণ করে নিচ্ছে। কেবল তাই নয়, সেই ঘাটতির অনেক বেশি সে রোজগার করছে।

ব্যবসাদার যোগীন্দর সিং রেখে ঢেকে কথা কইতে জানে না। একদিন সে সোজা জিজ্ঞেস করে বসল শশধরকে, দু'তিন দিন পর পর পেট্রোল কেনা হয়। এত পেট্রোল যায় কোথায়?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ হয়ে ওঠে শশধরের। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে জবাব দেয়, হিসেব করে দেখুন না, রোজ যতটা ঘোরাঘুরি করতে হয়, তাতে এই পেট্রোল লাগে কি না।

হিসেব আমি করেছি, বলে ওঠে যোগীন্দর, এত পেট্রোল খরচ হতে পারে না।

জবাব দেয় শশধর, না সিংজী, আপনার হিসেব ঠিক নয়। একে তো পুরনো গাড়ি, পেট্রোল কিছু বেশি খাবেই। তার ওপর খানাখন্দে ভরা রাস্তা। পেট্রোল তো বেশি খরচ হবেই।

শশধরের জবাবে হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে যোগীন্দর। চিৎকার করে বললে, আমিও ড্রাইভিং জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তুমি নির্ঘাত গাড়ি থেকে পেট্রোল চুরি করো।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে যায় শশধর। এমন চুরির অপবাদ কেউ কোনদিন তাকে দিতে পারে নি। তাও কি না আবার সোমার পেট্রোল।

প্রতিবাদের সুরে কি যেন বলতে যায় শশধর। কিন্তু তার আগেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে যোগীন্দর, আর নয়। এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বিদেয় হও। তোমাকে আর রাখবো না আমি।

বিচ্ছেদ! সোমার সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ! কথাটা ভাবতেও ব্যথায় মনটা টন্‌টন্‌ করে ওঠে শশধরের। চুরির অপবাদের চাইতেও সেই মুহূর্তে সোমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের ব্যাপারটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। অনুনয়ের সুরে সে বলতে থাকে যোগীন্দরকে, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন সিংজী। আপনার এই গাড়িকে আমি আদর করে 'সোমা' বলে ডাকি। সোমা আমার মেয়ে। পেট্রোল হচ্ছে গাড়ির গায়ের রক্ত। বাপ কি কখনও মেয়ের গায়ের রক্ত চুরি করতে পারে?

ওসব বুজরুকি ছাড়ো, বলে ওঠে যোগীন্দর। জেনে শুনে আমি চোর পুষবো না। তুমি এখনই চলে যাও।

শশধর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে যোগীন্দরের হাতে দিয়ে অবসন্ন পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোমা। শশধর এগিয়ে যায় সেই দিকে। সস্নেহে একবার হাত বুলোয় সোমার বনেটে। কয়েক ফোঁটা উষ্ণ জল তার চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়ে সোমার গায়ে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে অদৃশ্য হয়ে যায় শশধর সেখান থেকে।

নিশীথের কালো ছায়া

—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন আমার মাত্র আট বছর বয়স, তখন আমাকে বোলপুর শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়েছিল। খুব দুরন্ত ছিলাম, আর বাড়ির প্রথম শিশু বলে অজস্র আদর পেয়ে পেয়ে বেয়াড়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে কেউ বাগে আনতে পারতো না। তাই পরামর্শ করে স্থির হয়েছিল যে, আমাকে সজুত করতে রবিঠাকুরের স্কুলে পাঠানো হবে। তখন সাধারণের মধ্যে 'শান্তিনিকেতন' কথাটা খুব চালু হয়নি। লোকে বলতো বোলপুরের স্কুল, না হয় রবিঠাকুরের স্কুল। সাধারণের মধ্যে এ-ও ধারণা ছিল যে, বেয়াড়া ছেলেকে সজুত করতে ঐ স্কুলের আর জুড়ি নেই।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার মাতামহ বা দাদামশাইয়ের কী একটা যোগাযোগ ছিল, যার ফলে সহজেই ওখানে থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন আমার মামা। আমি ছিলাম মাতৃহীন। ভালোমতো জ্ঞান হবার আগেই মাকে হারিয়েছিলাম। আমাকে লালন-পালন করেছিলেন আমার দিদিমা।

বোলপুরে মাটির লম্বা একটা কুঁড়েঘরে আমরা কয়েকটি বালক থাকতাম। মামা আমাকে এখানে রেখেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অত ধরা-বাঁধা জীবন আমার ভালো লাগবে কেন? প্রথমেই আমি বিদ্রোহ করলাম। ভোরবেলায় গান গাইতে গাইতে

বৈতালিকের দল আসছে, ঘুম ভাঙবার মুখে গানের সুরটা খুব ভালো লাগছে। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি উঠবো কেন? বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইলাম, কিছুতেই উঠবো না!

আমার পাশের খাটে যে ছেলেটি শুতো, তার নাম নিশীথ। আমারই বয়সী, কিংবা বছরখানেকের বড়ো হতে পারে। ও ঘরে ঢোকা অবধি ওর সঙ্গেই আমার ভাব হয়েছিল প্রথম। সে এসে আমাকে ঠেলতে লাগলো,—এই ওঠো, ওঠো।

আমি জোর করে বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম, উঠলাম না। বৈতালিকের দল গান গাইতে গাইতে আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেল টের পেলাম, কিন্তু মুখ তুললাম না। চলে যাবার পর এক মুহূর্তের জন্য মাথা উঠিয়ে দেখলাম, ঘরে একটি ছেলেও নেই, সব বাইরে চলে গেছে। আমাকে কী যে একগুঁয়েমিতে পেয়ে বসেছিল কে জানে, আমি কাঠ হয়ে বিছানায় শুয়ে রইলাম, কিছুতেই মাথা তুললাম না। খানিকক্ষণ পরে একজন ষণ্ডামতন ঘোর কালো বর্ণের মানুষ এলো, তার পরনে মোটা ধুতি, গায়ে লাল আলোয়ান। সে আমায় বললে,—ঘুম তো ভেঙেছে দেখছি, উঠছো না কেন? উঠে মুখ-হাত ধোও, চান করো, এসব না করলে চলবে কেন? মুখ তুলে লোকটাকে দেখছিলাম। ভাবছিলাম আমাকে এসে চড়চাপড় লাগিয়ে সজুত করবে। কিন্তু তা না করে মিষ্টি করেই কথাগুলো বললো। আমি উত্তরে হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—না—না—আমি কিচ্ছু করবো না! লোকটি এইবার আমাকে ঘাড় ধরে টেনে তুললো বুঝি! কিন্তু তা-ও সে করলো না, ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পরে কেউ আমার কাছে এলো না, কেউ কিছু বললো না। একা একা ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে কতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়? এক সময় উঠে পড়লাম। ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে। তাকিয়ে দেখি, ঘরের ছেলেরা সব গামছা নিয়ে কুয়োতলায় ঐ ঠাণ্ডায় এক এক করে চান করছে, আর সেই ষণ্ডামতন লোকটা কুয়ো থেকে জল তুলে দিচ্ছে। নিশীথের চান হয়ে গিয়েছিল, সে গামছা পরে—কাপড় ছেড়ে—সেই কাপড়টা জল-কাচা করে উঠোনের তারে মেলে দিচ্ছিল। কাজটা শেষ করে সে আমার দিকে ছুটে এলো, বললে,—হাত-মুখ ধুয়ে ছোলা-গুড় খেয়ে নাও। তারপরে চান করো। একটু পরেই তো আমতলায় যেতে হবে, ওখানেই ক্লাস বসবে কি না! অবশ্য তার মাঝে আছে উপাসনা!

—সে আবার কী!

—দেখতেই পাবে।

স্নান সেরে ঘরে এসে দেখলাম, ছেলেরা পাটের কাপড় পরে ছোট্ট কম্বলের আসন বিছিয়ে এধারে-ওধারে বসে গেছে চুপচাপ। একটু পরেই তারা উঠে পড়লো। পাটের কাপড় ছেড়ে সাধারণ ধুতি পরলো, জামা গায়ে দিলো, তারপরে জলখাবার খেয়ে নিলো, —ছোলা-গুড়, আদার টুক্‌রো, মোহনভোগ আর দুধ।

এর পর যখন ঘণ্টা পড়লো, তখন বইপত্র হাতে নিয়ে আমবাগানের দিকে রওনা হলো তারা। আমি দলে পড়ে সবই করলাম, উপাসনা বাদ দিয়ে। বরাদ্দ মতো বাড়ি

থেকে দু'প্রস্থ জামা-কাপড়ের সঙ্গে পাটের কাপড় ও আসনও দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন পাটের কাপড় পরিনি, কারণ আসনে বসে কী করতে হবে, তা তো কেউ বলে দেয়নি! এরা পুরানো ছেলে, সব জানে। নিশীথ বললো,—চুপচাপ একটু ভগবানের চিন্তা করবে, ব্যস!

—কী করে করতে হয়?

—আমরা যেভাবে করি।

—কীভাবে করো?

নিশীথ বললো,—আমি করি প্রার্থনা ঃ প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে। তারপরে বলি, আমাকে সত্যপথে নিয়ে যাও, কখনো যেন মিথ্যা না বলি, মিথ্যা না শুনি।

অবাক হয়ে বললাম,—এসব তোমাকে কে শেখালো? সব ছেলেই কি এরকম বলে?

নিশীথ বললো,—না, ঠিক এরকমই সবাই বলে না। সত্যিকার উপাসনা করে বড়ো ছেলে বা বড়ো মেয়েরা। আমাদের শুধু বলা হয়েছে, আসন নিয়ে একটু বসবে, ভগবানকে স্মরণ করবে। যার যেমন পছন্দ বড়োদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। আমি কার কাছ থেকে শিখে নিয়েছি জানো? সুধাদির কাছ থেকে।

—সে কে?

—মেয়েদের বাসায় থাকে। ছাত্রী। ভারি ভালো মেয়ে। ফুরসুত পেলে ঠিক চলে আসে। তখন দেখো।

মনে আছে, সেদিন চান-টান করলেও ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বইপত্তর নিয়ে আমতলায় যাইনি এবং যাইনি বলে কেউ কিছু বলেনি। শুধু পরের দিন অফিস থেকে এক ভদ্রলোক এলেন, ইনি ছেলেদের কাগজ-পেন্সিল, কালি-দোয়াত—এইসব চাইলে দিয়ে থাকেন। কাছে এসে বললেন,—তুমি পড়তে যাওনি?

—না।

—ইস! ওরা যে পড়ায় অনেক এগিয়ে গেল!

আমি মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম।

পরদিন এলো নিশীথের সেই সুধাদি। কালো পাড় সাদা শাড়ি পরা, গায়ে একটা আবছা হলদে রঙের আলোয়ান, আমার ছোট মাসীর মতো দেখতে অনেকটা। উনিশ-কুড়ি হবে বয়স। ছিপছিপে গড়ন, একটু লম্বা ধরনের চেহারা, গায়ের রঙ ফর্সা, সঙ্গে আরও একটি মেয়ে ছিল, সে একটু গোলগাল দেখতে, নাম শুনলাম, কমলা। কমলা গেল ঘরের অন্যদিকে, আর সুধাদি এলেন আমাদের কাছে। আমাদের দিককার গোটাকয়েক ছেলে 'সুধাদি' 'সুধাদি' করে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, যেন সে সত্যিই ছেলেগুলোর দিদি। তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা-টথা বলে নিশীথের হাত ধরে আমার দিকে চলে এলো সুধাদি। বললো,—তুমি তো নতুন এসেছো, তোমার নাম যতীন, তাই না?

তাকিয়ে দেখলাম, পাতলা ঠোঁটের হাসির ধরনটাও যেন আমার ছোট মাসীর মতো। ছোট মাসী খুব ভালবাসতো আমাকে, কতো টফি আর চকোলেট খাইয়েছে! তার কথা মনে পড়ে বুকের ভিতরটা যেন মুহূর্তের জন্য মোচড় দিয়ে উঠলো।

ততক্ষণে নিশীথকে ছেড়ে আমার হাতখানা ধরেছে সুধাদি। বললো,—পড়তে যাও না কেন?

প্রথমে উত্তর দিই নি। বারকয়েক পীড়াপীড়ি করতেই বলে উঠলাম, আমার ভালো লাগে না।

—কী ভালো লাগে না? পড়তে?

—হ্যাঁ।

সুধাদির মুখে তখনো কোনো বিরক্তির ছায়া নেই। যে রকম হাসি হাসি মুখে কথা বলছিল, তেমনি সুরেই বললো,—তাহলে তুমি শিখবে কী করে?

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে ইচ্ছা করছিল,—'আমি শিখবো না, কিছুই শিখবো না'—কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

সুধাদি কিন্তু এবারেও বিরক্ত হলো না, বললো,—ঠিক আছে, পড়া যখন ভালো লাগে না, তখন পড়ার দরকার নেই। কিন্তু কী করবে বলো তো? কিছু একটা তো করা চাই! ছবি আঁকবে? গান শিখবে?

একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলাম,—কিচ্ছু করবো না—আমি খেলবো—শুধু খেলবো।

সুধাদির মুখে তখনো হাসির রেখা। বললো,—এই কথা! এতক্ষণ বলোনি কেন? খেলার ব্যবস্থা খুবই করে দেওয়া যায়!

নিশীথের পাশে দাঁড়িয়ে তারক বলে আরও একটি ছেলে আমাদের কথা শুনছিল। সুধাদির কথায় তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু কিছু বললো না। বললো নিশীথ,—আমরা তো বিকেলে রোজই খেলি।

সুধাদি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,—সে খেলার কথা ও বলছে না। ও পড়ার সময় খেলতে চায়।

এবার কথা বললো তারক,—তা কী করে হবে? পড়ার সময় কেউ খেলে?

সুধাদির উত্তর,—হয়ত খেলাটাই ওর বেশি ভালো লাগে।

তারক আর নিশীথ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

তা সে যা-ই হোক, পরদিন সকালবেলা ওরা যখন আমতলায় খাতাপত্র নিয়ে পড়তে গেল, আমি তখন সুধাদির বন্দোবস্তে একটি ব্যাট আর ক্যাম্বিস বল নিয়ে সারাক্ষণ অপর দিককার খোলা জায়গায় মনের আনন্দে পিটতে লাগলাম। নিজের ইচ্ছামতো খেলতে পেয়ে আনন্দের আর সীমা ছিল না। দুপুরে খাবার ঘরে খেতে গিয়ে নিশীথ আর তারককে আমার খেলার কথা বললাম। বললাম,—কাল আয় না তোরা, আমার সঙ্গে খেলবি?

ওরা এক বাক্যে আমার আবেদন নাকচ করে দিলো। আমি আরও দু'একটি ছেলেকে দলে টানবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কী আশ্চর্য, পড়ায় ওরা কী আনন্দ পেয়েছে কে জানে, কেউ আমার কথায় কান দিলো না। শুধু তা-ই নয়, আমার সঙ্গে কথাবার্তা একরকম বন্ধ করে দিলো বললেই হয়। তা দিক, আমি সকাল-বিকেল যখন ইচ্ছা তখনই ব্যাট-বল নিয়ে খেলছি। বিকালে সবাই খেলতে নামে বটে, কিন্তু আমার সঙ্গী হতে কেউ চায় না। ফলে, আমি রাগ করে বিকেলবেলাটা খেলাই ছেড়ে দিলাম। ওরা যখন মাঠে খেলছে, আমি তখন আমার ব্যাট-বল রেখে একটা মোড়া টেনে আমাদের ঘরের বারান্দার সামনেকার খোলা জায়গায় ঠায় বসে থাকতাম। বসে থেকে আবোল-তাবোল কী যে ভাবতাম কে জানে!

একদিন, অদূরের লাল পথটি দিয়ে সুধাদি হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছিল। আমার মতো দুষ্টু ছেলেকে অমন চুপচাপ বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপরে একটু হেসে ও পথ ছেড়ে আমাদের দিককার সরু পথটা ধরলো। কাছে এসে বললো,—বসে আছো যে? খেলছো না?

কথাটায় একটু লজ্জা পেয়েই উঠে দাঁড়ালাম, কিছু বললাম না। ঠিক সেই সময় সেই ষণ্ডামতন লোকটা কোথা থেকে হঠাৎ এসে হাজির হলো। সুধাদির কথার প্রসঙ্গে সে বলে উঠলো,—ও তো বিকেলে খেলা করে না—বসে থাকে।

সুধাদির মুখে হাসি ফুটলো,—বসে বসে কী ভাবিস রে?

—ভাবি না।

—তবে?

—দেখি।

—কী দেখিস?

উত্তর দিলাম,—আকাশটা বেশ দেখতে, না? যখন সূর্য ডুবে যায়, লাল-লাল রঙ মেঘের ওপর ছড়িয়ে পড়ে—

সুধাদি দু'হাতে আমাকে একেবারে কাছে টেনে নিলো,—বাঃ-বাঃ! সুন্দর বলেছিস!

সেই ষণ্ডামতন লোকটার মুখেও হাসি দেখলাম। আমার কথায় ওরা কেন যে অমন খুশি হলো, তা সেদিন বুঝতে পারিনি। লোকটা তার কাজে চলে গেল, সুধাদি আমাকে নিয়ে একটু দূরে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসলো। বললো,—ঘাসের ওপর এমনি করে বসিস, দারুণ আরাম! আগে-আগে তো আমি ঘাসের এই গালিচার ওপর টানটান হয়ে শুয়েই পড়তাম।

সুধাদির এই কথাটা আমার খুব মনে লেগেছিল। কিন্তু পাছে কেউ ঠাট্টা করে, তাই টানটান হয়ে মাঠের ওপর কোনদিন শুয়ে পড়ার সাহস পাইনি। তবে বসে বসে আকাশের রঙ দেখতে বাধা কী? সেদিন বিকেলে সুধাদি আবার তেমনি করে কাছে এলো, বললো,—বসে আছিস? জানিস, গুরুদেব শীগ্‌গিরই

ফিরছেন বিদেশ থেকে। ফিরে কলকাতায় আর ক'দিন থাকবেন ? ঠিক চলে আসবেন এখানে।

—'গুরুদেব' কে ?

—ওমা, তা-ও জানিস না ? বিশ্বকবি।

—বিশ্বকবি কে ?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এইবার বুঝলাম। যাঁর স্কুল, এইবার জানলাম তাঁর পুরো নামটা। সুধাদির কাছ থেকে আরও শুনলাম, ভোরবেলায় বৈতালিকেরা যে গান গাইতে গাইতে যায়, সে ওঁরই গান।

এ কথাটাও আমার কানে লেগে রইলো। পরদিন ভোরে বৈতালিকের গানের সুর কানে যেতেই উঠে বসলাম। মনে হলো ছুটে চলে যাই। কেমন গান একটু ভালো করে শুনি। কিন্তু আমাকে অমন তড়াক করে উঠে বসতে দেখে নিশীথ-তারকের দল এমন চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো যে আমি লজ্জা পেয়ে যেমন শুয়েছিলাম, তেমনি শুয়ে পড়লাম।

এইরকম করে দু'দিন, তিন দিন কেটে গেল। চার দিনের দিন আর সংকোচ করলাম না, দূর থেকে গানের সুর কানে আসতেই উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। পিছনে কে বা কারা হাসাহাসি করলো, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না। কিন্তু আমি তৈরি হতে-না-হতেই বৈতালিকের দল আমাদের ঘর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে চলে গেছে। আমি ছুটে গিয়ে তাদের সঙ্গ নিলাম। তখনো ভালো করে সকাল হয়নি, আবছা আবছা অন্ধকার চারদিকে ঘিরে রয়েছে, বেশ শীত। আমি ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে শেষের মানুষটি একবার চোখ ফিরিয়ে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। 'তোমারি হউক জয় —তোমারি হউক জয়'—গাইতে গাইতে ওঁরা এগিয়ে চললেন। আমিও জানি না কিসের টানে ওঁদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। ওঁরা ডান দিকে বাঁকলেন, সোজা যেতে যেতে আবার বাঁক নিলেন, ছাতিম গাছ আর উপাসনা ঘরের পাশ দিয়ে অতিথি ভবনের দিকে চলে গেলেন, তারপর আবার ফিরে এসে ফটক দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকের পথ ধরলেন। মোড় ছাড়িয়ে সোজা ঢুকে গেলেন একটা বড়ো দোতলা বাড়ির বিশাল চৌহদ্দির মধ্যে। তাকিয়ে দেখি, শুধু দোতলা বাড়ি নয়, চৌহদ্দির ভিতরে আরও গোটা দুয়েক ছোট ছোট বাড়ি রয়েছে। ওঁরা কিন্তু সেই বড়ো দোতলা বাড়ির সামনেকার চওড়া বারান্দা ঘেঁষে ওপরকার একটা জানালার নীচে গিয়ে থামলেন। জানালাটা বন্ধ ছিল। মনে হচ্ছিল, গান শুনে, যিনি ওখানে থাকেন তিনি এখুনি জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে ওদের দিকে তাকাবেন। কিন্তু সে সব কিছুই হলো না, ওঁরা 'এসেছো জ্যোতির্ময়'—কলিটা বার কয়েক গেয়ে আবার ফিরে এলেন।

পরদিন সুধাদি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। দু'হাতে আমাকে মোড়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে বললো,—হ্যাঁরে, তুই নাকি কাল বৈতালিকের দলের সঙ্গে গিয়েছিলি ? গান গেয়েছিলি ?

বললাম,—না। গান তো আমি জানি না।

—জানিস না—জেনে নিবি—বৈতালিকের দলের সঙ্গে হাঁটলে গান না গেয়ে পারা যায়?

পরদিন যথাসময়ে আমার ঘুম ভেঙেছিল। ও কোণ থেকে কোনো এক বন্ধু তা দেখে চেঁচিয়ে উঠলো,—কে জেগেছে?

আর একজন চেঁচিয়ে বললো,—বৈতালিক!

বুঝলাম ওদের টিট্‌কারীর লক্ষ্য আমি। 'বৈতালিক' 'বৈতালিক' বলে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অনেকেই চেঁচিয়ে উঠেছিল সেদিন। আমি আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। বৈতালিক গাইতে গাইতে দুয়ারের কাছ দিয়ে চলে গেলেন, আমি সঙ্গ নিলাম না, কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম।

সে রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। খুব ছোটবেলায় দিদিমা যখন রামায়ণের গল্প বলতো, তখন তাকে নানান্ প্রশ্নে জর্জরিত করতাম। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, বাল্মীকি মুনি কেমন দেখতে ছিল?

নাছোড়বান্দা নাতিটির সঙ্গে পেরে না উঠে দিদিমা উত্তর দিতো,—বুড়ো মানুষ, এই বড়ো পাকা দাড়ি ঝুলে পড়েছে, মাথার লম্বা পাকা চুল জট বেঁধে আছে!

আজ এতদিন পরে স্বপ্ন দেখলাম, দিদিমা কোলের কাছে আমাকে টেনে নিয়ে রামায়ণ বলছে, আর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন বাল্মীকি মুনি! সাদা চুল, সাদা দাড়ি, আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে কী যেন বলছেন, বুঝলাম না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, বৈতালিকের দলের গানের সুর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। আমি উঠে পড়লাম। ওদের ঠাট্টা-ইয়ার্কি গায়ে মাখলাম না। সবার সঙ্গে মিশে ঐ ঠাণ্ডার মধ্যেও স্নান করলাম। বাক্স থেকে আসন আর কাপড়-আলোয়ান বার করে সবার মতো উপাসনায় বসলাম। চোখ বুজে নিশীথকে বলা সুধাদির সেই কথাগুলো মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সব ছাপিয়ে বৈতালিকের সেই গানই মনেপ্রাণে বাজতে লাগলো, 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়!'

অবাক হয়ে বন্ধুরা আমাকে দেখতে লাগলো। আমি বাক্স খুলে পেন্সিল খাতাপত্তর আর বইগুলো বার করলাম। একা একা কাঁহাতক আর ব্যাট-বল খেলতে ভালো লাগে? তাই মনকে বোঝালাম, এখন একবার পড়া-পড়া খেলাটা খেলে দেখা যাক।

নিশীথ অবাক হয়ে বললো,—যতীন, তুমি পড়তে যাবে!

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম,—না।

—তাহলে?

—পড়া-পড়া খেলবো।

তারক হেসে উঠলো,—এ মা! পড়া-পড়া খেলা আবার কী কথা!

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলাম। ওরা বইপত্তর নিয়ে আমতলায় চলে গেল, আমি বারান্দায় আসন পেতে বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

বিকালে সুধাদি এসে বললো,—খেলা ছেড়ে পড়া নিয়ে বসেছো শুনলাম? পড়া তাহলে ভালো লাগছে?

—বললাম,—না। পড়া-পড়া খেলছিলাম শুধু।

সুধাদি আমার হাতটা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে উঠলো, বাঃ! সুন্দর বলেছো তো? পড়া-পড়া খেলা খেলবে আমার সঙ্গে?

খেলার কথায় মনটা আমার নেচে উঠলো। বললাম,—হ্যাঁ।

—তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

—বই নিয়ে আসবো?

সুধাদি বললো,—না—না—বই নিতে হবে না—এমনি এসো।

সুধাদি আমাকে সেই লাল রাস্তায় নিয়ে গেল। রাস্তা পার হয়ে মাঠে গিয়ে নামলাম। তারপরে কোণাকুণি মাঠ পেরিয়ে সুধাদি যেখানে থাকে, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ওখানে সুধাদির মতো আরও মেয়ে রয়েছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—কী হলো রে?

—যাবো না।

—কেন?

—ওখানে অতো লোক!

সুধাদি হেসে উঠলো, বললো,—দূর! ওরা তো আমার বন্ধু!

দেখতে দেখতে সুধাদিরই মতো শাড়ি পরা সুধাদির এক বন্ধু এগিয়ে এলো, বললো,—কে রে সুধা? তোর 'অমল'?

'অমল' ও 'সুধা'—ব্যাপারটা বুঝবার কথা তখন আমার নয়, কিন্তু মেয়েটির ভঙ্গিতে এমন এক কৌতুক ছিল যে আমি পিছন ফিরে তৎক্ষণাৎ দৌড়!

কিন্তু পারবো কেন সুধাদির সঙ্গে দৌড়ে? ছুটে এসে মাঝ রাস্তায় ঠিক আমাকে ধরে ফেললো। বললো,—অমন করে ছুটলি কেন? ছোটবার কী হয়েছে? তোকে 'অমল' বলেছে বলে? অমল কে তা তুই জানিস?

—না।

—তবে?

—ওখানে অতো মেয়ের মধ্যে যাবো না।

সুধাদি একটু হাসলো,—তবে কি দু'একজনকে এখানে ডাকবো?

বললাম,—না। শুধু তুমি।

সুধাদি আমার হাত ধরলো, বললো,—চল, তাহলে আমরা অন্যদিকে যাই। মাঠের ঐদিকে—যেখানে ছেলেরা খেলছে না, মেয়েরা খেলছে না—একেবারে নির্জন।

—তাই চলো।

আমরা মাঠের অন্যদিকে দুজনে ছুট দিলাম।

শীতকাল তখনো শেষ হয়নি, তার ওপরে কনকনে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে!
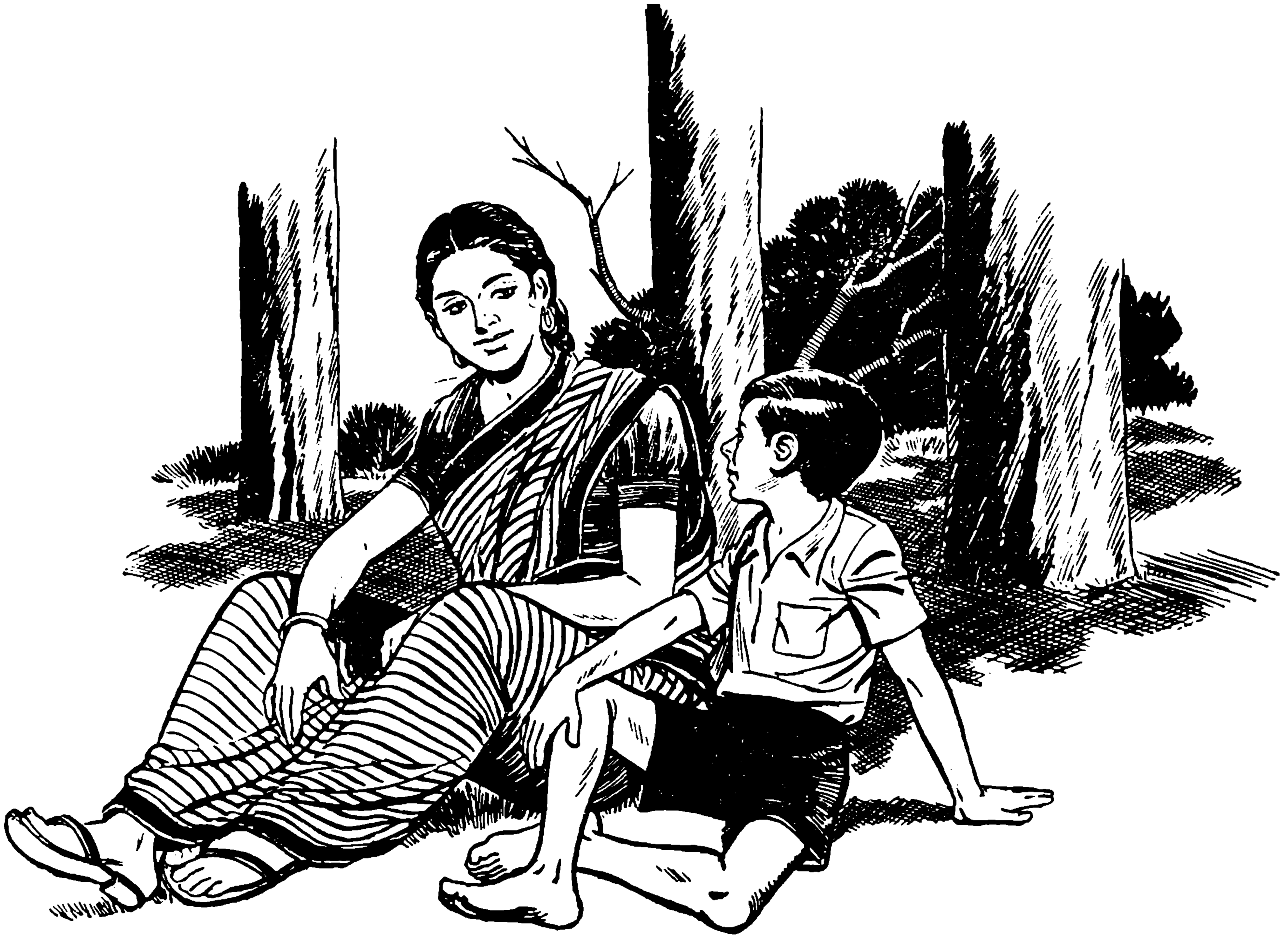
—এই যতীন, কবিতা শুনবি ?

তারই মধ্যে একটা পছন্দমতো জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা বসলাম।

সুধাদি একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপরে হঠাৎই বলে উঠলো,—এই যতীন, কবিতা শুনবি ?

কবিতা ? মনে পড়লো, আমার ছোট মাসী একবার একটা কবিতা শুনিয়েছিল,—'দুর্গেশ দুমরাজ', আর সব ভুলে গেছি, শুধু ঐ কথাটাই মনে আছে।

সুধাদি বলে উঠলো,—কী রে—চুপ করে রইলি কেন ?

—বললাম,—'দুমরাজ' কবিতাটা বলবে ?

—সে আবার কী ?—সুধাদি অবাক হলো, তারপরে বললো,—না রে না—আমার যেটা এখন বলতে ইচ্ছা করছে, সেটা শোন্ ?

—বলো।

সুধাদি আমার মুখের দিকে তাকালো, কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক করে দিলো, তারপরে ভারি সুন্দর করে বলতে লাগলো :

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে করবো শুধু পড়া-পড়া খেলা॥

ঐ 'পড়া-পড়া-খেলা' কথাটা শুনে ভীষণ আনন্দ হলো। বললাম,—আবার বলো।

সুধাদি বললো,—তোর ঐ 'পড়া-পড়া-খেলা' শুনে কবিতাটা আমার মনে পড়ে গেল। কবিতাটা আবৃত্তি করবার পর একটু থেমে থেকে সুধাদি বললো,—ঠিক তোর মতো একটি ভাই আছে আমার, দেশে।

—কোথায় দেশ ?

—সিলেট্।

—সে কোথায় ?

—পূর্ববঙ্গে।

—পূর্ববঙ্গ কোথায় ?

সুধাদি অল্প একটু হেসে উঠলো, বললো,—এ মা, এ-ও জানিস না! এইজন্যই তো পড়াশুনা করা দরকার।

—বললাম,—না, পড়াশুনা করবো না।

—তাহলে ? পড়া-পড়া খেলবি ?

—হ্যাঁ।

—ও একই কথা।

বললাম,—বা রে, পড়া আর খেলা কি এক হলো ?

সুধাদি সেদিন উত্তরে যে কথা বলেছিল, তা আমার মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে আছে। বলেছিল,—আসল যে খেলোয়াড়, তার কাছে খেলা আর পড়া একই কথা।

কথাটা তলিয়ে বোঝবার বয়স তখনো হয়নি। কিন্তু কথাটা যে ভালো, সে কথা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

—বলে উঠেছিলাম,—তাহলে আমি খেলোয়াড় হবো।

—এই তো চাই!—বলে সুধাদি আমাকে আদর করে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। সেদিনকার কথা আমি কোনোদিনই ভুলবো না, কারণ সেদিনই বুঝেছিলাম 'পড়া-পড়া-খেলা'র স্বাদটা কীরকম। সুধাদি অনর্গল অনেক কবিতা বলে যেতে লাগলো। 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে', 'আমি আজ কানাই মাস্টার',—আমি সেগুলি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি, আর তাকিয়ে রয়েছি দিগন্তের দিকে, সাদা মেঘের মাথার ওপর রাঙা আলো জ্বালিয়ে সূর্য তখন বিদায় নিচ্ছিল। আমি দেখছিলাম বেশি, শুনছিলাম কম, সুধাদির কবিতার সব কথা বোধহয় কানেও যাচ্ছিল না, কিন্তু হঠাৎ একটা কবিতার চরণ কানে যেতে প্রাণটা যেন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো। সত্যি কথা বলতে কী, অন্য কবিতার বেলা অমন অনুভূতি আমার হয়নি। কানে এলো সুধাদির সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর আর আশ্চর্য কবিতা ঃ

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

কবিতাটা নাকি অনেক বড়ো, সুধাদি সবটা মুখস্থ বলতে পারেনি। কিন্তু যেটুকু বলেছিল, সেটুকুতেই আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। বারবার কবিতার ঐ অংশটা ওকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েও আমার মন ভরছিল না। আমি আরও ছোটবেলায়

দিদিমাকে যেমন 'আবার বলো' বলে অস্থির করে তুলতাম, তেমনি করে সুধাদিকে জ্বালাতন করছিলাম। সুধাদি আর কতক্ষণ বকবক করতে পারে, এক সময় উঠে দাঁড়ালো। বললো,—ইস রে, অন্ধকার হয়ে গেল—শীগ্‌গির ফিরে চল্—তোকে পোঁছে দিয়ে আমার তবে ছুটি।

সুধাদির কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে তার কথার মাত্রা 'ইস্ রে' আমি আজীবন মনে রেখেছি। তার কথা মনে পড়লে আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে 'ইস্ রে' বলে ওঠা!

কিন্তু সে রাত্রে ঘুরে ফিরে 'ছোট নদী কবিতা'র কথা বারবার মনে আসছিল। অনেক রাত অবধি কবিতার লাইনগুলি মনে করবার চেষ্টা করছিলাম। আর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বৈশাখের কোনো এক 'হাঁটু-জল-থাকা' ছোট নদীর চেহারা! চোখের সামনে যেন সত্যিই কোনো ছোট নদী আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। যেন এক্ষুণি হাত বাড়িয়ে তার জল আমি ছুঁতে পারি, এক্ষুণি পারি সেই 'হাঁটুজল' পার হয়ে ওপারে যেতে।

পরদিন আমি ব্যাটবলের বদলে বই-খাতা নিয়ে বসলাম বটে, কিন্তু মন লাগলো না। তারক-নিশীথরা আম্রকুঞ্জে চলে গেছে কখন, আমি বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কখন যে আনমনে পায়ে পায়ে আম্রকুঞ্জ খুঁজে খুঁজে নিশীথদের পাশে গিয়ে বসে পড়েছি, নিজেই জানি না। নিশীথ-তারকরা এতো অবাক হয়ে গেল যে, তারা ভাবতেই পারছে না আমি সত্যি সত্যি ওদের সঙ্গে পড়তে বসেছি। শিক্ষকমশাই কী যেন বোঝাচ্ছিলেন, কথাগুলো শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন,—কী নাম?

নাম বললাম। উনি উত্তরে বললেন,—বেশ—বেশ। কিন্তু ওরা যে পড়ায় খানিকটা এগিয়ে গেছে?

আমি মাথা নীচু করে রইলাম, কিছু বললাম না।

শিক্ষকমশাই অল্প একটু হেসে বললেন,—ঠিক আছে। তুমি বেশি বেশি করে পড়ে ওদের ধরে ফেলবে।

আমি পরপর নিশীথদের সঙ্গে ক্লাসগুলো করে এসে দেখি, মুহূর্তে আমি ওদের বন্ধু হয়ে গেছি। ওরা আর পিছনে লাগছে না, বরং এর-ওর বাক্স থেকে টফি চকোলেট বার করে দু'একজন আমাকে আবেগের আতিশয্যে খাইয়েও দিলো। নিশীথ আমার সব থেকে অন্তরঙ্গ, সে আমাকে পুরানো পড়াও বুঝতে সাহায্য করতে লাগলো। কিন্তু বিকেলে যখন ওরা ওদের সঙ্গে খেলায় ডাকলো, তখন খেলতে নেমেও ফিরে এলাম, খেলাধুলো আর ভালো লাগছিল না। আমি মোড়া নিয়ে যেখানটায় বসতাম, সে জায়গাটা যেন আমাকে চুম্বকের মতো টানছিল।

দৌড়ে সে জায়গায় পৌঁছে দেখি সুধাদি দাঁড়িয়ে আছে। ভারি খুশি-খুশি মুখ সুধাদির। বললো,—সব শুনেছি, এই তো লক্ষ্মী ছেলে! দেখবে, মন দিলে তুমি পড়ায় হু-হু করে এগিয়ে যাবে।

আমাকে দু' হাতে কাছে টেনে নিতেই বললাম,—সুধাদি, সেই কবিতাটা আবার বলো না? সেই 'আমাদের ছোট নদী'?

সুধাদি একটু থেমে তারপর কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগলো।

শেষ হলে বললাম,—একটা কথা বলবো সুধাদি? রাগ করবে না?

—না—না—বল না?

—তুমি শুনবে, আমি কবিতাটা বলবার চেষ্টা করবো?

—কী আশ্চর্য! এই কথা বলবার জন্য এতো ভনিতা! শীগ্‌গির বল—ভুল হয় হোক—তুই বলে যা।

আমি গলা ছেড়ে কবিতাটা ঠিক সুধাদির মতো করে বলতে লাগলাম। পুরোটা পারি নি, তবে প্রায় অর্ধেকটা পেরেছিলাম বলে মনে হলো।

—বাঃ! চমৎকার!

—ভুল হয়নি?

—একদম না!

সেদিন থেকে আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে লাগলাম। কথাটা বলতে লজ্জা করছে, দিন দশেকের মধ্যে সহপাঠীদের পাঠ পর্যন্ত ধরে ফেললাম এবং আমার পড়াশোনায় হঠাৎ এমন মনোযোগ দেখে শিক্ষকমশাইরাও অবাক হয়ে গেলেন। নিশীথ ঘরে ফিরে এসে সেদিন বললো,—দারুণ মুখস্থ করতে পারিস তো তুই!

বললাম—মুখস্থ বিদ্যায় শুধু কুলোবে? তোরা কতো কী জানিস। আমি কিচ্ছু জানি না!

সব ঠিকঠাক চলতে লাগলো। আমি খেলায় যোগ দিতে পারি না, কারণ 'পড়া'টাই আমার কাছে তখন খেলা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে শোনা গেল ছেলেদের নিয়ে অভিনয় করানো হবে 'ডাকঘর'। ক'দিন খুব 'ডাকঘর' 'ডাকঘর' আওয়াজ শুনতে লাগলাম। একদিন বিকেলে সুধাদির সঙ্গে মাঠে বেড়াচ্ছি, এক শিক্ষকমশাই লাল রাস্তাটার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে ডাকলেন। বললেন,—সুধা, তোমার বন্ধুরা একেই অমল বলে বুঝি?

সুধাদি বলে উঠলো,—বলবেন না—বলবেন না—ভীষণ লজ্জা পাবে।

—লজ্জার কী আছে?—শিক্ষকমশাই বললেন,—ঠিক হয়েছে, 'ডাকঘর'-এ ও-ই 'অমল' করবে।

বলে এগিয়ে যেতে গিয়েও ফিরলেন, সুধাদিকে বললেন,—শুনেছো তো, গুরুদেব কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন? দিনকয়েকের মধ্যেই তাঁর এখানে আসার সম্ভাবনা। যদি তাঁকে আমরা 'ডাকঘর'টা দেখাতে পারি—

শুরু হলো তোড়জোড়। সুধাদি পরদিনই বিকেলে একখানা 'ডাকঘর' বই নিয়ে এসে আমাকে মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! অমলের কথা শুনতে শুনতে আমার বারবার চোখে জল আসছিল।

বিশেষ করে নাটকের শেষে যেখানে 'সুধা তোমাকে ভোলেনি' কথাটা আছে, সেখানে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম মনে আছে। সুধাদিরও চোখে জল, সে নিজের চোখ মুছে আমাকে শান্ত করতে করতে বললো,—সুধা তোকে সত্যিই কোনদিন ভুলবে না!

সন্ধ্যা হয়ে গেল, যে যার ঘরে ফিরে এলাম। আসা মাত্রই কাছে ছুটে এলো নিশীথ, বললো, তুই নাকি থিয়েটার করছিস?

থিয়েটার!

তারক বললো,—থিয়েটার না তো কী? শিক্ষকমশাইরা থিয়েটার করবে, সঙ্গে একজন ছোট ছেলে দরকার, তাই তোকে নিয়েছে!

নিশীথ বললো,—তুই পারবি তো?

—কে জানে?

পরদিন বিকেলে সুধাদির দেওয়া 'ডাকঘর'খানা উলটে-পালটে দেখছিলাম, কিন্তু পড়বো কী? প্রায় কথাতেই চোখে জল আসছিল। বইটা সুধাদি এমনভাবে পড়েছিল, যেন মনের মধ্যে চিরকালের জন্য গেঁথে গেছে! এর পরের দিন শিক্ষকমশাইরা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁদের বড়ো একটা ঘরে, যেখানে মহলা বসবে। আমাকে ওঁরা ডাকঘরের কোনো একটা জায়গা বলতে বললেন, আমি একটুও না ঠেকে গড়গড় করে বলে গেলাম। ওঁরা একটু অবাক হলেন, একজন আরেকজনকে বললেন,—চলবে।

তার পরদিন বিকেলে আনমনে নিজের মোড়াটার ওপর বসে আছি, 'অমল'-এর সেই রাজার চিঠি পাওয়ার কথাটা মনে তোলপাড় করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি সুধাদি কখন আসবে। এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো, লাল মাটির রাস্তাটা দিয়ে কে যেন হেঁটে আসছেন! লম্বা চেহারা, গায়ে লালচে আলখাল্লা, হাত দুটি পিছনে জড়ো করা। মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে গেলাম। দিদিমার বলা অবিকল সেই বাল্মীকি মুনি। পাকা লম্বা দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল। তার ওপর পড়ন্ত রোদের রাঙা আভা পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে তিনি হেঁটে আসছিলেন। আর অবাক কাণ্ড, তিনি লাল রাস্তা বেয়ে হেঁটে চলে গেলেন না, হঠাৎ বাঁয়ে মোড় নিয়ে আমাদের রাস্তা ধরে আমাদেরই ঘরের দিকে আসতে লাগলেন।

উনি কাছে এসে পড়তে না পড়তেই আমি মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। কী ফর্সা গায়ের রঙ! তার ওপর দুই ভুরুর মাঝখানে যেন গোল হয়ে কিসের আভা ফুটে বেরুচ্ছে! মনে হচ্ছিল, আমার দিকেই তিনি তাকিয়ে আছেন, আমাকে দেখেই তাঁর ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসেছে সেই লম্বা কালো লোকটা। ছুটে এসেছে সুধাদি, ছুটে এসেছেন সেই শিক্ষকমশাই, যিনি আমাকে 'অমল' করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই কালো লোকটা ঘর থেকে আরও একটা মোড়া বার করে আনলো। ওঁদের দেখাদেখি আমিও ওঁর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলাম। বলতে লজ্জা করে,

কিন্তু না বললেও নয়, সেদিন বালক বয়সে আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন 'পা' নয়, নরম পাঁউরুটির ওপর হাত বুলিয়েছিলাম।

তিনি শিক্ষকমশাইকে প্রশ্ন করলেন,—তোমরা নাকি 'ডাকঘর' করছো?

—হ্যাঁ গুরুদেব, এই ছেলেটাই 'অমল' করবে।

—বটে!—বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন, দুটি চোখ দিয়ে যেন স্নেহ উপচে পড়ছিল। বললেন,—দূর থেকে দেখছিলাম, সবাই খেলছে, আর একটি শিশু চুপচাপ একা বসে আছে, এ কেমনতরো? দেখতে হচ্ছে তো?

—ও একটু ভাবুক প্রকৃতির বটে!

—সেইজন্যই অমল করাচ্ছো?—বলে হেসে উঠলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —বইখানা হাতের কাছে আছে? নিয়ে এসো তো দেখি?

বলা মাত্র ছুট দিলাম। বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে! শিক্ষকমশাই ওঁকে 'গুরুদেব' বলে ডাকলেন। তাহলে ইনিই আমাদের বাড়ির 'রবি ঠাকুর' আর সুধাদির 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', যাঁর স্কুলে আমি সজুত হতে এসেছি? আমি 'ডাকঘর'-খানা বালিশের তলা থেকে বার করে দরজার দিকে এগোচ্ছি, আর হাত-পা যেন কাঁপতে আরম্ভ করেছে! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিদিমা বর্ণিত 'বাল্মীকি মুনি' হলেন কেমন করে?

কিন্তু তখনো অনেক বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। ডাকঘরখানা হাতে নিয়ে বইটা খুললেন। ততক্ষণে আরও অনেকে জড়ো হয়েছেন, মাঠ থেকে ছুটে এসেছে তারক-নিশীথের দল। তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তিনি আমাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন,—'অমল' কেমন করে বলবে বলো দেখি? শোনো—এইখানটায় শোনো।

বলে তিনি পৃষ্ঠাটা চোখের খুব কাছে টেনে নিয়ে পড়তে লাগলেন,—'ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন! ওই দেখো না যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের ওপর ভর দিয়ে কাঠবিড়ালি কুটুস-কুটুস করে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পারবো না?

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেই পাঠ শুনতে লাগলাম। কাঠবিড়ালি যে খুদগুলো কুটুস-কুটুস করে খাচ্ছে, পড়ার গুণে সে দৃশ্য নিমেষেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তিনি ওখান থেকে শুরু করে আরও পড়ে যেতে লাগলেন।

আজ কতো বছর হয়ে গেল, চুয়ান্ন বছর তো বটেই, তবু যেন চোখ বুজলেই কথাগুলো হুবহু শুনতে পাই। উনি তারপর দুটি-একটি কথা বলে উঠে চলে গেলেন, কিন্তু আমার জন্য রেখে গেলেন অদম্য উৎসাহ! আমি রাত্রে পড়ার বই না নিয়ে 'ডাকঘর'-এ হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল নিশীথ। তার মুখখানা থমথমে, একবার শুধু বললো,—ঐ রকম করে তুই পড়তে পারবি নাকি? আর ঐ রকম করে না বললে 'অমল' ফুটবে কী করে? শিক্ষকমশাইরা তখন বলাবলি করছিলেন, তাই শুনছিলাম।

আচমকা প্রশ্ন করে বসলাম,—কোন্ শিক্ষকমশাই?

থতমত খেয়ে নিশীথ বললো,—হ্যাঁঃ! ওকে এখন নাম বলি আর কী!

—মিথ্যে কথা!

নিশীথ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে সোজা তাকালো, বললো,—তার মানে তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বললে! ঠিক আছে, এর শোধ কী করে তুলতে হয়, তা আমি দেখিয়ে দেবো।

রেগে আমিও যেন কী বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে থেমে গেলাম। নিশীথ শ্যামল চেহারার মানুষ বটে, কিন্তু মুখখানি সুন্দর। অথচ এখন দেখলাম সেই সুন্দর মুখখানি কুৎসিত হয়ে গেছে! ভুরু দুটো কুঁচকে, ঠোঁট বেঁকিয়ে এমন করে তাকিয়ে আছে যেন চোখ দুটি দিয়ে বিষ ঝরে পড়ছে! সারা মুখে কালো ছায়া।

অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলাম,—কী হয়েছে নিশীথ?

ওর মুখখানা আরও বিকৃত দেখালো, চোখে বিষ, গলার স্বরে অস্বাভাবিক তীব্রতা, সে বলে উঠলো,—খবরদার আমার সঙ্গে কথা বলবে না! যে আমাকে মিথ্যেবাদী বলে, আমি তার সঙ্গে কথা বলি না!

সত্যি কথা বলতে কী, মনে এমন লেগেছিল যে পরে সুধাদির কাছে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

সুধাদি অবাক হয়ে বলেছিল, কী হয়েছে?

—কিছু না।

সুধাদিকে সব কথা বলতে পারি নি। সুধাদি আমার হাত ধরে বলেছিল,—বাড়ির জন্য মন কেমন করছে বুঝি?

—হুঁ।

—ভাবছিস কেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই তো বাড়ি যেতে পারবি।

পরদিন ক্লাস-ট্লাস সেরে ঘরে এসে যথারীতি বালিশের তলা থেকে 'ডাকঘর'খানা বার করলাম। কিন্তু পৃষ্ঠা উলটে দেখি অবাক কাণ্ড, যে তিন পৃষ্ঠা গুরুদেব নিজে পড়ে দিয়েছিলেন, এবং বলতে ভুলে গেছি, পেন্সিল চেয়ে নিয়ে কয়েকটা জায়গা নিজের হাতে দাগ কেটে দিয়েছিলেন, সেই পৃষ্ঠাগুলো কে যেন আগাগোড়া ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! আমি যেন চাবুক খেয়ে উঠে বসলাম। বন্ধুরা যে যার শুয়ে-বসে আছে, কিংবা গল্প করছে। আর নিশীথ বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে খাতায় খুব মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক কষছে!

আমি কাউকে কিছু না বলে, ছেঁড়া 'ডাকঘর'খানা নিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। যে ছাত্রী-ভবনের দিকে যেতে আমি বরাবর লজ্জা পেতাম, সেখানে ছুটে গিয়ে অবাক-অবাক চোখে-তাকানো মেয়েদের ভিড় থেকে সুধাদিকে কেমন করে খুঁজে বার করলাম, সে রহস্য আমি নিজেই জানি না। সুধাদিকে টেনে একান্তে একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে 'ডাকঘর'খানা দেখালাম,—দেখেছো! কী করেছে! ছেঁড়া জায়গাটা

দেখে সুধাদি বলে উঠলো,—ইস্ রে! আচ্ছা, ওটা থাক, তোকে একখানা নতুন বই আনিয়ে দেবো। এবার আমার চোখের পাতা ভিজে উঠলো, বললাম,—উনি নিজের হাতে পেন্সিলের দাগ দিয়েছিলেন, সে দাগ কি আর ফিরে পাবো?

দাগ দেওয়ার সময় সুধাদি কাছে ছিল, সেজন্য ব্যাপারটা বুঝতে তার কষ্ট হলো না, বললো,—কে এমন করে ছিঁড়লো বল তো? কী লাভ হলো তার?

কিন্তু সুধাদি বারবার জিজ্ঞাসা করেও আততায়ীর নাম বার করতে পারলো না। এখানে আসা অবধি নিশীথের সঙ্গেই আমার ভাব হয়েছিল সব থেকে বেশি, কিন্তু সেই নিশীথই আমার ওপর অমন ক্ষেপে গেল কেন, তার কারণটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আর পাচ্ছিলাম না বলেই অভিমান হয়েছিল প্রচণ্ড, যেজন্য আঁক-কষা নিশীথকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি নি, সেজন্য সুধাদিকেও ওর নাম-ধাম বলতে পারলাম না।

—খবরদার আমার সঙ্গে কথা বলবে না! [পৃঃ ৭৪

সুধাদি এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করলো না অবশ্য, শুধু বললো,—দাঁড়া না, ব্যবস্থা করছি। নিশিকান্তদা আমার খুব চেনা, তাঁকে ধরে গুরুদেবের কাছ থেকে আবার 'ডাকঘর' দাগিয়ে নিয়ে আসবো।

এই কথাটায় খুব খুশি হলাম, তারপরে বললাম,—সুধাদি, উনি ঠিক যেমন করে বলেছিলেন, আমি ঠিক তেমনি করে 'অমল' বলবো, তুমি দেখে নিও।

—পারবি তো?

—ঠিক পারবো।

সুধাদি বললো,—তাহলে তোকে একটা বাঁধানো খাতাই আমি উপহার দেবো, এই বলে রাখলাম।

সুধাদির হাত ধরে বললাম,—সুধাদি, একটা কথা বলবো? রাগ করবে না?

সুধাদি হেসে বললো,—ইস্ রে! কথাটা শুনে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। কী কথা না জানি বলবি!

প্রথম দিন থেকে যে কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সে কথাটাই এবার বলে ফেললাম মরিয়া হয়ে,—'ডাকঘর'-এ তুমি যদি 'সুধাদি' করতে!

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সুধাদি এমন জোরে হেসে উঠলেন যে আশেপাশের মেয়েরাও চকিত হয়ে এদিকে তাকালো। হাসির দমক একটু কমতে সুধাদি বললো,—ভালো করে পড়িস নি এখনো? পার্টটা 'সুধাদি'র নয়, 'সুধা'র। সুধা খুব ছোট্ট একটা মেয়ে।

সুধাদির মুখের দিকে তাকালাম, কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, তুমি যদি ছোট্ট মেয়েটি হতে!

—কী, কথা বলছিস না যে!

বললাম,—আমি তাহলে 'অমল' করবো না।

বলে আর দাঁড়ালাম না, মুখ ফিরিয়ে ওখান থেকে একেবারে ছুট।

এর পরে কী আর বলবো, সত্যি সত্যি আমাকে আর 'অমল' করতে হলো না। শীতের পর বসন্ত এসে গেছে, গুরুদেব 'ডাকঘর'-এর বদলে অন্য নাটক করতে বলেছেন। এতেও বড়োরা পার্ট করবে। নাটকের নাম 'ফাল্গুনী'। এতে নাকি প্রচুর গান আছে। সঙ্গীত-ভবনে রীতিমত গানের আসর বসে গেল। দূর থেকে শুনতাম, কাছে যেতে ভরসা পেতাম না। ঘরের বন্ধুরা আমাকে ক্ষ্যাপাতো বলে শিক্ষকমশাইরা ধমক দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে দেখলে 'ঐ নাম-কাটা অমল আসছে' বলে টিট্‌কারি দিতে ছাড়তো না।

সুধাদি একদিন কাছে ডেকে বললো,—গুরুদেব নিজে মহলায় বসছেন, জানিস? বসন্তোৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা আম্রকুঞ্জে অভিনয় হবে। দিনের বেলা বসবে কবিতার আসর। আমাদের নিশিকান্তদাও কবিতা পড়বেন।

'ফাল্গুনী'র কাজ এগিয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার যোগ নেই, নিশীথ-তারকরা ওদিকে লুকিয়ে-চুরিয়ে গান-টান শুনতে যায় বটে, আমার কিন্তু সেদিকে আগ্রহ জাগে না। আমি লাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াই, মাঠের মধ্যে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। সুধাদি কখনো-কখনো দেখতে পেয়ে কাছে আসে, বলে,—জানিস, গুরুদেব নিজে অভিনয় করবেন। শুনলাম তিনি 'অন্ধ বাউল' সাজবেন। যাবি তো দেখতে?

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম সুধাদির দিকে। মনে মনে 'অমল' হতে গিয়ে 'ডাকঘর'কে চিনেছিলাম, কিন্তু 'ফাল্গুনী'কে জানবো কী করে?

—তুই অমন মনমরা হয়ে গেছিস কেন রে?

বললাম,—সুধাদি, ঐ গেরুয়া রঙের ঝরাপাতাগুলো দেখছো, কেমন চুপচাপ ঝরে পড়ছে—

সুধাদি আমার হাত ধরে ঐ ঝরা পাতাগুলোর মধ্যে নিয়ে গেল। বললো,—পাতাগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটলে একটা শব্দ হয় না? একেই বলে 'মর্মর-ধ্বনি!'

এই ধরনের নতুন-নতুন কথা সুধাদির মুখে প্রায়ই শুনতাম। কিন্তু এর দিনকয়েক পরে সে ছুটে এসে নতুন কথা নয়, নতুন এমন এক খবর দিলো যে, আবার জ্বলে উঠলাম। সোজা আমাকে নিয়ে সে গিয়ে ঢুকলো 'ফাল্গুনী'-র মহলা-ঘরে। সেখানে আবার তাঁকে দেখলাম। এবার গায়ের আলখাল্লাটা পাতলা কাপড়ের। চোখে চশমা। কোলের ওপর একটা মোটা বাঁধানো খাতা। কে যেন সুধাদির হাত থেকে আমাকে কাছে টেনে নিলো। সুধাদি আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল, কিংবা বারান্দার জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো, তা বলতে পারবো না।

হ্যাঁ, আমাকে নামতে হয়েছিল 'ফাল্গুনী'তে। বসন্তোৎসবের দিনে তিনি অনেক কবিতা পড়লেন, নিজের লেখা কবিতা আরও অনেকে পড়লেন, তার মধ্যে সুধাদির সেই নিশিকান্তদাও ছিলেন। আর সন্ধ্যাবেলা হলো 'ফাল্গুনী'। আমার ছিল মাত্র কয়েকটি কথা 'চন্দ্রহাস' যিনি সেজেছিলেন, তাঁর সঙ্গে। দৃশ্যে প্রবেশ করেই উদভ্রান্তের মতো আমি বলেছিলাম,—'আমি পারলুম না। কিছুতেই তাকে ধরতে পারলুম না!' উনি বললেন,—'কাকে ভাই?' আমি উত্তর দিলাম,—'ওই তোমরা যে বুড়োর খোঁজ করছিলে তাকে।'

ছোট্ট ভূমিকা। তবু তো করেছিলাম। নিশীথের মুখখানা আবার কালো ছায়ায় ঢেকে গিয়েছিল। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম অন্ধ বাউলকে। হাতে একতারা, মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, গায়ে বাসন্তী রঙের আলখাল্লা, তিনি যেন আমাদের ছোট্ট হৃদয়গুলিতে ব্যথার পরশ ছুঁইয়ে দিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন,—'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে, চলো তোমার বিজন-মন্দিরে। জানিনে পথ, নাই যে আলো—'

গাইতে গাইতে তিনি যেভাবে পথ খুঁজছিলেন, তা এখনো আমি চোখ বুজলে যেন দেখতে পাই। অমন করে সারাজীবন আমরাও তো পথ খুঁজে বেড়িয়েছি! আমরা কেউ আমাদের সঠিক পথ জানি না, দেখতে পাই না যথার্থ আলোক রেখা, আমাদের সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিশীথদের কালো ছায়া।

শান্তিনিকেতনে ছিলাম মাত্র এক বছর। ওই এক বছরে তাঁকে আর দেখতে পাই নি। সুধাদি বলেছিল,—তিনি আবার বিদেশে চলে গেছেন।

আমি ছুটিতে কলকাতায় এলাম। আমাদের সংসারে বিপর্যয়, দাদু তাঁর কাজকর্ম নিয়ে খুব ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন,—এইসব নানা কারণে আমি আর 'রবিঠাকুরের স্কুল'-এ ফিরে যাই নি।

তারপরে কাছেরই এক স্কুলে ভর্তি হয়েছি, দিনে দিনে বেড়ে উঠেছি, কিন্তু যখনই কোথাও সাফল্যের একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি, তখুনি সামনে এসে অন্ধকার করে দাঁড়িয়েছে নিশীথদের কালো ছায়া। সেই ছায়া দেখে আর্তকণ্ঠে নির্বাক প্রশ্ন করেছি,—কেন এই অনর্থক হিংসা? কী দোষ আমি করেছি?

কালো ছায়া আরও কালো হয়েছে—উত্তর মেলে নি।

———

তারকবাবুর শেষ ইচ্ছে

—শচীন দাশ

ঠিক বিকেলের দিকেই তারকবাবু ট্রেন থেকে নামলেন।

বেলা চারটে বাজে। শ্রাবণ মাসের বিকেল। ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টিটা পড়েই চলেছে। যত না বৃষ্টি, তার চেয়ে হাওয়া বেশি। তার ওপর আকাশের যা চেহারা। দুপুর থেকেই মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। ফলে রাস্তাঘাটেও তেমন লোকজন নেই। নেহাৎ দরকার না হলে এই দুর্যোগে কে-ই বা বেরোতে চায়।

ব্রীজ পার হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন তারকবাবু। ভাবলেন, এই বৃষ্টিতে এখন আর হেঁটে কাজ নেই। তার চেয়ে একটা রিকশা নিয়ে চলে যাওয়াই ভাল। অন্যান্য দিন ফিরতি পথে অবশ্য রিকশার কথাটা ভাবতে হয় না তাঁকে। ট্রেন থেকে নেমেই সোজা হনহন করে হাঁটতে থাকেন। কিন্তু আজ আকাশের এই চেহারা।

চোখ তুলে একবার আকাশটা দেখে নিলেন তারকবাবু। পরে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে রিকশা খুঁজলেন। কিন্তু রিকশা কোথায়? এই বর্ষায় অনেকেই বোধহয় আজ রাস্তায় বেরোয়নি। যাও বা দু'চারজন ছিল এতক্ষণে নিশ্চয়ই যাত্রী নিয়ে চলে গেছে। উপায় না দেখে তারকবাবু হাঁটতে শুরু করলেন।

কাঁচা মাটির নতুন রাস্তা। এখনো খোয়া পড়েনি। এক বর্ষা পুরোপুরি জল খাইয়ে তবেই মিউনিসিপ্যালিটি থেকে খোয়া ফেলা হবে। তারপর হয়তো পীচ। যাতায়াতে কম সময় লাগে বলেই এরই মধ্যে অনেকে এদিক দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। তবে মাটির চরিত্র যা তাতে খুব সাবধানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকেন তারকবাবু। চটিটা খুলে নিলেই ভাল হত। কিন্তু নেবেন কি করে? একে কাঁধে একটা ভারি ব্যাগ, তার ওপর দু'হাতে দুটো জিনিস—ছাতা আর কাঁঠাল।

আজ ক'দিন ধরেই ভাবছিলেন অফিস ফেরত শেয়ালদা থেকে বেশ বড়সড় দেখে একটা কাঁঠাল নিয়ে যাবেন। ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বলে। কিন্তু সময় করে যে নিয়ে যাবেন, সে সুযোগও হচ্ছিল না। তাছাড়া দরদামেও ঠিক সুবিধে হয়নি। শেষে আজ দরটা একটু পড়তেই ঝপ করে কিনে ফেললেন।

অথচ ওই কাঁঠালটা কেনার পর থেকেই যত ঝামেলা শুরু হল। একেই কড়া মিষ্টি গন্ধ, তার ওপর যে দেখে সে-ই জানতে চায় দাম কত? উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে তারকবাবু যখন রাস্তা পার হয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে ঘটনাটা ঘটল।

একটা লরি আসছিল। তারকবাবুর প্রথমে চোখে পড়েনি। তাড়াহুড়া করে রাস্তা পার হতে গিয়ে যখন মাঝামাঝি পৌঁছে গেছেন, ঠিক তখুনি লরিটা এসে প্রচণ্ড শব্দে তাঁর ঘাড়ের ওপরে ব্রেক কষে দাঁড়াল। বৃষ্টিভেজা পেছল রাস্তায় তারকবাবু ততক্ষণে ছিটকে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হইচই, চিৎকার। আশেপাশের দোকান থেকে অনেকেই ছুটে এল। এসেই চটপট লরির নীচ থেকে সাবধানে তাঁকে তুলে নিয়ে একটা টানা রিকশায় বসিয়ে দিল। বসিয়েই সোজা হাসপাতাল। পেছনে পেছনে গেল অনেকেই। অস্পষ্ট হলেও তারকবাবুর এখনো মনে পড়ছে, হাসপাতালে গিয়ে এমার্জেন্সীতে তুললে দু'জন নার্স তাড়াতাড়ি ছুটে এল। ওরা তাঁকে শুইয়ে দিয়ে কপাল আর চুলের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া রক্ত মুছে দিল। এর পরেই এলেন একজন ডাক্তার। ডাক্তার তাঁকে কি সব পরীক্ষা করে-টরে একটা ইন্‌জেকশন দিলেন। আর তাতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখে কেমন ঘুম নেমে এল! আস্তে আস্তে তারকবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। তবে একটু পরেই যখন আবার ঘুমটা ভাঙল, তখন তাঁর মাথার চারপাশে একটা ধবধবে ব্যাণ্ডেজ।

খুব ভয় হয়েছিল তারকবাবুর। বাড়ি ফিরতে পারবেন তো? যদি না ফিরতে পারেন! না ফিরলে বাড়িতে ওরা খবর পাবে কি করে! বসে বসে এমনি নানা পাঁচ-সাত ভাবতে ভাবতে যখন চারপাশে তাকাচ্ছিলেন, সেই সময় একজন নার্স এসে তাঁর জিনিসগুলো তাঁর পাশে রেখে দিয়ে গেল। এখন তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন। বাড়ি ফেরার আনন্দে চটপট ব্যাগ, ছাতা ও কাঁঠালটা নিয়ে এর পর তারকবাবু বাড়ির রাস্তা ধরলেন। তার পরের ঘটনা তো আগেই বলা হয়ে গেছে। ট্রেন থেকে নেমে তারকবাবু ব্রীজ পার হয়ে এসে মিউনিসিপ্যালিটির নতুন রাস্তাটা ধরেছেন।

কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা! হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছনে তাকালেন তারকবাবু।

কেউ যেন আসছে? অথচ বৃষ্টির জন্য ছাতাটা আড়াল করে থাকায় ঠিক বুঝতে পারলেন না। একসঙ্গে যাওয়া যাবে ভেবে তারকবাবু দাঁড়ালেন।

একটু পরে কাছাকাছি আসতেই কিন্তু চিনতে ভুল হল না তাঁর। তাঁদের পাড়ার মুকুন্দ। স্টেশনের ওদিকে মাস দুই হল একটা স্টেশনারী দোকান দিয়েছে। তারকবাবু ডাকলেন, কি হে মুকুন্দ, দোকান বন্ধ করে ফিরছ নাকি?

হঠাৎ মুকুন্দ চমকে উঠল। এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যেন দ্রুত এগিয়ে গেল। তারকবাবু অবাক হলেন। ছেলেটা পালালো কেন? অভাবের সংসার। ধার, দেনা করেন বলে মুদির দোকানে তারকবাবুর একটু বদনাম আছে। সেই ভয়েই কি মুকুন্দ পালালো? তারকবাবুর খুব খারাপ লাগল ব্যাপারটা। তিনি জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, ও হে মুকুন্দ—দাঁড়াও, দাঁড়াও—

কিন্তু মুকুন্দ ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। তারকবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন। পাড়ায় গিয়ে কাল সকালে ছোকরাকে একবার ধরতে হবে। ও কি ভেবেছে, ডাকছি বলে ওর দোকান থেকেও ধারে জিনিস আনব? ছাতাটা আড়াল করে তারকবাবু এবার রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে এলেন।

এই মাঠটা এখনো জলে ভেসে যায়নি। আর দুদিন পরে এখানেও জল উঠলে অনেকটা ঘুরে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হবে। মাঠ পার হয়ে তারকবাবু বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলেন।

চারদিকে কটকট করে ব্যাঙ ডাকছে। বৃষ্টির বেগটাও এখন অনেকটা কম। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা—রাতের দিকে আরও বৃষ্টি হবে মনে হয়।

আর একবার কড়া নাড়ার আগেই দরজাটা খুলে দিল পানু। তারকবাবুর বড় ছেলে। কাঁঠালটা ওর হাতে দিয়ে ছাতাটা ভাঁজ করে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই পানু চেঁচিয়ে উঠল, এ কি, তোমার কি হল বাবা?

পানুর চেঁচামেচিতে ততক্ষণে আর সবাই ছুটে এসেছে। নানু, কানু, দীপালি আর সর্বজয়া।

সর্বজয়া বলল, সে কি, মাথা ফাটালে কি করে তুমি?

কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে রাখতে তারকবাবু বললেন, একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল। লরির সঙ্গে। ভাগ্যিস মরিনি। ওই রাস্তার লোকেরাই ধরাধরি করে নীলরতনে নিয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য জান—কাঁঠালটা হাতে ছিল। ছিটকে পড়ল। অথচ একটুও ফাটেনি। ফাটলে মন খারাপ হয়ে যেত। চার টাকা দাম নিয়েছে।

তা মাসের শেষে চার টাকা দিয়ে ওটা কেনারই বা কি দরকার ছিল! এদিকে ঘরে একটুও চিনি নেই। এতক্ষণে সর্বজয়া একটু বিরক্ত হল।

তারকবাবু বললেন, আনলাম কি আর এমনি। কানু নানুরা প্রায়ই বলে। তাছাড়া এবার তো আম-জাম কিছুই এনে দিতে পারিনি ওদের হাতে।

সর্বজয়া আর দাঁড়াল না। পানুর হাত থেকে কাঁঠালটা নিয়ে যেতে যেতে বলল, থাক, আজ ভেঙে কাজ নেই। কাল রবিবার। দুপুরে ভাঙবো। তুমি এখন তাড়াতাড়ি

জামা ছেড়ে ফেল। এ বেলা দীপালির খানিকটা দুধ আছে। গরম করে দিচ্ছি খেয়ে নাও। তারপর খিচুড়ি খেয়ো'খন।

—খিচুড়ি! আজ খিচুড়ি হয়েছে! তারকবাবু লাফিয়ে উঠলেন। এই একটা জিনিস তিনি বরাবরই ভালবাসেন। তার ওপর এই বর্ষার দিনে তো কথাই নেই। তাই তড়িঘড়ি আবার দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, তাহলে যাই, নিতাইয়ের দোকান থেকে দুটো ডিম নিয়ে আসি।

—না-না, আর কিছুর দরকার নেই। সর্বজয়া বলল, বেগুন এনেছো। বেগুন ভাজলেই হবে। তুমি এখন ভেজা কাপড়টা ছাড় দেখি!

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একবার তারকবাবু পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে তারকবাবু মুকুন্দর ঘটনাটা বললেন সর্বজয়াকে। সর্বজয়া কেমন অবাক হয়ে তারকবাবুর দিকে তাকাল। তারকবাবু বললেন, ইচ্ছে হয়েছিল ছোকরার মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।

রাম রাম! সর্বজয়া হঠাৎ মৃদু ধমকে উঠল তারকবাবুকে।—কি যে বিচ্ছিরি কথাবার্তা!

তারকবাবু হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। পিঁড়ি ছেড়ে ছেলেমেয়েদের ডিঙিয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে গজরাতে লাগলেন। সর্বজয়ার ততক্ষণে নজরে পড়েছে তারক-বাবুর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। চোখে রাগ কিন্তু মুখের চেহারায় কেমন যেন একটা ভয়ের চিহ্ন।

সর্বজয়া বলল, কি হল তোমার?

—না-না, ওসব বাজে বাজে কথা মুখে আনবে না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তারকবাবু বললেন।

সর্বজয়া অবাক হল। আবার ভয়ও হল একটু। খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ এমন করছেন কেন? মাথায় চোট পেয়েছেন। খারাপ কিছু হয়নি তো?

খুব নরম সুরে সর্বজয়া বলল, হ্যাঁ গো, তোমার মাথায় চোট লেগেছে। হাসপাতালে ওরা ভাল করে দেখে দিয়েছে তো? ওষুধ-টষুধ দেয়নি?

তারকবাবু আবার স্বাভাবিক হয়ে এসে পিঁড়িতে বসলেন। বললেন, হ্যাঁ, ওষুধ তো দিয়েছে। ওই তো আমার চশমার খাপের ভেতরে ভরে এনেছি।...হ্যাঁ রে কানু, কই খা!

বলতে বলতে গপাগপ এক নিমেষে খিচুড়ির থালাটা শেষ করে দিলেন তারকবাবু। স্ত্রীকে বললেন, কই দাও। আরো দাও। দেখি কতটা আছে আর হাঁড়িতে?

সর্বজয়া চমকে উঠল। হল কি মানুষটার! এমন তো কোনোদিন করেন না। চেয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, না দিলে তো কোনোদিন খেতেই চান না। অথচ আজ! দুর্ভাবনায় সর্বজয়ার বুকটা কেঁপে উঠল।

সর্বজয়া হাঁড়িটা এনে তার থেকে আর কয়েক হাতা খিচুড়ি ঢেলে দিলেন তারক-

বাবুকে। দিতে না দিতে সেটুকুও শেষ। এই সময় নানু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারক-বাবু বললেন, কি রে, খেলি না যে! ভাল লাগছে না খেতে?

—না বাবা। আমার ঘুম পেয়েছে।

—তাহলে দে। তোরটা আমিই খেয়ে ফেলি। নষ্ট করে লাভ কি!

বলে নানুর থালাটা টেনে নিয়ে সেটাও চেটে পুটে খেয়ে সর্বজয়ার হাঁড়িটা নিজের দিকে টেনে নিলেন তারকবাবু। বললেন, বড় ভাল হয়েছে গো। এমন খিচুড়ি তুমি কোনোদিনও রাঁধোনি। ইচ্ছে হচ্ছে আরো খাই।

সর্বজয়ার ততক্ষণে কান্না এসে গেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মাথায় একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। না হলে অমন মানুষটা এরকম হয় কি করে? আর শুধু সর্বজয়াই নয়, ব্যাপারটা ততক্ষণে বোধহয় পানুও খানিকটা বুঝতে পেরেছে। বুঝেই মার দিকে তাকিয়ে কি বলতে গেল সে, কিন্তু বলা হল না। তার আগেই বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নেড়ে উঠল।

পানু বলল, কে এল বল তো?

সর্বজয়া চমকে উঠল; বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। সেই সঙ্গে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি। এত রাতে এই দুর্যোগে কে এল আবার! পানুর ছোট কাকা নয় তো? কিন্তু হৃষিকেশের তো আজ বাইরে কোথায় যেন যাওয়ার কথা। তবে কে এল!

সর্বজয়া বলল, শুনছো কে যেন কড়া নাড়ছে?

হাঁড়িটা থেকে মুখ তুলে তারকবাবু বললেন, কড়া নাড়ছে! না-না, এখন আবার কে আসবে! হাওয়ায় বোধহয় কড়াটা নড়ছে।

এই সময় কড়াটা আবার জোরে নড়ে উঠল। পরিষ্কার শোনা গেল কে যেন দরজাটা ধাক্কাচ্ছে।

সর্বজয়া বলল, ওই শোনো—শুনেছো?

ঘাড় কাত করে তারকবাবু ততক্ষণে পেছনে তাকিয়ে। পানুও উঠে দাঁড়িয়েছে। সর্বজয়া পানুকে বসতে বলে বলল, তোকে যেতে হবে না। তোর বাবাই যাবে এখন।

হঠাৎ কড়াটা আবার প্রচণ্ড জোরে নড়ে উঠল। সেই সঙ্গে এতক্ষণে একটা গলার আওয়াজ।

—দরজা খুলুন। বাড়িতে কে আছেন?

সর্বজয়া তারকবাবুকে তাড়া লাগাল। যাও না শীগগির। দেখো না কে এল?

প্রায় তড়িৎগতিতে এবার উঠে পড়লেন তারকবাবু। সর্বজয়া পানুর দিকে তাকাল, কিরে, তুই কোথাও আবার কিছু করে আসিসনি তো? তোর জ্বালায় হাড়মাস তো আমার আলাদা হয়ে গেল।

মুখ কাঁচুমাচু করে পানু বলল, বা রে আমি আবার কি করবো! আজ সারাদিন তো ঘরেই ছিলাম।

সেটা অবশ্য জানে সর্বজয়া—পানু কোথায়ও বেরোয়নি আজ। আর সে

কারণেই যদিও পানুর ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত সে, তবুও এই রাতে হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজে পানুর কথাটাই আগে ভেবেছিল সে।

গলার আওয়াজটা আবারও ভেসে এল।

—কি হল, দরজাটা খুলুন না? ভেতরে কে আছেন?

আশ্চর্য! সর্বজয়া উঠে পড়ল। মানুষটা গেল দরজা খুলতে। অথচ এখনো দরজা না খুলে কি করছেন! বাচ্চাগুলোকে পানুর হাতে ছেড়ে দিয়ে প্রায় দৌড়ে সে গেল দরজার দিকে।

কিন্তু মানুষটি কোথায়! এই যে মাত্র দরজা খুলতে উঠে গেলেন!

দরজায় আবারও ধাক্কা পড়ল। তারপরই আবার সেই গলার আওয়াজ—কি হল কি, দরজাটা কি খুলবেন?

—আমিই তো বললাম দরজাটা খুলে দিতে।

এবার আর দেরী করল না সর্বজয়া। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে ঝট করে দরজাটা খুলে ফেলল। আর খুলতেই চমকে উঠল সে। সামনে একজন পুলিস অফিসার। সঙ্গে দু'তিনজন কনস্টেবল।

রেইন কোটটা খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকেই অফিসারটি বললেন, এটাই তো তারকবাবুর বাড়ি—তারকনাথ মিত্র, তাই না?

সর্বজয়া মাথা নাড়তেই ভদ্রলোক বললেন, তারকবাবু তো সরকারী চাকরিতে আছেন—রাইটারস বিল্ডিংয়ে, তাই তো?

সর্বজয়া এবার মাথা নাড়তেই পুলিস অফিসারটি বললেন, দেখুন—আমরা একটা বিশেষ কারণে এখানে এসেছি। না হলে এই দুর্যোগের রাতে আপনাকে বিরক্ত করবো কেন? আচ্ছা আপনিই তো তারকবাবুর স্ত্রী—তাই না?

সর্বজয়া ভয়ে ভয়ে সম্মতি জানাতেই অফিসার বললেন, এখানে কে কে আছে আপনার?

—তিন ছেলে এক মেয়ে আর—ফিসফিস করে বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সর্বজয়া। তারপরেই বলল, আচ্ছা, উনি কি করেছেন?

—না, কিছুই করেন নি। আচ্ছা, তারকবাবু কি বাড়ি ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, ফিরেছেন তো। সর্বজয়া বলল, এই তো একটু আগে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি খেতে বসেছিলেন। কড়া নাড়ার আওয়াজে আমিই তো বললাম দরজাটা খুলে দিতে।

—কি বলছেন কি আপনি? পুলিশ অফিসারটি চমকে উঠলেন। কনস্টেবল দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, কই ডাকুন তো তাঁকে?

সর্বজয়া ছেলেকে ডাকলেন, পানু—এই পানু—

ছেলে আসতেই বললেন, দেখ তো তোর বাবা কোথায় গেল?

—বাবাকে তো তুমি বললে দরজাটা খুলে দিতে।

—বললাম তো। কিন্তু তোর বাবা দরজা না খুলে দিয়ে কোথায় গেল বল তো?

পুলিস অফিসার এতক্ষণ পর্যন্ত সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার সর্বজয়া আর পানুকে নিয়ে সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে তারকবাবুকে কোথাও না পেয়ে বললেন, আচ্ছা, কাছাকাছি আপনাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন আছেন?

সর্বজয়া জানাল, আছে। খানিক দূরে মোড়ের মাথার সামনে তার দেওরের মিষ্টির দোকান। তার পেছনেই বাড়ি। তবে দেওর বোধহয় আজ নেই। বলছিল যেন কোথায় যাবে।

—ঠিক আছে, আমরা দেখছি। পুলিস অফিসারটি এর পর সর্বজয়ার কাছ থেকে তার দেওরের নামধাম নিয়ে কনস্টেবল দুজনকে কি যেন বললেন। বলতেই চলে গেল ওরা।

খানিক বাদে আবার যখন ফিরে এল তখন সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক। হাতে টর্চ আর ছাতা। তারই ভেতরে সর্বজয়ার মেজ দেওর হৃষিকেশকেও চোখে পড়ল।

হৃষিকেশ এসে ঘরে ঢুকতেই অফিসারটি বললেন, আপনিই তারকবাবুর ভাই? শুনুন হৃষিকেশবাবু—আজ দুপুরের দিকে শেয়ালদার কাছাকাছি লরির সঙ্গে প্রচণ্ড একটা অ্যাকসিডেণ্টে তারকবাবু মারা যান। সঙ্গে ছাতা আর ব্যাগ ছিল। সে দুটো আমাদেরই জিম্মায় আছে। কিন্তু হাতে একটা কাঁঠাল ছিল। সেটা আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। চাকার নীচে পড়ে একদম থেঁত্‌লে গেছে।

—কিন্তু এ কি করে হয় ঠাকুরপো। সর্বজয়া এতক্ষণে ভেঙে পড়ল। বলল, পানুর বাবা তো সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফিরে এসেছেন। এই তো এতক্ষণ পর্যন্ত ওদের সঙ্গেই খেতে বসে কত কথা বলছিলেন। তবে মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ ছিল। জানালেন, প্রচণ্ড একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আজ। বরাতজোরে তিনি বেঁচে গেছেন।

কান্নাভাঙা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে সর্বজয়ার হঠাৎ মনে পড়েছে কাঁঠালটার কথা। পানুর হাত থেকে কাঁঠালটা নিয়ে সে-ই তো রান্নাঘরে রেখে দিয়েছে।

সর্বজয়া ছুটল। কাঁঠালটা একবার দেখতেই হবে।

কিন্তু রান্নাঘরে গিয়েই চমকে উঠল সে। কোথায় কাঁঠাল! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। একটু আগেও তো দেখে গেছে। অথচ এখন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

আর কিছু ভাবতে পারে না সর্বজয়া। সামনের বাঁশের খুঁটিটা ধরে থরথর করে শুধু কাঁপতে থাকে।

বাঘে মানুষে লড়াই

—পরেশ ভট্টাচা

শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই!

তারপর যে সে বাঘ নয়, সুন্দরবনের রাজা বাঘ!

শুনলে মনে হবে আজগুবি গল্প, কিন্তু তা নয়—শুধু হাতে সুন্দরবনের রাজা বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিল সমশের নগরের সুবল বাউলি।

শীতের মরসুমে গিয়েছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রাম সমশের নগরে। যে গাঁয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে সুন্দরবন দেখা যায়, যেখানে ঘরে শুয়ে বাঘের ডাক শোনা যায়।

গ্রামটা বড় মজার। চারদিকেই জল। তিন দিক জুড়ে রয়েছে কালিন্দী আর রায়মঙ্গল, আর একদিকে রয়েছে সংকীর্ণ খাল—নাম ফড়েখালি। খালের পারেই নিবিড় জঙ্গল।

সুবল বাউলি

এখানকার নদীগুলো যেমন তেমন নয়, এপারে দাঁড়ালে ওপার স্পষ্ট দেখা যায় না।

শীতের দিনে নদীগুলো কিছুটা শান্ত থাকে, কিন্তু অন্য ঋতুতে হয়ে ওঠে দামাল। ঝড় উঠলে তো কথাই নেই, ক্ষেপে ওঠে নদী।

এ এক আশ্চর্য দেশ। এখানে জলে রয়েছে হিংস্র কামট, কুমির আর হাঙরের দল, আর ডাঙায় অরণ্য জুড়ে রাজত্ব করছে রাজা বাঘ। সেই বাঘের রাজত্বেও রয়েছে

হরিণ, বুনো শূয়োর আর বানরের দল। এ ছাড়া অরণ্য অঞ্চল জুড়ে আছে নানা জাতের বিষধর সাপ।

এ তল্লাটের মানুষ ভয়কে পরোয়া করে না। ঝড়-তুফানেও তারা ডিঙি ভাসায় বদরপীরের নাম করে। বনদেবীর পূজো দিয়ে মাছ ধরতে চলে যায় খাড়িপথে অরণ্যের গভীরে। আর মধু সংগ্রহের সময় এলে দল বেঁধে মৌচাকের সন্ধানে যায় অরণ্যের গভীরতম অঞ্চলে। তাছাড়া বার মাস কাঠ কাটতে যাওয়া তো আছেই।

এই সব মানুষেরা ভয়কে জয় করেছে বাঁচার তাগিদে। ঘরে বসে থাকলে তো আর চলবে না।

সমশের নগরে এসে উঠছি দেবেন মাস্টারের বাড়ি। আসল নাম দেবেন রায়, কিন্তু সবাই বলে দেবেন মাস্টার। আর যেমন তেমন মাস্টার নয়, একেবারে ডবল মাস্টার। একদিকে গ্রামের প্রাইমারী স্কুল আর একদিকে পোস্ট অফিস—দুদিকে সামলাতে হয় দেবেন মাস্টারকে। এর পর আবার বাড়তি কাজও আছে—ডাক্তারী করা। ঘরে আলমারি ভর্তি এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, স্টেথোস্কোপ—সব কিছুই আছে। দেবেন মাস্টার যে ডাক্তারী করে, এ খবরটা জানতাম না। এখানে এসেই দেখলাম।

দেবেন মাস্টারের কাছে গল্প শুনি। কত রকমের গল্প। সনাতন মালো নামে একজন আছে যে নাকি রায়মঙ্গল সাঁতরে পার হয়েছে। আসরফ গাজী গাদা বন্দুক দিয়ে বিশ-পঁচিশটা মানুষখেকো বাঘ মেরেছে, সুরেন দাস একা ডিঙি ভাসিয়ে সাগরের মুখ পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। এ-ছাড়া আরো কত মানুষের গলা, কত শিকারের গল্প শুনি দেবেন মাস্টারের মুখে। যাদের কথা বলে, তাদের দু'চারজনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে।

কিন্তু যখন সুবল বাউলির কথা শুনলাম, তখন মনে হল নিছক গল্প শুনছি।

আমার মুখে চোখে অবিশ্বাসের রেখা ফুটে উঠতে দেবেন মাস্টার বললে, কি দাদা—বিশ্বাস হল না?

বললাম, না—ঠিক তা নয়, তবে শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করা কি সম্ভব?

দেবেন মাস্টার একটু চুপ করে থেকে বললে, ঠিক আছে, রাতটা কাটুক, কাল ভোরে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো সুবল বাউলির বাড়ি।

সকাল হল।

চা পানান্তে দেবেন মাস্টারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

খাল পার দিয়ে পথ। নামেই পথ। আসলে মাটির বাঁধ।

শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে পথ চলছি। খাল পারে কসাড় জঙ্গল। কত রকমের গাছ। গেঁয়ো, কেওড়া, গর্জন, গরাণ, ওড়া, পিটুলি। মাঝে মাঝে হেতালের কল ঝোপ, কোথাও গোল পাতার জঙ্গল।

এই সাত সকালে খালের এপারে-ওপারে জাল ফেলছে মানুষ। বয়স্কদের সঙ্গে কাচ্চা-বাচ্চারাও রয়েছে।

এক সময় দেবেন বললে, সে-ও এক শীতের সকাল, সুবল বাউলিও মাছ ধরছিল খালের ওপারে।

—তারপর ?

—তারপর আমি আর কি বলবো, সুবল বাউলির মুখ থেকেই শুনো।

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে সুবল বাউলির বাড়ি। বাড়ি বলতে জীর্ণ দোচালা কুঁড়ে।

উঠোনে দুটি কচি ছেলেমেয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। এরা সুবলের ছেলেমেয়ে। দেবেনের স্কুলে পড়ে।

দেবেন জিজ্ঞাসা করলে, এই, তোদের বাবা কোথায় রে ?

ছেলেটি বললে, মাছ মারতে গেছে।

দেবেন জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ?

উত্তর দিলে ছেলেটি, বোধ হয় মোড়লজোলে।

সুবল বাউলির সঙ্গে দেবেন মাষ্টার

ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলে গেছে আলপথ। আলপথ ধরে কিছুদূর এলাম। আর পথ নেই। জলা জায়গা। জলের মধ্যে গজিয়ে আছে হোগলা পাতি কাম। এই জলা জায়গাটার নামই মোড়লজোল।

বেশ কিছু লোক মাছ ধরছে মোড়লজোলে। তারই মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করে দেবেন ডাকলো, কই গো সুবল, একবার এদিকে এসো তো।

মাঝবয়সী সুবল হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে জাল ফেলে মাছ ধরছে। ডাক শুনে সে ফিরে তাকালো। বললে, যাই মাস্টার।

জাল টেনে তুললো সুবল। কিছু চুনোপুঁটি জড়িয়ে আছে জালের সঙ্গে। ডাঙায় এসে জাল ঝেড়ে-ঝুড়ে মাছগুলো খারায় রাখলো। তারপর এগিয়ে এলো আমাদের কাছে। দেখেই শিউরে উঠি। চোয়ালে বিরাট একটা গর্ত, মুখটা বাঁকা, আর একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।

সুবলের মাথায় গামছা জড়ানো। দেবেনের কথায় মাথার গামছা খুলে ফেললো।

মাথার খানিকটা অংশ নেই। ডান দিকের কানটা মাংসের দলার সঙ্গে ঝুলে আছে কাঁধের ওপর, তারপর ঘাড়ের ওপর এক খাবলা মাংস নেই।

এই সুবল বাউলি শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিল।
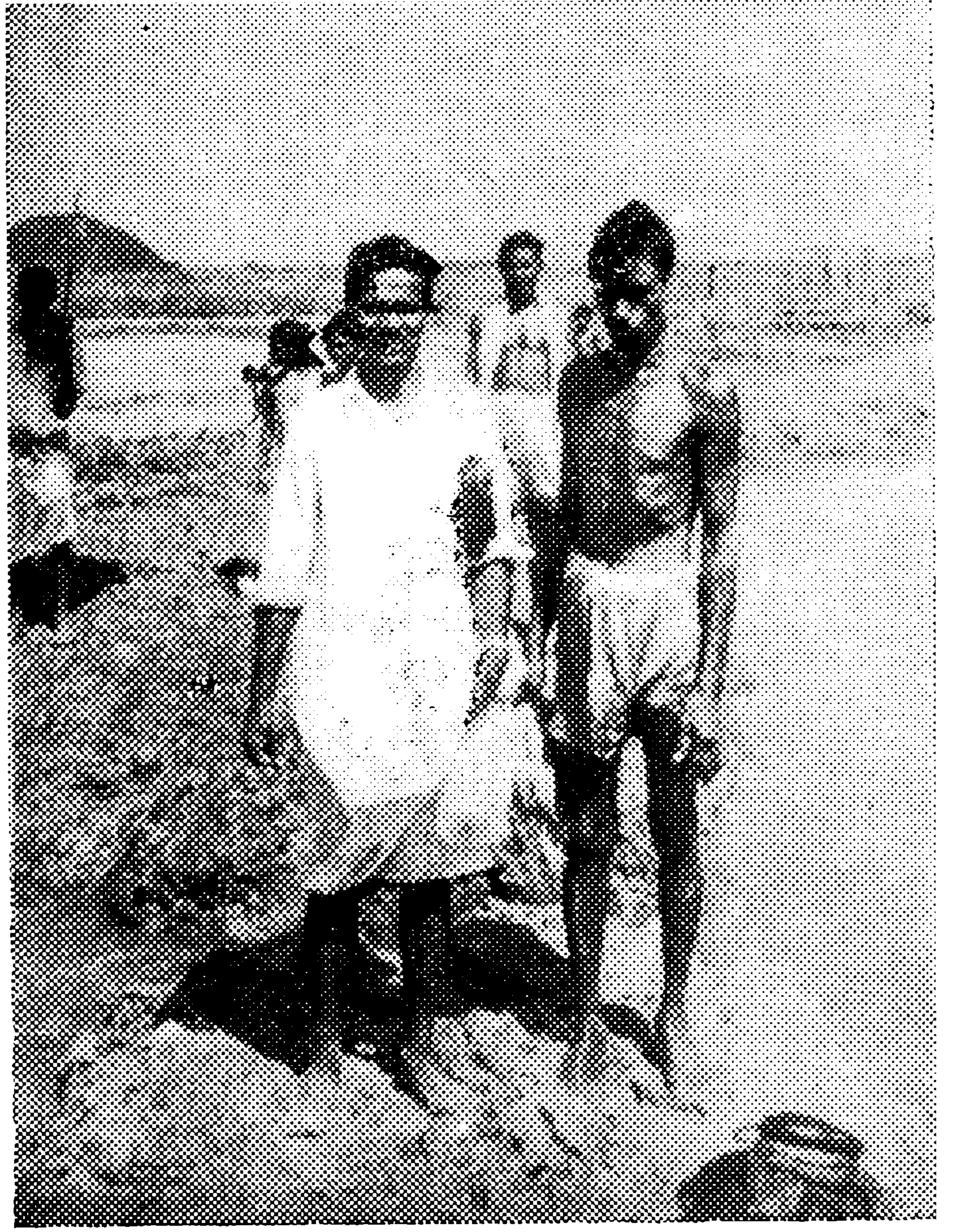
মোড়লজোলের ধারে একটা ঝাঁকড়া সাঁইবাবলা গাছ। সুবলকে নিয়ে সেই গাছের নিচে ঘাসের ওপর বসলাম।

সুবল আরম্ভ করলে তার গল্প।

মাছ ধরা সুবলের নেশা নয়, পেশাও। ক্ষেত-খামারে কাজ না জুটলে সেদিনটা ও মাছ ধরেই কাটিয়ে দেয়। খাবার মাছটাও হয়, কিছু বিক্রিও করতে পারে।

সেদিনও ছিল শীতের সকাল। জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল খাল পারে। সে একা নয়, দূরে কাছে খালের এপারে ওপারে মাছ ধরছিল আরো মানুষ।

সেদিন জালে বেশ মাছও পড়ছিল।

সুবল যেখানে জাল ফেলছিল, তার পাশেই একটা খাড়ির মুখ।

খালে তখন ভাঁটার টান। খাড়ির জল কুলকুল করে খালে এসে পড়ছিল।

ভাঁটার সময় এই খাড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে যায়, আবার নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন খালেও আসে জোয়ার। জোয়ারের জলে খাড়িগুলোও ভরে যায়। ছোট-বড় এই খাড়িগুলো জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে।

ভাঁটার সময় এই খাড়ির মুখেই মাছ পাওয়া যায় বেশি।

সুবল মনের আনন্দে মাছ ধরছে। কোনদিকে ফিরে চাইবার অবকাশ তার নেই।

এরই মধ্যে হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। মাথার ওপরে ক্যাওড়া গাছ থেকে একটা পাখি কর্কশ সুরে ডেকে ওঠার মুহূর্তে সুবলের কাঁধে প্রচণ্ড জোরে থাবা মেরে ঘাড়ের ওপর কামড় দিয়ে দাঁড়ালো কালান্তক যম—রাজা বাঘ!

সেই মুহূর্তে চারদিকের মানুষেরা, যারা মাছ ধরেছিল খালের ওপারে এপারে, তারা চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়—তারই মধ্যে সুবলের মনে হল তার জীবন তো শেষ।

সুবল নিজেই জানে না সেই মুহূর্তে অত সাহস আর বুদ্ধি তাকে কে জোগালো।

হাতের জাল ফেলে দিয়ে সুবল কোনরকমে একটা হাত ঘুরিয়ে দুটি আঙুল বাঘের নাকের দুটো ফুটোয় সজোরে ঢুকিয়ে দিলে। আর একটি হাত তখন প্রায় অবশ, তবু কে যেন তার সেই হাতে শক্তি জোগালো। হাতটা নিয়ে গেল বাঘের মুখের কাছে। মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে সজোরে চেপে ধরলো বাঘের জিভ।

কিন্তু একজন মানুষের গায়ে আর কত শক্তি! একটি বাঘকে সামলানো কি মুখের কথা! সুবলের মনে হল, মরতে যখন হবেই তখন লড়াই করে মরবো।

বাঘ তখন মাথাটা তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। বাঘের জিভ সুবলের হাতের মুঠোয়। সে বাঁ হাতের দু'আঙুল তখনো চেপে রেখেছে বাঘের নাকের ফুটোয় আর তার খরখরে জিভ ধরে সমানে টানছে ডান হাত দিয়ে।

সুবলের চোখের সামনে তখন নিকষকালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও সে যেন দেখতে পাচ্ছে বনদেবী তার সামনে দাঁড়িয়ে। বনদেবী যেন দু' হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টানতে চাইছে।

তারপর আর কিছু জানে না সুবল। এগারো দিন পর যখন তার চেতনা ফিরলো তখন সে বসিরহাট হাসপাতালে।

কিন্তু গাঁয়ের মানুষ জানে শেষের ঘটনা, সুবল যা জানে না।

কড়েখালির পারে তখন ভিড় করেছে অনেক মানুষ। কেউ টিন পেটাচ্ছে, কেউ শাঁখ বাজাচ্ছে, আবার কেউ কেউ খাল পেরিয়ে যাচ্ছে বল্লম, সড়কি, গাদা বন্দুক নিয়ে।

বাঘটা তখন ছটফট করছে। যদিও সুবলের চেতনা নেই, তবু সে ধরে রেখেছে বাঘের জিভ। তবে নাকের ফুটো থেকে তার আঙুল দুটো বেরিয়ে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত বাঘটা ওই অবস্থায় পিছু হটতে লাগলো। সুবলের রক্তাক্ত দেহটা নরম পলির ওপর দিয়ে লুটিয়ে যাচ্ছে। কিছুটা ওপরে যখন উঠে গেছে বাঘটা, তখন এপারের মানুষ সড়কি-বল্লম নিয়ে পৌঁছে গেছে ওপারে। বাঘের জিভটা কাঁকড়ার কামড়ের মত আঁকড়ে রেখেছে অচেতন সুবলের খিল লেগে যাওয়া হাতের মুঠো।

বাঘটা তখন রীতিমত ভয় পেয়েছে। সড়কি-বল্লমের খোঁচাও বিঁধেছে তার গায়ে। বাঁচার তাগিদে বাঘটা তখন প্রচণ্ড জোরে মাথা ঝাঁকালো। এবারে মুক্ত হল বাঘটা। ছুটে পালালো গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

সুবলের রক্তাক্ত অচেতন দেহটা তখন নরম পলির ওপর। সবাই ধরে নিয়েছিল, সুবল আর বেঁচে নেই—কিছু কাছে গিয়ে দেখলো তখনো সুবলের বুক ওঠা-নামা করছে।

এর পর গাঁয়ের লোক সুবলকে নিয়ে গেল মোল্লাখালি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে বসিরহাট হাসপাতালে।

ডাক্তারবাবুরা ভেবেছিলেন সুবলকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবল বাঁচলো।

ফেরার পথে দেবেন মাস্টারের কাছেই শুনলাম, প্রায় এক বছর হাসপাতালে ছিল সুবল। ফিরে আসার পর প্রথম প্রথম জড়ভরত হয়ে বসে থাকতো ঘরে। তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল। এখন ও কাজকর্ম সবই করে, কিন্তু খাল পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে যায় না। তারপর আরো একটা কথা—সুবল আর আরসিতে মুখ ছ্যাখে না। আরসিতে চোখ পড়লে ও আঁতকে ওঠে, ভয় পায়, মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে।

———

বৃন্দাবনে ফড়িং

—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

হাবুদার সঙ্গে ফড়িং মাইশোরে এসেছে। আসলে সে ফড়িং নয়, চেহারাটাও নয় ফড়িং-এর মতো। তার একটা ভাল নামও ছিল। কিন্তু সবাই সে নাম এখন ভুলে গেছে। ফড়িং নিজেও মাঝে মাঝে ভুলে যায়। হঠাৎ কেউ নাম জানতে চাইলে থতমত খেয়ে তার ভাল নামটা মনে করবার চেষ্টা করে।

ইস্কুলের খেলার মাঠে বলের পেছনে সে সারাক্ষণ তিড়িং বিড়িং করে ছুটে বেড়াত। তাই দেখে বিরক্ত হয়ে খেলার মাস্টারমশাই একদিন বলেছিলেন, 'তুই ফড়িং নাকি রে!' সে লজ্জা পেয়েছিল। আর ছেলেরা হেসে উঠেছিল। আর তার পর থেকেই তার ফড়িং নামটা চালু হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ফড়িং কোনদিন আপত্তি করে নি। করবেই বা কেন! নামটা তো মানুষের পরিচয় নয়! ডাকবার সুবিধের জন্যে যে কোন একটা নাম হলেই চলে।

এই তো, হাবুদার নামই বা হাবুদা হল কেন! হাবুদা তো সত্যি সত্যি হাবা নয়। হাবুদার মতো দারুণ বুদ্ধিমান কি পাড়ায় আর একটা আছে! বুদ্ধির জোরেই তো পাড়ার সব ছেলেদেরই হাবুদা হয়েছে! বি-এ-পাশ করে বেরোতে না বেরোতেই কত বড়

একটা চাকরি পেয়ে গেল! আজ ধনেখালি, কাল বকখালি, তার পরেই সন্দেশখালি। এলাহাবাদ থেকে হায়দ্রাবাদ, তার পরেই সিকেন্দ্রাবাদ। আর ব্যালাসোর থেকে ফিরেই মাইশোর। এমন এমন সব জায়গার নাম হাবুদা বলে যে ভূগোলের বই-এ নেই।

ভাগ্যিস ফড়িং তার জ্যাঠামশায়ের একশো একটা পাকা চুল তুলে দিয়েছিল, আর ভাবছিল এবারে পয়সা না নিয়ে কী চাইবে? তাইতেই তো হাবুদা মাইশোরে আসছে শুনে বলতে পারল, 'পয়সা নয় জেঠু, এবারে হাবুদার সঙ্গে মাইশোরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও।' হাবুদা বলেই তো সবাই মেনে নিল! অন্য কারও সঙ্গে কি তাকে আসতে দিত?

ফড়িং ওই যেন ইন্দ্রভবনের বারান্দায় বসে হাবুদার সঙ্গে মজাসে ডোসা আর কফি খাচ্ছে। হাবুদা অফিস থেকে এইমাত্র ফিরেছে। খাওয়া শেষ হলেই দুজনে বেরিয়ে পড়বে। তাড়া দিয়ে হাবুদা বলল, তাড়াতাড়ি শেষ করতো!'

গরম বলে ফড়িং-এর দেরি হচ্ছিল। আর চামচে দিয়ে ঠিকমতো ডোসা কাটতেও পারছিল না। ভুঁড়ি ভেস্কে গিয়েছিল গরম ডোসার। তাই হাবুদার তাড়া খেয়ে ফড়িং তার হাত লাগাতে যাচ্ছিল। কিন্তু হাবুদা একবার চারদিকে চেয়েই চাপা গলায় তাকে ধমকে উঠল, 'করছিস কী! হোটেলের বারান্দায় বসে কি কেউ হাত দিয়ে খায়?'

সত্যিই তো! ফড়িং চট করে তার হাতটা গুটিয়ে নিয়ে আবার চামচে ধরল। চুপি-চুপি বলল, 'বুঝলে হাবুদা, এইটুকুনি একটা চামচে দিয়ে এত বড় ডোসাটা ঠিক সামলাতে পারছি নে।'

হাবুদা বলল, 'মুশকিল কিছুই নয়। খাবার আর্টটা জানতে হয়। এই দেখ্, দেখে শিখে নে।

বলে ডোসার মাঝখানটা কেটে চামচে দিয়ে মুখে তুলতে গিয়েই সেটা হাবুদার কোলের ওপরে পড়ে গেল।

হাবুদার ভয়ে ফড়িং হাসতে পারল না। রেগে গেলে হাবুদা তাকে ফেলেই বেরিয়ে যাবে। তাই ফড়িং ভালো মানুষের মতো মুখ করে চেয়ে দেখল যে হাবুদা তার নিজের চারধারটা একবার দেখে নিয়েই তার হাত দিয়ে কোলের ওপর থেকে সব কিছু তুলে মুখে পুরে ফেলল। আর চক্ষের নিমেষে শেষ করে বলল, 'দেখনি?'

ফড়িং মাথা নাড়তেই বলল, 'এমনি করে খেয়ে নে।'

পথে নেমে হাঁটতে লাগল তারা। সুন্দর রাস্তা আর বড় বড় ঘরবাড়ি দেখে ফড়িং হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'এ জায়গার নাম মাইশোর হল কেন হাবুদা?'

হাবুদা বলল, 'নাম! নামের কি আবার কোন মানে হয়?'

ফড়িং আপত্তি করে বলল, 'কেন, সেবারে তো বলেছিলে জায়গার নামগুলোর এক একটা মানে থাকে! ধনেখালিতে শুধু ধনে দিয়ে রাঁধে। বকখালির আকাশে আকাশে সারাক্ষণ বক ওড়ে, আর—'

সেসব কথা মনে পড়তেই হাবুদা বলল, 'আর সন্দেশখালিতে আমি খালি সন্দেশ খেয়েই ছিলাম!'

'তবে মাইশোর নামেরই বা একটা মানে থাকবে না কেন?'

হাবুদা তখনই বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। মানেটা মনে পড়ে গেছে।'

অনেক আগ্রহ নিয়ে ফড়িং হাবুদার মুখের দিকে চাইল।

হাবুদা বলল, 'ইংরিজি জানিস?'

'অল্প অল্প।'

'মাইশোর মানে কী?'

মাথা চুলকে ফড়িং বলল, 'সোর মানে তো সমুদ্রের—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে। বল্!'

'সমুদ্রের তীরকে কী বলে হাবুদা?'

হাবুদা বলল, 'বেলাভূমি। এই দেশটা সমুদ্রের ধারে বলেই তো এর নাম মাইশোর হয়েছে। এই দেশের রাজা এই নাম রেখেছিল।'

ভারতবর্ষের ম্যাপটা ফড়িং-এর মনে পড়ল না। বলল, ভারতবর্ষের তিন দিকে তো তিনটে সমুদ্র। মাইশোর কোন্ সমুদ্রের ধারে?'

হাঁটতে হাঁটতে তারা বড় রাস্তার ধারে পৌঁছে গিয়েছিল। এখান থেকেই বাস পাওয়া যায়। অটো রিক্শাগুলোও ছুটোছুটি করছে। হাবুদা ফড়িংকে একটা ধমক দিয়ে বলল, 'সারাক্ষণ এমন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস কেন বল তো?'

ফড়িং চুপ্‌সে চুপ হয়ে গেল।

কিন্তু ফড়িং-এর মুখ দেখে মায়া হল হাবুদার। বলল, 'চল্, তোকে আজ বৃন্দাবন দেখিয়ে আনি।'

বৃন্দাবন নামটা ফড়িং-এর শোনা ছিল, কিন্তু সে বৃন্দাবন যে এইদিকে, তা তার জানা ছিল না। কিন্তু হাবুদা আবার রেগে যাবে মনে করে ফড়িং এই মুহূর্তে কোন প্রশ্ন করল না। ভাবল যে পরে সুবিধেমতো সব কথা জেনে নেবে।

হাবুদা একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করে বৃন্দাবনের একটা বাসে উঠে বসল। ফড়িংকে পাশে বসিয়ে বলল, 'দেখলি তো!'

ফড়িং বুঝতে পারল যে হাবুদার মেজাজ এখন প্রসন্ন। তাই চট করে প্রশ্নটা করে ফেলল, 'বৃন্দাবন বুঝি মাইশোরের কাছে হাবুদা?'

হাবুদা বলল, 'কাছে মানে! দেখতেই তো পাচ্ছিস, আমরা এখন বৃন্দাবনে যাচ্ছি!'

ফড়িং বলল, 'জানো হাবুদা, আমি এতদিন ভুল জানতাম। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে ভেবেছিলাম, বৃন্দাবন আগ্রার কাছে। এদিকে তাজমহল, আর ওদিকে বৃন্দাবন।'

হাবুদা বলল, দূর বোকা, তোর ঠাকুমা তো একটা পুঁটলির মতো। যেখানে নামিয়ে নেয়, সেখানেই নামে আর যেখানে তুলে দেয় সেখানেই ওঠে। কোন্ জায়গা কোথায়, ও বুড়ি তা জানবে কী করে!

কিন্তু হাবুদার এই মন্তব্যটা ফড়িং-এর ভালো লাগল না। ঠামার কাছে সে অনেক গল্প শুনেছে, অনেক জায়গার গল্প। দাদুর সঙ্গে ঠামা অনেক জায়গায় গেছে। ঠামা তখন নিজে নিজেই বেড়াতে পারত। তবু সে চুপ করে রইল।

কিন্তু তাদের সামনের এক যাত্রী চুপ করে থাকতে পারল না। পিছন ফিরে বলল, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন তা বৃন্দাবন নয়, বৃন্দাবন গার্ডেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন, আগ্রা আর দিল্লীর মাঝখানে।

ফড়িং হাবুদার মুখের দিকে তাকাল, আর চোখের ইসারায় হাবুদা বলল চুপ করে থাকতে।

বৃন্দাবনে বাস থেকে নেমে হাবুদা একটু আড়ালে গিয়ে বলল, 'কিস্সু জানে না লোকটা।'

কিন্তু চারদিকে চেয়ে ফড়িং-এর মনে হল যে তারা একটা সুন্দর বাগানে এসেছে। রাস্তার ধারে ধারে কত রকমের ফুল আর ফোয়ারা। মস্ত একটা বাড়ির কাছ থেকে জলের ধারা নাচতে নাচতে ধাপে ধাপে নেমে আসছে। তারই মাঝে মাঝে চারিদিক থেকে ফোয়ারার জল উঠে ধাক্কা খেয়ে ঝরে পড়ছে, ফেনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। অন্য দিকে বিরাট একটা পুকুর থেকেও ফোয়ারার জল ঠেলে উঠছে আকাশের দিকে। নালা, পুকুর তো নয়, এ ঠিক সমুদ্রের মতো। আর ফোয়ারা তো নয়, যেন জলস্তম্ভ। ভূগোলের বই-এ ফড়িং জলস্তম্ভের কথা পড়েছে।

তারপরেই আশ্চর্য হয়ে দেখল যে অনেকেই সেই সমুদ্রে নেমেছে নৌকোয় চেপে। আর ঐ জলস্তম্ভের দিকেই যাচ্ছে। ফড়িং চেঁচিয়ে উঠল, দেখো, দেখো হাবুদা!

হাবুদা গম্ভীরভাবে বলল, তুই দেখ।

কিন্তু নৌকোগুলো জলস্তম্ভের কাছাকাছি না গিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল। ও কি, ওর পেছনে যে একটা দ্বীপের মতো দেখা যাচ্ছে! সেখানেও তো অনেক লোকজন! ফড়িং বলে উঠল, 'আমরা ওখানে যাব না হাবুদা?'

হাবুদা তখন একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। এইবারে তার দিকে ফিরে বলল, 'এই তো মাইশোরের সমুদ্র। এর নাম কৃষ্ণরাজ সাগর।'

'কিন্তু সমুদ্রের মতো জল তো তোলপাড় করছে না?'

'করবে কী করে! বাঁধ দিয়ে রেখেছে যে! যাবি ওখানে?'

'চল না।'

বলে ফড়িং লাফাতে লাফাতে নৌকোর ঘাটে এসে পৌঁছল।

একখানা নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ছিল। সবাই নেমে পড়তেই হাবুদার সঙ্গে ফড়িং নৌকোয় উঠল লাফিয়ে। তারপরে দুলতে দুলতে বলল, 'এই সমুদ্রে আমার একটুও ভয় করছে না হাবুদা।'

কিন্তু সেই জলস্তম্ভের কাছে এসে নৌকো যেই লাফিয়ে উঠল, ফড়িং অমনি হাবুদার হাত ধরল চেপে, বলে উঠল, 'অত কাছে যাচ্ছে কেন!'

ফড়িং অমনি হাবুদার হাত ধরল চেপে। [পৃঃ ৯৩

কিন্তু কলের নৌকো তো! মাঝি চট্ করে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে সেই দ্বীপটার দিকে এগিয়ে চলল। ফড়িং এবারে হাবুদার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'জায়গাটা ভারি সুন্দর না হাবুদা?'

হাবুদা বলল, 'সুন্দর না হলে তোকে এখানে আনব কেন?'

অন্ধকার হবার আগেই তারা সেখান থেকে ফিরে এলে। কিন্তু হোটেলে ফেরার জন্য কোন বাস পেল না। বৃন্দাবনের বাতি না জ্বললে কোন বাস ফিরবে না। তাই ফড়িংরা আবার ফোয়ারাগুলোর কাছে ফিরে এল। বৃন্দাবনে যারা এসেছে, সবাই এখানে ঘোরাঘুরি করছে। বেঞ্চিতে আর ঘাসের উপরও বসে আছে অনেকে।

একটুখানি অন্ধকার হতেই চমকে উঠল ফড়িং। একি, জায়গাটা বদলে গেল নাকি! এ তো বৃন্দাবন নয়, এ তো একটা পরীর দেশ। একটা ফোয়ারাতেও আর সাদা জল নেই, জলের সব ধারাগুলো রঙীন হয়ে গেছে। ফুলগাছগুলো রঙীন। লাল রঙে ঝলমল করছে চারদিক। হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফড়িং উঠল, 'এ কী হল হাবুদা? এ আমরা কোথায় এলাম?'

হাবুদা নিজের পায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'আমরা তো এখানেই আছি।'

'তবে কি জায়গাটাই বদলে গেল!'

'তা হবে কেন?

সবার সঙ্গে ফড়িংরাও ঘুরে ঘুরে সব দেখল। জলের নীচে ছিল নানা রঙের বাতি। চারদিকের ফুলের গাছেও। একসঙ্গে এইসব বাতি জ্বলে উঠেছে। নানা রঙের বাতির আলোয় সব কিছুই এখন এখানে রঙীন হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু দেখবার পরে বাসের দিকে যেতে যেতে হাবুদা বলল, 'এইসব দেখাবার জন্যেই তো তোকে এখানে এনেছিলাম।'

ফড়িং বলল, 'বৃন্দাবনে ঠামা এসব নিশ্চয়ই দেখে নি, দেখে থাকলে ফলাও করে গল্প শোনাত।'

হাবুদা বলল, 'বৃন্দাবনে এসে থাকলে তো বলবে।'

শহরে পৌঁছে বাস থেকে নামবার আগে হাবুদা বলল, 'দেখলি তো, তোকে ঠিক বলেছি কি না? কৃষ্ণরাজ সাগরের তীরে বসেই রাজা এই সাগরের নাম রেখেছিল মাইশোর।'

এবারে পিছন থেকে এক ভদ্রলোকের গল্প শোনা গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'কী যা তা বলছেন! এখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে ম্যাঙ্গালোরে গেলে আরব সাগর, আর ততটাই দূরে ম্যাড্রাসে গেলে বঙ্গোপসাগর। ভারত মহাসাগর দেখতে হলে নীলগিরি পাহাড় ডিঙিয়ে আরও বেশিদূর যেতে হবে কন্যাকুমারী পর্যন্ত।'

দুজনেই একসঙ্গে পিছন ফিরে দেখল যে সেই ভদ্রলোক, বৃন্দাবনে যাবার সময় যে সামনে বসেছিল। হাবুদা তার মুখটা চট করে ফিরিয়ে নিয়ে ফড়িংকে চোখ টিপল। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন, 'বৃন্দাবন গার্ডেনে যে সাগর দেখলেন, তা আসলে কাবেরী নদীর ড্যাম। নদীর ওপরে বাঁধ দিয়ে ঐ সাগর তৈরি হয়েছে রাজার নামে।'

হাবুদা খুব চালাক। ভদ্রলোকের ভুল ভাঙাবার চেষ্টা একবারও করল না। হোটেলে ফেরার পথে হেসে উঠল প্রবলভাবে। ভয় পেয়ে ফড়িং বলল, 'অমন করে হাসছ কেন হাবুদা?'

হাবুদা হাসতে হাসতেই বলল, 'ভদ্রলোক কী বোকা দেখেছিস! কী রকম উল্টোপাল্টা কথা বলছিল! ওর ভুল ভাঙিয়ে কী হবে! থাক অমনি বোকা। আর বোকামি করেই কাটাক বাকি জীবন!

মণি ও মুক্তা

ওরাং ওটাংরা মধু খেতে ভালবাসে। চিড়িয়াখানার নকল মৌচাক থেকে ওরা বাঁশের কঞ্চি ডুবিয়ে চেটে চেটে কেমন মধু খাচ্ছে দেখ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ওরা খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী।

উমাপতির কীর্তি

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাখোপতি উমাপতি হয়ে গিয়ে খাপ্পা
রাঁচি থেকে এক ছুটে গেলো রাজরাপ্পা!
একদিন শৈশবে
রেকর্ডের বৈভবে
চব্বিশ ঘণ্টা সে শুনে শোরে লাপ্পা
ডাক নাম 'মিঠুয়া'টা করেছিল 'বাপ্পা'।

* * *

রাজরাপ্পায় গিয়ে
বললো সে চেঁচিয়ে—
যত কিছু প্ল্যান ছিল
সব গেলো কেঁচিয়ে
সব চেয়ে ভালো তাই
ঝাল যদি বেশী খাই
আর যদি টিকিটাকে
বেঁধে ফেলি পেঁচিয়ে
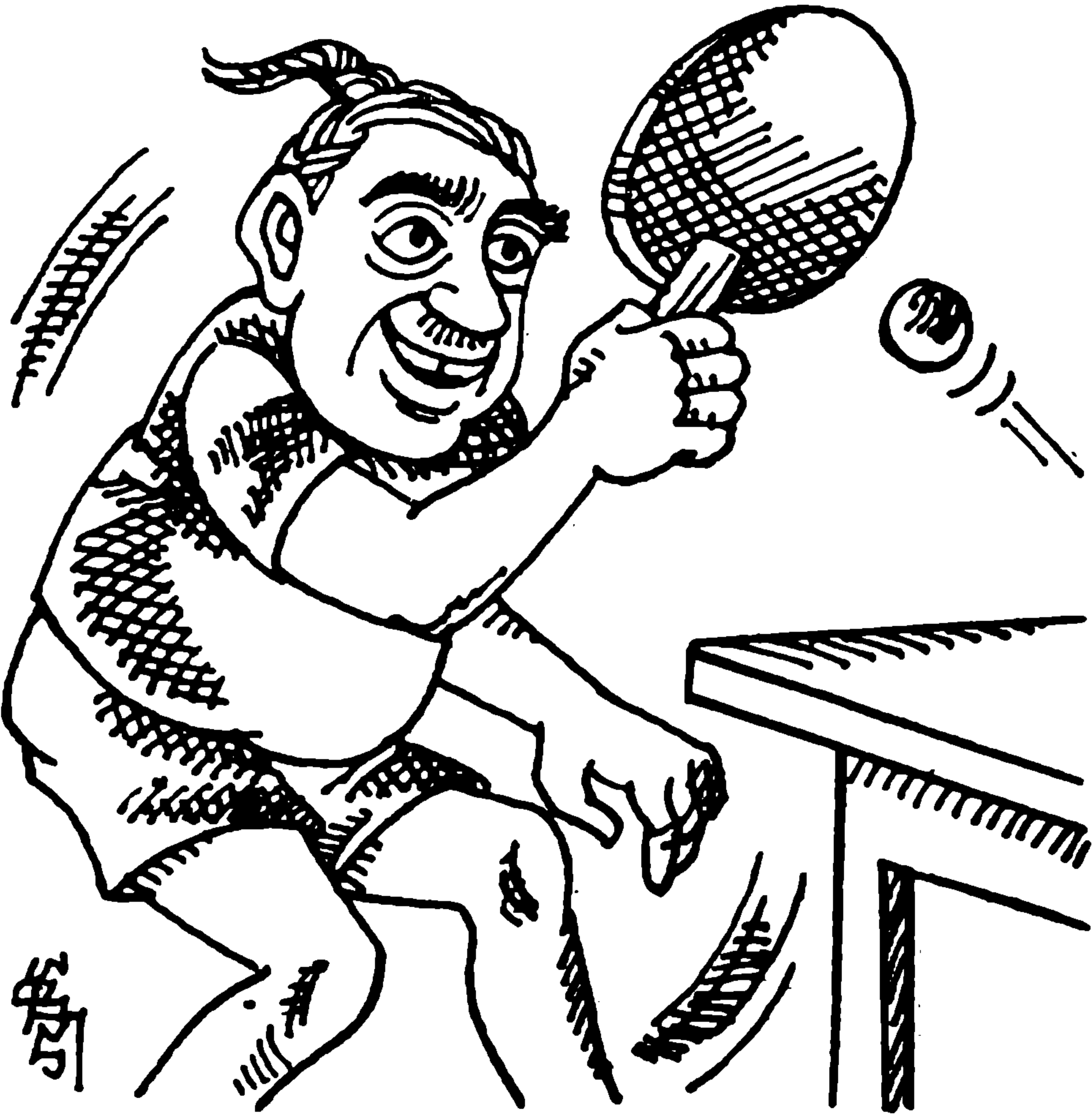
কোনোদিন কোনো প্ল্যান
যাবে নাতো কেঁচিয়ে।

* * *

গপাগপ গিলে ফেলে
ঝাল গুলগাপ্পা
বললো সে—ঝাল কই
এ যে শুধু ধাপ্পা।
পরের মুখেতে ঝাল
খাবো আর কত কাল
নইতো বিশ্বনাথ
আমি গুণ্ডাপ্পা
আমি খেলি পিংপং
মেরে দেবো চাপ্পা!!

ঝানু ছেলে কানু

নারায়ণ দেবনাথ

কিরে, বদ্যা! তোর বলটা দিয়ে লাথালাথি খেলি আয়।

আচ্ছা, কিন্তু বেশী জোরে লাথাবি না বলে দিচ্ছি, কেনো!

এটা কিন্তু জোরে মেরেছিস, কেনো!

গদাম!

উঁফ্!

মর্কটেরা! ধরতে পারলে যেখানে সেখানে বল খেলার মজা টের পাইয়ে দেবো!

বদ্যারে, পালা!

ওঃ! খুব বেঁচে গেছি! খেলাটাই মাটি হয়ে গেলো!

রেডিওতে এখন কি হচ্ছে শোনা যাক।

গত কাল রাত্রে সার্কাস থেকে যে ভালুকটা পালিয়েছিলো তাকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে ওকে ধরতে সাহায্য করবে তাকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে!

এটা আমাকে একটা নতুন খেলার মতলব দিয়েছে!

আমি এই ভালুকের ছাল দিয়ে ভালুক সাজবো!

বাগানে বাবা রয়েছে বাবাকে আমি ভয় পাইয়ে দি!

আমি আমার নতুন ইলেকট্রিকের ঝোপ কাটার যন্ত্রটাকে পরখ করে দেখি!

এটা আবার কিরে?

এই যে, বাবা!

বাহ! তোর জন্যে এই দামী ছালটার কি হাল হয়েছে দ্যাখ্!

মরেচে!

এটা আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো যে,তুই আর খুঁজে পাবি না।

বাহ্ !

দারুণ! আমি মায়ের এই কোটটা দিয়ে ভালুক সেজে খেলবো।

...এই অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন ছাড়া পাওয়া ভালুকটার দিকে নজর রাখেন...

বাবাগো ! সেই ভালুকটা!

ঘোঁয়াৎ!

হতচ্ছাড়া জানোয়ার,দূর হ !

ছপাস !

হতচ্ছাড়া কেনো! বাঁদর কোথাকার! দ্যাখ্ আমার দামী কোটটার কি দশা করেছিস!

এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি!

আমি এই দেয়াল আলমারিটায় লুকিয়ে থাকি... আরে! এইতো ভালুকের ছালটা!

হতভাগাটা আমায় বোকা বানিয়েছে! আমি এখানে রেখেছিলাম নিশ্চয় কেনোটা খুঁজে পেয়েছে!

এই যে বিচ্ছুটা এখানে! এবার আমি ওকে তামাসা করার মজা দেখাচ্ছি!

এই দ্যাখ এবার কেমন মজা লাগে!

ভালুক!

গররর!

ঘোঁয়াৎ!

বন্ধু!

বাঁচাও!

[এর পর ২৯৬(ক) পৃষ্ঠায়]

ঘোষাল মা

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়:

বর্ধমান জেলায় নিশিরাগড় নামে একটি গ্রাম আছে। দেবীপুর স্টেশন থেকে মাইল দুয়েকের পথ এই নিশিরাগড়। আগে এর নাম ছিল নিশিনগর। এই নিশিনগর নামেরও একটা ইতিহাস আছে।

বাংলার বিখ্যাত রঘু ডাকাত যখন পাণ্ডুয়ার বনে দলবল নিয়ে বাস করত, সেই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অনেক চেষ্টা করেও রঘু ডাকাতকে ধরতে না পেরে তার জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। ঘোষণায় বলা ছিল যে কেউ রঘু ডাকাতকে ধরিয়ে দিতে পারবে বা তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকেই পুরস্কারের টাকাটা দেওয়া হবে।

রঘু ডাকাত এই ঘোষণার কথা শুনে দল বল নিয়ে সেই অঞ্চল ছেড়ে পালাল। তারপর বহু বনজঙ্গল অতিক্রম করে দেবীপুরের কাছে এক গভীর জঙ্গলে এসে নিজেদের যখন নিরাপদ মনে করল, তখন রাতারাতি সেই অরণ্যের একাংশের গাছপালা কেটে বসবাসের উপযোগী করে তুলল।

রঘু ডাকাতের দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল খুব। তাই সে পরে কাছাকাছি অন্য একটি গ্রাম থেকে জনা পাঁচেক ব্রাহ্মণকে বহু সোনার মোহর ইত্যাদি উপহার দিয়ে নিজেদের গ্রামে নিয়ে এসে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানালো। রাতারাতি গ্রামটি গড়ে উঠেছিল বলে ব্রাহ্মণরাই সেই গ্রামের নাম দিয়েছিলেন নিশিনগর।

এই নিশিনগর বা নিশিরাগড়ে রঘু ডাকাতের সমসাময়িক কাল থেকে একটি দুর্গোৎসব হয়ে আসছে। এই দুর্গোৎসবের প্রচলন করেছিলেন এই গ্রামেরই ভগবতী ঘোষাল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা আজও বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে 'ঘোষাল মা' নামেই পূজা পেয়ে আসছে। প্রতি বছর শারদোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ করানো হয়। মহিষ হতে উদ্ভূতা অসুরের সাথে যুদ্ধরতা সিংহবাহিনী দুর্গাই 'ঘোষাল মা'। এ অঞ্চলে এই ঘোষাল মাকে নিয়ে একটি বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ ঘটনা প্রচলিত আছে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে ভগবতী ঘোষাল নিশিনগরে সর্বপ্রথম দক্ষ কারিগর দিয়ে প্রতিমা তৈরী করিয়ে দুর্গা পূজার প্রচলন করেন।

মহা ধূমধামে পূজা অনুষ্ঠিত হল।

বিজয়ার দিন হঠাৎ কোথা থেকে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল সেখানে।

সন্ন্যাসী এসে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রতিমার দিকে। তারপর এক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—কে এই প্রতিমার পূজা করেছে?

ঘোষাল মহাশয় সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করে হাত দুটি জোড় করে বললেন—কেন প্রভু?

—আমি জানতে চাই।

ঘোষাল মহাশয় বললেন—আমাদের পুরোহিত করেছেন।

সন্ন্যাসী গম্ভীর গলায় বললেন—মার পূজা হয় নি।

বিস্মিত ঘোষাল মহাশয়ের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। বললেন—সে কি!

চারিদিকে তখন সন্ন্যাসীকে ঘিরে প্রচুর লোকজন।

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন—মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠাই হয়নি তো পূজা গ্রহণ করবে কে?

ভগবতী ঘোষাল ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম ভীরু লোক। সন্ন্যাসীর কথায় ভয় পেয়ে বললেন—আমি তো মায়ের পূজার কোন ত্রুটি রাখি নি প্রভু। দোষ তাহলে পুরোহিতের। আমি কি করতে পারি বলুন?

যে পুরোহিত মায়ের পূজা করেছিলেন, তাঁরও মুখ তখন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর কথা শুনে ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল তাঁর।

গ্রামবাসীরাও বিস্মিত। হতচকিত হয়ে তারা বলল—তাহলে উপায়?

সন্ন্যাসী বললেন—উপায় আছে। তোমাদের মত হলে মায়ের পূজা আমিই করতে পারি।

ঘোষাল মহাশয় তখন গ্রামবাসীদের বললেন—এ ব্যাপারে আপনারাই মতামত দিন।

গ্রামবাসীরা অবশ্য দ্বিমত হল না কেউ। এক বাক্যে সকলেই বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার নতুন করেই মায়ের পূজা হোক।

অনুমতি পেয়ে সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাসীর হাতে একটি সিঁদুর-

রঞ্জিত ত্রিশূল ছিল। সেটি মাটিতে গেঁথে জল শুদ্ধি আসন শুদ্ধি করে সর্বাগ্রে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর দু'চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন তিনি।

চারদিকে তখন ভিড়ে ভিড়।

খবর পেয়ে আশপাশের গ্রাম থেকেও দলে দলে লোক আসতে লাগল। দেবীপুর, শালারপুর, পানপাড়া, ধামাস প্রভৃতি যত গ্রাম ছিল, সব গ্রাম উজাড় করে লোক এলো। সন্ন্যাসীর ক্রিয়া কর্ম দেখতে গ্রামের মানুষদের আগ্রহ অধীর হয়ে উঠল।

এদিকে সন্ন্যাসী সেই যে ধ্যানে বসেছেন, তাঁর আর ওঠবার নামটি নেই। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা দুই-তিন কেটে যাবার পরও যখন সন্ন্যাসীর নড়াচড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন অধৈর্য হয়ে উঠল সকলে।

পুরোহিত ঠাকুরও এবার একটু বুকে বল পেলেন। এতক্ষণ অপমানে মুখ লাল হয়েছিল তাঁর। ক্ষুণ্ণ হয়ে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার মনে একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন—একটা পাগলের কথা শুনে এ আপনারা কি করছেন? প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে যে!

ঘোষাল মহাশয় বললেন—আমি যে কি করব, কিছু তো ঠিক করতে পারছি না। সন্ন্যাসী এখনো ধ্যানস্থ। ওনাকে ডাকেই বা কে? তাছাড়া এ অবস্থায় ওনার ধ্যান ভাঙানোটাও কি ঠিক হবে?

পুরোহিত বললেন—কি যে বলেন? আমার মনে হচ্ছে, ও ব্যাটা একটা বদ্ধ পাগল। কোথা থেকে এসে গোলমাল বাধিয়ে দিল, আর আপনারা এতগুলো লোক সেটাকে বরদাস্ত করলেন! অথচ আমি যে এত কষ্ট করে চার দিন ধরে মায়ের পূজা করলাম, তার কি কোন মূল্যই নেই? ঐ অপরিচিত সন্ন্যাসীর কথাই বড় হল আপনাদের কাছে?

ঘোষাল মহাশয় বললেন—না না না। ব্যাপারটাকে আপনি ওভাবে নেবেন না। আসলে উনি এমনভাবে এসে বললেন, যাতে সবাই আমরা ঘাবড়ে গেলাম। এখন আপনিই বলুন কি করা উচিত?

ঘাড় ধরে উঠিয়ে দিন ব্যাটাকে।

পুরোহিত রাগের মাথায় বললেও ঘোষাল মহাশয় তা পারেন না। তিনি নীরবে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এদিকে গ্রামবাসীরাও তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সবারই মুখে এক কথা 'এ কি রে বাবা।'

কেউ বলল—ব্যাটা ভণ্ড।

কেউ বলল—উন্মাদ। চোখের চাউনি দেখলে না, যেন গিলে খাচ্ছে।

কেউ বলল—আসলে নেশার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে।

অবশেষে সবাই মিলে দারুণভাবে উত্তেজিত করতে লাগল ঘোষাল মহাশয়কে। নিরঞ্জনের সময় পার হয়ে গেলে খুঁত হয়ে যাবে, এমন ভয়ও দেখাতে লাগল অনেকে।

ঘোষাল মহাশয় তবুও আরো ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করলেন। তিনি না পারছেন সন্ন্যাসীকে ঘাঁটাতে, না জনতাকে শান্ত করতে। শেষে বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসীকে ডাকতে লাগলেন—ঠাকুর, উঠে পড়ুন এবার। অনেক সময় পার হয়ে গেছে। লোকজন অধৈর্য হয়ে উঠছে যে?

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

সন্ন্যাসী অটল অনড়।

পুরোহিত বললেন—ওভাবে হবে না। ধাক্কা দিয়ে তুলে দিন।

ঘোষাল মহাশয় তাই করলেন। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে ভয়ে ভয়েই ঠেলে দিলেন একটু।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল অঘটন।

দুলে উঠলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আসনও টলে উঠল। প্রোথিত ত্রিশূলটা পড়ে গেল সশব্দে। দেবীর ঘট পর্যন্ত দুলে উঠল। সন্ন্যাসী ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। রক্তচক্ষুতে ঘোষাল মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—মূর্খ! এ কি করলি তুই? আমি কত আহ্বান করে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর কত কষ্ট করে দেবীকে ঘটে এনেছিলাম, তুই তাকে তাড়িয়ে দিলি?

ঘোষাল মহাশয় স্তব্ধ।

পুরোহিত তো গায়ের জ্বালায় জ্বলছিলেন এতক্ষণ। বললেন—ওসব বুজরুকি অন্য জায়গায় দেখাবে বুঝলে? তুমিই যে দেবীর সত্যিকারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছ, তার প্রমাণ কি?

সন্ন্যাসী রোষকষায়িত লোচনে বললেন—প্রমাণ চাই? দেখবি তবে?

—হ্যাঁ, দেখব।

—এই দেখ। বলেই এক গাছি কুশ প্রতিমার পায়ে বিঁধিয়ে পুরোহিতকে আদেশ করলেন—দেবীর পা থেকে ঐ কুশ মুক্ত করে নে।

পুরোহিতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবুও এগিয়ে এসে চরণে বিদ্ধ সেই কুশটি যেই না তুলে নিলেন, অমনি সেইখান থেকে ধনুকের আকারে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

হইহই করে উঠল সকলে।

বিস্মিত অভিভূত রোমাঞ্চিত জনসাধারণ 'মা-মা' বলে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। 'মা রক্ষা করো, মা রক্ষা করো' রব উঠল চারদিকে।

ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী বললেন—আমার আরো প্রমাণ আছে। দেবীর রক্তপাতে ঘোষাল বংশ নির্বংশ হবে। আর এইখানে যদি কখনো প্রতিমার চক্ষুদান বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা হয়, তাহলে গ্রামসুদ্ধ লোক মহামারীতে শেষ হয়ে যাবে। এই বলে নিমেষের মধ্যে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন, তাঁর সন্ধান কেউ পেল না আর।

এদিকে ঘোষাল মহাশয় তো সন্ন্যাসীর অভিশাপ শোনা মাত্রই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখলেন, লালপাড় শাড়ি পরা একটি ন'বছরের মেয়ে যেন তাঁকে বলছেন 'তুই ভয় করিস না ঘোষাল, তোর ভক্তিতেই আমি এসেছি। আমার চরণে শীঘ্রই স্থান পাবি তুই। আর এই মণ্ডপে আমার প্রতিমার চক্ষুদান যদিও হয়, প্রাণ প্রতিষ্ঠা যেন কখনো না হয়। যদি হয়, তাহলে আমার রক্তের বদলে আমি নররক্ত চাই।'

স্বপ্নান্তে ঘোষাল মহাশয় যখন সম্বিত ফিরে পেলেন, তখন ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বললেন—এ কি স্বপ্ন তুই দিলি মা আমায়? নররক্ত আমি কোথায় পাবো?

চণ্ডীমণ্ডপের ঈশান কোণ থেকে তখন উত্তর এলো—নররক্ত তোকে দিতে হবে না ঘোষাল। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে যে আমার সামনে পড়বে, তারই রক্ত আমি গ্রহণ করবো।

ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে ঠেলে দিলেন একটু। [পৃঃ ১০০

এই দৈববাণী শুধু ঘোষাল মহাশয় নয়, সকলেই শুনতে পেল। কাঁটা দিয়ে উঠল সকলের। এর পর বিসর্জনের পালা। প্রতিমা চতুর্দোলায় চাপিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নিয়ে চলল সকলে। কাছেই ধুলি নদী। সেইখানে বিসর্জন হল।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত করুণ।

পরের বছরই ঘোষাল মহাশয়ের একমাত্র ছেলে মুখে রক্ত উঠে মারা গেল। আর সেই শোকে কয়েকদিনের মধ্যেই স্ত্রীও চলে গেলেন।

ঘোষাল মহাশয় তবুও শারদীয়ায় চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে মায়ের পূজা করালেন। নররক্তের বিকল্প হিসাবে নিজের বুক চিরে রক্ত দিলেন। তারপর তিনিও গেলেন।

তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই ঘোষাল বংশ লোপ পেল। ঘোষাল বংশ লোপ পাবার

পর সিংহবাহিনীর এই পূজার ভার নিলেন গ্রামবাসীরা। বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে আজও এই প্রতিমার পূজা হয়। আজও সেখানে ভগবতী ঘোষালের নামে পূজার সময় সংকল্পও হয়। তবে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণের সময় কেউ আর প্রতিমার সামনে থাকে না। দৈবাৎ যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, সেই ভয়ে সন্ধিপূজার সময়টা প্রতিমার সম্মুখ ভাগ নতুন কাপড় ঢেকে আড়াল করে রাখা হয়। এই দিন ঘোষাল মায়ের আঙিনায় দারুণ উৎসব জমে ওঠে। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেরাও ছুটে আসে এই সুপ্রাচীন দুর্গোৎসব দেখতে।

মণি ও মুক্তা
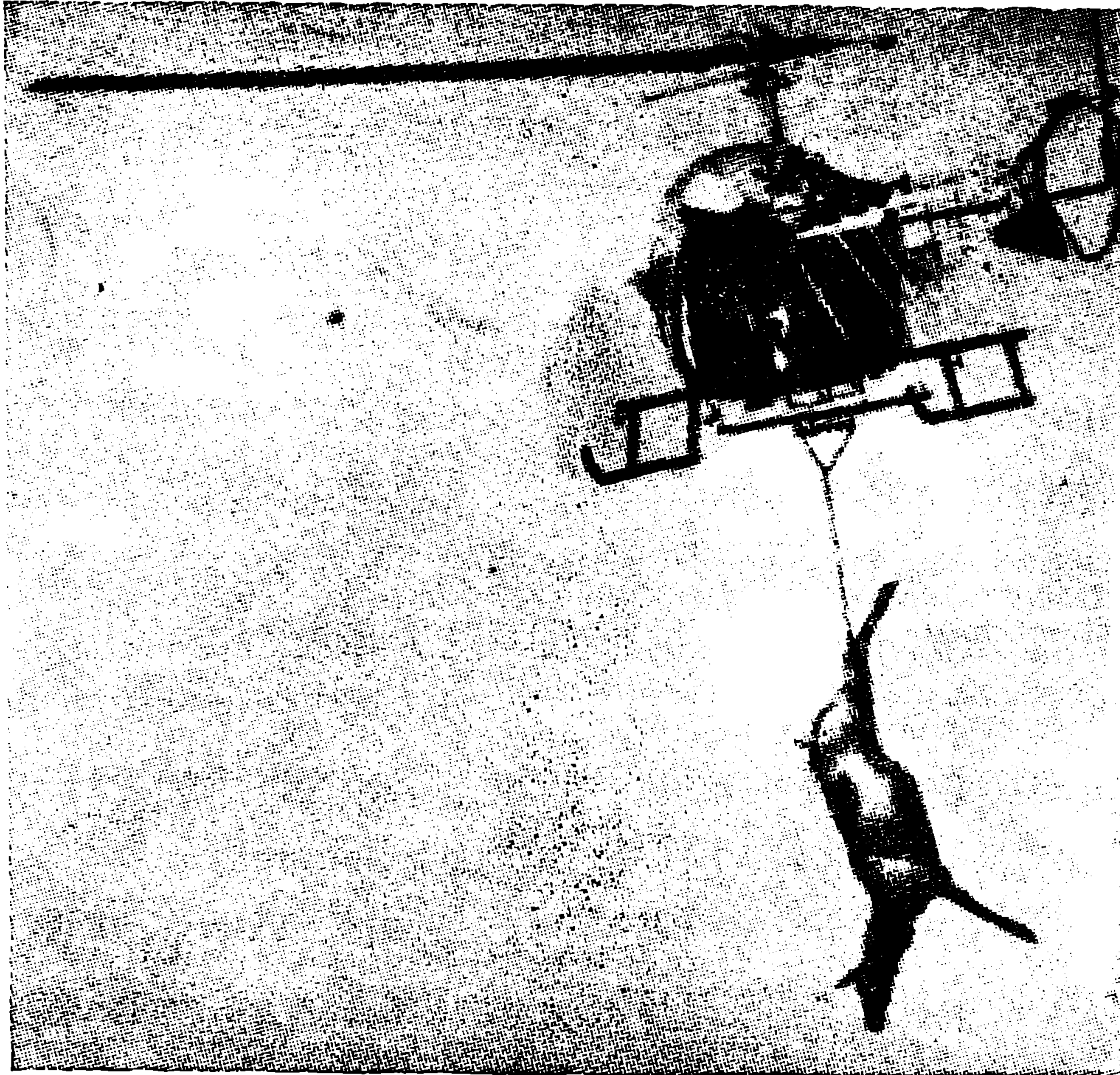
গভীর পর্বতসঙ্কুল অরণ্যে আহত এক ঘোড়াকে হেলিক্যাপ্টারের সাহায্যে কাছাকাছি এক হাসপাতালে কি অদ্ভুতভাবে নিয়ে যাচ্ছে দেখ !

উর্দি দেখানোর অভিযান

[আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "এ ওয়ে ইউ উইল নেভার বী" অবলম্বনে]

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

এই মাঠখানা! লড়াইটা এই মাঠ বরাবরই হয়েছিল বটে। স্যাঙ্গাতরা যে মাঝে মাঝেই চোট খেয়েছে ভাল রকম, চিহ্ন তার স্পষ্ট, চোট খেয়েছে মেশিনগানের। রাস্তার প্রতিটা নামাল অংশ থেকে। এদিকে ওদিকে ছড়ানো প্রতিটা খামারবাড়ি থেকে। চোট খেয়েছে ক্রমাগত, যাবৎ না পৌঁছোতে পেরেছিল শহরের অন্দরে।

শহরে ঢুকে তখন নিশ্চিন্দি। জনপ্রাণী নেই সেখানে। গোটা শহর পেরিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত এগিয়ে গেল ইতালীয়রা, দর্শন পেলো না একটাও অস্ট্রিয় সৈনিকের।

বাইসিকেলে আসছে নিকোলাস এ্যাডামস্। কখনও তাতে চেপে, কখনো তাকে ঠেলতে ঠেলতে। রাস্তায় আর রাস্তা নেই। অনেক জায়গাতেই নেই, সেখানে কাজেই "উল্‌টো বুঝলি রাম"। এ্যাডামস্ আর সেখানে চাপতে পারছে না গাড়িতে, তারই কাঁধে চাপছে গাড়ি।

যা হোক, যেভাবেই হোক, রাস্তা বেয়েই আসছে নিক এ্যাডামস্। আর সে রাস্তায় যত্রতত্র চোখে পড়ছে লাশের পরে লাশ। কোথাও একটা, কোথাও এক গাদা। ইতালীয় বই কি! প্রায় সবাই তারা ইতালীয়। তাদের পকেটগুলো ওলটানো। মাছির ভনভনানি তাদের ঘিরে।

মাছির মতই সুপ্রচুর আর একটা জিনিস, লাশগুলোর আশেপাশে। তা হল কাগজ। নানা ধরনের ইস্তাহার। প্রার্থনার বই। দলবদ্ধ ফটো। মেশিনগান ঘিরে গোলন্দাজেরা দাঁড়িয়ে আছে বিকশিত দন্তে, তারই ফটো, খুশীতে ডগমগ যেন ওরা, যেন যুদ্ধে ওরা যাচ্ছে না, যাচ্ছে ফুটবলের ম্যাচ খেলতে। বেশী দিনের ফটো নয়, হয়ত গত হপ্তাতেই তোলা হয়েছিল। আর এ হপ্তায়? ঐ যে তারা পথের ধুলোয় বা মাঠের ঘাসে পড়ে আছে। অষ্টাবক্র হয়ে। ফুলে ঢোল হয়ে। যে রোদ্দুর! আর দুই একদিন যদি ওরা পড়ে থাকে এইভাবে, এ পথে মানুষ চলতে পারা দূরে থাকুক, এখানকার আকাশ দিয়ে পাখিও চলতে পারবে না, অবশ্য শকুন ছাড়া।

ইস্তাহার? হরেক বয়ানের। চাষী মেহনতীদের লোভানি দিয়ে পল্টনে টানবার চেষ্টা। লুটপাটের লোভানি। পাপের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শতেক সুযোগের লোভানি। ইস্তাহারে রসালো ঝাঁজালো বয়ান শুধু নয়, ততোধিক রসালো ঝাঁজালো ছবিও আবার।

চিঠি? দুই চারখানা চিঠি প্রতি সৈনিকের লাশের পাশে। মায়ের আর বৌয়ের চিঠিই বেশী, বন্ধুর চিঠিও কালে-কস্মিন। খামের ভিতর কারও বা প্রিয়জনের ছোট্ট ফটো।

পড়ে আছে লাশগুলোর পাশে পাশে। ছত্রাকার।

নিক এ্যাডামস্ ভাবনায় পড়েছে। দীর্ঘপথে অস্ট্রিয় সৈনিকের মৃতদেহ সে দেখতে পেয়েছে কুল্যে তিনটি। তার মানে কি এই যে শহর রক্ষার চেষ্টা তারা বিশেষ কিছুই করে নি? অবশ্যই তাই। শহরটা মিত্রশক্তির হাতে এক রকম বিনা যুদ্ধেই সঁপে দিয়েছে অস্ট্রিয়া, তার পল্টন সরিয়ে নিয়েছে—

কোথায়? সম্ভবতঃ দানিয়ুবের ওপারে।

যা কিছুই তারা করে থাকুক, এক্ষুণি জানতে পারবে নিক। পথ খোলা, ড্যাং-ডেঙ্গিয়ে চলে যাও শহর পেরিয়ে। সাইকেলে নয়, পায়দলে। শহরের ভিতর রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা নয়, সেদিক দিয়ে অসুবিধা কিছুই হত না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে নিকের নিজেরই মাথাটার দরুন। টনটন করছে, দপদপ করছে। ঘুরে যাচ্ছে বোঁ করে। টাল সামলাতে বেগ পাচ্ছে নিক। এ অবস্থায় একটা লাঠিসোটায়, নিদেনপক্ষে তরোয়ালে ভর দিয়ে পায়ে হাঁটা চলতে পারে কায়ক্লেশে, সাইকেলে চাপতে গেলে মুহূর্ত মধ্যে সশব্দ পতন অনিবার্য।

এই রোদ! ত্রিভুবন পুড়িয়ে দেবার জন্য যেন ক্ষেপে উঠেছে ঐ সূর্যটা। নিকের আবার আগাগোড়া সামরিক উর্দি পরনে, মার্কিন উর্দি। মাথায় জবরজঙ্গ শিরস্ত্রাণ।

নিখাদ ইস্পাতের। মাথায় চাপাবার আগে তাতে ভাঁজে ভাঁজে কাপড় জড়াতে হয়েছে, ভিজে কাপড়। তবু মাথাটা—

উঃ, তবু পোড়া মাথা টনটন করছে, দপদপ করছে, বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছে আচমকা। টাল সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে নিকের।

না বাবা সাইকেল, আপাতত তোমাকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় নেই। থাকো তুমি এই নদীর ধারের নীচুপানা হলদে বাড়িটার বারান্দায়। ছাউনিতে পৌঁছে একটা রানার পাঠিয়ে দেব এখন, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

উঃ, তবু এই নিমকহারাম মাথা তকলিফ দিচ্ছে নিদারুণ। হেলমেট খুলে ফেলেছে নিক, সেটা এখন পিঠের ঝোলায়। কিন্তু ইতালীয় ছাউনিতে ঢোকার আগেই সেটা পরে নিতে হবে আবার। তার এ অভিযানে আসাই তো ইতালীয় সৈনিকের মার্কিন সামরিক উর্দির চেহারা দেখাবার জন্য!

কিন্তু মাথাটার হল কী?

এ কি সেই—সেই—আর্থার—রাজার আমলের সেই অসহ্য ব্যথাটার পুনরাক্রমণের পূর্বাভাস নাকি? তা যদি হয়—সর্বনাশ! সে যন্ত্রণার কথা মনে হলে এখনও যে হৃৎকম্প হয় নিকের! ভগবান রক্ষা কর।

দেখতে দেখতে যাচ্ছে নিক। শহর রক্ষার চেষ্টা সামান্যই করেছিল অস্ট্রিয়ানেরা। গোড়া থেকেই যেন তাদের মতলব ছিল নদী পেরিয়ে ছাউনি ফেলার। গড়খাই হিসাবে অত বড় নদীটাকে পাওয়া একটা যে খুবই বরাতের কথা, তাতে আর সন্দেহ কী!

দেখতে দেখতে যাচ্ছে নিক। বাড়িঘর গোলার ঘায়ে ভাঙ্গাচোরা। পথঘাট ইট-কাঠ পলেস্তারা ধুলো বালিতে আকীর্ণ। দেয়ালে দেয়ালে ফুটো। সব ফুটোর মুখে হলুদ ছোপ। ও ছোপ সর্ষে-গ্যাসের। যত্রতত্র ফাটা গোলার টুকরো। শ্র্যাপনেল থেকে ঠিকরে বেরুনো বুলেট। মিশে আছে আবর্জনায়। মানুষ? শহর শূন্য।

মানুষ? ফর্নাসি থেকে বেরুনোর পরে জ্যান্ত মানুষ একটাও চোখে পড়ে নি এ যাবৎ। তবে হ্যাঁ, মানুষ না দেখলেও বন্দুকের নল অনেক দেখেছে নিক। রাস্তার বাঁ দিক বরাবর ঐ যে একটানা তুঁতঝাড়গুলো, ওদেরই ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে। চোখে পড়ার কথা নয়, তবু পড়েছে। কারণ, রৌদ্রদগ্ধ ইস্পাত থেকে একটা তাপতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় শূন্যপানে, কানা যে নয়, তার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

নিক এ্যাডামস্ শহরের এ প্রান্ত দিয়ে ঢুকল, ও প্রান্ত দিয়ে বেরুলো। শহর একদম পরিত্যক্ত, জনপ্রাণী নেই। একটা নামাল রাজপথ, তার নীচেই নদীজলের উদার বিস্তার। সে জলও পরিত্যক্ত। একখানা ডিঙ্গিও ভাসছে না তাতে।

আগে থেকেই শোনা ছিল নিকের, ইতালীয়দের ছাউনি পড়েছে নদীতীরের একটা খোলা মাঠে। ছাউনি? সারি সারি গর্ত শুধু। সেই গর্তের তলায় কাদায় ঢাকা বাঁশ-খড়ের আচ্ছাদনের নীচে কয়েকটা করে মানুষ।

এ্যাডামস্ চলেছে তো চলেইছে। কাদায়-কাদা নদীতীরের একটা বাঁক ঘুরতে তবেই তখন মুখোমুখি তার দেখা হয়ে গেল একটা দাড়িওয়ালা তরুণের সঙ্গে। দাড়িগুলো শখের দাড়ি নয়। হপ্তাখানেক না কামানোর দরুন অযত্নে বর্ধিত খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

হাতের বিল্লা থেকে ছোকরার পরিচয় জানা যাচ্ছে, ও জনৈক সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট এ-বাহিনীর। টকাস্ করে ও পিস্তল বাগিয়ে ধরল—"কে তুমি?"

পরিচয় দিল নিক এ্যাডামস্।

"কী করে জানব, তুমি সত্যি বলছ?

পরিচয় পত্র দেখালো নিক, তাতে তৃতীয় পল্টনের সীলমোহর। নিজের ফটো দেখালো, স্টীল তাতেও। লেফটেনাণ্ট সেগুলি দখল করল—"আমি নিয়ে নিচ্ছি এসব।"

"মোটেই না"—বলল নিক—"ফেরত দাও ওসব, আর ঐ পিস্তলটা পুরে ফ্যালো পকেটে।"

"এসব যে জাল নয়, তার প্রমাণ কী?"

"বোকার মত কথা কইছ তুমি। শোনো, ক্যাপ্টেন পার্ভাসিনি বলে কাউকে চেনো? খুব লম্বাটে? খুব ছোট গোঁফ? বাড়িঘরের নকশা করতেন আগে? ইংরেজী বলতে পারেন?"

পালটা জেরা করে লেফটেনাণ্ট—"তুমি তাঁকে চেনো না কি?"

"এই, মোটামুটি।"

"বল তো, কোন্ কোম্পানীর ক্যাপ্টেন?

"দ্বিতীয়।"

"তাই ছিলেন বটে। এখন কিন্তু গোটা ব্যাটালিয়নেরই তিনি অধিনায়ক।"

"সুখবর"—বলল নিক—"তাহলে তুমি এইবার তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার আমায়।" পার্ভাসিনি বেঁচে আছে, এইটাই সুখবর নিকের কাছে। ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হওয়া যে কপালে জলের তিলক পরা, তা সে জানে। এই আছে, এই নেই।

এই লেফটেনাণ্ট ছোকরা! এ্যাডামস্-এর মাথার দপদপানিটা ডবল বাড়িয়ে দিলে ও। কী উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ওর দু' চোখে! কী টকটকে লাল দুটো বৃত্ত সেই দু'চোখ ঘিরে! কানের কাছে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে গোলা ফাটলেও তো মানুষের চেহারা অমন হওয়া উচিত নয়! আর এই ছাউনিতে—ছাউনিই বা বলি কেন, শহরে ঢোকার পর থেকে একটা শ্র্যাপনেল ছাড়া অন্য কিছুরই তো আওয়াজ পায় নি নিক।

ই-ই-স্! অমন ভয়কাতুরের হাতে ঐ পিস্তল? বিপদের কথা নিক এ্যাডামস্-এর। সে বারবার অনুনয় করছে—"পিস্তলটা পকেটেই রাখো বৎস! দুশমন তো অত-বড় চওড়া নদীটার একদম ওপারে!"

"কী করে রাখব পকেটে? এক্ষুণি হয়ত তুমি দৌড়ে পালাতে যাবে! তখন তো গুলি চালাতেই হবে আমায়!"

"চ-লো বাবা! ঝটপট তাহলে পার্ভাসিনির কাছেই চল।"

পার্ভাসিনি আসলে ক্যাপ্টেন ছাড়া কিছু নয়। অমন ক্যাপ্টেন অন্তত দুই ডজন থাকে একটা ব্যাটালিয়নে। সেই ব্যাটালিয়নের নায়কত্বে যিনি থাকেন, তাঁর পদবী হওয়া উচিত কর্নেল, নিদেনপক্ষে মেজর। এখন এই যে ব্যাটালিয়নটা, লড়াইয়ে লড়াইয়ে ক্ষয় হতে হতে এটার সৈন্যবল এমন একটা লঘিষ্ঠ সংখ্যায় পোঁছেছে যে এর খবরদারির জন্য কর্নেল তো দূরের কথা, একটা ওয়াকিবহাল মেজরও মোতায়েন করতে নারাজ উপরওয়ালারা। তাই বেছে বেছে, ক্যাপ্টেনদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে পুরনো, তাঁকেই গছিয়ে দিয়েছেন পরিচালনার দায়িত্ব, সাময়িকভাবে মেজর পদবীতে ভূষিত করে। সেই লোকই হচ্ছেন পার্ভাসিনি, নিক এ্যাডামস্-এর আলাপী এবং মুরুব্বি।

টকাস করে ও পিস্তল বাগিয়ে ধরল—"কে তুমি?" [পৃঃ ১০৬

এ্যাডামস্ দেখল, অস্থায়ী প্রমোশনের কল্যাণে পার্ভাসিনি মানুষটা আগের চেয়েও রোগাটে হয়ে গিয়েছে। ভাঙ্গা চোয়াল ফুঁড়ে সযত্নে-অভ্যাস-করা ইংরেজীয়ানা ভাবটা আগের চেয়েও যেন বেশী বেশী প্রকাশ পাচ্ছে ওর। গর্তের মধ্যে টেবিল পেতে আফিস বসিয়েছেন অস্থায়ী মেজর। সেই টেবিলের এধার থেকে, ওধারে অধিষ্ঠিত মেজরকে স্যালিউট দিল নিক এ্যাডামস্।

"আরে, আরে,"—বললেন পার্ভাসিনি—"তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না হে! এ উর্দিটা অঙ্গে চড়িয়েছ কোন্ গরজে?"

"চড়িয়ে দিলে ওরা—তা লড়াইটা লড়লে কেমন?"

"দেখবার মতন হে, দেখবার মতন। সত্যি বলছি, ভারী স্টাইলমাফিক হয়েছিল। এই যে! এক আঁচড়ে বুঝিয়ে দিই এসো।"

দেয়ালে ম্যাপ ঝুলছে। তারই উপর দিয়ে আঙ্গুল ঘষে ঘষে নিক এ্যাডামস্‌কে

বোঝাতে শুরু করে দিলেন মেজর। সেই পিস্তলধারী দাড়িওয়ালা লেফটেনাণ্ট ততক্ষণে কেটে পড়েছে ব্যাপার-স্যাপার দেখে।

পার্ভাসিনি প্রমুখাৎ প্রকৃত ঘটনার একটা পরিমার্জিত (না, না, অতিরঞ্জিত নয়) বর্ণনা নীরবে শুনে শেষ করার পরে নিক শুধু বলল—"আমি তো ফর্নাসি থেকেই আসছি। কীভাবে কী হয়েছিল, পরিবেশ দেখে আন্দাজ করেই এসেছি খানিকটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারিফ করতে হয় বই কি! তোমার হাতের কাজ, ওর ট্রেড মার্কই আলাদা। সেই নিরানব্বুই সালে দৈনিক দেখেছি তো!"

"আহা, সেই নিরানব্বুই সাল। কী দিনই ছিল তখন! তা তুমি কি আবার পল্টনে এলে নাকি? মাথার সেই ব্যামোটার ইতিহাস চেপে গিয়েছ বুঝি?"

"না, না, দুই প্রশ্নেরই এক উত্তর—'না।' আমি পল্টনেও ঢুকি নি, চেপেও কিছু যাই নি। ওরা আমায় ডেকে এনে এই উর্দিটা পরিয়ে দিলে খামোকা। বললে—"ত্রিভুবনে এই উর্দি দেখিয়ে বেড়ানোর পবিত্র দায়িত্ব আজ থেকে তোমার।"

পার্ভাসিনি কি বোকা, না ন্যাকা? কিছুই যেন বুঝল না। "সে আবার কী কথা? উর্দি দেখিয়ে বেড়ানো? কাকে? কেন?"

"ছাউনিতে ছাউনিতে মিত্রশক্তির যত জোয়ান আছে, সবাইকে। কেন জিজ্ঞাসা করছ? জোয়ানদের উৎসাহের দরিয়ায় ভাঁটার টান শুরু হয়েছে, না? একটা মার্কিন উর্দি নিজেদের মধ্যে দেখতে পেলে সে দরিয়ায় আবার ষাঁড়াষাঁড়ির বান বইবে তৎক্ষণাৎ। আশার আলো ফুটবে হতাশ প্রাণে। সবাই ভাববে, একটা মার্কিন সৈনিক যেখানে এসে গিয়েছে, এক মিলিয়নও এল বলে। আমিও অবশ্য এমনভাবে বাতচিত আওড়াব, যাতে সেইরকম না ভেবে উপায় থাকবে না তাদের।"

"কিন্তু তোমার ওটা যে মার্কিন উর্দি, তা জানছে কে?"

"সেটা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তোমার।"

"আমার? ঠিক আছে। একটা কর্পোরাল দেব তোমাকে। তোমার যা বলবার, তুমি বলবে জোয়ানদের। জোয়ানেরা যাতে সে সব বিশ্বাস করে, সেটা দেখবে সেই কর্পোরাল।" এতক্ষণ বেশ গম্ভীরভাবেই কথা কইছিল পার্ভাসিনি, হঠাৎ সে হেসে ফেললো ফিকফিক করে—"কৌশলটা মন্দ নয়। কথায় আছে না—All is fair. In love and war! (কিছুই সেথা নিন্দের নয়। ব্যাপার যেথা রণ বা প্রণয়)। তা এও এক রকম রণকৌশল বই কি! তবে কী জান? (পার্ভাসিনি আবার গম্ভীর) ধাপ্পা-ধুপ্পির ব্যাপারে তোমার মাথা আজকাল বেশ খেলছে তো? মানে, সেই যে সেই পুরনো মাথার ব্যামোটা তোমার, যা কোনমতেই সারে না দেখে নিরানব্বুই সালে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম কপাল ফুটো করে মাথার ঘিলুতে হাওয়া ঢোকাতে।"

টুকটুক করে খানিক আফশোষব্যঞ্জক আওয়াজ করল নিক। তারপর জবাব দিল —"পাঁচ সাঙ্গাৎ মিলে আমায় দিলে না তো সে পরামর্শ নিতে! তারা ফতোয়া দিলে—"সাধারণ অসুখ, অত অসাধারণ চিকিৎসা না করলেও সারবে। সে ফতোয়া না মানাই

উচিত ছিল আমার। অসুখ কমে গিয়েছিল ঠিকই, এক রকম বলাই যায় যে সেরে গিয়েছিল, কিন্তু আজ এই রোদ্দুরে আসতে আসতে মাথার ভিতর যা যন্ত্রণা হচ্ছিল—তরোয়ালে ভর দিয়ে টলতে টলতে পথ চলেছি আমি। সাইকেলখানা নদীর ধারে পড়ে আছে, তাতে উঠে বসার মুরোদ হয় নি।”

“এঃ হে-হে!—তুমি খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর খানিকটা। ঐ যে মাচা! ওটা তুমি অনায়াসে দখল করতে পার। এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে তারপর যদি উর্দি দেখানোর অভিযানে বেরোও, চাই কি এমন কিছু হয়ত জোয়ানদের বলতেও পারবে, যা শুনে তারা অট্টহাসি হেসে উঠবে না তোমার মুখের উপরে।”

পার্ভাসিনি উঠে পড়ল, তার হাজার কাজ। নিক একবার উপর পানে তাকালো, আকাশটা জ্বলছে যেন। জ্বলছে তার মাথার ভিতরটাও, ঠিক যেভাবে জ্বলত সেই কুড়ি বৎসর আগে। সত্যিই কি পুরনো মাথার ব্যামোটা ফিরে এল আবার? ঠিক যখন একটা বড় রকম দায়িত্ব তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে বিপন্ন মিত্রশক্তি? কী দুর্দৈব, দেখ দেখি!

পার্ভাসিনি বেরিয়ে পড়েছে। নিকও মাচায় আশ্রয় নিয়েছে। ঘুম হয় যদি, ভাল। নাও যদি হয়, এই মাটির তলার ঠাণ্ডা ঘরে দু'ঘণ্টা বিশ্রাম করতে পারলেও দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। মাথাটা—এঃ, সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ঐ পার্ভাসিনি—ও কোথায় ছিল এই কুড়িটা বচ্ছর? ওই না পরামর্শ দিয়েছিল, মাথা ফুটো করে ভিতরে হাওয়া ঢোকাতে? পরামর্শটা নেওয়া হয় নি। নিলে হয়ত আজ আবার এমন দপদপ করত না মগজের ভিতর, চিন্তার ধারা পাক খেতে খেতে পাতালে ঢুকতে পারত না।

বেশ ঘুমোলো নিক। যদিও সে ঘুম শান্তির ঘুম নয়। স্বপ্ন দেখলো, মাঠের ভিতরকার সেই অষ্টাচক্র মড়াগুলো উঠে এসেছে এক একটা তুরপুন হাতে করে। বলছে—“তোমার মাথাটা ফুটো করে দিই এসো, ঘিলুতে হাওয়া ঢুকলে সব যন্ত্রণা সেরে যাবে।”

নাছোড়বান্দা মড়ারা তুরপুন হাতে নিয়ে ঘিরে ধরেছে নিককে, নিক ধড়মড় করে উঠে বসল। সত্যিই তার মাচার পাশে পাশে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে, নয়? তবু ভাল। মড়া নয় এরা। জ্যান্ত মানুষই বটে। গর্ত ভর্তি মানুষ। উর্দি আছে সকলের পরনে। একজনের উর্দিতে বিল্লা আবার। এ্যাডজুটাণ্ট অর্থাৎ ব্যক্তিগত সহকারী ঐ মেজর পার্ভাসিনির।

সেই শিরস্ত্রাণটা! মাঠের রোদ্দুরে যখন গরম হয়ে গেল ভিজে কাপড়ের ঢাকনা সত্ত্বেও, সেটা খুলে ঝোলায় রেখেছিল নিক। ছাউনিতে ঢোকার সময় বার করতে হয়েছিল ঝোলা থেকে, ভিজে কাপড় থেকে মুক্ত করে মাথাতেও পরতে হয়েছিল। এখন এই যে তার শিয়রেই রয়েছে সেটা, শোবার সময় খুলতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই।

আবার পরতে হচ্ছে। উর্দি দেখানোর জন্যই তার আসা। শিরস্ত্রাণ তো একটা বিশিষ্ট অংশ উর্দির।

শিরস্ত্রাণ মাথায় পরছে নিক। কিন্তু শিরস্ত্রাণ চাপালেই কি ঠাণ্ডা হবে মাথা? ভিতরে যে টগবগ করে ফুটছে তার ঘিলু। সেই বিশ বছর আগের সেই অতি পরিচিত যন্ত্রণা। তবু England expects that everyone will do his duty. কে বলেছিল? নেলসন? না, নেপোলিয়াঁ? যেই বলুক, ব্যক্তির চাইতে বাণীর মর্যাদা বেশী। England expects—ইত্যাদি। নিক এ্যাডামস্ অবশ্য ইংরেজ নয়, মার্কিন। মার্কিনরা অবশ্য এখনও এ-লড়াইয়ে ভিড়ে নি। কিন্তু ভিড়েছে ইংরেজেরা। কাজেই, মধু অভাবে গুড় যেমন সমাদরের বস্তু, মার্কিনের অনুপস্থিতিতে ইংরেজ তেমনি মনিব পদবাচ্য। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের প্রত্যাশার অনুযায়ী—

মাথা থাকুক আর গোল্লায় যাক—কর্তব্য করবেই নিক। উর্দি দেখাতে এসেছে, দেখাবেই উর্দি। যাকে সমুখে পাবে, তাকেই দেখাবে। এই একটা এ্যাডজুটাণ্ট, ঐ দুটো তিনটে সিগন্যালার মন্দ কী? এদের দিয়েই তো দিব্যি কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে!

গলায় একটা খাঁকারি দিয়ে নিক শুরু করল—"ভাই সব! কাজ শুরু করার আগে তোমাদের হাতে হাতে কিছু কিছু উপহার সামগ্রী ধরিয়ে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু শহর পরিত্যক্ত, চকোলেট বল আর চুরুট বল, 'ফর লাভ অর মানি', নগদ দাম দিয়েই হোক আর ভালবাসার খাতিরেই হোক, এ শহরে আজ মেলানো অসম্ভব। তাই, ওটা তোমরা ক্ষ্যামাঘেন্না করে নাও, আমি যা বলছি, শোনো মন দিয়ে।"

এ্যাডজুটাণ্ট গায়ে পড়া হয়ে জানিয়ে দিল—"মেজর এক্ষুণি আসছেন।"

"মেজর জানেন আমি কী বলব। কাজেই তাঁর জন্য অপেক্ষা না করলেও ক্ষতি নেই। সময় মূল্যবান। ব্লুকার সময়মত এসে পড়েছিলেন বলেই ওয়েলিংটন জিতেছিলেন ওয়াটার্লুতে। আমিও এসে পড়েছি ঠিক সময়েই, আপনাদের যুদ্ধজয় অনিবার্য। এই যে দেখছেন উর্দিটি আমার পরনে, এ হল মার্কিন বাহিনীর উর্দি। চমৎকার, না? যদিও, ফ্লোরেন্স-এর সব সেরা দর্জি যে স্প্যাগলোনিও, সেও হুবহু নিখুঁত জিনিসটি পারে নি করতে।"

একটা চাপা হাসি শ্রোতাদের ভিতরে। মাথায় গোলমাল যদিও, তবু সাধারণ বুদ্ধি এখনও একেবারে লোপ পায় নি নিকের, ও হাসি কানে তোলা যে সমীচীন হবে না এই মুহূর্তে, তা চট করে তার মাথায় এসে গেল। সত্যিই দারুণ গলদ হয়ে গিয়েছে ইতালির দর্জি স্প্যাগলোনিওর নাম করা।

না, ওরা সব হাসুক আর ঢিল মারুক। নিক এ্যাডামস্ নিজের কাজ ভুলবে না। সে বলে যাচ্ছে—"আমি স্বীকার করেই নিচ্ছি, খাঁটি মার্কিন উর্দি হয় নি এটা। তবু আদল আছে, শতকরা নব্বই ভাগই উতরেছে, বলা যায়। তা, নব্বুই ভাগ না হয়ে ষাট ভাগ হলেই বা তোমাদের অসুবিধে কী হত? বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু। কাঠের বেড়াল রেখে দাও মেঝেতে, ইঁদুর সব ঘেঁষবে না সে ঘরে। হ্যাঁ, এই উর্দি। একে মার্কিন উর্দি বলে মেনে নাও যদি একবার, এটাও তার পরে তোমাদের বিশ্বাস করতে আটকাবে না যে এই রকম উর্দিপরা (অবশ্য সে সব উর্দি মার্কিন দেশেই বানানো) কয়েক মিলিয়ন

মার্কিন জোয়ান অস্ট্রিয়ার এই পাহাড়ে জঙ্গলে দুই-চার দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তোমরা।

"বলেন কী? এইখানে? কয়েক মিলিয়ন?"—ঘোরতর সন্দেহের সুর এ্যাডজুটাণ্টের কথায়।

"নিশ্চয়। পাঁচ মিলিয়ন অন্তত। ইয়া ইয়া জাঁদরেল চেহারার মার্কিন। এই তো আমায় দেখছ? নিতান্ত পুঁচকে চেহারা নয়। যারা আসছে, তারা আবার আড়ে-দীর্ঘে আমারও ডবল জনে জনে। তাদের স্বাস্থ্য যেমন অটুট, মনও তেমনি নিষ্পাপ। রাত্রে ঘুমোয় তারা, শুঁড়িখানায় গিয়ে হল্লা করে না। ভগবান তাদের ভালবাসেন। কখনো তারা জখম হয় নি যুদ্ধে। গোলার মুখে উড়ে যায় নি। মাথা ছাতু হয়ে যায় নি। বললে না পেত্যয় যাবে, তাদের মধ্যে অনেকের ক্যানসার রোগটাও হয় নি কোনদিন। আশ্চর্য সব মানুষ। দুটো দিন সবুর কর, চোখেই দেখতে পাবে তাদের।"

এ্যাডজুটাণ্ট হঠাৎ একটা টিপ্পনী কাটল—"তুমি ইতালির লোক, না?"

"না, না, আমেরিকান। উর্দি দেখছ না? তৈরী ইতালিতেই অবশ্য, কিন্তু মার্কিন উর্দি, তাতে তো আর ভুল নেই!"

"আমেরিকার কোন্ দিকে বাড়ি? উত্তরে? না দক্ষিণে?"

"উত্তরে"—বড় সন্দিগ্ধ এই এ্যাডজুটাণ্ট লোকটা। নিক অস্বস্তি বোধ করছে। আর অস্বস্তি যত বাড়ছে, মাথার ভিতর টগবগানিও বাড়ছে তত।

"মার্কিন, কিন্তু ইতালির ভাষায় কথা তো কইছ চমৎকার?"

"সেটা কি অনধিকার চর্চা আমার পক্ষে?"

"ইতালির মেডাল তোমার বুকে—"

"মেডাল নয়। শুধু ফিতে। মেডাল আসছে পার্সেলে। মিলানের দোকানে অর্ডার দিয়েছি। তোমার মন চায় যদি, তুমিও আনিয়ে নাও দু' একটা। যুদ্ধে যদি টিকে থাক কিছুদিন, না আনিয়ে যাবে কোথায়? মেডালহীন সৈনিক কি আবার সৈনিক না কি?"

"আমি আনাড়ী নই," বুক চিতিয়ে বলছে এ্যাডজুটাণ্ট, "ইরিত্রিয়ায় লড়েছি, লড়েছি ত্রিপলিতে।"

"ওরে ববাপ! তা হলে তো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার হাতে হাতে স্বর্গলাভ হয়ে গেল বলুন!"

এ্যাডজুটাণ্ট আর বিরক্তি চাপতে পারল না—"এখানে কী কর্মে এসেছেন আপনি?"

"কর্ম? এই মার্কিন উর্দির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। গলায় একটু আঁটো বটে, তবু মিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন পরছে তো অম্লান বদনে। মিলিয়ন মিলিয়ন! বুঝলেন? ধারণা করতে পারলেন? পঙ্গপালের ঝাঁকেও অত পঙ্গপাল দেখেন নি কখনো। ভাল কথা! ফড়িংও যে এক জাতীয় পঙ্গপাল, তা আপনারা জানেন না বোধ হয়? ফড়িং, মশাই, ফড়িং! যে প্রাণীকে আমরা ফড়িং বলি মার্কিন দেশে, সেই প্রাণীটাই। আসলে ওটাও একরকম পঙ্গপাল। সত্যিকার ফড়িং হল আকারে ছোট, রং তার সবুজ।

কমজোরী দুব্‌লাও বটে। একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন। ঝিল্লির সঙ্গে আবার গুলিয়ে ফেলবেন না ফড়িংকে। সাত বছর বাঁচে ঐ ঝিল্লিগুলো। ক্রমাগত একটা বিটকেল আওয়াজ করে, যা এক্ষুণি বার করতে পারছি না গলা দিয়ে। পারলে বুঝতেন, কী বিটকেল সে আওয়াজ। শুধু সে আওয়াজ কেন, কোন রকম আওয়াজই আমি আর আপাতত পারছি না গলা দিয়ে বার করতে। যদি আপনারা আমার বক্তব্যটা বুঝে নিয়ে থাকেন, তাহলে অনুমতি করুন, আমি এইখানেই শেষ করি আমার ভাষণ।"

"আপনি চোট-টোট খেয়েছিলেন না কি? এই ধরুন, মাথায়?" জিজ্ঞাসা করল এ্যাডজুটান্ট—"মাথার ভিতর সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায় না-কি সময় সময়? এই ধরুন, কড়া রোদে অনেকক্ষণ ঘুরলে?"

একটা রানারকে বলল চুপিচুপি—"মেজরকে গিয়ে বল, তাঁর অতিথি ঠিক সুস্থ বোধ করছেন না।"

ওদিকে নিক এ্যাডামস্‌ এ্যাডজুটান্টের কোন কথাতেই কান দিচ্ছে না, উপস্থিত সর্বসাধারণের দিকে দরাজভাবে হাত নেড়ে নিবেদন করছে—"আমার যা করার ছিল, তা করেছি। যা বলার ছিল, বলেছি। কেউ যদি তা না বুঝে থাকেন, বলুন। প্রশ্ন করে করে জেনে নিন। এই বেলা। আমি চলে যাব এইবার, তারপর কে আর বুঝিয়ে দেবে আপনাদের? কী বলছেন? সবাই সব বুঝেছেন? তা হলে এইবার আমি শেষ করব। শেষ করার আগে অবশ্য স্যার হেনরি উইলসনের সেই লাখ কথার এক কথাটি আপনাদের একবার না শুনিয়ে পারছি না। কী? শুনেছেন সেকথা? শোনারই কথা। তবু আর একবার শুনুন। ভাল কথা, যতবার শুনবেন, ততবারই ভাল লাগবে। কথাটা এই—"হয় তোমরা অন্যদের শাসন কর। নয় তো তৈরী থাক, অন্যেরাই তোমাদের শাসন করবে।" স্মরণ রাখবেন এই উক্তিটি, আর বিশ্বাস রাখবেন এই মার্কিন উর্দির উপরে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল পার্ভাসিনি, অস্থায়ী মেজর। "তোমার সাইকেল কোথায় যেন রেখে এসেছিলে? খুঁজে নিতে পারবে তো? রোদ অবশ্য এখনও খুব রয়েছে, তবু ফোরান্সি পৌঁছোতে তো সময় লাগবে, তোমার আবার শতেক জায়গায় কাজ পড়ে আছে—দেরি করা তো তোমার আমার সাজে না!"

"না, দেরি করা সত্যি সাজে না। সাইকেল? নিতে পারব খুঁজে। নদীর ধারে একটা নীচুপানা হলদে বাড়ি, তারই ভিতর—রানার? না, রানার সঙ্গে দিতে হবে না। ঠিক খুঁজে নেব এখন—ভেবো না কিছু—আনন্দ রহো।"

"আনন্দ রহো"—সমস্বরে শুভেচ্ছা জানালো সমবেত সবাই। নিক উঠে গেল গর্ত থেকে।

পার্ভাসিনি বলল এ্যাডজুটান্টের কানে কানে—"যা সব বলেছে এখানে ফড়িং-পঙ্গপালের কথা, কোর্ট মার্শালের কাঠগড়ায় না দাঁড়াতে হয় বেচারাকে। কী করব? কপাল ফুটো চিকিৎসায় যদি ও রাজী হত সেই বিশ বছর আগে, আজ কি ওকে উর্দি দেখানোর কাজ নিয়ে হইহই করে বেড়াতে হয়? এ্যাদ্দিনে ও ক্যাপ্টেন বনে যেতো অক্লেশে।"

———

লাল কালো

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

॥ ১ ॥

সোঁ-সোঁ—সাট্‌-সাট্‌—অন্ধকারে গুলি চলেছে অবিশ্রাম।

অন্ধকারের মধ্যে উভয় পক্ষে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গুলি বিনিময়ের পর এক সময় গুলির শব্দ থেমে এলো।

অবনীশ হাতের মুঠোয় লোডেড পিস্তলটা ধরে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কান পেতে গুলির শব্দ শোনার জন্য—কিন্তু মুহূর্তগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে, কোম গুলির শব্দই আর শোনা যাচ্ছে না।

পাশেই হাত তিনেকের ব্যবধানে দাঁড়িয়েছিলো এ্যাসিসটেণ্ট সাব-ইনসপেক্টার বরকৎউল্লা খান। সে বললে, বেটা বোধহয় খতম হয়ে গিয়েছে স্যার।

খতম নাও হতে পারে, খান সাহেব, রহিম শেখের ব্যাপারটা একটা ধোঁকা দেবার চেষ্টাও হতে পারে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে একটা গুলি অবনীশের ডান হাতে বিদ্ধ হলো।

অস্ফুট একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে অবনীশ বাঁ হাতে ডান হাতের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলেন।

তারপর আবার সব চুপচাপ।

গুপ্তচরের মুখেই অবনীশ সংবাদটা পেয়েছিলেন।

দুর্ধর্ষ ডাকাত রহিম শেখ তার গ্রামের ডেরায় আসবে রাত্রে তার পাঁচ মাসের বাচ্চাকে দেখতে। সেই গুপ্ত সংবাদ পেয়েই অবনীশ রহিম শেখের গ্রামের বাড়িটা ঘেরাও করেছিলেন, এবং মশার কামড় খেয়ে বাড়ির অনতিদূরে জংগলের মধ্যে অন্ধকারে দশজন সশস্ত্র পুলিস ও এ. এস. আই, বরকৎউল্লা সাহেবকে নিয়ে ঘাপটি মেরে সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেন। রাত যখন ঠিক এগারটা, অতঃপর কি করবেন অবনীশ যখন ভাবছেন, শত্রুর শিবির থেকে আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু হলো, অবনীশও আর চুপ করে থাকলেন না—ফায়ারিংয়ের নির্দেশ দিলেন।

শুরু হলো উভয় পক্ষে গুলি বিনিময়—এক ঘণ্টা ধরে প্রায় চললো পরস্পরের মধ্যে গুলি বিনিময়।

অবনীশ অবিশ্যি জানতেন, রহিম শেখ ডাকাতকে সহজে করায়ত্ত করা যাবে না। প্রায় এক বছর ধরে তক্কে তক্কে থেকে আজ পেয়েছিলেন ঐ সুযোগটা।

গুলিটা অবনীশের হাতে খুব ডীপ গর্ত করতে পারেনি, পকেট থেকে রুমালটা বের করে অবনীশ বরকৎউল্লাকে বললেন ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিতে।

আবার স্তব্ধতা—

অন্ধকারে কেবল একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে একটানা আর মৃদুপত্র মর্মর।

কোথায় কোন গাছের ডালে বোধকরি একটা রাতজাগা পাখি ডানা ঝাপটালো।

—চলুন স্যার, ফিরে যাই—বরকৎউল্লা বললে।

—না, চল এগুনো যাক—অবনীশ বললেন।

—কিন্তু স্যার—রহিম শেখ সাক্ষাৎ শয়তান—

—চল, এগোও—দৃঢ় পায়ে এগুলেন অবনীশ গাঙ্গুলী।

উপরওয়ালার অর্ডার, এগুতেই হলো বরকৎউল্লা খানকে। বুনো আগাছা, বিন্না ঘাস ও কাঁটা মনসার এবং রাঙচিতার জঙ্গলটা থেকে বের হয়ে দশ পা প্রায় এগুতেই অন্ধকারে একটা টিমটিমে আলো দেখা গেল—কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন অবনীশ, কান পেতে রইলেন—তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে গুলিভরা পিস্তলটা ধরে এগুতে লাগলেন নিঃশব্দ সতর্ক পায়ে সামনের দিকে।

আলো আসছিল একটা টিনের চালার ভিতর থেকে।

খোলা দরজা পথে আলোটা দেখা যাচ্ছিল।

সন্তর্পণে প্রাণ হাতে করে অসীম সাহসে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজা পথে উঁকি দিলেন অবনীশ এবং ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

ঘরের এক কোণে টিম টিম করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

আর মেঝেতে পড়ে আছে পাশাপাশি দুটি দেহ। একজন ষণ্ডাগণ্ডা পুরুষের দেহ তার পাশে শাড়িপরা একটি ২২।২৩ বৎসরের স্ত্রীলোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ এবং সেই

রক্তাক্ত স্ত্রীলোকের বুকের পাশে হাত-পা নেড়ে একটি শিশু আপন মনে খেলা করছে তখনো।

পাশাপাশিই বলতে গেলে রক্তাক্ত মৃতদেহ এবং তার মধ্যে ঐ শিশুটি। মৃত্যুর মধ্যে একটি প্রাণের স্পন্দন যেন। বরকৎউল্লা বলে, ঐ দেখুন স্যার—

—দেখেছি, ঐ রহিম শেখ না?

—হ্যাঁ স্যার।

—আর পাশে বোধহয়—

—মনে হচ্ছে ওর বিবি জেরিণা, আর ঐ—

—ওদেরই সন্তান—ঐ সন্তানকে দেখতেই এসেছিল রহিম শেখ আজ রাত্রে এখানে, মনে হচ্ছে।

রহিম শেখ ও জেরিণা উভয়ের হাতে ধরা তখনো পিস্তল। বোঝা গেল, শেষ পর্যন্ত তারা ফাইট দিয়েছে—মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দু'জনেই গুলি চালিয়েছে, শেষ গুলিটা কে চালিয়েছিল কে জানে?

॥ ২ ॥

বরকৎউল্লাই বললে, ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন কি করা যায় স্যার?

একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে বাচ্চাটার—তাই ভাবছি কি করা যায়?

নদীর ধারে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে বলতে গেলে রহিম শেখের কুটির—তাহলেও ভোরের আলো ফুটবার পর গ্রামের লোকেদের ডেকে বাচ্চাটাকে দেবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করলেন অবনীশ—কিন্তু ডাকাতের শিশুটিকে কেউ গ্রহণ করতে সম্মত হলো না।

—তাহলে—কি করা যায় স্যার?—বরকৎউল্লাই আবার প্রশ্ন করে।

—ভাবছি খান সাহেব, আচ্ছা, আপনি তো ওর স্বজাতি—আপনি কি নিতে পারবেন না বাচ্চাটাকে?

—কি বলছেন স্যার—জেনেশুনে একটা ডাকাতের—কেউটের বাচ্চাকে ঘরে নিয়ে যাবো?

অবনীশ হাসলেন, ছেলেটা তখন কাঁদতে শুরু করেছে।

আমার মনে হয়, ও এখানেই পড়ে থাক—আল্লাই ওর একটা ব্যবস্থা করবেন।

অবনীশ আর কোন কথা বললেন না, এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে ছেলেটাকে বুকে করে তুলে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা চুপ করে যায়।

বাড়িতে ফিরে এলেন অবনীশ বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে—বাচ্চাটা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে তাঁর বুকের মধ্যে মাথা রেখে। স্ত্রী মমতা স্বামীর পায়ের সাড়া পেয়েই এগিয়ে এলেন, বললেন, ও কিগো, তোমার বুকে ও কাদের ছেলে?

—মমতা, এ রহিম শেখের ছেলে।

—রহিম শেখ!

—হ্যাঁ, সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত রহিম শেখ—ওর বাবা-মা দুটোই গুলি খেয়ে মরেছে—অনেক চেষ্টা করলাম, কেউ ওকে নিল না, তাই—

মমতা স্তব্ধ।

—কি, অন্যায় করেছি?

—না।

—কিন্তু ও মুসলমান।

—তাতে কি, দাও ওকে আমার কাছে।

অবনীশ গাঙ্গুলী ব্রাহ্মণের স্ত্রী মমতা গাঙ্গুলী রহিম শেখের শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন।

একটি যেন চাঁদের টুক্‌রো, টকটকে গায়ের রঙ—এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—একটি যেন মোমের পুতুল।

—কি নাম ওর গো?

—জানি না তো, তা তুমিও যখন ওর মা হলে, একটা নাম দাও না ওর—

—আমাদের ছেলে দেখতে কালো, তাই তুমি নাম রেখেছো কালো—কৃষ্ণেন্দু, আমি দিই ওর নাম—লাল টুক্‌টুকে—লাল—ললিত।

চার মাসের শিশু লাল অবনীশের দশ মাসের শিশু কালোর সঙ্গে অতঃপর মানুষ হতে লাগল।

কালো কৃষ্ণেন্দু শান্তশিষ্ট নিরীহ গোবেচারী টাইপের আর যত বড় হতে লাগল লাল—ললিত—অশান্ত অস্থির প্রকৃতির ও দুরন্ত হয়ে উঠতে লাগল।

অবনীশ তখন বাঁকুড়ায় পোস্টেড্।

উপরের ঘটনার এক মাসের মধ্যেই অবনীশ বদলি হয়ে চলে এসেছিলেন প্রমোশন পেয়ে। এখন তিনি ইনসপেক্টার থেকে ডি. এস. পি.।

পুলিস সাহেবের বাংলোতে এবং বাংলোর সামনে খোলা জায়গায় দুটি শিশু দাপাদাপি করে বেড়ায়—একটির বয়স দুই অন্যটির দেড় বছর।

একটি ফর্সা টকটকে রঙ—অন্যটি কালো—যেন গোপাল।

একটি শান্ত, অন্যটি অশান্ত।

অবনীশ আর মমতা যেন ভুলেই গেছেন লাল মুসলমানের সন্তান।

লাল আর কালো—দুটিতে বড় ভাব।

একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে শোয়।

আরো কয়েক বছর পরে।

অবনীশের আরো প্রমোশন হয়েছে।

হাওড়ায় এস. পি. এখন তিনি।

চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার।

কালোর বয়স এখন চোদ্দ—লাল সাড়ে তের বছরের। দুই কিশোর, কালো একটু রোগাটে ধরনের, লাল কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

দু'জনেই স্কুলে পড়ে—একই ক্লাসের ছাত্র, লেখায় পড়ায় দু'জনই ভাল। খেলাধুলায় লাল কালোর চাইতে ভাল। যাকে বলে একেবারে চৌকস। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল আরো দুরন্ত আরো দুষ্টু হয়েছে।

॥ ৩ ॥

রহিম আর করিম শেখ ছিল দুই ভাই। রহিম বড়, করিম ছোট—দেড় বছরের ছোট বড় ছিল ওরা একে অন্যের থেকে।

ডাকাতি করে বেড়াতো দুই ভাই।

তের বছর আগে যে রাত্রে পুলিশের এনকাউনটারের পর পুলিস যে দুটি মৃতদেহ টিনের চালার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পায় এবং যাকে বরকৎউল্লা সনাক্ত করে রহিমের মৃতদেহ বলে, আসলে কিন্তু সেটা রহিমের মৃতদেহ ছিল না—সেটা ছিল গুলিবিদ্ধ করিমের মৃতদেহ।

ডান চোখে গুলি লাগায় মুখটা কিছুটা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় বরকৎউল্লা ঠিক চিনতে পারে নি করিমকে—তাছাড়া সংবাদ পেয়েছিল তারা গুপ্তচরের মুখে রহিম আসছে সে রাত্রে ঘরে ছেলেকে দেখতে—ছেলেকে সে বড় ভালবাসত।

রহিমের সঙ্গে করিমও ছিল, জানতে পারে নি—পুলিস।

পুলিসের গুলিতে ঘটনাস্থলে করিম মারা যায়—রহিম পায়ে ও হাতে আহত হয়ে কোনমতে অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে গঙ্গার ধার পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সবাই জানল রহিম শেখেরই মৃত্যু হয়েছে।

মাস তিনেক রহিম গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াল—তারপর এক রাত্রে গ্রামে ফিরে এলো ছেলের সন্ধানে—এসে শুনলো ইনেসপেক্টার সাহেব তার ছেলে চাঁদকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন এবং বলেছেন, ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবেন।

রহিম শেখ জানত না ইতিমধ্যে অবনীশের প্রোমোশন হয়েছে এবং তিনি অন্য জেলায় এস. পি. হয়ে গিয়েছেন, তবু কি ভেবে চারিদিকে যে সব অনাথ আশ্রম ছিল, সেখানে ছেলের খোঁজ করল কিন্তু পেল না ছেলের কোন সন্ধান। রহিম ভাবতেও পারে নি, এক ব্রাহ্মণ পুলিস অফিসার একটি মুসলমান শিশুকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার নিজের সন্তানের সঙ্গে লালন-পালন করবেন।

ছেলের কথা ভুলতে পারে না রহিম।

চাঁদের টুকরোর মত দেখতে ছিল বলে রহিম তার নাম দিয়েছিল চাঁদ।

একটা তীব্র প্রতিহিংসায় রহিম হন্নে হয়ে ছেলের সন্ধান করে বেড়াতে লাগল। এবং কেবল ছেলেকে খুঁজে পাওয়া নয়, অবনীশকে হত্যা করে সে তার স্ত্রীর খুনের বদলা নেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।

অনেক ঘুরে ঘুরে অনেক সন্ধানের পর এক আকস্মিক ঘটনায় রহিম জানতে পারল এক রাত্রে—তার চাঁদ কোন অনাথ আশ্রমে নয়—সে পালিত হচ্ছে সন্তানের মতই সেই পুলিস অফিসার অবনীশ গাঙ্গুলীরই গৃহে—তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি এবং সেই পুলিস অফিসার এখন কলকাতায় ডি. সি.।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস।

পুলিসের এক জাঁদরেল বড় কর্তা।

দীর্ঘ তের বৎসর পরে।

বরকৎউল্লা সাহেব মধুপুরের কাছাকাছি এক খুনের তদন্ত করতে সাধারণ সিভিল বেশে যায় এবং তদন্ত সেরে মধুপুর স্টেশনে এসে ডাউন ট্রেনের অপেক্ষায় প্ল্যাটফরমের 'পরে পায়চারি করছিল।

রাত তখন অনেক।

ট্রেন আসতেও ঘণ্টাখানেক দেরি।

সেই মধুপুর স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল অকস্মাৎ বরকৎউল্লা ইনেসপেক্টারের সঙ্গে রহিমের।

রহিম তখন—সকলে জানে মানে পুলিসের খাতায় তার নাম তখন করিম শেখ।

রহিমও ব্যাপারটা জানত।

আসলে করিম যে রাত্রে মারা গিয়েছিল এবং রহিম যে এখনো জীবিত, পুলিস তখনো জানে না, রহিম তখন ঐ তল্লাটেই ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে।

গ্রীষ্মকাল। মধুপুরে প্রচণ্ড গরম। সাধারণ সিভিল ড্রেসে ছিল বরকৎউল্লা খান।

হঠাৎ একজন দেহাতী লোক তার সামনে এসে দাঁড়াল, বাবুজী, ম্যাচিস আছে?

আমি সিগারেট বিড়ি খাই না—বরকৎউল্লা খান বললে। কিন্তু কথাগুলো বলার সময় স্টেশনের আলোয় বরকৎউল্লা রহিমের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঐ মানুষটার মুখটা চেনা চেনা তার মনে হলো। রহিমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বরকৎউল্লা।

কি দেখছেন বাবুজী আমার মুখের দিকে? অমন করে চেয়ে আছেন কেন? রহিম বলে।

তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

আমাকে—

হ্যাঁ।

কোথা দেখেচেন বাবুজী?

তুমি কি মুর্শিদাবাদে কখনো ছিলে?

রহিম চমকে ওঠে এবং বলে, আমি—না, সেখানে কখনোও যাই নি—রহিম কথাগুলো বলে সরে পড়বার জন্য পা বাড়ায়। বরকৎউল্লা বাধা দেন, দাঁড়াও—দাঁড়াও—

একই গ্রামে বাড়ি থাকার দরুন করিম ও রহিম দুই ভাইকে বরকৎউল্লা খুব ভালভাবেই চিনত। আর বরকৎউল্লাকেও করিম ও রহিম ভাল করেই চিনত। এবং রহিম শুনেছিল, রেইডের রাত্রে ইনেসপেক্টার অবনীশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে বরকৎউল্লা খানও ছিল। রহিমও বরকৎউল্লা খানকে চিনেছিল ততক্ষণে। রহিম সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পিস্তলটা টেনে বের করে এবং কঠিন গলায় বললে—চিনতে আমাকে আপনার ভুল হয় নি সাহেব—আমি রহিম শেখের ভাই করিম শেখ। এভাবে কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কখনো ভাবিনি—শান্ত গলায় রহিম তার মিথ্যা পরিচয়ই দিল।

করিম শেখ!

হ্যাঁ হুজুর—ভীত করিম শেখ—এতদিনে ভাইয়ের দেনা নেবার সুযোগ এলো—আল্লাহকে ধন্যবাদ—কথাগুলো বলে বরকৎউল্লাকে লক্ষ্য করে গুলিভরা পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে রহিম শেখ।

আমাকে তুই মারবি করিম?

হ্যাঁ—কুকুরের মতই গুলি করে মারব—কিন্তু তার আগে একটা কথা জানার আছে আমার—রহিমের বেটা চাঁদ কোথায়—কোন্ অনাথ আশ্রমে রেখেছো তাকে?

চাঁদ!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—চাঁদ—কোথায় সে?

সে তো সেই পুলিস সাহেবের ঘরেই—আছে এখনো, আমি জানি।

কি রকম—

হ্যাঁ—তার বেটার মতই পালিত হচ্ছে সে তার ঘরে।

মুসলমানের ছেলেকে বামুন তার ঘরে নিয়েছে—ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পাও নি।

যা বলছি তা সত্যি—অবনীশ গাঙ্গুলী এখন কলকাতায় ডি. সি., তার ঘরেই আছে তোর ভাই-বেটা।

ঠিক আছে—তোমার কথা যদি সত্য হয়—তাহলে তোমাকে খুন করব না—আর যদি মিথ্যা হয়, ইবলিশের বাচ্ছা তুই আমার হাত থেকে বাঁচবি না। যেখানেই থাকিস না কেন, আমি তোকে খুঁজে বের করবোই—তারপর কুত্তার মত তোকে গুলি করে মারব।

কথাগুলো বলে চকিতে রেল লাইন পার হয়ে রহিম অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওদিকে হেড লাইট জ্বালিয়ে ডাউন ট্রেনটা গর্জন তুলে ছুটে আসছে।

পরের দিনই ডাউন কলকাতা মেলে রহিম কলকাতায় চলে এলো।

কলকাতা শহরে সে কোনদিনই আসে নি—অচেনা অজানা শহর—তাছাড়া বিরাট শহর কলকাতা।

রহিমের মত গেঁয়ো লোক—তাছাড়া একজন ডাকাত, যে মানুষের সমাজকে বরাবর এড়িয়ে এসেছে, হাওড়া স্টেশনে পা দিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে।

॥ ৪ ॥

গিজ্‌গিজ্‌ করছে মানুষে।

মানুষের ভিড়ে পা ফেলাই কষ্ট—

স্টেশনের বাইরে এসে রহিম আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। বাস ট্রাম ট্যাক্সি প্রাইভেট কার কোথা থেকে যে কখন গায়ের উপর এসে পড়বে—আতঙ্কিত রহিম দু'পা এগোয় তো দু'পা পিছিয়ে আসে।

এই অসংখ্য মানুষের ভিড়ে সে সেই পুলিসের ডি. সি. অবনীশ গাঙ্গুলীকে খুঁজে বের করবে কেমন করে?

দিশেহারা রহিম কোনমতে ভিড়ের মধ্যে দিয়েই পথ করে করে এগুতে লাগল।

এই এতগুলো বছর জীবনের কেটে গিয়েছে—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দিয়ে পালাতে পালাতে আজ সেও ক্লান্ত, তার সেই পূর্বের তেজ বা শক্তি কিছুই নেই।

মাথার চুলগুলো সামনে পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

মুখের দাড়িতেও পাক ধরেছে।

পরনে একটা পায়জামা ও তার উপরে একটা কুর্তা—মাথায় একটা ফেট্টি—কাঁধে একটা ঝোলা—ঝোলার মধ্যে কিছু জামাকাপড় আর কোমরে গোঁজা গুলিভরা একটা পিস্তল।

পুলিসের খাতায় ডাকু রহিম শেখের তের বছর আগেই মৃত্যু হয়েছে। পুলিসের খাতায় সে মৃত। বরকৎউল্লা সাহেবও তাকে চিনতে পারে নি।

মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে কোনমতে রহিম শেখ এগিয়ে চলে। সেই চাঁদপানা শিশুটার মুখখানি রহিম একদিনের জন্যও ভুলতে পারে নি।

রহিম যখন ছেলেকে একটিবার দেখবার জন্য রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গ্রামে আসে—করিম তাকে একা আসতে দেয় নি, বিপদ-আপদের কথা তো বলা যায় না।

স্বয়ং বরকৎউল্লা সাহেব যখন তাকে চিনতে পারল না রহিম বলে, কেউই হয়ত তাকে আজ রহিম বলে চিনতে পারবে না—তাছাড়া অবনীশ গাঙ্গুলীও তাকে চেনেন না। তিনিও জানেন, তের বছর আগে পুলিসের এনকাউণ্টারে সে রাত্রে রহিম শেখই মারা গিয়েছিল। পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে করিম শেখকে—তাকে—রহিম শেখকে না।

কিন্তু তার ছেলে—চাঁদ?

সেই শিশু চাঁদ আজ কিশোর বালক।

তাকে কি রহিম চিনতে পারবে?

পারবে—ঠিক পারবে চিনতে রহিম তার চাঁদকে! তার স্বর্ণ-চাঁপার মত টকটকে ফর্সা রঙ। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন কালো চুল ছিল আর কপালে রাজটিকার মত একটা লাল জরুল ছিল।

তার চাঁদ—চাঁদ এখনো বেঁচে আছে?

পুলিস সাহেবের পুত্রের পরিচয়ে তাঁর ঘরেই আছে।

হঠাৎ মনে হয় রহিম শেখের, কি পরিচয় নিয়ে গিয়ে আজ সে দাঁড়াবে তার কিশোর পুত্রের সামনে?

তার বাপ—আব্বাজান।

তারপর—তারপর সে যখন জানতে পারবে—যদি আজো না জেনে থাকে তার বাপ দুর্ধর্ষ ডাকাত রহিম শেখ—তখন—তখন যদি চাঁদ তাকে আব্বাজান বলে না স্বীকার করে—

হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল রহিম শেখ।

কয়েকজন পথচারী বিরক্তির সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল।

রহিম সরে দাঁড়িয়ে পুলের রেলিংটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

নীচে গঙ্গা—কলকল শব্দে বহে চলেছে।

ছোটবড় নৌকা—বড় বড় জাহাজ—একটা স্টীম লঞ্চ জল কেটে চলে গেল। দু' পাশে সব ইমারত। এ মুর্শিদাবাদ শহর নয়—এ কলকাতা শহর।

আশ্চর্য—কথাটা একবার তো কখনো মনে হয় নি।

কেন মনে হয় নি?

মনে হলো না কেন?

সে একজন পলাতক ডাকাত।

পুলিস আজো তাকে হন্নে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তার নাম অপরাধের খাতায় আজো জমা আছে। ধরা পড়লে হয় ফাঁসী নয় দীর্ঘ-মেয়াদী জেল।

কলকাতা শহরের পথে পথে আজ দশ দিন ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রহিম শেখ।

কত পুলিস—কত অফিসার, এঁদের মধ্যে অবনীশ গাঙ্গুলী ডি. সি. কোথায় আছে কে জানে, কেমন করে তার সন্ধান মিলবে। পথে যেতে যেতে যত কিশোর বালক চোখে পড়ে অধীর আগ্রহে তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে রহিম।

কখনো মনে হয় ঐ বুঝি তার চাঁদ।

তার সেই হারানো মানিক।

তের বছর ধরে যার স্মৃতিটুকু বুকের মধ্যে বহে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে একদিন মরিয়া হয়েই এক কর্তব্যরত পুলিসকে রহিম শুধালো পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে—ডি. সি. অবনীশ গাঙ্গুলী কোথায় থাকে জানো।

জানিস দাদা, আজ স্কুলে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল—

কর্তব্যরত পুলিসটা তার মুখের দিকে তাকায়।

ছিন্ন মলিন বেশ একজন পথচারী ডেপুটি কমিশনার গাঙ্গুলী সাহেবের সংবাদ চাইছে !

—কেয়া হোগা কমিশনার সাব কো পাত্তা লেকে, কেয়া মাংগতে তুম ?

—সাহেব আমাদের গাঁয়েরই লোক।

—নেহি—হাম জানতা নেহি—কোন্ গাঙ্গুলী সাবকো বাত তুম করতে হে—দো গাঙ্গুলী সাব হ্যায় এক সাব নজদিগ মে, ঐ যে পুলিশ স্টেশন হ্যায়, উঁহা রহতা হ্যায়।

কথাটা বললেও কেমন যেন সন্দিগ্ধ-ভাবে চেয়ে থাকে রহিমের দিকে পুলিসটা।

—আচ্ছা ভাই, সেলাম।

রহিম এগিয়ে গেল।

সাহস হয়ে আসছিল—সামনের পার্কটায় পরিশ্রান্ত রহিম শেখ ঢুকে পড়লো।

কয়েকটি কিশোর বালক সেখানে খেলছে।

রহিম ওদের দিকে তাকায়।

হঠাৎ কানে এলো, এই লাল, চল এবারে বাড়ি যেতে হবে না ?

ভারী সুন্দর দেখতে ছেলেটি—হৃষ্টপুষ্ট—চমৎকার চেহারা। কালোমত রোগা পটকা অন্য ছেলেটি। তার দিকে তাকিয়ে সুন্দরমত ছেলেটি বলে, আর একটু থাক না দাদা।

—না—বাবা বকবে—টিউটর এসে বসে থাকবেন।

—জানিস দাদা, আজ স্কুলে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল—সুন্দরমত ছেলেটি বললে।

—কি মজার ব্যাপার ?

—রমেন জানে না যে ডি. সি. অবনীশ গাঙ্গুলী আমাদের বাবা।

কথাটা কানে যায় অন্যমনস্ক রহিমের—সে চমকে ওঠে।

॥ ৫ ॥

ডি. সি. অবনীশ গাঙ্গুলীর ছেলে।

তবে কি—তবে কি ঐ সুন্দরমত ছেলেটি তার চাঁদ?

রহিম এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

ডাকল, খোকাবাবু—শোন।

ওরা ফিরে তাকাল, একটা ভিখারী মত লোক।

ললিত বললে, আমাদের বলছো?

—হ্যাঁ—কি নাম তোমার?

—আমার নাম দিয়ে তোমার কি হবে।

—বল না নামটা তোমার?

—ললিতমোহন গাঙ্গুলী।

—তোমরা বুঝি ডি. সি. অবনীশ গাঙ্গুলীর ছেলে?

—হ্যাঁ—চল দাদা।

দুই ভাই পাশাপাশি এগিয়ে চলে, দূর থেকে অলক্ষ্যে ওদের অনুসরণ করে রহিম শেখ ছায়ার মতো। ওরা কিছুই জানতে পারে না। ঐ অঞ্চলেই একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির মধ্যে ছেলে দুটি ঢুকে গেল, দূর থেকে দেখলো রহিম শেখ।

গেটে সশস্ত্র পুলিস প্রহরী—রহিম শেখ জানতে পারে, ঐটাই ডি. সি. অবনীশ গাঙ্গুলীর গৃহ। ঐখানেই তার চাঁদ আছে।

ডি সি. অবনীশ গাঙ্গুলীর গৃহের কিছু দূরে রহিম শেখ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। গেটে সশস্ত্র পুলিস প্রহরা—সর্বক্ষণ প্রহরী রয়েছে পুলিস কমিশনার সাহেবের বাড়ির সামনে।

সেদিনকার সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত রহিম শেখ—যার ভয়ে কেবল সাধারণ মানুষই নয়, পুলিসেরও বুক কাঁপত, যে একদিন রাতারাতি দশ মাইল পথ হেঁটে চলে গিয়েছে, খাল-বিল নদী-নালা কোন বাধাই তার কাছে বাধা ছিল না। অনায়াসে সাঁতরে পার হয়ে গিয়েছে—বন্দুকের সঙ্গে নিশানা যার কিংবদন্তীর মত ছিল—সেই ডাকাত রহিম শেখ পুলিস কমিশনার সাহেবের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ করে।

তের বছর আগে হলে অনায়াসেই রহিম শেখ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে তার ছেলেকে ডাকাতি করে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত—কিন্তু আজ —আজ সেই দুর্জয় সাহস কোথায়?

ধীরে ধীরে এক সময় রহিম শেখ বাড়িটার সামনে থেকে সরে এলো।

কিন্তু কি এক দুর্বার আকর্ষণ যেন ঐ বাড়িটা—ঐ লাল রঙের বাড়িটা রহিম শেখকে টানতে থাকে।

রহিম শেখের একমাত্র কাজ হলো ঐ কিশোর দুটিকে ছায়ার মত অনুসরণ করা, ওরা স্কুলে যায়—স্কুল থেকে ফেরে, একজন সেপাই সঙ্গে থাকে, খেলার মাঠে যায়, সেখানেও সঙ্গে থাকে সেপাই।

ওদের একজনের নাম কালো, একজনের নাম লাল—জানতে পেরেছে রহিম শেখ, কালো মত দেখতে ছেলেটির নাম কালো আর সুন্দর গৌরবর্ণ ছেলেটির নাম লাল।

কালোমত ছেলেটি রোগা—কিন্তু গৌরবর্ণ ছেলেটি বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা।

কে জানে ঐ লাল কালো ছেলে দু'টির মধ্যে কে তার হারানো ছেলে চাঁদ? মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু সাহসে কুলায় না।

সুযোগের সন্ধানে ফেরে রহিম শেখ।

যদি কোন সুযোগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারত একটি বার।

বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা রহিম শেখকে অস্থির করে তোলে।

এক একবার মনে হয় রহিম শেখের, যা হবার হোক—একবার ঐ বাড়িটার মধ্যে ঢুকবেই সে, তারপর যে লোকটা তার ভাই আর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছে—তাকে খুন করে তার ঐ ছেলেটাকে নিয়ে সে পালিয়ে আসবে।

কিন্তু কথাটা ভাবা যত সহজ—কাজটা ঠিক ততটা কঠিন।

সুরক্ষিত ঐ পুলিস কমিশনারের বাড়িতে ঢুকে তার ছেলেকে নিয়ে আসা কাজটা আদৌ সহজসাধ্য নয়।

॥ ৬ ॥

আকস্মিকভাবে এক বৈকালে সুযোগটা মিলে গেল।

স্কুলে সেদিন কালো ও লালের বার্ষিক স্পোর্টস ছিল। স্পোর্টসের পর দুই ভাই স্কুল থেকে বের হয়ে পড়লো—স্কুল কমপাউণ্ডের বাইরে এলো, যে সেপাইটার ওদের এসে নিয়ে যাবার কথা, তখনো সে পৌঁছায় নি এসে, ওরা দুই ভাই হাঁটতে শুরু করে বাড়ির দিকে—বাড়ি খুব একটা কিছু দূরে নয়।

গেটের অনতিদূরেই রহিম শেখ ওদের পথ চেয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল, সেও ওদের অনুসরণ করল। দেখলো সেদিন ওদের সঙ্গে কোন লোক নেই, ওরা দু'জন হেঁটে চলেছে।

রহিম শেখ বেশ সাহস করেই এগিয়ে গেল ওদের সামনে। ছেলে দুটির দিকে ভাল করে তাকাতেই রহিমের নজর পড়লো ফর্সামত ছেলেটির কপালে একটি লাল জরুল চিহ্ন।

চমকে ওঠে রহিম শেখ, ঐ—ঐ তার ছেলে চাঁদ। কপালে ঐ লাল জরুলের জন্যই ছেলের নাম রেখেছিল রহিম চাঁদ, আরো এগিয়ে চাঁদের পাশে চলে গেল—ঐ সময় কালো একটু পিছিয়ে একটা দোকান থেকে চকোলেট কিনছে, চাঁদ একা দাঁড়িয়ে পথের মাঝখানে।

—তোমার নাম লাল না খোকাবাবু?
—হ্যাঁ। তুমি কে?
—আমি—
—হ্যাঁ—কে তুমি? তুমি আমার নাম জানলে কি করে?
—জানি।
—কি করে জানলে? তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি না।
—না, আমাকে তো চিনবে না। কখনো তো আমাকে দেখ নি। তোমারই নাম লাল তো?
—হ্যাঁ।
—তুমি পুলিস কমিশনারের বাড়ি থাকো, তাই না?
—হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা।
—তুমি ঠিক জান, তিনি তোমার বাবা—আব্বাজান—
—বাঃ, জানবো না কেন?
—বোধহয় না।
—মানে? কি বলছো তুমি?
—পুলিস কমিশনার সাহেব দেখো না কালো—তার ছেলেও কালো—কিন্তু তুমি কত ফর্সা—ওই টকটকে সাহেবদের মত রং—

তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

—তাতে কি?
—তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো—তুমি সত্যি সত্যিই তার ছেলে কিনা? আমি জানি, তুমি ওদের ছেলে নও—কথাটা বলে রহিম চলে গেল।
লাল হাসলো।
ইতিমধ্যে কালো ফিরে আসছিল, তাই দেখে রহিম চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।
লোকটা চলে যাচ্ছে দেখলো। ললিত ডাকল, শোন।
—কি?
—তুমি কে?
—আমার নাম রহিম শেখ—আমার নামটা নিশ্চয়ই তোমার বাবা পুলিস সাহেবের মনে আছে—নামটা শুনলেই তিনি ঠিক চিনতে পারবেন—তাঁকেও জিজ্ঞাসা করো।

কথাগুলো বলে আর রহিম শেখ দাঁড়াল না। চলে গেল দ্রুত পায়ে—কালো ততক্ষণে এসে গিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এলো লাল।

তার কিশোর মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা দ্বন্দ্ব জাগছে—রহিম শেখ কি বলে গেল, ওকথা কেন বলে গেল?

বাড়িতে ফিরে পড়ার ঘরে গিয়ে বই-খাতা রেখে একটা চেয়ারের 'পরে চুপচাপ বসে থাকে লাল।

মা মমতা এসে ঘরে ঢোকেন এক সময়। ডাকেন, লাল—

ঘুরে তাকাল লাল মায়ের মুখের দিকে।

—কি হয়েছে লাল, অমন চুপচাপ বসে কেন বাবা? স্কুল থেকে ফিরে খেতে গেলে না?

—মা।

—কি বাবা?

—একজন, মানে একটা ভিখারীমত লোক—মুসলমান—কি বলে গেল জান আমাকে!

—কি বলে গেল?

—বলে 'আমি' তোমাদের ছেলে না।

—সে কি!

—হ্যাঁ মা, সত্যি—বললে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে—জান মা, আজ ক'দিন লক্ষ্য করছি—ঐ লোকটা আমাদের পিছনে পিছনে হাঁটছে।

—এতদিন বলো নি কেন কথাটা—চল—খাবে চল।

—কিন্তু মা—

—তুমি আমারই ছেলে। তুমি আর কালো আমাদের দুই ছেলে—চল।

তবু কিন্তু কথাটা ভুলতে পারে না লাল।

কেবলই ঘুরে ফিরে কথাটা তার মনের মধ্যে আসে।

ঐ রাত্রেই মমতা স্বামীকে কথাটা বললেন।

অবনীশ গাঙ্গুলী কথাটা শুনে চমকে উঠলেন।

মমতা বললেন, কে বলতো লোকটা—আর সে জানলই বা কি করে কথাটা? এ সেই ডাকাতটা নয়ত—যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল?

—কি জানি—ভাল করে খোঁজ করতে হবে। বুঝতে পারছি না, রহিম শেখ তো মরে গিয়েছে। ভূত হয়ে গিয়েছে—অবিশ্যি তার এক ভাই ছিল করিম শেখ।

॥ ৭ ॥

মমতা বললেন, করিম শেখ! রহিমের এক ভাই ছিল নাকি?

—শুনেছি তাই! সেও ডাকাতি করতো—তার নামে আজো পুলিসের ওয়ারেণ্ট ঝুলছে।

—তাহলে ঐ লোকটা সেই করিম নয় তো?

—হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু ব্যাপারটাও ভাবিয়ে তুলল মমতা—অবনীশ বললেন।

—ছেলেটাকে নিয়ে যাবে না তো আমাদের কাছ থেকে? শংকাভরা গলায় বললেন মমতা।

—নিয়ে যাবে, কেমন করে।

—ও তো তাদেরই ছেলে! এতকাল ধরে ছেলের মত পালন করে শেষটায়—

—তুমি বিচলিত হচ্ছো কেন মমতা?

পরের দিন সকালে অবনীশ লালকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

—আমাকে ডেকেছো বাবা?

—হ্যাঁ—তুমি তোমার মার কাছে কি বলেছো?

ললিত আনুপূর্ব্বিক সব কথা অবনীশকে বলল, আমি নাকি তোমাদের ছেলে নই—আমার—

—লোকটার নাম কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ—তার নাম নাকি রহিম শেখ—বলছিল নামটা বললেই তুমি তাকে চিনতে পারবে, রহিম শেখ কে বাবা?

—বুঝতে পারছি না ঠিক কে লোকটা?

মুখে ঐ কথা বললেও মনে মনে চমকে ওঠেন অবনীশ, রহিম শেখ! সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত—সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে!

—বাবা—

—কি?

—সত্যিই আমি তোমাদের ছেলে নই?

—কে বললো? তুমি আমাদেরই ছেলে। ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে তাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসো তো, কেমন?

—আচ্ছা।

রহিম নিজেই এলো, তাকে ডেকে আনতে হলো না।

সন্ধ্যার পর সেদিন অফিসঘরে অবনীশ বসে কি কাগজ দেখছিলেন—কনেস্টবলটি এসে সেলাম দিল।

—কি বিরজুপ্রসাদ।

—একটা ভিখারী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় সাহেব।

—ভিখারী!

—হ্যাঁ, নাম বললে রহিম শেখ।

চমকে উঠলেন অবনীশ। বললেন, নিয়ে এসো এই ঘরে।

একটু পরে রহিম এসে ঘরে ঢুকল।

—সেলাম সাহেব।

অবনীশ লোকটার দিকে চেয়ে থাকেন।

—সাহেব—

—তোমার নাম রহিম শেখ?

—হ্যাঁ, সাহেব।

—কি চাও?

—আমি—ধরা দিতে এসেছি—

—ধরা দিতে এসেছো!

—হ্যাঁ, আমাকে ধরে জেলে দিন—আপনারা জানেন তের বছর আগে পুলিসের গুলিতে রহিম শেখ মারা গিয়েছিল—কিন্তু সে মরে নি। মারা গিয়েছিল আমার ভাই করিম।

—তুমি—

—না। আমি মরি নি—আমি আজো বেঁচেই আছি—রহিম শেখ বললে।

—তুমি তোমার ছেলেকে ফিরে চাও?

—না।

—চাও না?

—না—এ কয়দিন অনেক ভেবেছি—সে আপনার কাছেই থাক।

ঠিক ঐ সময় ললিত এসে ঘরে ঢুকল, বাবা—

—লাল!

—বাবা, এই সেই লোকটা—রহিমের দিকে তাকিয়ে লাল বলে ওঠে।

—খোকাবাবু, তোমাকে সেদিন আমি মিথ্যা কথা বলেছি—তুমি রহিম শেখের ছেলে নও—তুমি পুলিস সাহেবেরই ছেলে। তাছাড়া তুমি জানো না খোকাবাবু—রহিম শেখ একটা ডাকাত—পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—তুমি এসব কথা জানলে কি করে? লাল বললে।

—জানি—আমি সব জানি। সাহেব, আমাকে এ্যারেস্ট করুন।

অবনীশ রহিমের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

—যাও খোকাবাবু, তুমি ভিতরে যাও—রহিম শেখ বললে, তারপর হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আপনার লোকেদের বলুন আমাকে এ্যারেস্ট করতে।

—লাল, ও মিথ্যে বলছে—ও ডাকাত নয়—বাবা—অবনীশ হঠাৎ বললেন।

না, না, না—চিৎকার করে ওঠে রহিম শেখ—আমি এত বছর ধরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি—আর পালাব না—আমাকে এ্যারেস্ট করুন—

———

ভোজ

চিত্তরঞ্জন মাইতি

॥ ১ ॥

বুধ্‌লী গাঁয়ের তিন্নির ঘুম ভেঙে গেল। সে তাপ্‌রীর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, মা নেই, কাঠ বেচতে বাস রাস্তার দিকে বেরিয়ে গেছে।

পাহাড়ী এলাকার কোন কোন জায়গায় মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরী খুব ছোট্ট ঘরকে বলে তাপ্‌রী। পাহাড়ী রাস্তার ধারে বনের পাশে এমনি এক ভাঙা তাপ্‌রীতে থাকে তিন্নি আর তার মা। তিন্নির মা কাঠকুড়ুনী। ছোট্ট তিন্নি মাকে কাজে অনেক সাহায্য করে। সে ঘরে ঝাড়ু দেয়। বাউড়ি বা পাহাড়ী ঝোরা থেকে মাটির ঘড়ায় করে জল তুলে আনে। তারপর মায়ের সঙ্গে বনের ভেতর গিয়ে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে বয়ে আনে তাপ্‌রীতে। হপ্তায় দু'দিন তিন্নির মা কাঠের বোঝা পিঠে চাপিয়ে বাস রাস্তার ধারে যায়। সেখানে চা আর খাবারের দোকানীদের কাছে কাঠ বেচে আটা, নিমক আর মিরচা কিনে আনে। যেদিন তিন্নির মা বাস রাস্তার ধারে

কাঠ বেচতে যায়, সেদিন ফিরতে ফিরতে সারাদিন কাবার হয়ে যায়। তিন্নি রাঁধতে পারে না, কিন্তু সবকিছু গুছিয়ে রাখে। মা এলে উনুন ধরিয়ে রুটি বানায়। মির্‌চা, মানে লঙ্কা দিয়ে রুটি খাওয়া হয়। অনেক দিনের পর এক আধদিন সব্‌জি বা তরকারি জোটে। যেদিন সামান্য সব্‌জি জোটে, সেদিন তিন্নির আনন্দ ধরে না। মা নিজের ভাগে নামমাত্র রেখে প্রায় সবটাই তিন্নিকে দিয়ে দেয়। মোটা মোটা মকাই-এর রুটির সঙ্গে তরকারি, আঃ, ভাবলেও তিন্নির নোলা সুড়সুড় করে।

তিন্নিরা যে পাহাড়ে থাকে, তার তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভারী সুন্দর উপত্যকা। সে উপত্যকার বুক চিরে ঝকঝকে একটা নদী বয়ে চলেছে। সেখানে অনেক ফলের বাগান আর ঘরবাড়ি আছে। ওপরের পাহাড় থেকে বাড়িগুলোকে দেশলাই-এর বাক্সের মত মনে হয়। ঠিক কোন্ মাসে তিন্নি জানে না, ঐ উপত্যকায় ফুল ফোটে। মা বলেছিল আপেল গাছের ফুল। ওপর থেকে সে সময় নীচের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কড়ার মত গোল আর গভীর উপত্যকাটার চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তিন্নিদের পাহাড়ের ডান দিকে উপত্যকার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়টা তারই ওপর দূর থেকেও বড় একটা কাঠের কুঠী দেখা যায়। ঐ বাড়ির মালিক লম্বরদার হনুমান সিং ঠাকুর। লম্বরদার হল গ্রামের মুখিয়া বা প্রধান। অনেক ভেড়ার মালিক সেই লোকটি। তিরিশ চল্লিশ জনেরও বেশি বাওয়াল হনুমান সিং-এর ভেড়া চরিয়ে বেড়ায়। ভেড়া যারা চরায়, তাদের বলে বাওয়াল।

তিন্নির বাবা হনুমান সিং ঠাকুরের ভেড়া চরাত। গরমের দিনে অনেক অনেক উঁচু পাহাড়ে ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলে যেত তার বাবা। চারদিকে ঠাণ্ডা বরফের পাহাড়ের মাঝখানে সবুজ ঘাসের ময়দান। সেই ময়দানে ভেড়ারা নীরু ঘাস খেত। আবার শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসত নীচে। মালিকের কুঠীতে ভেড়া জমা রেখে তিন্নির বাবা ঘরে আসত। মাস দুয়েক ঘরে কাটিয়ে তিন্নিকে অনেক আদর করে আবার বেরুতো অনেক নীচের পাহাড়ে ভেড়া চরাতে।

তিন্নি তখন অনেক ছোট। একবার তার বাবা ওপরের পাহাড়ে ভেড়া চরাতে গিয়ে আর ফিরে এল না। মা তাকে নিয়ে গিয়েছিল হনুমান সিং-এর কুঠীতে। সেখানে তার মা জানতে পারে, তার বাবা নাকি তুষার ঝড়ের মুখে ভেড়া সমেত বরফ চাপা পড়ে মারা গেছে। হনুমান সিং তার অনেকগুলো ভেড়া বরফ চাপা পড়েছে বলে খুব আক্ষেপ করল। তিন্নির বাবা যে একটা গোঁয়ার, সে কথা তিন্নির মাকে বলতে ছাড়ল না। আসার সময় দয়া করে তাদের দুটো ভেড়া দিল। তিন্নি অনেকদিন সে ভেড়া দুটোকে আগলে রেখেছিল। শেষে বড় কষ্টে পড়ে মা ভেড়া দুটোকে বেচে দিল। ভেড়া দুটো চলে যেতে তিন্নি দু'দিন খুব কেঁদেছিল।

ভোরবেলা উঠেই মা বনে ঢোকার আগে উত্তর দিকের বরফের পাহাড়টাকে নমস্কার করে। তাকেও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিকে তাকিয়ে নমস্কার করতে

শিখিয়েছে মা। একটু বড় হতেই সে বুঝেছে, ঐ পাহাড়ের কোথাও তার বাবা ঘুমিয়ে আছে, তাই মা ওদিকে তাকিয়ে তাকে প্রণাম করতে শিখিয়েছে।

॥ ২ ॥

আজ রোববার। তিন্নি জানে, মা কাঠ নিয়ে রোববার আর বুধবার বেচতে যায়। সেই ফেরে সন্ধ্যের একটু আগে। সে কাল থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, আজ রোববার, হনুমান সিং ঠাকুরের কুঠীতে ভোজ খেতে যাবে।

পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে, তারাই ক'দিন ধরে বলাবলি করছে, ঠাকুর সিং-এর নাতি হয়েছে, সবাইকে ববরু আর ইয়া বড়া বড়া লাড্ডু খাওয়াবে।

ছেলে হবার পনের দিন পরে ববরু, মানে পুরী তৈরী করে খাওয়ানো হয় কুটুম বন্ধুদের। যারা বড়লোক, তারা উৎসবের দিনে যারাই গিয়ে পড়ে, প্রায় তাদের সকলকেই ববরু খেতে দেয়।

ভারী বড়লোক হনুমান সিং, তাই তার নাতি হবার খবরটা ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। একটা একটা করে লোকে পনেরটা দিন গুনে ফেলেছে। আজ রোববার, ববরু খাবার দিন।

শনিবার কাঠ কুড়োতে কুড়োতে মার কানে কথাটা তুলেছিল তিন্নি। মা কিন্তু আমল দেয় নি সে কথায়।

তিন্নি একবার লাড্ডু খেয়েছিল। মা যেন কোথায় পেয়েছিল। পাতায় জড়িয়ে এনেছিল তার জন্যে। কি স্বাদ মেঠাইটার। তিন চার দিন ধরে একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে খেয়েছে। শেষে তিন চারটে দানা রেখেছিল বিছানার ধারে। ভোরে উঠে দেখে, মেঠাই-এর দানা ক'টা রাতে কখন ইঁদুর এসে খেয়ে গেছে। সেই থেকে ইঁদুরের ওপর তার বড় রাগ। না বলে কারু জিনিস খাওয়া কি ভাল?

তিন্নি উঠে পড়ল। ছেঁড়া, ময়লা, পুরনো কাপড়ের একখানা খিন্দ (কাঁথা) আছে তাদের। শোবার সময় সেটা পাতা হয়। আবার ভোরবেলা সেটাকে ঘরের এক-ধারে গুটিয়ে রেখে দেয় তিন্নি। আজ কিন্তু হনুমান সিং-এর কুঠীতে যাবার তাড়ায় তিন্নি সেটা তুলে পাট করে রাখতে ভুলে গেল। শুধু কি কাঁথাটা তুলতে ভুলল, আরও দুটো জিনিস ভুলে গেল সে। কাঠ বেচতে যাবার দিন সন্ধ্যায় ফেরে বলে মা আগের দিন রাতে ক'খানা বেশি রুটি তৈরী করে রেখে যায়। সেই রুটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে সে ভুলে গেল। আর উত্তর দিকে বরফের পাহাড়টার দিকে চেয়ে ভুলে গেল সে নমস্কার করতে।

বনের ধার দিয়ে ঐ একটাই পথ। পাহাড় ভেঙে কখনো সে পথে ওপরে উঠতে হয়, কখনো বা নামতে হয় নীচে। তিন্নি প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই সে পথ ধরে চলেছে। এদিকে পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে লাফিয়ে উঠেছে।

এক জায়গায় এসে তিন্নি থেমে গেল।

কে যেন একটা হুইস্‌ল বাজালে। বন চিরে বাঁশির সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজটা বেরিয়ে এল। তিন্নি সেই বাঁশির শব্দ লক্ষ্য করে বনের ভেতর ঢুকল।

চীর-পাইনের বন। লম্বা লম্বা গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ঝাউ পাতার মত সরু সরু পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার সময় সন্‌-সন্‌ শব্দ তুলছে। ডালপাতার ফাঁকে সূর্যের আলো যেন আবছায়া বনে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তিন্নি বন চিরে এগোতে এগোতে যেখানে এসে থামল, সেখানে এক অবাক দৃশ্য তার চোখে পড়ল। সে জানত না জায়গাটার নাম খাজিয়ার। একটা সুন্দর বাংলো বাড়ি আছে বনের মধ্যে। প্রতিদিন ডালহৌসি শহর থেকে বাস বোঝাই ট্যুরিস্ট আসে। চারদিকে পাহাড় আর বন। মাঝখানে ঢালু সবুজ ঘাসে ছাওয়া গোলাকার ময়দান। ঐ ময়দানের মাঝখানে আবার ছোট্ট একটি জলাশয়।

তিন্নি চীরগাছের ফাঁক দিয়ে দেখল, তারই বয়েসী এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে ময়দানে দৌড়োদৌড়ি করে খেলছে। যে সব ট্যুরিস্ট বেড়াতে এসে বাংলোর বাগানে রঙীন ছাতার তলায় বসে গল্পগুজব করছে, তাদের ছেলেমেয়েরা খেলার আসর পেতেছে ঐ সবুজ ঘাসের ময়দানে।

হরেক রঙের প্রজাপতি যেন নেচে বেড়াচ্ছে। রঙীন পোশাকে কি সুন্দর মানিয়েছে তাদের। এক ঝাঁক রঙ-বেরঙের বেলুন আকাশে উড়িয়ে তার সুতো ধরে সামনে চলেছে একটি ছেলে। কোমরে হাত দিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলেছে বাকি ছেলের দল। ঘুরে ঘুরে নানারকম শব্দ করে খেলছে তারা।

এক সময় তারা লুকোচুরি খেলায় মাতল। গাছের আড়ালে লুকোবার সময় হঠাৎ তাদের একজন তিন্নিকে দেখে ফেলল। সে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল সর্দারের কাছে। গরিবের পোশাক পরলে কি হয়, তিন্নির মুখখানা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওরা সবাই নতুন সাথী তিন্নিকে নিয়ে খেলায় মাতল। তিন্নি জীবনে এত আনন্দ কোনদিন পায় নি। সে ভুলে গেল তার ক্ষিদের কথা।

কতক্ষণ খেলার পর হঠাৎ একটা হুইস্‌ল বেজে উঠল। অমনি ছেলেমেয়ের দল খেলা ভেঙে ছুটল ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে। তিন্নি দেখল, অনেকগুলি সাজপোশাক পরা সাহেব মেম-সাহেব বাচ্চাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ওরা ময়দান থেকে ওপরে উঠতেই ওদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল খাবারের প্যাকেট। ওরা বাংলোর বাগানে হইচই করে খেতে লাগল।

ঘাসের ময়দানে তখন তিন্নি একা দাঁড়িয়ে। সে বুঝতে পারল না আবার খেলা শুরু হবে কি না?

কতক্ষণ বাংলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেল। সে শুকনো ঠোঁটে জিভ ঘষে একটা ঢোক গিলল। না, আর সে দাঁড়াবে না। হনুমান সিং-এর কুঠীতে এক্ষুণি তাকে যেতে হবে।

ওরা সবাই নতুন সাথী তিন্নিকে নিয়ে খেলায় মাতল। [পৃঃ ১৩২

তিন্নি বন চিরে আবার পথে গিয়ে পড়ল। সে ছুটতে লাগল হনুমান সিং-এর কুঠী লক্ষ্য করে।

ক্ষিদের জ্বালায় পেট চুঁই-চুঁই করছে তার। বেশ খানিক পথ পার হয়ে এসে সে পথের ধারে দেখতে পেল একটা আপেলের বাগান। থমকে দাঁড়াল তিন্নি। কেউ কোথাও নেই। গাছের তলায় বেশ কয়েকটা পাকা আপেল পড়ে আছে। একটা তুলে এনে কামড় বসালে কি হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মার কথা, না বলে কখনো কারু জিনিসে হাত দিতে নেই।

তিন্নি বাগানের দিকে আর এগোল না। হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা কাঠবেড়ালীর ওপর। আপেল গাছ বেয়ে তির্‌তির্‌ করে নেমে এল সে। গাছের তলায় পড়ে থাকা আপেলটাকে সামনের দু'পায়ে জাপটে ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে লাগল। তিন্নি ছোট্ট একটা পাথরের নুড়ি তুলে ওর দিকে টুক্‌ করে ছুড়ে দিয়ে মনে মনে বলল, কি হচ্ছে ও? না বলে চুরি করে খাচ্ছ?

কাঠবেড়ালীটা তিন্নির পরোয়া না করে ওর দিকে শুধু ল্যাজ তুলে পেছন ফিরে বসে খেতে লাগল।

তিন্নি পা চালাল হনুমান সিং-এর কুঠীর দিকে। পথে কেবল দেরী হয়ে যাচ্ছে তার। একটা চিড়ু পাখি টুঁই-টুঁই লিক্, টুঁই-টুঁই লিক্ ডাকতে ডাকতে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল সেই হনুমান সিং-এর কুঠী লক্ষ্য করে।

তিন্নি আরও জোরে পা চালাল। নিশ্চয়ই পাখিটা খবর পেয়ে গেছে। পাখিরা তো চারদিকে উড়ে বেড়ায়, তাই ওরা সব্বার আগেই খবর যোগাড় করে নেয়।

হনুমান সিং ঠাকুরের কোঠী দেখতে যত কাছে, পথটা কিন্তু তত কাছের নয়। দুপুর গড়িয়ে তিন্নির গা দিয়ে ঘামও গড়িয়ে পড়ল ক'ফোঁটা, তবুও পথ ফুরোলো না।

অনেকগুলি লোক খেয়ে ফিরছিল, তারা তারিফ করছিল ববরু আর লাড্ডুর। ওদের কথা শুনে তিন্নির পেটের ভেতর নাড়ীভুঁড়ি জ্বলতে লাগল।

তিন্নি যখন পথ ভুল করে আবার পথ চিনে হনুমান সিং ঠাকুরের কুঠীতে পৌঁছল তখন কুঠীর দেউড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। কাতারে কাতারে লোক দেউড়ির বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কত দূর থেকে খবর পেয়ে এসেছে তারা। কিন্তু তাদের বেশিদূর এগোতে হল না। বাঁধান লাঠির দু'প্রান্ত দু'হাতে ধরে হনুমান সিং-এর দারোয়ানরা তাদের ঠেলতে ঠেলতে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিল।

দয়ার শরীর হনুমান সিং-এর। কাঠের বাড়ির তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে ক'টা লাড্ডু বেঁচেছিল, তাই ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল ভূখা মানুষগুলোর ভেতর। ভেঙে ধুলো হয়ে যেতে লাগল লাড্ডুগুলো, তবু কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ঐ ভাঙা লাড্ডু কুড়িয়ে খাবার জন্য।

ঝুড়ি শেষ হলে কুঠীর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল হনুমান সিং।

তিন্নি ভিড় দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে মরিয়া হয়ে তারই ভেতর দু'একবার লাড্ডুর ধুলো কুড়োবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সবই বৃথা। ভিড়ের চাপে চেপ্টে মারা পড়ার যোগাড় হয়েছিল।

তিন্নি কাঁদতে কাঁদতে ঘরের দিকে ফিরল। আসার সময় অনেকখানি পথ চড়াই ভেঙে উঠতে হয়েছিল, এখন সহজেই উতরাইতে নামতে লাগল তিন্নি। সময়টাও লাগল কম।

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল তার। বনের মধ্যে একটা ঝর্নার ঝরে পড়ার শব্দ শুনে সে ঢুকল তার ভেতর। ঝর্নার ওপর বিকেলের কয়েক টুকরো আলো এসে পড়েছিল। সে জল খেতে এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। তার সারা গা মুহূর্তে হিম হয়ে গেল। একটা ভালুক তার বাচ্চাকে জল খাওয়াচ্ছে। বাচ্চাটা চুক্‌চুক্ করে জল খাচ্ছিল। জল খেতে খেতে নাকটা যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন বাচ্চাটা ওপর দিকে নাকটা তুলে ফ্যাচ ফ্যাচ করছিল। মা ভালুক নিজের মুখটা বাচ্চার মুখে ঠেকিয়ে তাকে উৎসাহ দিতে লাগল।

জল খাওয়া শেষ হলে ভালুকটা ঝর্নার পাশে পাশে নীচে নেমে গেল। আর বাচ্চাটা মায়ের পেছন পেছন একটা ময়লা কালো পুঁটলির মত গড়াতে গড়াতে চলল।

বড় বাঁচা বেঁচে গেল তিন্নি। সে ঝর্না থেকে দু'হাত ভরে জল তুলে খেতে লাগল। আঃ, এতক্ষণ পরে ধড়ে যেন প্রাণ এল তার। সে উঠে দাঁড়াতেই আর একটি শব্দ কানে এসে বাজল।

গাছের ওপর থেকেই শব্দটা আসছিল। সে ভয়ে ভয়ে ওপর দিকে তাকাল। না, ভয় পাবার কিছু নেই। একটা বাদামী রঙের বাঁদর গাছের ডালে বসে ছোট ছোট ফল পেড়ে খাচ্ছে। একটু পরেই তিন্নি একটা সার্কাসের খেলা দেখতে পেল। বাঁদরটা গাছের একটা ডালে তার ল্যাজটা কয়েক পাক জড়িয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল। অমনি পাশের একটা গাছ থেকে পুঁচকে একটা বাঁদর শূন্যে লাফ দিয়ে পড়ল এসে ঐ বাঁদরের গায়। বাঁদরটা খপ করে তাকে ধরে নিল। তারপর দুটিতে মিলে গুছিয়ে বসল গাছের ডালে।

একটা বাঁদর গাছের ডালে বসে ছোট ছোট ফল খাচ্ছে।

তিন্নি এতক্ষণে বুঝল, ওটা বাঁদর নয়, বাঁদরী। বাঁদরী তার বাচ্চাকে কোলে বসিয়ে উকুন বাছতে লাগল। উকুন বাছা শেষ হলে গাছ থেকে ছোট ছোট ফল পেড়ে নিজে খেল আর বাচ্চাটাকে খাওয়াল। তারপর বাচ্চাটা মায়ের বুকখানা জাপটে ধরল আর বাচ্চা সমেত মা এক লাফে গিয়ে উঠল অন্য একটা গাছের ডালে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি ঘরে পৌঁছে তিন্নি দেখে, মা তারই ফেরার পথের দিকে চেয়ে আছে।

মা তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আয়, খাবি আয়। সারাদিন পেটে কিছু পড়েছে বলে তো মনে হয় না। ববরুর লোভে রুটিগুলো ফেলে গেলি, ববরুও জুটল না।

তিন্নি অবাক হল। মা যেন মুখ দেখে সবকিছু জানতে পারে।

দুজনে বসে মোটা মোটা ময়লা রুটিগুলো শুধু মির্‌চা (লংকা) দিয়ে খেতে লাগল। তিন্নির মনে হল, এমন অমৃত সগ্‌গো, মত্ত, পাতালের কোথাও মিলবে না।

———

মাঝ রাতে

—কমল লাহিড়ী

বাপ্পা একটা হাই তুলে বলল, "না-না, হাসির নয়, আজ বেশ গায়ে কাঁটা দেয়া ভূতের গল্প বলুন মামা।

আবীর বলল, "ধ্যুর ভূত-ফূত কিছু আছে নাকি যে তার কথা শুনে আবার গায়ে কাঁটা দেবে?"

তিবু বলল, "নারে, ওদের নিয়ে এমন কথা বলিস নি। গতবার গরমের ছুটিতে বহরমপুর ছোড়দাদুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আমার সেজ মাসির যা কাণ্ড দেখেছি, মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার। সেজ মাসি ভাল করে খেত না, ঘুমুতো না, শুধু শুধু অজ্ঞান হয়ে যেত।"

"ও তো হিস্টিরিয়া।" বিজ্ঞের মত জবাব দেয় আবীর।

তিবু প্রতিবাদের স্বর তুলে বলে, "না-না, হিস্টিরিয়া নয়। তাহলে তো ডাক্তার কাকুই ভাল করতে পারতেন। পলাশপুর থেকে রসুল ফকির এসে কি সব মন্তর পড়ল। হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরল। তারপর জানিস—এই এত বড় একটা লাঠি নিয়ে না সেজ মাসিকে কী মার মারল! আর কি বলব তোদের, সেই মার খেয়ে যে অজ্ঞান হল সেজ মাসি, তারপর জ্ঞান ফিরতেই একেবারে ভাল হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও দেখেছি ওসব। দু'বছর আগে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ভুটানী বস্তিতে ঠিক এই রকম একটা ঘটনা বাবা-মা আমি সবাই দেখেছিলাম। মামাও তো সে কথা বাবার কাছে শুনেছেন বোধ হয়।" এবার বাপ্পা একটু সরে বসে তিনু মামার দিকে তাকিয়ে বলে।

তিনু মামা এতক্ষণ চুপ করেই ওদের কথা শুনছিলেন। তিবুর দিকে এগিয়ে বসে মামা বললেন, "আবীর যা বলল তাও ঠিক, আবার তিবু যে ঘটনার কথা শোনাল, সেটাও মিথ্যে নয়। অনেক সময় এমন সব অদ্ভুত ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে, যার কোনও ব্যাখ্যা আমরা সহজে করতে পারি না।"

"আপনি একটা সেইরকম ঘটনাই বলুন না মামা।" বাপ্পা আদুরে গলায় বলে।

তিনু মামা আসলে আবীরের ছোটমামা। রেলে ডাক্তারী করেন। প্রতি বছরই পুজোর সময় দু'মাসের ছুটি নিয়ে এখানে আসেন, ভীষণ আমুদে লোক। ছোটদের নিয়ে হই-হুল্লোড় করেই বেশী সময় কাটান। তিনু মামা আসা মানেই বাপি-বাপ্পা-তিবু-মহুয়া আর বাবলিদের মজা। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরই আবীরদের বাড়িতে গল্পের আসর বসে। আবীরের মামা হলেও ওর বন্ধু বাপ্পা-তিবু-মহুয়া-বাবলিদের সঙ্গে পাড়ার অন্য ছোট ছেলেমেয়েরাও তিনু মামার গল্পের ভীষণ ভক্ত।

আজ সকাল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দুপুরের পর একটু কমলেও বিকেল থেকেই আবার সেই বৃষ্টি। আর ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টির জন্যই আবীরের সব বন্ধুরা আজ আসতে পারে নি। বৃষ্টি তো ছিলই, তার উপর আবার লোডশেডিং হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মামা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই গরম তেলেভাজা আর মুড়ি ট্রেতে সাজিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল বাবলি।

মামার সামনে ট্রে নামিয়ে মাথার ভেজা চুল হাত দিয়ে ঝেড়ে বলল, "বাবা-বাবা, কি ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টিই না শুরু হয়েছে! সেই কখন থেকে আসব ভাবছি। মাসিমা আবার তেলেভাজা ভাজতে বললেন। তা গল্প কি শুরু হয়ে গেছে মামা?"

"না-না, তুমি ছাড়া আসর জমে নাকি?" বাবলির হাত ধরে পাশে বসিয়ে সস্নেহে বলেন তিনু মামা। মুড়ি আর তেলেভাজার প্লেটগুলো সবার সামনে এগিয়ে দেয় বাবলি। বৃষ্টিটা অল্প একটু কমেছিল, আবার জোরে শুরু হল। সঙ্গে বাতাসের দাপাদাপি। টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ওদের ছায়াগুলো একসঙ্গে জড়াজড়ি করে রয়েছে।

খাওয়া শেষ করে বাবলির দিকে তাকিয়েই তিনু মামা বলেন, "আজ কিন্তু ভূতের গল্প হবে, তোমার ভয় করবে না তো বাবলি?"

"সবচেয়ে ভাল লাগা সাবজেক্ট মামা। ভূতের কথা শুনতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। সেই গত বছর পুজোর সময় আপনি মনেন্দ্রগড়ের 'গহন রাতের বন্ধু'র দাহারুর ঘটনা বলেছিলেন। ঠিক সেই রকম গা ছমছম করা একটা গল্প বলুন।"

"আর দেরী না করে এবার আপনি শুরু করুন মামা।" তিবুও বাবলির কাছে এগিয়ে বসে। আবীর আর বাপ্পাও তিনু মামার কাছে সরে যায়। একবার সবার

মুখের দিকে তাকিয়ে রুমালে মুখ মুছে কী যেন চিন্তা করেন তিনু মামা। তারপর সহজ ভাবেই বলেন ঃ

"শোন তাহলে, এবারও সেই মধ্যপ্রদেশেরই ঘটনা। মানে আমার চাকরির প্রথম জীবনের যে সময়গুলো মধ্যপ্রদেশের ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ী এলাকার মধ্যে কেটেছে তখনকারই গল্প। মনেন্দ্রগড় থেকে আমি তখন চিরিমিরিতে বদলি হয়েছি। আমার মত আরও কিছু বাঙালী মধ্যপ্রদেশের এই নির্জন পাহাড়ী এলাকায় চাকরির খাতিরেই বসবাস করছেন।

চিরিমিরি থেকেও একটা নতুন রেলপথ পাহাড়ের গা দিয়ে বসছে। এসব অঞ্চলের সব কিছুই কোলিয়ারীর জন্য। বহু বাঙালী এখানে কোলিয়ারীতে চাকরি করেন। নতুন রেল লাইন বসানোর কাজেই আমরা এসেছি! অস্থায়ী ডাক্তারখানাও রয়েছে। আমি সেখানকার ডাক্তার।

দিনের বেলাটা নানা কাজের মধ্য দিয়েই কেটে যায়। কিন্তু রাত্রি হলেই কেমন গা ছমছম করে ওঠে। মহুয়া গাছের নীচে ফুলের মধু খেতে ভালুকও আসে মাঝে মাঝে। রাত্রিতে পাহাড়ের গায়ে গাছের শুকনো পাতায় আগুন লেগে মালার মত নাচতে থাকে। আমাদের জন্য পাহাড়ী বাঁশ আর ছোট ছোট টালি দিয়ে অস্থায়ী ঘর বানানো হয়েছে।

চিরিমিরি শহরটাও কিন্তু পাহাড়ের উপরেই। নীচে রেল স্টেশন। উত্তর দিকে সোনালী পাহাড়। পশ্চিমে সিদ্ধি বাবার পাহাড়, কিছুটা দূরে বিশাল নদী। পাহাড়ী ঝর্না থেকেই নদী বেরিয়েছে। এমনিতে শান্ত হলেও বর্ষার সময় ভীষণ দেখতে হয় সেই ছোট্ট নদী। নদীর ধারেই শ্মশান।

এখানে এসে অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে। বিদেশে বাঙালীরা একসঙ্গে হলেই গল্পের আসর বসে। তখন আর কে ডাক্তার, কে ইনজিনীয়ার, কে কেরাণীবাবু, সে সব হিসেব থাকে না। সবাই বাঙালী—এইটাই আসল পরিচয়। নতুন ইনজিনীয়ার রজত গুপ্তর সঙ্গেই আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমরা কয়েকজন শুধু গল্প আর আড্ডার জন্যই এক একদিন এক একজনের কোয়ার্টারে বসে সময় কাটাই। মধ্যপ্রদেশের সেই হাড় কাঁপানো এক শীতের রাত্রে কোয়ার্টারে বসে আমরা কয়েকজন গল্প করছিলাম। আসরে বেশী গল্প রজত গুপ্তই বলে।

যে দিনের কথা বলছি, সেদিনও এই আজকের মত বিশ্রী আবহাওয়া ছিল। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর পাহাড়ী বৃষ্টির এমনই মজা, একবার শুরু হলে তিন-চার দিনের আগে থামে না। সেদিন আমার কোয়ার্টারেই আসর বসেছিল।

সন্ধ্যে হতে না হতেই এসে গেছে সবাই। কিছুক্ষণ অফিসের কথা আলোচনার পরই আমার রাঁধুনি ও খবরদারি করার লোক বুধনরাম গরম পাঁপড় ভাজা আর চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে রজত গুপ্ত বলল, "জানিস প্রশান্ত, আজকের এই ওয়েদারের সন্ধ্যায় ভূতের গল্প খুব ভাল জমে।" গুপ্তর কথা শুনে একযোগে ঘোষাল, রায়, নন্দী, বোস, মজুমদার আর সামন্তও সম্মতি জানাল। আমি শুধু চুপ করে থাকি।

"তোমার বন্ধুদের নাম নেই ছোটমামা ?"

আচমকা আবীরের প্রশ্নে ওর দিকে তাকিয়েই চুপ করলেন তিনু মামা, তারপর হেসে বললেন, "ধরেছিস ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে বলতে। ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে আমরা সবাই পদবী ধরে ডাকতেই অভ্যস্ত। নাম একটা করে সবারই আছে। তবে পদবীতে ডাকাই সুবিধে। ইনজিনীয়ার রজত গুপ্ত আর আমিই শুধু দুজনাকে নামে ডাকতাম।"

"আপনি বলুন মামা—মাঝখানে থামলে এ সব গল্প জমে না।" বাবলি মামার হাত ধরে বলে, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে তিনু মামা শুরু করেন।

রজতের ওই কথা শুনে আমি করুণ চোখেই ওর দিকে তাকাই। কারণ আমার এক অসতর্ক মুহূর্তে ওর কাছে আমার যে একটু ভয় বেশী, সে কথা বলে ফেলেছিলাম। আমার মুখের দিকে আবার তাকিয়ে মুখে চাপা হাসি নিয়ে রজত এবার বলে, "প্রশান্তর যখন মত নেই তখন ভূত আজ গাছেই থাক। যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আজ বরং বৃষ্টি আর বন্যার গল্পই হোক।"

রজত গুপ্তর কথায় হেসে ওঠে সবাই। আমার অবস্থা তখন বেশ অসহায়। সবার সামনে ভীতু প্রমাণিত হওয়া একটা লজ্জারও কথা। তাই ওদের হাসি থামলে বড় এক টিপ নস্যি নাকে ঢুকিয়ে শব্দ করে নাক ঝেড়ে আমি বললাম, "না—না— বৃষ্টি নয়। আজ আসরে গাছ থেকে ভূতই নামাও। দেখি কেমন তোমার গেছো ভূত ?"

আর একবার হাসির ঝড় উঠল ঘরে। আমার দিকে তাকিয়েই রজত গুপ্ত শুরু করল, "এক শ্বাসরুদ্ধকর রহস্য আর অশরীরী আত্মার কাহিনী। বর্ধমানের কাছে এক গ্রামে ওর ছোড়দির শ্বশুর বাড়িতে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়ে রজত বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সমবয়সী কয়েকজনের বাজি ধরে ডানপিটে রজত অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে, শ্মশানের মাটিতে বাঁশ পুঁতে ফিরে আসবার সময় কীভাবে এক ভূতের খপ্পরে পড়েছিল, আর সেই ভূত সারারাত মাঠ-ঝিল-রাস্তা ঘুরিয়ে শেষে ভোর রাত্রিতে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল, সেই অসাধারণ গল্প বেশ গুছিয়ে বলল রজত।"

রজত গুপ্তর গল্পের রেশ না থামতেই ঘোষাল শুরু করল আর এক কাহিনী। ঘোষালের এক জ্যাঠতুতো দাদা নাকি প্রায়ই রাত্রে ঘর থেকে একা একা বেরিয়ে যেতেন। শেষে একদিন এক কবরখানার কাছে কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরে তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল।

এর পর মজুমদার আর সামন্তও ওদের জানা ঘটনা বলল। আমরা সবাই তোমাদের মতই গায়ে গা লাগিয়ে গল্প শুনছিলাম। আর এ সব গল্পের মজা হল একজন বললেই আর একজন শুরু করবে। শুনতে ভয় হলেও মজাও আছে।

গল্পে গল্পে রাত বেড়ে চলে। বুধনরাম ভিতরের বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়েই রজত বলে ওঠে, "ইস, দেখ কাণ্ড, রাত যে এগারোটা বাজতে চলেছে। আজ ভূতের ফাইল এখানেই বন্ধ থাক।"

রজতের কথায় সবাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় রজত আবার হাসতে হাসতেই আমাকে সাবধানে থাকতে বলল। ওরা চলে যেতেই বুধনরামকে ডেকে তুললাম। কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লাম। বুধনরাম বাইরের বারান্দাতেই শোয়। সেদিন ওকে আমার ঘরের মধ্যেই বিছানা করতে বললাম। মনের মধ্যে একটা অজানা ভয়ের রেশ তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঠাকুরের নাম স্মরণ করেই দু' চোখ বন্ধ করলাম।

হঠাৎই অনেক মানুষের কথার শব্দে একবার চোখ খুলেই বন্ধ করলাম। বিস্ময়ের ঘোর যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমাকে ঘিরে তখন অনেক মানুষের মুখের ভিড়। ইনজিনীয়ার রজত গুপ্তর গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মনে হল। উঠতে চেষ্টা করেও পারছি না। বুকের কাছে একটা ব্যথা আর ভার ভার লাগছে। আসলে আমি যে কোথায় কী অবস্থায় তখন আছি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তবুও আস্তে আস্তে মনে জোর এনে চোখ খুললাম। দিনের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। অফিসের হেড-ক্লার্ক থেকে শুরু করে পিওন শিউরতন পর্যন্ত সবাই আমাকে ঘিরে রয়েছে। আমার তাকান দেখেই রজত সামনে এগিয়ে এসে বলল, "কি, এখন কেমন লাগছে?"

রজতের কথার জবাব না দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলাম। এতক্ষণ পরে একটু একটু করে সব ঘটনা যেন আবার ছবির মত স্পষ্ট ভেসে উঠল চোখের সামনে। বেশ মনে পড়ছে, গতকাল রাত্রে শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর তারপর—এখনও যেন কানে বাজছে সেই ডাক, "প্রশান্ত—প্র—শা—ন্ত—" স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাইরে রজত গুপ্তই আমার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছিল।

ওর ডাক শুনেই বিছানা থেকে উঠেছিলাম আমি, আর দরজা খুলে রজত গুপ্তকেই দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর তো ওরই নির্দেশমত রাস্তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রজত বেশ উত্তেজিত ভাবে আমাকে বলেছিল, "হঠাৎই একজন ছত্রিশগড়িয় মজুর পায়খানা আর বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাই আমাকে এখুনি তাকে দেখতে যেতে হবে। এই পর্যন্ত বেশ মনে পড়ছে। কিন্তু এর পর যে কি হল, সে সব আর কিছুই মনে করতে পারছিলাম না।"

এই পর্যন্ত বলে তিনু মামা একটু থামলেন। আবীর, বাপ্পা, তিবু আর বাবলিও বড় বড় চোখ করে চুপ করে আছে। নীরবতা ভেঙ্গে তিবুই মুখ খুলল, "তারপর কি হল মামা?"

তিনু মামা যেন হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর রুমালে মুখ মুছে বললেন, "তারপরের ঘটনা রজত গুপ্তর মুখেই শুনেছিলাম সেদিন। রাত প্রায় দুটোর সময় আমি নাকি ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিলাম। দরজা খোলার শব্দেই বুধনরামের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুমের চোখে ও প্রথমে ভয়ই পায়। তারপর আমাকে বাইরে বেরুতে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দরজায় শিকল তুলে আমার পিছু নেয়।

আমি তখন টলতে টলতে বিশাল বোরা নদীর ধারে যে শ্মশান, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি খুব তাড়াতাড়ি। জোরে পা চালিয়েও বুধনরাম আমাকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। শেষে মরিয়া হয়ে ও চিৎকার করে ছুটতে শুরু করে আমাকে ধরতে।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসে কোনও রকমে আমাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে। বুধনরামের গায়ে পড়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমি। দুজনেই একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ি মাটিতে।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জাপটে ধরে।

বুধনরামের চিৎকার শুনেই রজতরা সব ওদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর খুঁজতে খুঁজতে আমাদের দুজনাকেই আবিষ্কার করে।

রজত গুপ্তর কথা শেষ হলে আবার জোরে হেসে ওঠে সবাই। অনেক মুখের হাসি আর সরস মন্তব্যের সামনে নিজেকে তখন ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে রজত আর ঘোষালের গল্প শুনেই যে আমার এ রকম হয়েছিল, হেড-ক্লার্ক স্বামীনাথন সে কথাটা বেশ রসিয়ে বোঝালেন সবাইকে। অসহায় অবস্থায় শুয়ে থেকে আমি শুধু মনের জোর আনতে চেষ্টা করতে লাগলাম।

"কিন্তু মামা"—তিনু মামা চুপ করতেই আবীর হঠাৎই ডেকে ওঠে। এতক্ষণের গা ছমছমে ভাব কাটিয়ে বাবলিরাও নড়ে বসে। আবীরের দিকে তাকিয়ে মামা বলেন, "কি হল ?"

"না—মানে সত্যিই কি আপনি সেই রাত্রে বন্ধুর ডাক শুনেই বাইরে বেরিয়ে ছিলেন ?" আবীরের দিকে তাকিয়ে আবার কী যেন চিন্তা করেন তিনু মামা। তারপর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি জান—এটা যদি বানানো গল্প হত, তাহলে অনেক কথাই বলতে পারতাম। কিন্তু এ তো গল্প নয়। আমার নিজের জীবনের ঘটনা, যা আমি আজও ভুলতে পারি নি। তোমাদের সবার সঙ্গে আমার মনেও বিরাট একটা প্রশ্নের বোঝা আজও রয়ে গেছে।"

সত্যিই যে সে রাত্রে রজত গুপ্তর ডাক শুনেই বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিলাম আমি; আর চোখের সামনে স্পষ্ট তাকে দেখে তারই নির্দেশমত রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিলাম, এ কথা কাউকে বোঝানো যাবে না, যে আমি দিনের বেলাতেও বিশাল বোরা নদীর রাস্তায় যাই না, সেই আমি অত রাত্রে সেখানে গেলাম কি করে ?

বহুবার মনে হয়েছে, একান্ত নিভৃতে রজতকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যি সত্যিই সেই রাতে আমাকে ভয় দেখানোর জন্য সে আমার দরজায় হাজির হয়েছিল কিনা ? কিন্তু পাছে আর একবার এই কথায় সবাই হাসাহাসি করে, তাই জিজ্ঞাসাও করতে পারি নি। তাই, সেদিন রাত্রের ঘটনা আজও আমার কাছে প্রশ্নই থেকে গেছে। বিস্ময়ের সমাধান সেদিনও করতে পারি নি, আজও জানি না।
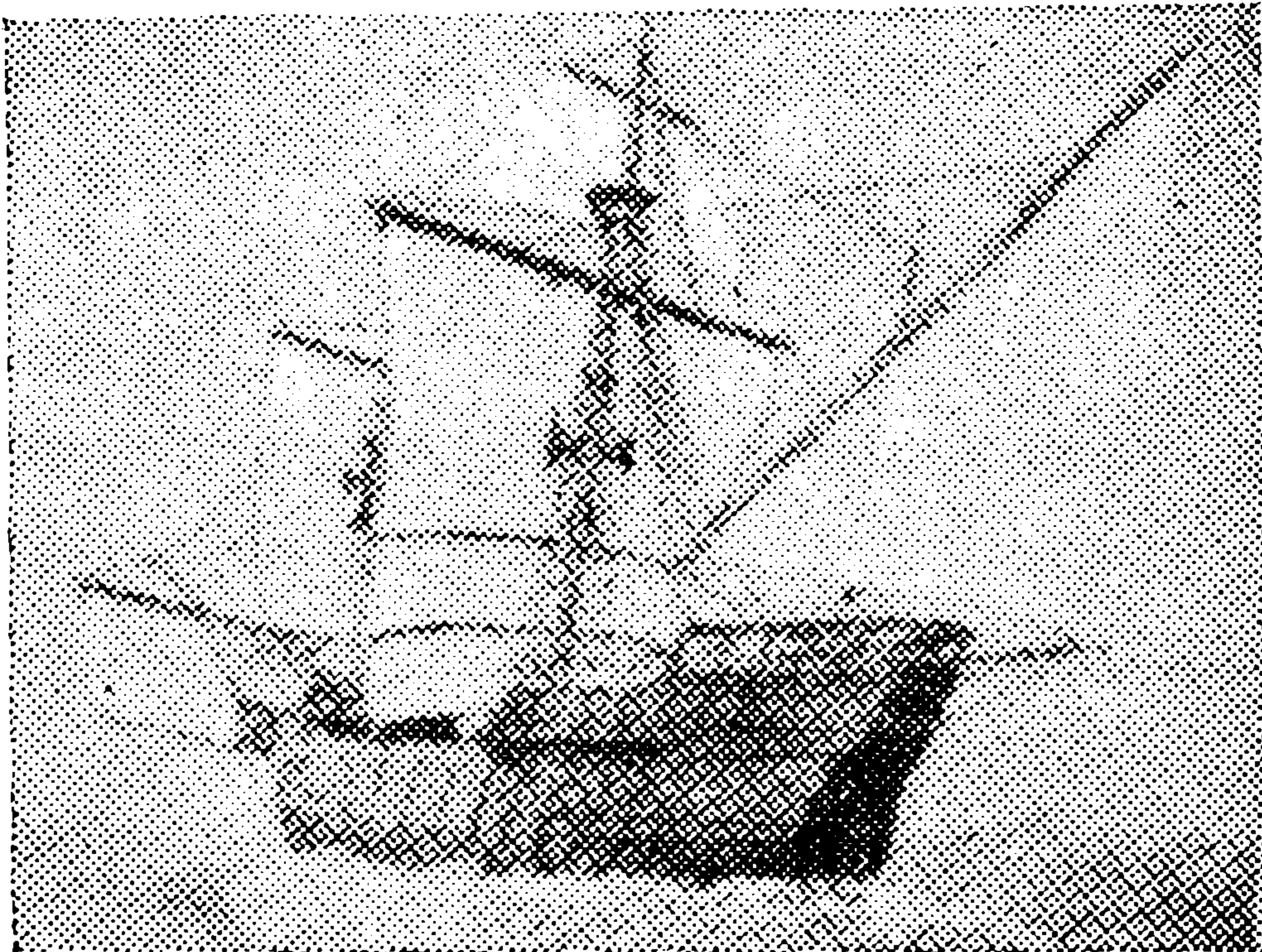
মণি ও মুক্তা

কলম্বাস কিংবা তাঁর প্রখ্যাত জাহাজ 'সাণ্টা মারিয়া'র কোন প্রামাণ্য ছবির অস্তিত্ব আজও পর্যন্ত অজ্ঞাত। তবে উপরোক্ত ছবিটি উক্ত জাহাজের হুবহু মডেল বলেই মনে করা হয়।

দিব্যদৃষ্টি

আশাপূর্ণা দেবী
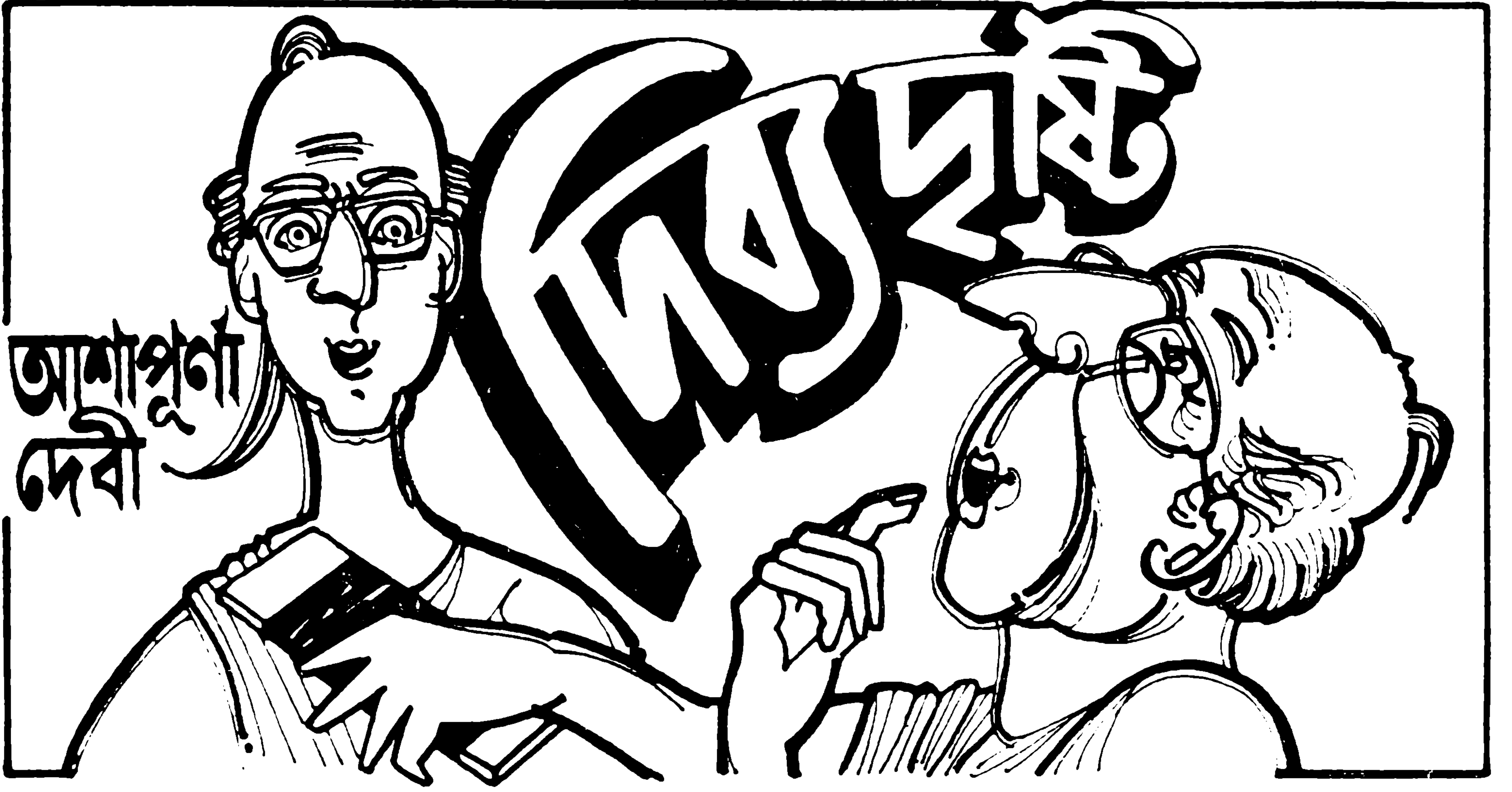
আমার ঠাকুর্দার বাবার ঠাকুর্দা বলদেশ্বর বাচস্পতি ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল ডাকসাইটে। হরবখত তাঁকে এই কেঁদো কাসুন্দিপুরের গর্ত থেকে ছুটতে হতো কাশীতে, নবদ্বীপে, প্রয়াগে পণ্ডিতসভায় সভাপতিত্ব করতে। বিশেষ করে কাশীতেই।

সারা ভারতবর্ষ থেকে মহা মহা সব বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি আসতেন তখন 'বারাণসী বিদ্বৎ সম্মেলনে'। সেই সভায় সভাপতিত্বের ভার কিনা কেঁদো কাসুন্দিপুরের বলদেশ্বর বাচস্পতির।

বোঝো ব্যাপার!

সাধে শাস্ত্রে বলেছে, 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।'

তা সত্যিই খুবই নাকি পুজো-টুজো পেতেন বলদেশ্বর। 'পুজো' মানেই তো নৈবিদ্যি? সেই নৈবিদ্যির বহরটি বেশ জম্পেশই হতো। সম্মেলন সেরে যখন দেশে ফিরতেন বাচস্পতি, দেখা যেতো সঙ্গের লোকেরা নৌকো থেকে (নৌকোই তো। তখন আর রেলগাড়ি কোথা?) জিনিস নামাচ্ছে তো নামাচ্ছেই। ইয়া-ইয়া পেতলের ঘড়া গামলা-থালার গাদা, ঝকমকে ঝকঝকে রুপোর গেলাশ বাটি রেকাবীর গোছা, ডাঁই ডাঁই শাল র‍্যাপার চাদর কম্বল, গরদের জোড়, বেনারসী দোপাট্টা, আর ঝোড়া ঝোড়া কাশীর সুবিখ্যাত প্যাঁড়া। গরমের সময় হলে তার সঙ্গে অমৃতসম 'বেনারসী ল্যাংড়া'। তখন তো আর লোকে কারবাইড দিয়ে পাকাতে জানতো না, আসল গাছপাকা। তার স্বাদই আলাদা।

এ সব শুনেছি আমি আমার ঠাকুর্দার কাছে, তিনি আবার তাঁর বাবার কাছে, আর তিনিও আবার—সে যাই হোক, অবিশ্বাসের কিছু নেই। তখন টাকায় ষোলো সের প্যাঁড়া পাওয়া যেতো, টাকায় দুশো আমের টুকরি, আড়াই টাকা তিন টাকা রুপোর সের, আর পেতল কাঁসা শাল দোশালার কথা তো বাদই দাও। আন্দাজ করে বুঝে নিতে হবে।

এসবই হচ্ছে 'পণ্ডিত বিদায়' বাবদ।

মূল পণ্ডিত বলে কথা! কাজেই বলদেশ্বর বাচস্পতির তখন যাকে বলে জমজমাটি অবস্থা। নাম শুনলেই অন্য পণ্ডিতরা উদ্দেশ্যে নমস্কারও করেন, আবার মনে মনে হিংসেও করেন।

তা এটাই তো 'চরম সুখের নিদর্শন'? লোকের হিংসের পাত্র হওয়া। কিন্তু মানুষের চিরকেলে স্বভাবই এই, সুখে থাকতে ভূতের কিল খেয়ে মরা।' অত বড় পণ্ডিত মানুষ হয়েও বলদেশ্বর ওই মনুষ্য ধর্মটির গাড্ডায় পড়ে মরলেন। কোনখানে কিছু নেই, দরকারের বালাই নেই, সেধে ডেকে এনে খেতে বসলেন ভূতের কিল।

সম্মেলনের শেষ দিনে যখন সন্ধ্যাকালে পণ্ডিতবর্গ আরামে গঙ্গার ধারে বসে হাওয়া খাচ্ছেন আর নস্যি নিচ্ছেন, বলদেশ্বর হঠাৎ ধরলেন এক শুঁটকো পণ্ডিতকে। বলে উঠলেন, মহাশয়, অনুমান হয় আপনি বঙ্গদেশীয়।

শুঁটকো চমকে উঠে বললেন, অনুমানের কারণ?

কারণ সভায় আপনার নীরবতা। প্রতিদিনই দেখি, কিন্তু কোনদিন শাস্ত্র আলোচনায় যোগ দিতে দেখি না। এর কারণ এই মনে হয়, স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত ভাষা বলার অনভ্যাস। বাঙালী পণ্ডিতরা মহাশাস্ত্রজ্ঞ হলেও যদি উচ্চারণে নির্ভুল না হন, এই ভয়ে অনেক সময় নীরব থাকেন।

শুঁটকো এক ঝুড়ি দাঁত বার করে বলে ওঠেন, মহাশয়ের অনুমান ঠিক। ক'দিন পরে মাতৃভাষায় কথোপকথন করে বাঁচলাম। আপনি এতো বড় ব্যক্তি, বলতে সাহস হয় না, তবু বলি, দয়া করে যদি একবার আমার আঙিনায় আসেন, প্রাণ খুলে দু'চারটি কথা বলে বাঁচি। বাঙালী বলেই সাহস।

উত্তম কথা। তা একটি প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে লাল চেলি জড়ানো ওই পুঁথিটি কিসের? প্রতিদিন সভায় দেখেছি, এখনো দেখছি, একবারও কুক্ষীচ্যুত করেন না। কৌতূহল বোধ করছি।

শুনে শুঁটকোর মুখে একটি অলৌকিক সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। তারপর অতি বিনয়ের সঙ্গে বলেন, ও কিছুই না, সামান্য একটু বিদ্যার বোঝা।

বিদ্যার বোঝা!

বলদেশ্বর শিহরিত হলেন, বিদ্যাকে 'বোঝা' বলছেন? এটা কি সঙ্গত? এর অর্থই বা কি?

শুঁটকো আরো সূক্ষ্মতর হাসি হেসে বলেন, বর্তমানে ওটি আমার কাছে বোঝা-

স্বরূপই হয়ে উঠেছে মহাশয়। এটি একটি আধা দৈবি আধা ভৌতিক বিদ্যা। গুরুর নির্দেশ, যদি এর হাত থেকে মুক্ত হতে চাও, কোন উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ করে তবে—

কিন্তু একটি আয়ত্ত বিদ্যার হাত থেকে মুক্ত হতে চান কেন? এ তো বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার।

মহাশয়, আমার সংসারাদি নাই, ইচ্ছা যে শেষ বয়সে হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করি। তাই—অথচ গুরুর নির্দেশের জন্য—

শুনে বলদেশ্বর কৌতূহলী হলেন, তা বিদ্যাটি কী?

শুঁটকো মোলায়েম হাসি হেসে বলেন, আজ্ঞে মহাশয়, 'দিব্যদৃষ্টি'। যে মুহূর্তে আমি এই পুঁথিটি তামা তুলসী ও গঙ্গাজল সহযোগে কারো হাতে সমর্পণ করবো, সেই মুহূর্তেই সমগ্র পুঁথির জ্ঞানটি প্রাপকের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে দিব্যদৃষ্টি দান করবে।

—অ্যাঁ! বিদ্যা আয়ত্তের জন্য অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে না?

—না না। সমর্পণ মাত্রই—

বলদেশ্বর পুলকে রোমাঞ্চিত হলেন।

সারাজীবন শুধু পুঁথি পড়ে পড়ে হাড় কালি করেই তবে বাগ্‌দেবীকে বাগ মানিয়েছেন, আর এ একেবারে মুফতে মিলে যাওয়া।

বিনয়ের অবতার হয়ে বললেন, মহাশয় কি 'আমাকে' উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করতে পারেন না?

—সে কী! সে কী! কী বলছেন—

শুঁটকোর টিকি লটপটিয়ে উঠল, খড়ম খটখটিয়ে উঠল, দাঁতের পাটি বিকশিত হয়ে গেল।—আপনি হচ্ছেন পাণ্ডিত্যের পাহাড়, শাস্ত্রজ্ঞানের সাগর, বিদ্যার বন্যা, আপনি এই ক্ষুদ্র বিদ্যাটি গ্রহণ করবেন? এ তো আমার স্বপ্নের অতীত। তবে—এখনি এই শুভ সান্ধ্য মুহূর্তেই কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাক।

বলেই শুঁটকো গঙ্গার ঘাটে প্রতিষ্ঠিত একটি তুলসী মঞ্চের তুলসী গাছ থেকে তিন-খানি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে, তাড়াতাড়ি গঙ্গা থেকে উড়ুনির কোণ ভিজিয়ে গঙ্গাজল এনে ফেলে, নিজের আঙুলে পরা তামার আংটিটা খুলে নিয়ে বলেন, এই তামা, এই তুলসী, এই গঙ্গাজল, ধরুন মহাশয়, আমার হাত থেকে। এই যে—'অহং দদামি—'

বলদেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'অহং গৃহ্ণামি।'

ব্যস। শুঁটকো পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে ঘাট থেকে উঠে পড়ে, অত অত পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তার ওপরে উঠে চোঁ-চাঁ দৌড়।

কিন্তু এ কী!

বলদেশ্বর এ কী দেখলেন?

তিনিও পিছু পিছু ছুটতে থাকেন, ও পণ্ডিত, করেন কী! করেন কী! আপনার সামনেই যে একটি শুষ্ক কূপ! আর অগ্রসর হলে মৃত্যু অনিবার্য।

দুই পণ্ডিতের কাণ্ডয় রাস্তার পাণ্ডা থেকে গুণ্ডা (কাশীতে যেটি চিরবিখ্যাত), ভক্ত থেকে ভণ্ড এবং সারমেয় থেকে ষণ্ড, সবাই সচকিত হয়ে দেখে কী হলো?

কিন্তু কারণটা শুনে সবাই হেসেই অস্থির।—শুকনো কূয়ো?

পণ্ডিতমশাই কি দিবাস্বপ্ন দেখছেন? এখানে শুকনো কূয়ো কোথায়?

বলদেশ্বরও অবাক হয়ে দেখেন, সত্যি তো, কোথায় শুকনো কূপ? শুঁটকো পণ্ডিত তো লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলেছেন। অতঃপর একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। চিরবিখ্যাত কাশীর গলি, একবার ঢুকে পড়লে তাকে আর খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই।

কিন্তু খুঁজতে কে চাইছে? বলদেশ্বর শুধু অবাক হয়ে ভাবছেন, কেন, তিনি স্পষ্ট দেখলেন শুঁটকো পণ্ডিত চটপট হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন একটি জলহীন শুকনো কূয়োর দিকে, আর—আর একটা যেন আর্তস্বরও কানে এলো। চকিতের মতই। কিন্তু কেন?

হঠাৎ চৈতন্য হলো, ওঃ। এটাই তাহলে সদ্য পাওয়া বিদ্যে 'দিব্যদৃষ্টি'। এই দণ্ডে না হলেও, শুঁটকো কোথাও কোনোখানে একটি শুকনো কূয়োর মধ্যে পড়ে প্রাণ হারাবেন। হয়তো ওই যে গলির মধ্যে ঢুকলেন, তারই শেষ প্রান্তে, বা কোনো বাঁকে।

আবার গঙ্গার ঘাটে ফিরে এসে বসলেন বাচস্পতি, লাল চেলি জড়ানো পুঁথিটি উত্তরীয়র মধ্যে আড়াল করে। অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো, কয়েকদিন যাবৎ অবিরাম শাস্ত্রের কচকচিতে বাচস্পতির মস্তিষ্ক ভার হয়ে গেছে, তাই হঠাৎ দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি ঘটেছে।

বাচস্পতি নিজেও সঠিক বুঝতে পারছেন না আসলে কী!

কিন্তু ব্যাপার আরো ঘোরালো হলো, যখন বলদেশ্বর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ওই যাঃ। শিশুটি মাতৃক্রোড় থেকে গঙ্গাগর্ভে পড়ে গেল।

শুনে তো সবাই থ।

এই পণ্ডিতজন জমজমাটি ঘাটে 'শিশুক্রোড়ে মা' আবার কোথায়? তাছাড়া, পড়ে গেলে মা চেঁচিয়ে উঠবে না? শোরগোল হবে না? কোনোখানে তো টুঁ শব্দটি নেই। ওপাশে পাঠক ঠাকুর যেমন সুর করে ভাগবত পাঠ করছিলেন, করেই চলেছেন। গঙ্গা নিস্তরঙ্গ নির্মল।

তার মানে পণ্ডিতের মাথাটি সত্যিই বিগড়েছে।

কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বলে উঠলেন, পণ্ডিত মশাই, কয়েক দিনের পরিশ্রমে আপনি ক্লান্ত, মনে হয় গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করা কর্তব্য।

আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হই নি মহাশয়, বলেন তো এখনই শাস্ত্রযুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হতে পারি।

না, না, তাতে প্রয়োজন নেই। আপনি এই গঙ্গার ধারের নির্মল বায়ু আরো কিছুক্ষণ সেবন করুন।

কিন্তু আরো কিছুক্ষণটা কতক্ষণ?

হঠাৎই পাশের ঘাট থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠল, তার সঙ্গে বহু মানুষের কলকোলাহল।

কী ব্যাপার! সবাই সচকিত! ছুটল কেউ কেউ পাশের ঘাটে। বলদেশ্বরও এগোতে থাকেন এই ঘাটের সিঁড়ি ধরে ধরে। দু ঘাটের মাঝখানে একটি শিব-মন্দির, তার চাতাল দিয়েই একেবারে ও ঘাটে গিয়ে পড়া যায়! কিন্তু বলদেশ্বরের আর তেমন তাড়া নেই, তিনি দেখতে পেয়েছেন, আশপাশের নৌকোর মাঝি-মাল্লারা শিশুটিকে তুলে এনেছে, এবং সে বেঁচেও আছে। একটু পরেই সমবেত উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল, উঠেছে! উঠেছে!

অতঃপর বুঝতেই পারছ বলদেশ্বরকে ঘিরে কী জটলা! প্রশ্নের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কী করে উনি ঘটনা ঘটবার আগেই আগাম বুঝে ফেললেন?

ইত্যবসরে দু' একজনকে বলাবলি করতে শোনা গেল, কাশীতে আজকের দিনটা দেখছি বিপদ মুক্তির দিন। এই কিছুক্ষণ আগে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গণেশ মহল্লার ওদিকে একটি ভগ্নগৃহ সংলগ্ন শুষ্ককূপে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন, কিন্তু ভগবানের এমনি দয়া যে দুটো হনুমান তাই দেখে কূয়োয় নেমে তাঁকে তুলে নিয়ে এল। ভাবো কাণ্ড!

সমগ্র কাশীর মানুষ ছেঁকে ধরল বলদেশ্বরকে। [পৃঃ ১৪৮

লোকে তো দোহাত্তা সেই হনুমানদের কলা, ছোলা ইত্যাদি খাওয়াতে লেগে গেছে। বলছে, ওরা সামান্য হনুমান নয়, রামচন্দ্রের ভক্ত 'বীর হনুমান'। নচেৎ এরকম ত্রাণের কাজ শিখল কী করে?

তা তো হলো। কিন্তু কে যেন কূয়োয় পড়ার ভবিষ্যৎ বাণীটি করেছিলেন? কে আবার, এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মশাই, যিনি পণ্ডিত সম্মেলনে প্রধান ছিলেন আর এখন এখানে বসে রয়েছেন।

আশ্চর্য! এতোদিন ধরে ইনি এতো শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলেন, কই এই বিদ্যেটির

কথা তো প্রকাশ হয় নি। তার মানে চাপা মানুষ! কিন্তু আর তো চেপে রাখা চলবে না, একবার যখন জেনে ফেলা হয়ে গেছে।

সমগ্র কাশীর মানুষ একেবারে ছেঁকে ধরল বলদেশ্বরকে। 'ধরল' বলে কিছুই বলা হয় না, ধরে আর ছাড়ল না। দিন নেই, রাত নেই, সকাল-সন্ধ্যে-দুপুর কিছু নেই, দলে দলে লোক আসছে, মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো! ভবিষ্যত বলে দিতে হবে। বেশীর ভাগই অবাঙালী, পয়সাকড়ি আছে, তারা আবার মোটা মোটা টাকা আনে। তারটা আগে বলে দিতে হবে। বলদেশ্বর যতই বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমি বাপু জ্যোতিষীও নই, গণৎকারও নই, হঠাৎ হঠাৎ সামনের জিনিসটা আগাম দেখতে পাই! কিন্তু সে কথায় কে কান দিচ্ছে? বলদেশ্বরকে প্রায় ছিঁড়ে খাবার যোগাড়।

দেশে ফেরা মাথায় উঠল, এখন প্রাণ রক্ষে করা দায়। পুজো করার সময় নেই, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। এমন কি, গুছিয়ে ধুতি উত্তরীয়টা পরে লোকসমাজে বেরোবেন তারও সময় নেই। কাজেই হঠাৎ হঠাৎ লোক সমাজে অভ্রমের একশেষ!

ভীড় ঠেকাতে কোথায় কাছা, কোথায় কোঁচা, কোথায় চাদর! পৈতে পর্যন্ত লটর-পটর। সবাই তারস্বরে প্রশ্ন করে চলেছে, পণ্ডিত মশাই, বলে দিন, এর অসুখটা কবে ভাল হবে? পণ্ডিত মশাই বলুন আমার যে মামলাটা চলছে, তাতে আমি জিতবো কিনা?

বলদেশ্বর এর উত্তর দেবেন কী করে? তিনি তো ঘটনাটাকে যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছেন ততক্ষণ নীরেট বোদা। যেটা দেখতে পান, যেমন হঠাৎ একদিন এক বাঙালী মহিলাকে বলে উঠলেন, মা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বিবাহের মঙ্গল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করুন, আপনার সঙ্গের এই নাতনীটির আজ রাত্রেই বিবাহ।

শুনে তো মহিলা হাঁ।

সে কি ঠাকুরমশাই! নাতনী সবে তো এই দশ বছরের! ঘরে একটাও টাকা নেই, পাত্তর কোথায় তার ঠিক নেই, বিয়ে কী—

ঠাকুরমশাই বললেন, কী, তা জানি না মা, তবে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি মেয়েটির বিবাহ হচ্ছে। পাত্র অতি সুন্দর, আর মেয়েটির মাথা থেকে পা অবধি স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত।

মহিলাটি বেজার গলায় বললেন, বাঙালী হয়ে বাঙালীকে তামাসা করছেন? আমি দীনদুঃখী গরিব বিধবা মা-বাপ মরা এই নাতনীটাকে দু'বেলা ভাল করে খেতে দিতেই পারি না। আর তাকে কি না সর্বাঙ্গে গহনা পরিয়ে—

ঠিক এই সময় ঘটলো এক কাণ্ড! একটা লোক ভিড় ঠেলে ছুটে এসে ডাক পাড়ে, 'নারাণীর ঠাকুমা' বলে কেউ আছেন এখানে? নারাণীর ঠাকুমা?

এই তো—এই তো আমি!

মহিলাটি তদব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান, কী হয়েছে? কী ব্যাপার মুকুন্দ?

ব্যাপার গুরুচরণ! শীগগির নারাণীকে নিয়ে চলে আসুন। আজই এই সন্ধ্যের লগ্নে নারাণীকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে হবে।

মহিলা তো আকাশ থেকে পড়েন, ওমা! অ্যাঁ। ইকি অনাছিষ্টি কথা! এ যে একেবারে পাগুলে কথা।

পাগুলে ছাগুলে জানি নে মাসী। কথা এই, বর্ধমান জেলার কোন এক গাঁয়ের জমিদার তোমার বাড়িতে এসে ধর্না পেতে বসে আছে, এদিকে তুমি নিপাত্তা! আমি তো বিশ্বনাথের মন্দির গঙ্গার ঘাট সব খুঁজে এসে—জমিদারবাবু এক কাশীবাসী কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়িতে ছেলের বিয়ে দিতে এসেছিলেন, সেখানে হঠাৎ খটাখটি চটাচটি, ব্যস হয়ে গেল! সেখানের সম্বন্ধ খতম। অথচ এই লগ্নেই ছেলের বিয়ে না দিলে মান থাকে না। কে কী ভাবে তোমার নাতনীর খবর দিয়েছে, 'উচ্চ কুলীন, সুন্দরী কন্যে' শুনে বাবুমশাই চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে ছুটে এসেছে। সঙ্গে এতো বড় একটা বাক্সে এক বাক্স গহনা। একেবারে পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে যাবে। অষ্টাঙ্গে গহনা মোড়া কনে তো চাই! চল না বাবা, কী দাঁড়িয়ে আছো বোকার মত। খানিক পরেই বর এসে পড়বে।

সত্যিই তাই ছিলেন মহিলা, বোকার মত। হঠাৎ 'ঠাকুরমশাই' বলে ডুকরে উঠে বলদেশ্বরকে একটা প্রণাম ঠুকে নাতনীর হাতটা হিঁচড়ে ধরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কথাগুলো লোকটা যতই তাড়াতাড়ি বলে যাক, শুনতে কারো বাকি থাকলো না, বুঝতেও না। তাহলে? এর পর আর কে রক্ষা করবে বলদেশ্বর বাচস্পতিকে 'জনতার' হাত থেকে? ঝাঁপিয়ে পড়বে না জনতা? কার আর বিয়ের যুগ্যি ছেলেমেয়ে নেই? নেই একশো হাজার জটিল সমস্যা? আর সামনে ভবিষ্যতের অজানা অন্ধকার?

বাচস্পতির হাতে রয়েছে সেই অন্ধকার ঘোচাবার আলো।

এমনিতেই লোকে ছেঁকে ধরছিল। ক্রমশঃ ছিঁড়ে খেতে শুরু করল। দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, বাসার দরজায় ধাক্কা, ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই—

ওহে ভাই সকল, আমায় এবার ছাড়ুন, আমায় গৃহে ফিরতে হবে না?

কাতর মিনতি করেন বাচস্পতি, কিন্তু ছাড়তে কার দায় পড়েছে?

যে লোকের হাতে এত বড় একখানা ক্ষমতা, হাত না দেখে, খড়ি না পেতে, কোষ্ঠী বিচার না করে দুমদাম বলে দিতে পারে কী ঘটবে, কী ঘটতে চলেছে, তাকে কেউ ছাড়ে?

পাছে না বলে পালিয়ে যান, এই ভয়ে বাসার দরজায় পাহারা বসে গেল। দু' দুটো ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা মার্কা লোক দিনে-রাতে দরজার আশেপাশে মজুত!

লোকে নাম দিয়েছে 'জাদুকর পণ্ডিত', সংক্ষেপে 'জাদুপণ্ডিত'।

জীবন অতিষ্ঠ। এখন বুঝছেন কেন শুঁটকো বলেছিল 'বিদ্যার বোঝা'।

ঠিক করলেন ওই সর্বনাশা বিদ্যাটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে বাঁচবেন। একদিন স্নানের সময় নিয়ে গিয়ে দেবদেবী, ভূত-প্রেত সবাইকে প্রণাম করে আস্তে পুঁথিটিকে জলের তলায় নামিয়ে রেখে স্নান সেরে বাসায় ফিরলেন 'ভারমুক্ত' মনে।

কিন্তু হরি! হরি! এ কী!

উঁচু তাকে পুঁথিটি যেখানে তোলা থাকতো, ঠিক সেইখানেই তো গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছে। শুধু মোড়া চেলিটার গায়ে বেশ কিছু জলের ফোঁটা।

বলদেশ্বর বাচস্পতির মাথাজোড়া টাক, তাই চুল ছিঁড়বার কোনো উপায় নেই, মনের মাথার চুলের মুঠিটা ধরেই নাড়া দিতে লাগলেন, ওরে মুখ্যু, ভাবলি না, এতো সহজেই যদি রেহাই পাওয়া যেতো, শুঁটকো পণ্ডিত 'অহং দদামি' বলবার জন্যে লোক খুঁজে বেড়াতো না।

আধাদৈবিক, আধাভৌতিক এই বিদ্যাটি অতএব বাচস্পতির ঘাড়ে চেপেই রইল। তাই বাচস্পতির মুখ থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে থাকল। আরে, মণিকর্নিকায় যে দেখছি আজ কোথাকার মহারানী আসছেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, চেলি বেনারসী গায়ে জড়িয়ে। ওঃ, নিশ্চয় কোনো বড় গোছের রানী, মণ মণ খই কড়ি ছড়াচ্ছে।

আহা-হা! এ কী দেখছি। ধনী মাড়োয়ারী ছগনলালের আজ পৌত্র জন্মাচ্ছে। কাঙালী গরিব বড়লোক হয়ে যাবে। দানবীর লোক ছগনলাল।

ওঃ! এ কী মর্মান্তিক! এই কচি বালিকাটিকে সহমরণে নিয়ে এসেছে! ছি-ছি!

'দিব্যদৃষ্টির' মজাই এই—বলব না ভাবেন, তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। এবং কিছু পরেই জানা যায় সব সংবাদই সত্যি!

তবে?

যারা কাছে বসে থাকে তাদেরও তো বলে ফেলেন, ওহে, চটপট বাড়ি যাও, তোমার ঠাকুর্দা বোধহয় পটল তুলল! ও মা জননী, আপনার বাড়িতে আজ বিস্তর কুটুম আসছে। পেল্লায় দল। গাঁ থেকে বেরিয়েছে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করতে। ফেরার পথে অতিথির জন্য সের কতক প্যাঁড়া নিয়ে যান, কাজে লাগবে।

উচ্চ তুচ্ছ সব খবরই সত্যি হয়।

তাহলে আর বাচস্পতি কোন ফাঁক দিয়ে সেই কেঁদো কাসুন্দিপুরে ফিরে যেতে পারেন? দরজার পাহারা আরো শক্ত হয়।

কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়।

তার কাছে কিছুই নয়।

পড়ে থাকলো 'পণ্ডিত বিদায়ের' বিপুল জিনিসপত্র, পড়ে থাকলো আরো কত কী! নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্রও রইলো পড়ে। পাঁজিপুঁথি গীতা-ভাগবত সব থাকল।

একদিন বাচস্পতি নগদ টাকাকড়ি যা ছিল, কোমরের গেঁজেয় পুরে বেঁধে নিয়ে, অপেক্ষাকৃত নির্জন 'অহল্যা বাঈয়ের' ঘাটে চান করতে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

নির্জন হলেও এরকম কাণ্ডে হইহই পড়ে গেল বৈকি! মাঝি-মাল্লারা জলে নেমে তোলপাড় করতে শুরু করে দিল কিন্তু জাদুপণ্ডিতকে আর পাওয়া গেল না। গ্রামের

ছেলে দুরন্ত সাঁতারু বলদেশ্বর ততক্ষণে ডুব সাঁতার দিয়ে কাশীর অপর পার রামনগরে গিয়ে পৌঁছে গেছেন।

এ ঘাটে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি বুক চাপড়াচাপড়ি আর 'হায় হায়'!

তারপর সেই রামনগর থেকে পায়ে হেঁটে, মাল বওয়া গরুর গাড়িতে চেপে খেয়া নৌকোয় চেপে পালাচ্ছেন কীভাবে যে বলদেশ্বর, সে এক অবর্ণনীয় ইতিহাস। সাত্ত্বিক পণ্ডিত মানুষ, কাছে পয়সা থাকলেও যেখানে সেখানে খেতে তো পারেন না! কাজেই কেবলমাত্র ডাব আর ফল খেয়ে খেয়েই দিন কাটানো। শরীর চিমড়ে গেল।

পরনের ব্যাপারেও তেমনি। চান করতে নেমেছিলেন গামছা কোমরে বেঁধে আর একখানি ধুতি উড়ুনি কাঁধে ফেলে, সেই ঝাপটে নিয়ে ডুব সাঁতার কেটেছেন সেই সম্বল।

কিন্তু শুধুই কি সেইটুকুই সম্বল?

না, আরো কিছু আছে বৈকি। ডুব সাঁতার দিয়ে উঠে রামনগরে পৌঁছেই টের পেয়েছেন বলদেশ্বর, সেই লাল চেলিমোড়া পুঁথিটি তাঁর কোমরে গামছার সঙ্গে বাঁধা! হায় ভগবান! পাষণ্ড শুঁটকো পণ্ডিত! হা অদৃষ্ট!

বুঝলেন, ওই 'বিদ্যের বোঝা' তাঁকে বয়ে মরতেই হবে।

এদিকে বিনা খড়মে হেঁটে হেঁটে পা আটফাটা, তেলের অভাবে গায়ে খড়ি উঠছে, না খেয়ে শরীর শীর্ণ, উড়নি ধোপাবাড়ি যাওয়ার অভাবে মলিন। প্রায় পাগলের তুল্য মূর্তি।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন হঠাৎ এসে পড়লেন পাটনার ঘাটে। চেনা জায়গা, জলপথেই তো বরাবর আসা-যাওয়া। দূর থেকে দেখলেন, ঘাটে একটি বৃহৎ সুন্দর বজরা সাজানো। লোককে জিগ্যেস করে জানলেন, পাটনা থেকে কলকাতা যাচ্ছে। যাত্রী যত সব সাহেব-সুবো।

তা রেলগাড়ি তো ছিল না তখন, এরোপ্লেনের কথাই ওঠে না, সাহেব-সুবোদেরও জলপথ ভিন্ন গতি কী?

বাচস্পতি ভাবলেন, বলে কয়ে যদি ওই বজরায় একটু জায়গা করে নিতে পারি, তাহলেই দুর্গতির শেষ হয়। হুগলী ঘাটে নেমে পড়তে পারলেই ব্যস, কেঁদো কাসুন্দিপুরের পথটুকু হেঁটে মেরে দিতে পারবেন।

ছুটে ছুটে এসে পড়েই কিন্তু থমকে গেলেন।

কারণ চোখের সামনে দিব্যদৃষ্টি ঝলসে উঠল। বজরা ডুবে যাচ্ছে!

বাচস্পতি দু'হাত তুলে পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এলেন, বজরা এখন ছাড়বে না, এখন ছাড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই এতোগুলি লোকের সলিল সমাধি হয়ে যাবে!

শুনে সবাই হাসতে লাগলো হ্যা-হ্যা করে, পাগলটা বলে কী!

বাচস্পতি অনেক অনুরোধ করলেন, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাগলের কথায় কে কান দিতে যায়? তা'ও আবার সাহেব-সুবোগণ!

বজরা ছেড়ে দিল! এক গাদা লোক বোঝাই করে।

বাচস্পতি হতাশ হয়ে ঘাটে বসে কপালে হাত দিলেন।

কিন্তু দু'একটি সাহেব ঘাটে ঘোরাঘুরি করছিল তখনো, তারা বন্ধুদের তুলে দিতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন বাংলানবীশ। কলকাতায় দীর্ঘদিন কেটেছে। কী ভেবে সে বাচস্পতির কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, বেঙ্গলী বাস্তিন, কী হেটু টুমি বজরা ছাড়িতে নিষেধ করিটেছিলে?

বাচস্পতি সাহেবের মুখে বাংলা শুনে যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। বলে উঠলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বজরা ডুবি হবে। এতোগুলি লোক মারা যাবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে কেউই আমার নিষেধ শুনল না।

সাহেব এটাকে পাগলের প্রলাপ ভেবেই মনে মনে হাসলো। তবু কথা চালাতেই বোধহয় বললো, টুমি কীরূপে জানিলে এই বজরা ডুবি হইবে?

সাহেব, আমি দেখতে পেলাম।

কী আস্চয্যো কথা। যে ঘটনা ঘটে নাই, আশঙ্কা যে ঘটিতে পারে। টাহা টুমি দেখিতে পাইলে?

হ্যাঁ সাহেব! এই আমার বিধিলিপি।

কী লিপি?

মানে আমার—

বলে কপালে হাত ঠেকালেন বাচস্পতি!

সাহেব সকৌতুকে বলল, আচ্ছা, টোমার কথা যদি সত্য হয়, টোমাকে আমি এক লক্ষ টাকা দিব। আর যদি—

সাহেব! এতোগুলি লোকের মৃত্যু ঘটিবে, তার বিনিময়ে আমি টাকা নেব। নাঃ! টাকায় আমার কাজ নাই। আমার কথা মিথ্যাই হোক।

ঠিক আছে। মিথ্যা হইলে আমি টোমায় থানায় লইয়া যাইব।

যেও।

বলে বলদেশ্বর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

সাহেব বলল, কিন্টু টখন আমি টোমাকে কোঠায় পাইব?

এইখানেই পাবে।

কোঠাও যাইবে না?

না।

হেটু?

কোনো নৌকার সন্ধানে থাকব।

কোঠায় যাইতে চাহ?

হুগলী ঘাটে।

ঠিক ?

ঠিক।

সাহেব চলে গেল।

কিন্তু পরদিনই পাগলের মত ছুটে এসে হাজির।

বাস্তিন টোমার কঠাই সট্য হইয়াছে। হঠাৎ ঝড় উঠিয়া বজরা ডুবিয়া গিয়াছে। ও হো-হো, আমার কটো বন্ধুগণ উহাতে ছিল! সকলের মৃট্যু ঘটিল।

আমি জানতাম সাহেব। আমার নিষেধ শুনলে এটি হত না।

আচ্ছা। বাস্তিন্ আমি জানিতে চাহি তুমি কী রূপে অ্যাড্‌ভান্স বুঝিতে পারিলে ?

ওটা একটা বিদ্যা সাহেব। যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তা আমি দেখতে পাই। দেখ একটু পরেই দেখতে পাবে এখানে একটি মেম সাহেব আসছেন, তোমাকে খুব তিরস্কার করবেন ও গালি দিবেন।

মেম সাহেব ? আমায় গালি দিবে ? হেটু ?

হেতু জানিনা। দেবেন তাই বলতে পারছি। মেমসাহেব খুব লম্বা, চোখ নীল, চুল সোনালী !

বলতে না বলতে নীল চোখ সোনালী চুল মেমসাহেব এসে হাজির এবং সাহেবকে এই মারে তো সেই মারে। বলদেশ্বর ইংরিজি জানেন না, তাই কথাগুলো বুঝতে পারেন না, তবে আন্দাজ করেন, ওই ডুবো বজরায় তার কোনো আপনজন ছিলো এবং তার যাওয়ার জন্য ওই সাহেবই দায়ী।

অনেক চেঁচিয়ে, নীল চোখ লাল করে বিদায় নিলেন মেমসাহেব, বলদেশ্বর জানলেন তাঁর আন্দাজই ঠিক। এই সাহেবেরই যাওয়ার কথা, অন্য জনের যাওয়ার ব্যস্ততা দেখে নিজের টিকিটটি তাকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই লোক ওই মহিলার মামা।

সাহেব হঠাৎ বলদেশ্বরের হাত চেপে ধরে, বাস্তিন, টুমি আমার সাটে আমার ডেশে চলো। আগামী মাসে বিলাইতের জাহাজ ছাড়িবে, আমার প্যাসেজ বুক করা আছে, টোমার জন্যও একটি টিকেট করিয়া লইব। টোমার এই বিড্যা আমি আমার দেশবাসীকে দেখাইটে চাহি।

সর্বনাশ। সাহেব বলে কী!

বলদেশ্বর মাথা নাড়েন, 'তা' হয় না সাহেব।

হোয়াট ? কেনো ? কেনো হয় না ?

বিলাত গেলে আমাদের জাত যায় সাহেব।

জানি। সাহেব মাথা নেড়ে দুঃখের গলায় বলে, জানি টোমাদিগের এইরূপ প্রেজুডিস আছে। কিনটু আমি টোমার জন্য এক জাহাজ ফল ও একশত ড্রাম টোমাডের এই গ্যাঞ্জেস ওয়াটার লইয়া যাইব।

বলদেশ্বর হাসেন, সাহেব, আমাদিগের নিয়ম, সমুদ্র পার হলেই জাত যায়।

ওঃ গড্! কী আস্চয্যো! এই যে আমরা আসিটেছি, কই আমাদিগের তো জাত যায় না?

বলদেশ্বর হেসে ওঠেন।

সাহেব ক্ষুব্ধভাবে বলে, টোমার এই মিরাক্যাল বিড্যাটি আমার ডেশকে দেখাইটাম বাস্তিন, টাহা হইল না। আচ্ছা, টোমাকে যদি আমি ডুই লক্ষ টাকা দিই?

হিন্দু ব্রাহ্মণ টাকার লোভ করে না সাহেব।

সাহেব কিন্তু নাছোড়বান্দা।

ডুই লক্ষ? তিন লক্ষ? চারি লক্ষ? টিকিট করিয়া তোমার বিড্যা ডেখাইয়া আমি ওই টাকা সহজেই টুলিতে পারিব।

দশ লক্ষ দিলেও নয়, সাহেব।

ওঃ গড্! টোমরা ইণ্ডিয়ানরা অ্যাটো মূর্খ, অথোচো অ্যাটো সব বিড্যা জানো!··· ওঃ। কী মার্ভেলাস! কী আস্চয্যো। যে ঘটনা ঘটিবে, টুমি পূর্বেই টাহা দেখিটে পাও!! বাস্তিন, কতদিনের চেষ্টায় টুমি এই বিড্যাটি শিক্ষা করিয়াছো? আমাকে শিখাইয়া দিবে?

শুনেই না বলদেশ্বরের মুখে একটি সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। যেমন উঠেছিল শুঁটকে পণ্ডিতের মুখে।

বলদেশ্বর বলে ওঠেন, সাহেব, তুমি এই বিদ্যাটি গ্রহণ করবে?

অ্যাঁ! কী বলিলে?

বলিলাম, তুমি এই বিদ্যাটির মালিক হইতে চাও?

সাহেব তো হতভম্ব!

কী বলিটেছো?

বলিতেছি, আমাকে যখন তোমার দেশে লইয়া যাইতে পারিতেছ না, তখন বরং আমার এই বিদ্যাটিই লইয়া যাও, তুমিই দেশবাসীকে দেখাইতে পারিবে।

টোমার কঠা আমার মাঠায় প্রবেশ করিটেছে না।

প্রবেশ করিবে, বলেই বলদেশ্বর এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে একটু এগিয়ে গিয়েই একটা তুলসী ঝাড় থেকে তিনখানা তুলসী পাতা তুলে নিয়ে চাদরের খুঁট থেকে একটি তামার পয়সা বার করে, গঙ্গার ঘাট থেকে চাদর ভিজিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে এসে, কোমর থেকে লাল চেলিমোড়া পুঁথিটি সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন, সাহেব, আমি একটি মন্ত্র পাঠ করবো, তুমি তখন বলবে, 'অহং গৃহ্নামি।'

হতভম্ব সাহেব সেই পয়সা, তুলসী আর পুঁথি হাতে নিয়ে ন্যালাক্ষ্যাপার মত বলে, কী বলিব?

বলিবে—'অহং গৃহ্নামি'। বলেই মনে মনে নিজের মন্ত্রটা পাঠ করে বলেন। বল সাহেব, অ-হ-ং গৃহ্নামি। এটা বলে ফেললেই এই বিদ্যাটি তোমার কাছে চলে যাবে।

অ্যাঁ? ঠিক?

ঠিক।

কিনটু ইহার ডাম?

দাম লাগিবে না।

কিনটু টাকা লইবে না কেনো?

আমার টাকার দরকার নাই সাহেব।

ওঃ গড! এইজন্যই বলিয়াছি, টোমরা অ্যাটো মূর্খ, আর টোমাডের অ্যাটো বিড্যা! যাক—কি বলিতে বলিলে?

বলিলাম—বলো, 'অহং গৃহ্ণামি।'

সাহেব বললো, হোহোন্—হোহোন্—

হোহোন নয়, বল অহং, মনে কর চীনা ভাষা বলছো।

সাহেব অতিকষ্টে বলে, হহং—

হহং নয়, অহং!

সাহেব আরো কষ্টে বলে, ওহং!

ওহং নয়, অহং!

সাহেব প্রাণপণে বলে ওঠে, অহং!

বাঃ! বাঃ! এবার বল, গৃহ্ণামি!

সাহেব, তুমি এই বিদ্যাটি গ্রহণ করবে? [পৃঃ ১৫৪

কিন্তু বললেই হলো? বলা এতো সহজ? সাহেব দাঁত কিড়মিড়িয়ে চোখ ঠেলে বার করে, গলার শির ফুলিয়ে, 'গাড়নানি' 'গিড়নানি' 'গ্রিননানি' ইত্যাদি বহুবিধ পাঠের পর হঠাৎ বলে ফেলে 'অহং গ্রিহ্ন্নামী'।

ব্যস, ব্যস, এতেই হবে।

বলেই বলদেশ্বর উল্টোমুখো হয়েই চোঁ-চাঁ দৌড়!

পিছনে যে সাহেব চিৎকার শুরু করে দিয়েছে, তা কানও দিলেন না।

কান দিয়েই বা কী হবে? সাহেব তো ইংরিজি ছোটাচ্ছে। শুধু একটি শব্দই বলদেশ্বরের কানে বারবার ঢুকে পড়ছে, ফায়ার ফায়ার।

কিন্তু কে জানে তার মানে কী!

আর নৌকোর পিত্যেশ নয়, হাঁটতে হাঁটতে আর মাল বওয়া গরুর গাড়ি চেপে চেপে, শেষ অবধি আধমরা গোছ হয়ে কেঁদো কাসুন্দিপুরে এসে পৌঁছলেন। এবং কিছু-দিন ধরে দৈনিক পাঁচ সের দুধ, দু'সের মণ্ডা, দু'সের চালের ভাত, এক পোয়া গব্যঘৃত এবং দশটি করে ডাব খেয়ে খেয়ে তবে আবার আগের চেহারায় ফিরলেন।

কিন্তু তারপর?

তারপর থেকে বাকি জীবনটা আর গ্রামের চৌহদ্দি পার হননি বলদেশ্বর। বাড়ি বসে রাতদিন শুধু শাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। এখনো যেখানে যত টোল আছে সর্বত্র নাকি সেই সব বই পড়ানো হয়। হবে না? কত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সব বই সংস্কৃতে লেখা। তবে প্রতিটি বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় নাকি একটি বাংলা শ্লোক আছে, সেটি হচ্ছে লোভে পাপ, পাপে তাপ, বাপরে বাপ মাথায় সাপ।

অন্যেরা এ শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করতে না পারলেও, আমরা এই 'ঈশ্বর' গুষ্ঠিরা সবাই পারি। বংশানুক্রমে শুনে আসছি তো এ গল্প। আমি শুনেছি আমার ঠাকুর্দা বাণেশ্বর ভটচাযের কাছে, তিনি তাঁর বাবা বুধেশ্বর ভটচাযের কাছে, তিনি আবার তাঁর বাবা—সে যাই হোক—যিনি বিনি পয়সায় বিলেতে ঘুরে আসা, আবার তার দক্ষিণা বাবদ দু'চার লাখ টাকাকে হেলায় ঠেলে ফেলে চলে এসেছিলেন, তিনিও যখন এ শ্লোক লিখেছেন, তখন বুঝতেই হবে শুঁটকো পণ্ডিত তাঁকে সত্যিই 'দিব্যদৃষ্টি' দান করেছিল।

———

মণি ও মুক্তা

এই ধুসর রঙের কাঠবেড়ালিরা ব্যাঙের ছাতা জাতীয় খাদ্য খুব পছন্দ করে। এরা সাংঘাতিকভাবে প্রচুর গাছ-গাছড়া বিনষ্ট করে। বছরে ৩৭০,০০০ করে এদের মেরে ফেলে ১০ বছর বাদেও দেখা গেছে এদের শেষ করা যায় নি এবং এদের গাছ নষ্ট করা রোধ করা যায় নি।

কান ধরে টেনো না

—অরুণ দে

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল ঘোৎনা। তারপর দ্রুতপায়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হল।

ক্লাস পালিয়ে তিন বন্ধু ঘোৎনা, রঞ্জিৎ আর মণ্টু বেশ জমিয়ে পার্কে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। হঠাৎ ঘোৎনাকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে রঞ্জিত বলল, "কি হল রে? বিছে-টিছে কামড়াল নাকি? লাফিয়ে উঠলি কেন?"

মণ্টু বলল, "এই জন্যেই তো প্রথমেই ঘাসের উপর বসতে নিষেধ করেছিলাম। কত রকম পোকামাকড় ঘাসের মধ্যে থাকে জানিস? কোথায় কামড়েছে? খুব জ্বালা করছে বুঝি?"

"তোর মুণ্ডু করছে। পোকায় কামড়ায় নি। ভূতো স্যার কামড়েছে। ঐ দেখ, পেছনে তাকিয়ে দেখ"—বলল ঘোৎনা।

পেছন ফিরে তাকিয়েই রঞ্জিত আর মণ্টু চমকে উঠল।

স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার ভূতনাথ মণ্ডল হনহন করে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন।

এই অসময়ে তাঁর এদিকে আসার কথা নয়, বরং ক্লাসে বসে কোন ছেলের কান ধরে মাথায় রামগাঁট্টা লাগাবার কথা। ছাত্রদের কথায় কথায় গাঁট্টা মারতে তিনি খুবই ভালবাসেন। পড়ানোর থেকে ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ বেশী। স্কুলের সব ছাত্রই তাঁকে ভয় করে। তাঁকে দেখে রঞ্জিত আর মণ্টুরও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তবে ঘোৎনার মত অতটা ভয় তারা পায় নি, কারণ ভূতনাথ স্যার এখন

আর তাদের ক্লাসে পড়ান না। তবে ঘোৎনা কয়েক বছর একই ক্লাসে আছে, ভূতনাথ স্যার সেই ক্লাসের ইতিহাসের টিচার রয়ে গেছেন।

ঘোৎনা বন্ধুদের বলল, "আমি দৌড়ে পালাচ্ছি। যদি ভূতো স্যার আমাকে ছুটে ধরে ফেলেন, তাহলে বলবি আমি কালা হয়ে গেছি। কানে কিছু শুনতে পাই না। বুঝলি?"

রঞ্জিত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঘোৎনা দৌড়তে আরম্ভ করল।

পেছন ফিরে রঞ্জিত দেখল ভূতনাথ স্যারও দৌড়তে আরম্ভ করেছেন! দ্রুতবেগে ঘোৎনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে মণ্টু চিৎকার করে উঠল, "ঘোৎনা, তোকে ধরে ফেলবে। স্যারকে পা বেঁকিয়ে লেঙ্গি মার।"

ঘোৎনা কথাটা শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু লেঙ্গি দেবার কোন চেষ্টা করার আগেই ভূতনাথ স্যার ছুটতে ছুটতে তার জামা চেপে ধরলেন।

সে দৃশ্য দেখে মণ্টু মাঠে আর অপেক্ষা করল না। এক ছুটে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

রঞ্জিত কিন্তু বন্ধুকে বিপদে একা ফেলে পালাল না। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে ঘোৎনার কাছে পৌঁছল।

ভূতনাথ মণ্ডল তখন ঘোৎনার জামা ছেড়ে দিয়ে কান টেনে ধরে চিৎকার করছেন, "কোথায় পালাচ্ছিস?"

ঘোৎনা গোবেচারার মত মুখ করে উত্তর দিল, "রাজা হর্ষবর্ধনের বাবা গোবর্ধন সম্রাট সাজাহানের আক্রমণের ভয়ে লঙ্কায় পালিয়ে গিয়েছিল।"

"কি বললি হতভাগা? আমি জিজ্ঞাসা করছি তুই আমাকে দেখে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিলি?"

"ইতিহাসের সন তারিখ আমার স্যার ঠিক মনে থাকে না, তবে মনে হয় যে বছর বুদ্ধদেব মারা গেছিলেন, সেই বছরই রাজা গোবর্ধন লঙ্কায় পালিয়ে ছিলেন।"

ঘোৎনার উত্তর শুনে ভূতনাথবাবু বার দুয়েক তাঁর গোঁফজোড়া নাচালেন। বেশী রাগ হলে গোঁফ নাড়া তাঁর অভ্যাস। তারপর আঙ্গুল বেঁকিয়ে ঘোৎনার মাথায় রামগাঁট্টা মারতে উদ্যত হলেন।

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "ওকে মারবেন না স্যার, ও অসুস্থ।"

"অসুস্থ!"—ভুরু কুঁচকে তাকালেন ভূতনাথবাবু।

"হ্যাঁ স্যার। ঘোৎনা আজকাল কানে শুনতে পায় না। কালা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? তোর কানে কি হয়েছে রে ঘোৎনা?"

ঘোৎনা উত্তর দিল, "ধানে পোকা হয়েছে স্যার, তাই ধান থেকে চাল বেরোয় নি।"

"ধান নয়, কানের কথা বলছি। তোর মামা কি জানে যে তুই কালা হয়ে গেছিস?"

"ধামা করে ধান নেওয়া যায়, তবে স্যার তালা নেওয়া খুব মুশকিল।"

পেছন ফিরে রঞ্জিত দেখল ভূতনাথ স্যারও দৌড়তে আরম্ভ করেছেন! [পৃঃ ১৫৮

"কানের একেবারে বারোটা বেজে গেছে দেখছি। মামা বললে ধামা শোনে, কালা বললে তালা শোনে—কবে থেকে এমন হল?"

"আজ সকাল থেকে স্যার।"

"এবার আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?"

"মাঝে মাঝে শুনতে পাই স্যার।"

"ইস্কুল থেকে পালিয়ে মাঠে আড্ডা দিচ্ছিলি কেন?"

"বিশ্বাস করুন স্যার, আজ সকালে আমি আলুভাতে, বেগুনপোড়া আর ঘি-ভাত ছাড়া আর কিছুই খাই নি। আপনি বলেছিলেন ব্রাহ্মি শাক খেলে ব্রেণ ভাল হয়, বাড়িতে সেকথা জানিয়েছিলাম কিন্তু আমার মামা বাজারে নাকি ব্রাহ্মি শাক খুঁজে পায় নি।"

"দুত্তোর, ব্রাহ্মি শাকের নিকুচি করেছে। এক বললে আরেক শুনিস। কানের চিকিৎসা করা। এ তো খুব সর্বনেশে ব্যাপার হয়েছে। ক্লাসের পড়া শুনবি কি করে? তোর বন্ধুর এ কি সর্বনাশ হল রে রঞ্জিত।"

রঞ্জিতের দিকে ফিরে তাকালেন ভূতনাথবাবু। রঞ্জিত বলল,—"আমরাও তাই ভাবছি স্যার। ঘোৎনার এত বুদ্ধি, তবু সে বারবার পরীক্ষায় ফেল করে, তার কারণটা এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি।"

"কারণটা কি?"

"আপনারা এক কথা পড়ান, ও অন্য কথা শোনে, তাই পরীক্ষার খাতায় উল্টোপাল্টা লিখে আসে। ভবিষ্যতে বেচারার যে কি হবে তাই ভাবছি।"

"তোর অত ভাবতে হবে না। ওর মামাকে বলে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা কর। শুনেছি ও নাকি ওর মামার কাছেই থাকে।"

"ওর মামা যে বড্ড গরিব স্যার। ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। ওকে সারাজীবন কালা হয়েই থাকতে হবে।"

রঞ্জিতের কথা শুনে ভূতনাথবাবু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর ঘোৎনার দিকে তাকিয়ে দরদী গলায় বললেন, "আহা, বেচারা। এত বুদ্ধিমান ছেলে, শুধু কানের রোগে ভুগে সারাজীবন কষ্ট পাবে, পয়সার অভাবে চিকিৎসা হবে না—এ তো খুব দুঃখের কথা।"

ঘোৎনা বলল, "আমার জীবনটাই দুঃখের স্যার। আপনারা ক্লাসে কত কষ্ট করে পড়ান, কত সময় কত উপদেশ দেন কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাই না। প্রায়ই কানে তালা লেগে যায়, কোন কথাই কানে ঢোকে না, ঢুকলেও উল্টো শুনি। আমার জীবনই বৃথা স্যার।"

ভূতনাথবাবু ঘোৎনার হাত ধরে বললেন, "তুই দুঃখ করিস না ঘোৎনা। তুই আমার ছাত্র। আমি তোর জীবন বৃথা হতে দেব না। তোর মামার ডাক্তার দেখাবার টাকা নেই, সেজন্য কি তুই চিরকাল কালা হয়ে থাকবি? তা হতে পারে না।"

"এ ছাড়া আর আমার উপায় কি স্যার। এখন একটু শুনতে পাচ্ছি, কিছুক্ষণ পরেই হয়ত আর শুনতে পাব না। এরকমই হয়—এ ভাবেই আমার দুঃখের জীবন কাটবে। মামা গরিব। ডাক্তাররা যে কি চীজ, তা তো জানেন স্যার। টাকা না পেলে কোন ডাক্তার কোন লোকের কান ধরেও টেনে দেখে না।"

"কিন্তু তোর কান দেখবে। আমি দেখাব। টাকা লাগবে না। আমার ভাই গুঁতোনাথ একজন নামকরা ডাক্তার। স্কুলে হঠাৎ পেটে দারুণ ব্যথা হওয়ায় আমি স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে তার কাছেই যাচ্ছিলাম। তুইও আমার সঙ্গে চল। পেট ব্যথাটা এখন কম মনে হচ্ছে। আমার পেটের বদলে সে তোর কান দেখবে। চল!"

ঘোৎনা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমি কান দেখাব না স্যার।"

ভূতনাথবাবু বললেন, "কেন রে, ভয় কি। আমার ভাই গুঁতো তো নাক গলা আর কানেরই স্পেশালিস্ট। দরকার হলে তোর কানে ওষুধ দেবে, ইনজেকশন দেবে। ভয় নেই, টাকাপয়সা লাগবে না। আমার ছাত্রদের কাছে ও টাকা নেয় না। চল, চল।"

ঘোৎনা বলল, "আর একদিন যাব স্যার। আজ থাক।"

ভূতনাথবাবু শক্ত মুঠিতে ঘোৎনার হাত চেপে ধরে বললো, "না, অন্যদিন নয়। আজ এখনই তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার ভাই ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমার একজন ছাত্র কানে কালা হয়ে থাকবে—এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। ছাত্রের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। চল, যেতেই হবে।"

ভূতনাথবাবু ঘোৎনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। নিরুপায় ঘোৎনা তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওরে রঞ্জিত, এ কি ফ্যাঁসাদে পড়লাম রে। স্যার আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওরে তুই কেটে পড়িস না, তুই আমার সঙ্গে চল। ডাক্তারের হাতের মুঠোয় কান পড়লে, সে কান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব কিনা কে জানে?"

"অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ডাক্তারবাবু কি তোর কান ছিঁড়ে ফেলবে?"

"ডাক্তারদের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। দাঁতে যন্ত্রণা হলে ডাক্তাররা সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত তুলে ফেলে, কানে ব্যথা শুনলে রোগীর কান কেটে ফেলা তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তুই আমার সঙ্গে চল রঞ্জিত।"

"চল না। যাচ্ছি। আমার নাকটাও একবার দেখিয়ে নেব। বইপত্তরের গন্ধ নাকে গেলেই আমার নাক চুলকোয়। কেন এমন হয়, ডাক্তারের কাছে জানতে হবে। চল!"—বলে রঞ্জিত ঘোৎনাকে অনুসরণ করল।

ভূতনাথবাবু রাস্তায় ঘোৎনার হাত ছাড়লো না। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার গুঁতোনাথ-এর চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

ডাক্তার গুঁতোনাথ তখন একজন রোগীর গলা পরীক্ষা করছিলেন। রোগীটি হাঁ করে জিভ বের করেছিল। ডাক্তার তার জিভটা চামচ দিয়ে চেপে ধরে গলার ভিতরে উঁকি দিয়ে কি যেন দেখছিলেন।

একটা বেঞ্চির উপর বসে আরও কয়েকজন রোগী অপেক্ষা করছিল।

ঘরে ঢুকে ভূতনাথবাবু গলা খাঁকারি দিলেন।

ডাক্তার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

ভূতনাথ ঘোৎনাকে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার প্রিয় ছাত্র ঘোৎনা। কানে শুনতে পাচ্ছে না। শুনলেও অধিকাংশ সময়ই উল্টোপাল্টা শোনে। তুমি ওর কানটা পরীক্ষা করে দেখ। ওষুধপত্তর যা দরকার দিয়ে দিও।"

চামচটা টেবিলের উপর রেখে ডাক্তার ঘোৎনার দিকে ভুরু কুঁচকে দেখলেন। তারপর দাদা ভূতনাথকে বললেন, "দাদা, তুমি ভেতরে ঘরে গিয়ে বোস। আমি ছেলেটিকে দেখে দেব। কোন ভাবনা নেই।"

ঘোৎনাকে বেঞ্চির উপর বসতে ইঙ্গিত করে ডাক্তার আবার তাঁর রোগীর দিকে মন দিলেন।

ভূতনাথবাবু গট্‌গট্‌ করে ভিতরে চলে গেলেন।

রঞ্জিত আর ঘোৎনা বেঞ্চির একধারে বসে পড়ল। পাশের রোগীটি ঘোৎনাকে বলল, "তোমার বুঝি কানে কট্‌ কট্‌ করে?"

"আজ্ঞে না, পেটের ভেতর ভট্‌ ভট্‌ করে"—গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল ঘোৎনা।

"দাঁতেও ব্যথা হয় নাকি?

"ব্যথা হয় না, তবে কেউ বাজে বকলে তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে। আমার কি হয়েছে ডাক্তার বুঝবে, আপনার ভ্যাজর ভ্যাজর করার কি দরকার?"

"তুমি অমন চটে যাচ্ছ কেন?"

"রোগ না থাকলেও যদি চিকিৎসা করতে হয়, তবে সবাই চটে যায়। আচ্ছা, এই ডাক্তার কান দেখার সময় কান ধরে কি খুব টানাটানি করবে?"

"জানি না"—বলে ভদ্রলোক ঘোৎনার পাশ থেকে উঠে অন্য জায়গায় গিয়ে বসল।

রঞ্জিত ঘোৎনাকে বলল, "ডাক্তারখানায় বেশী কথা বলতে নেই। চুপ করে বোস। ডাক্তার অন্য রোগীদের দেখার পর বোধ হয় তোকে দেখবে। তুই সবচেয়ে শেষে এলি কিনা।"

ঘোৎনা ফিসফিস করে বলল, "অতক্ষণ বসে থাকতে আমার বয়ে গেছে। চল কেটে পড়ি। ভূতো স্যার তো এখন এ ঘরে নেই। এই সুযোগে পালাই।"

রঞ্জিত এদিক ওদিক তাকাল। তারপর কি যেন ভেবে চুপি চুপি বলল, "চল"।

গুটিগুটি পা ফেলে দুই বন্ধু দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে ডাক্তার গুঁতোনাথের গলা শোনা গেল—"ও খোকা, রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? ডাক্তারের কাছে এলে একটু অপেক্ষা তো করতেই হয়। এসো, তোমার কানটাই আগে দেখে দিচ্ছি। তুমি আবার দাদার ছাত্র। এসো।"

হতাশ হয়ে ঘোৎনা একবার ডাক্তার আর একবার রঞ্জিতের দিকে ফিরে তাকাল।

ডাক্তার আবার বললেন, "তাড়াতাড়ি এসো, অনেক রোগী বসে আছে।"

অগত্যা ঘোৎনাকে ডাক্তারের কাছে এগিয়ে যেতে হল।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, "ঘাড় বেঁকিয়ে একটা কান কাত করে বস।"

চেয়ারে বসে তাই করতে হল ঘোৎনাকে।

ডাক্তার এক হাতে ঘোৎনার কান টেনে ধরে অন্য হাতে ছোট একটি টর্চ নিয়ে সেই টর্চের আলো কানের গর্তের ভিতরে ফেলে কি যেন দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, "কানে ব্যথা হয় নাকি?"

"ব্যথা না। মাঝে মাঝে কানের ভিতর ফরফর করে।"

গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল ঘোৎনা।

"ফরফর করে? পোকা ঢোকে নি তো?"

"পোকা! ঢুকতেও পারে।"

"কখন ফরফর করে? সকালে না সন্ধ্যায়?"

"ফরফর করার কোন সময়ের ঠিক নেই। কেউ আমাকে পড়তে বসতে বললে কিংবা গুরুজনরা কোন উপদেশ দিলে কানের ভিতর ফরফরানি আরম্ভ হয়ে যায়। তখন কিছুই শুনতে পাই না।"

ডাক্তার ঘোৎনার কথা ঠিকমত বুঝতে না পেরে বললেন, "কি বললে?"

"ইয়ে। বলছি কানটা ছেড়ে দিন। আর কতক্ষণ টেনে ধরে রাখবেন। ব্যথা লাগছে।"

"ব্যথা তো করবেই। মনে হচ্ছে কানে পুঁজ হয়েছে।" বলে ডাক্তার ঘোৎনার কান ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, "এবার তোমার নাকটা দেখি।"

"না? আমার নাকে তো কিছু হয় নি।"

“না হোক। কানের সঙ্গে নাকের গভীর যোগ আছে। নাকটা উঁচু করে বোস—নাকের ভিতরটা দেখা দরকার।”

“তোমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা দরকার”—মনে মনে ভাবল ঘোৎনা। তারপর নাকটা ডাক্তারের মুখের কাছে এগিয়ে ধরল।

ঘোৎনার নাকের ফুটো দুটো ভাল করে দেখার জন্য ডাক্তার এক হাতে টর্চ নিয়ে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাকের সামনেটা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোৎনা ‘হাঁচ্চো’ শব্দে বিরাট হাঁচি হাঁচল।

মুহূর্তে তার নাকের এবং গলার ভিতর থেকে কি সব বেরিয়ে ডাক্তারের চোখে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

“আরে ছ্যা ছ্যা। আমার মুখময় এসব কি ছিটিয়ে দিলে”—ডাক্তার প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

বেঞ্চির উপর বসে থাকা একজন রোগী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ডাক্তারবাবু, আপনি জল দিয়ে সব ধুয়ে ফেলুন। আপনার গালের উপর কি সব নোংরা লেগে গেছে।”

“এমন বদখদ রোগীর পাল্লায় কখনও পড়ি নি। শুধু গায়ে নয়, জামায়ও লেগেছে দেখছি। যাই, ধুয়ে আসি। ভূতোদা এ কি রকম রোগী এনেছে! তাকে ডেকে আনছি”—বলে ডাক্তার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দিকে ছুটে গেলেন।

ডাক্তার ঘর ছেড়ে চলে যেতেই ঘোৎনা উঠে দাঁড়াল। রঞ্জিত এতক্ষণ তার পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

সে ঘোৎনাকে ফিসফিসিয়ে বলল, “আর দেরী নয়, এবার কেটে পড়া যাক।”

ঘোৎনা বলল, “কথা নয়, দরজার দিকে ছোট।”

দুই বন্ধু দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ভূতনাথবাবু কোথা থেকে ঘরে ঢুকে ছাত্রদের ছুটতে দেখে বললেন, “এ কি, তোমরা ছুটছ কেন? ডাক্তার গুঁতোনাথ কোথায়?”

দুই বন্ধু কোন উত্তর না দিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটতে লাগল।

ভূতনাথবাবু দরজার কাছে এসে ‘থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সম্রাট মহম্মদ শার বিচার

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহম্মদ শাহ্ নামে মুঘল সম্রাট হলেও তাঁর তেমন কোন দাপট বা দক্ষতা ছিল না। বাবুর শাহ্ থেকে আলমগীর এই ছ' পুরুষ ক্রমাগত ক্ষমতা আর রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু আলমগীরের আমলেই যেমন গোটা ভারত বলতে গেলে ওঁর শাসনের মধ্যে এসে গিয়েছিল, তেমনি ওঁর রাজত্বকালেই তাতে ভাঙ্গনও শুরু হয়।

আর, তা তো হতেই পারে। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি রাজত্ব করে নব্বুই বছর বয়সে মারা যান। তাঁর ছেলেরাই তখন রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছেন। তা ছাড়া ভয়ে ভয়ে থেকে তাঁদের দাপট দেখাবার অভ্যাসটাও চলে গিয়েছিল। তাছাড়া আলমগীর জীবনের শেষ পঁচিশ বছর দাক্ষিণাত্যেই ছিলেন, ক্রমাগত যুদ্ধ করে গেছেন। তাতে টাকাও খরচ হয়েছে বিস্তর, উত্তর ভারতের কোথায় কি হচ্ছে, তাও অত খবর রাখতে পারেন নি। তখন রেলপথ ছিল না, টেলিগ্রাফও ছিল না। বড়জোর ঘোড়ার ডাক বসিয়ে জরুরী খবর পাঠানো হত। তাতেও সময় লাগত ঢের।

তবু এমনই আলমগীর বাদশার নাম ছিল যে তিনি বেঁচে থাকতে খোলাখুলিভাবে কেউ মাথা তুলতে সাহস করে নি। কিন্তু তাঁর মরার সঙ্গে সঙ্গে উইধরা গাছের মতো সব যেন ভেঙ্গে পড়ল।

তারপর শুরু হল বছর কতক ধরে উজীর আর সেনাপতিদের শাসন। মানে কাজে তাই, তাঁরা নামে বাদশা বংশের একজনকে সিংহাসনে বসাতেন, আবার অসুবিধে বুঝলে তাঁকে নামিয়ে আর একজনকে। যাঁকে গদী থেকে টেনে নামানো হত, তাঁকে হয় অন্ধ করে দেওয়া হত (অন্ধরা কখনও সিংহাসনে বসে না) কিংবা অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হত। এই ব্যবস্থাটাই চলত বেশির ভাগ। একমাত্র ফররুখশিয়ারই বছর ছয়েক টিকে ছিলেন—কিন্তু তেমনি তাঁকে বিস্তর কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয়েছিল।

যে দুজন, উজীর বলো, আমীর বলো, সেনাপতি বলো, এদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর, ক্ষমতালোভী, বদমাইশ—সৈয়দ দু ভাই—তাঁরাই দুজনে সেনাদের হাত করে এইভাবে অনেকগুলি বাদশাকে নিয়ে পুতুল খেলার মতো খেলেছিলেন। কোন বাদশার বাদশাহী মোট দু'তিন দিনেই শেষ হয়ে গেছে—এমনও হয়েছে।

এরই ফলে মুঘল রাজবংশের সাহস শিক্ষা সহবৎ সব নষ্ট হয়ে গেল। আসলে এঁদের মনটাই গেল ভেঙ্গে। সৈয়দরাও অবশ্য শেষ পর্যন্ত খুন হয়েই মারা গেলেন কিন্তু ততদিন অনিষ্ট যা হবার তা হয়েই গেছে। দিল্লীর শাসন এইভাবে আল্গা হয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হয়ে উঠলেন। যা খুশি তাই করতে শুরু করলেন। কেউ কেউ বাদশার প্রাপ্য কর দেওয়াও বন্ধ করলেন, তাদের শিক্ষা দেবার বা শাসন করার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না বাদশারা।

বাইবেলে আছে, "যে ব্যক্তি তরবারির দ্বারা উন্নতি করে. সে তরবারির দ্বারাই বিনষ্ট হয়।"

পৃথিবীর ইতিহাস তো বটেই, শুধু ভারতের ইতিহাসটা ভাল করে পড়লে জানা যায় কথাটা কত সত্যি। তবে এও ঠিক, এই সব লোকগুলো খুনোখুনি করে—তা যুদ্ধেই হোক গুণ্ডামি করেই হোক—যে অনিষ্ট করে যায়, অনেকের জীবনে যে ক্ষতি হয়—তার আর পূরণ হয় না বড় একটা।

অত বড় বিশ্ববিখ্যাত মুঘল রাজবংশেও তাই হয়েছিল। বাবুর আকবর আলমগীরের তেজ-বুদ্ধি-শক্তি-বীর্য কিছুই আর দেখা যেত না শেষের বাদশাদের মধ্যে। বরং তাঁরা চাকর-বাকরদের কাছেও উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতেন। যাকে বলে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়া—ওঁদের যেন তাই গিয়েছিল। শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলে মানুষ আর সোজা হতে পারে না, বলতে গেলে কাজের বার হয়ে যায়—সেই জন্যেই এই উপমা দেওয়া হয়।

সৈয়দরা যাবার পরে মহম্মদ শাহ্ যখন বাদশা হলেন, তখন তাঁর বয়স অল্প। রূপবান (মুঘলরা বেশির ভাগই দেখতে সুন্দর ছিলেন), বেশ জোয়ান—কিন্তু খুব দুর্গতির মধ্যে মানুষ হওয়াতে লেখাপড়া কিছুই শেখেন নি। জ্ঞান-বুদ্ধিও তেমন ছিল না।

পৃথিবীর সব দেশেই—যেখানে যেখানে রাজা ছিল কি আছে এখনও—রাজবংশের ছেলেদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ডাক্তার উকীল ইঞ্জিনিয়ারদের যেমন নিজেদের বিশেষ কাজ শেখা দরকার—যে অনেক লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে একদিন—তাকে সেইভাবেই তৈরী করতে হবে বৈকি।

কিন্তু শেষের দিকে মুঘল বাদশাদের এইটেই হয়েছিল সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যেখানে রাজারাই পরের অধীন, অপরের দয়ার ওপরে যাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে—তাদের বংশের অন্য লোকের ছেলে মেয়েদের কে লেখাপড়া শেখাবে, কেই বা লড়াই করতে শেখাবে! এমনিই তো টাকা সব ঐ উজীর আমীরের দল লুটে খাচ্ছে—তারা বাদশার খরচ যদি বা দিত, অন্যদের কষ্টের সীমা ছিল না, সামান্য দশ বিশ টাকা মাসোহারা পেত, তাও কি সব ঠিক ঠিক পেত? তাও না। লেখাপড়া তো দূরের কথা, এক এক সময় পরনের পোশাকই জুটত না।

মহম্মদ শাহ্ও সেইভাবেই মানুষ হয়েছিলেন। অক্ষর পরিচয় যদি বা ছিল—বাদশাহী করার কোন শিক্ষাই পান নি কখনও।

জ্ঞান-বুদ্ধি বা বিদ্যা ছিল না বলেই নতুন ছেলেমানুষ বাদশা মানুষ চিনতেন না। রাজনীতি বোঝারও শক্তি ছিল না। দেখতে দেখতে একপাল মোসাহেব এসে জুটল। কতকটা ওদের ওপরই দেশ শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে বাদশা আমোদ-আহ্লাদে ডুবে রইলেন। সকালে দরবার করার সময় হয়ত হাতীর লড়াই দেখতেন, নয়ত মোরগের লড়াই। রাজা-রাজড়ারা শিকারে যেতে ভালবাসেন—উনি তাও যেতেন না। এমন কি বেশ কয়েক বছর রাজত্ব করলেও (তখন সৈয়দ ভাইরা মারা গেছেন বলে সিংহাসন হারাতে হয় নি।) তার মধ্যে দিল্লীর বাইরে বড় একটা যান নি।

একেবারেই অপদার্থ যাকে বলে—তবু বড় বংশের একটু চিহ্ন এক আধবার দেখা গিয়েছিল বৈকি।

নাদির শা যখন চারদিক জ্বালিয়ে লুঠ করে দিল্লীর দিকে আসছেন, তখন যদিও সেনাপতি উজীররা স্তোক দিচ্ছেন যে আমরা লড়াই ফতেহ্ করবই—তিনি বুঝেছিলেন যে এইসব অকর্মণ্য লোভী কর্মচারীদের সে সাধ্য নেই। পাছে দিল্লী ধ্বংস হয়, এই জন্যে সাহস করে নিজেই এগিয়ে গিয়ে নাদিরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সেই প্রবাদের মতো বিখ্যাত কোহিনূর হীরে আর শাজাহান বাদশার অত সাধের তখ্ত-এ-তাউস বা ময়ূর সিংহাসন দিয়ে সন্ধি করতে হয়েছিল।

তবু দিল্লীর লাখ দুই লোক মরেছিল এবং দুদিন ধরে দিল্লী লুঠ হয়েছিল—তবে সে ওঁর দোষ নয়। গুজব যে কত অনিষ্ট করে মানুষের—এই দিল্লীর ঘটনাই তার বড় প্রমাণ।

সে কথা থাক। এবার আমার আসল গল্পে আসি।

যে সময়ের কথা বলছি তখনও বাদশাদের কিছু হীরে জহরত ছিল কোষাগারে।

কাজেই তা পাহারা দেবার জন্যে লোকও ছিল মোতায়েন।

একবার এক রাতের পাহারাদারের কি মতিচ্ছন্ন হল সে ঠিক করল, তোষাখানা থেকে কিছু দামী জিনিস সরাবে—মানে চুরি করবে। যে মালিক, তার তো হিসেব দেখার সময়ই নেই—কে আর টের পাবে!

লোকটার নাম? তা কিছু ইতিহাসে দেওয়া নেই। নাম, ধরো আসগর খাঁ।

সে অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে ঠিক করল—ঘরের দেওয়াল তো নিরেট পাথরের, দরজাও মজবুত—ছাদ থেকে গর্ত করে ভেতরে পড়বে, তাহলে কেউ অত বুঝতেও পারবে না। ওপরে যে ঘর, সে ঘরে কোন লোক থাকে না, গর্ত করারও কোন অসুবিধে নেই।

যা ভাবা তাই কাজ।

গর্তও হল, সাবধানে নীচে নামাও গেল। একটা হীরের কণ্ঠি আর চুনি বসানো বাজু জেব্ বা পকেটে ভরে মনের আনন্দে আসগর খাঁ সাবধানে ওপরে উঠতে যাবে, উঠেও ছিল অনেকটা—হঠাৎ হাত পিছলে পড়ে গিয়ে দারুণ জখম হল—পায়ে আর এমন জোর রইল না যে লাফিয়ে ওপরের ছাদের গাঁথুনি ধরে ফেলবে।

কি আর করে। মৃত্যু তো অনিবার্য।

এখন যেটা ভাবনা, কতটা যন্ত্রণা দিয়ে মারা হবে সেইটে নিয়ে। জ্যান্তেই কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে, না অল্প অল্প করে কেটে কেটে নুনের ছিটে দেওয়া হবে, না সোজাসুজি শূলে দিয়ে একচোটেই শেষ করা হবে!

চোর তায় বিশ্বাসঘাতক, যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক; অল্পে অব্যাহতি পাবে না, এটা ঠিক।

যাই হোক, যা অদৃষ্টে আছে, তা তো হবেই।

পরের দিন ভোরেই ধরা পড়ল।

চোরাই মাল সুদ্ধ কোতোয়ালের লোক খোদ বাদশার কাছে নিয়ে এল।

বাদশা কিছু কিছু নেশা করতেন রাত্রে, তখনও সে নেশা সবটা কাটে নি, কথাটা বুঝতেই দেরি হল। যখন ঠিক মাথায় ঢুকল তখন সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, 'আরে বেতত্মিজ, তুই আমার মাইনে খাস পাহারা দিবি বলে—তুইই চুরি করলি। এমন নেমকহারামি করলি!'

মরতে যে হবে তা তো জানা কথাই, আসগর খাঁ মরীয়া হয়ে উঠল। বললে, 'জনাবালি, কী করব বলুন, ন' মাসের তন্‌খা পাই নি, ছেলেপুলেরা না খেয়ে মরতে বসেছে। আমাদেরই বঞ্চিত করা টাকা এই ঘরে আছে জানি—তা এ ঘরে চুরি না করে কোথায় করতে যাবো বলুন। এ তো আমার হক্কের পাওনা!'

শাহেন শাহ, (মানে রাজার রাজা) অর্থাৎ বাদশার চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তবে সে রাগে নয়, বোধ হয় লজ্জায়। তারপরই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আমীরের দল, অন্য কর্মচারীরা তো অবাক। এ কী কাণ্ড! তাহলে কি ব্যাপারটা জাঁহাপনার মাথায় ঢুকছে না এখনও?

হঠাৎ হাত পিছলে পড়ে গিয়ে দারুণ জখম হল। [পৃঃ ১৬৭

কিন্তু বাদশাকে তখনও ওঁরা কেউ চেনেন নি। তিনি খুশী হয়েছেন ওর এই স্পষ্ট আর সত্য কথাতে। হাসি থামলে বললেন, 'ঠিকই বলেছিস তুই। আমি অবিশ্যি জানতুম না, এতদিনের মাইনে বাকি পড়েছে তোদের। যা, তোকে আমি মাপ করলুম। ওগুলোও নিয়ে যা, তবে দামী জিনিস, পোদ্দার না ঠকায়, ঠিক দাম পেলে তোর পাওনার চার গুণ পুষিয়ে যাবে। আর এমন কাজ করিস নি, ভাল করে পাহারা দিবি।'

ছাড়া পেয়ে আসগর তো নাচতে নাচতে চলে গেল।

বড় উজীর সাহেব মুখ ব্যাজার করে বললেন, 'কাজটা কি ভাল করলেন জাঁহাপনা? চোরকে সাজা দিলেন না, তার ওপর ওকে আবার কাজে বহাল রাখলেন। ওর তো সাহস বেড়ে যাবে।'

মহম্মদ শাহ্‌ও স্পষ্ট কথাই বললেন, উজীরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'বহু চোর আমার নানা চাকরিতে বহাল আছে উজীর-এ-মুলুক, তাদের যখন শাস্তি দিতে পারছি না—এঁকে দেব কোন্ অধিকারে? এ বেচারী তো প্রয়োজনে চুরি করেছে। তারা করছে লোভে পড়ে। বলতে গেলে এদের মুখের গ্রাস চুরি করছে, অনেক টাকা তাদের। তার সঙ্গে আরও অনেক টাকা যোগ করার জন্যে তাদের দিনে রাতে শান্তি নেই। তাদের কি আপনি আমি বরখাস্ত করতে পারছি? এটুকু আমি ঠিক জানি, এ আর কখনও চুরি করবে না। আমার আমীরদের মতো এত নেমকহারামি এরা শেখে নি!'

মহম্মদ শার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল।

নাদির শা তখন দিল্লীর কাছে এসে পড়েছেন, বাদশা গেছেন দিল্লীকে বাঁচাতে, আগু বেড়ে পরাজয় স্বীকার করতে—দিল্লী রক্ষা করার বিশেষ কেউ নেই, বাদশা অত দরকারও বোঝেন নি।

উজিররা কিন্তু বুঝেছিলেন যে যতই দীনতা স্বীকার করে মহম্মদ শাহ আত্মসমর্পণ

করুন, নাদির শা দিল্লী লুঠ না ক'রে ঘরে ফিরবেন না। অন্তত লাল-কেল্লায় সোনার কুঁচি বলতেও কিছু থাকবে না।

[নাদির দিল্লীতে এসে নিজের নামে তঙ্কা বা টাকা ঢালাই করিয়েছিলেন—তাতে যে ফার্সী বয়েৎ বা শ্লোক ছিল তার বাংলা করলে দাঁড়ায়—

"রাজার উপরে রাজা এ অবনীতলে,
নাদির রাজার রাজা, শাসিবে সকলে॥"]

আর হলও তাই।

সামান্য একটা গুজবে দিল্লীর কিছু নাগরিক নাদিরের কয়েকজন সেনাকে মেরে ফেলে, তার শোধ তুলতে নাদির দুদিন ধরে দিল্লীর এক লাখেরও বেশি লোককে খুন করান তাঁর সেনাদের দিয়ে। এ ছুতো দিল্লীই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল বলতে গেলে। চাঁদনীচকের 'সোনেরি মসজিদে' দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে নাদির সে রক্তবন্যা দেখেছিলেন নাকি। আর, শুধু মানুষ মেরে তারা ক্ষান্ত হবে, তাই কি সম্ভব, সেই সঙ্গে লুটতরাজও চলেছিল সমান তালে।

কিন্তু আমি যে ঘটনাটা বলছি, সেটা ঘটেছিল নাদির শহরে ঢোকার আগেই।

জন দুই বাদশার 'বন্ধু' ঠিক করলেন, সবই তো লুটেরার হাতে যাবে, তার আগে তাঁরা যদি কিছু সরিয়ে নিতে পারেন—তাতে দোষ কি? অত কেউ বুঝতেও পারবে না। সে দুর্দিনে কেই বা এত হিসেব দেখছে?

অবশ্য লুঠ হলে তাঁদের বাড়িও লুঠ হতে পারে—এটা তাঁদের মাথায় যায় নি। টাকার লোভে মানুষ যখন চুরি করে—তখন চোরের ধন যে বাটপারে নিতে পারে সে কথা ভাবে না।

আর হলও তাই।

চাবি কার কাছে তাও এঁরা জানতেন, সেখান থেকে সেটা হাতানোও শক্ত হল না।

ভুল হল দিনের বেলায় না গিয়ে গভীর রাতে যাওয়াটা। লোক জানাজানি হলে ভাগ দিতে হবে অপরকে, এটাই বোধহয় ভেবেছিলেন।

সেদিন রাত্রে পাহারায় ছিল আসগর খাঁ। ওঁরা গিয়ে বললেন, 'এই সরো, আমরা তোষাখানা খুলব।'

আসগর অভিবাদন করে বলল, 'না, সে আমি পারব না।'

'তার মানে, তোমার আস্পদ্দা তো কম নয়। দেখছ, আমাদের কাছে চাবি—আমরা কি চুরি করতে এসেছি? এখান থেকে এসব দামী জিনিস সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখব।'

আসগর বলল, 'না হুজুর, বাদশা এখানে নেই, তিনি হুকুম না দিলে আমি দরজা ছাড়ব না। তবে আমাদের যিনি ওপরওলা, সে উমীদ খাঁ যদি হুকুম করেন—সামনে এসে লিখিত হুকুম দেন, তবে ছাড়তে পারি।'

তলোয়ার খুলতে দেখে চিৎকার করে উঠল সে।

এঁরা জানতেন, উমীদ খাঁ সে প্রকৃতির মানুষ নয়। মাঝখান থেকে তাকে জানালে তখনই পাঁচ কান হবে।

এঁরা গরম মেজাজ দেখাতে গেলেন।

'এত বড় সাহস তোমার। বান্দার বান্দা, আমাদের মুখের ওপর কথা বলো! এখনই তোমার মাথা মাটিতে লুটোবে বলে দিচ্ছি, ফের যদি জবাব করো।'

'এ জান শাহেন শারই দেওয়া, তাঁর সেবায় যায় যাবে। কিন্তু দরজা আমি ছাড়ব না।'

আরও দু'চারটে কথা-কাটাকাটি হল।

শেষে সত্যিই একজন তলোয়ার বার করলেন।

কথা ওঁরা যা বলছিলেন, চাপা গলায়, কিন্তু তাতেই আরও এঁদের মতলব বুঝতে পেরে আসগর বেশ জোর গলায় জবাব দিতে লাগল। মানে যাতে দু' চারজন গোলমাল বুঝে এদিকে আসে।

শেষে তলোয়ার খুলতে দেখে চিৎকার করে উঠল সে, 'ভাই সব, কে আছ পাহারাদার, এদিকে এসো।'

তার গলার আওয়াজ বন্ধ করতেই গলা কাটলেন ওঁরা—কিন্তু ততক্ষণে বহু লোক ছুটে এসেছে। সেদিন আর কিছু করা গেল না, যা হোক একটা কিছু কৈফিয়ত দিয়ে তাঁদের সরে পড়তে হল।

বাদশার দেওয়া প্রাণ দিয়ে বাদশার দয়ার ঋণ শোধ করল আসগর, তখনকার মতো বাদশার কোষাগার রক্ষা পেল।
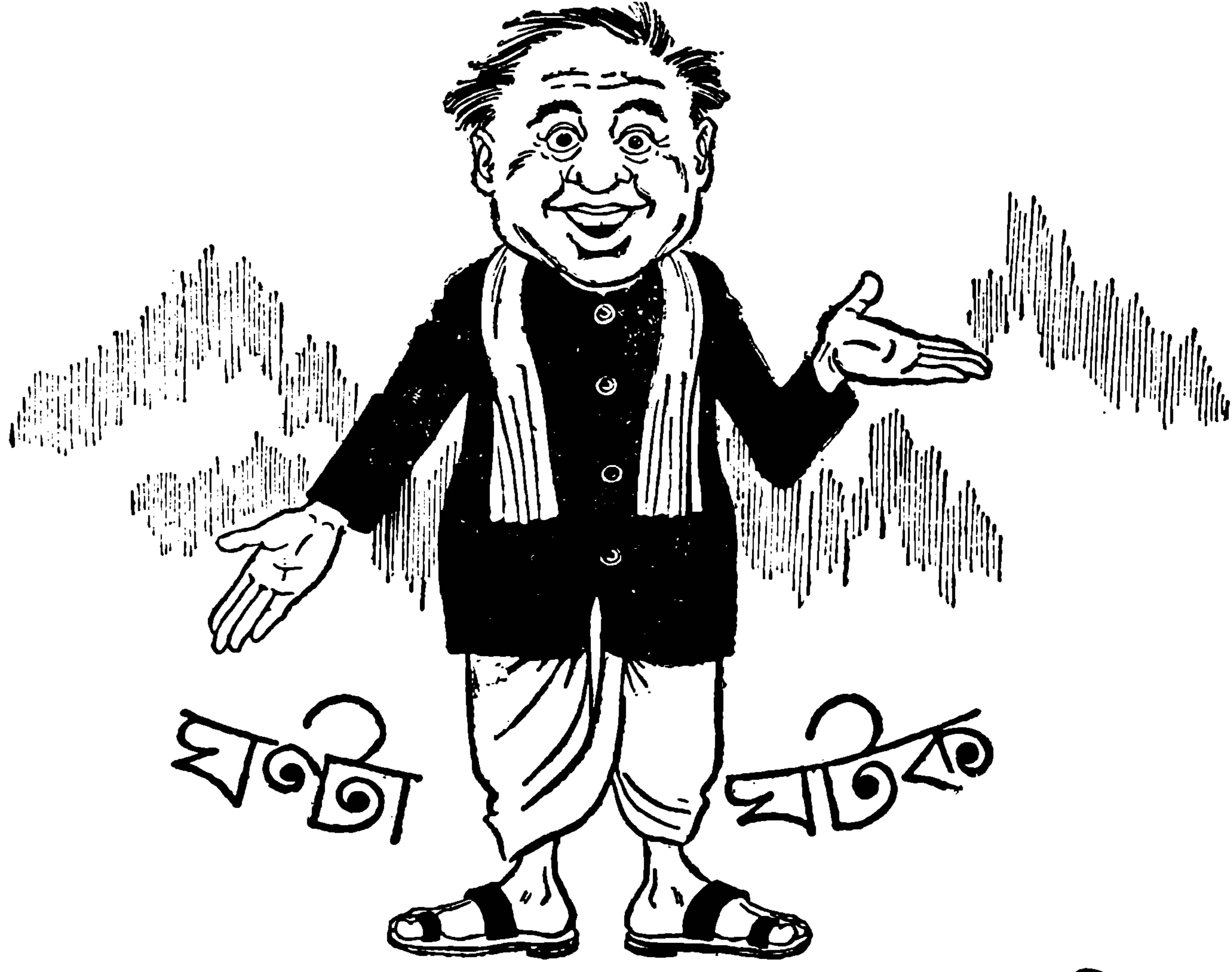
ঘণ্টা ঘটক

শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়

ঘণ্টা ঘটক যেথায় থাকে
এসো এসো সেখানে,
ভাল ভাল পাত্র
পাবে তুমি এখানে।
খ্যাঁদা আছে বোঁচা আছে
ট্যারা আছে কত চাও,
খোঁড়া বুড়ো ধেড়ে এঁড়ে
সব পাবে দেখে নাও।
আরও আছে সুন্দরী
কুরূপা কি মোটকা,
দজ্জাল ঘ্যানঘেনে
ধিঙ্গি ও হোঁতকা।
ছিমছাম নোংরাটে
প্যাঙা আর পুঁটকে,
তোতলা যে হাই তোলে
পিচুটি যে চটকে।
লাল পড়া পাত্রীর
অনেক তো গয়না,
যৌতুক ভাঙা গাড়ি
কানা ময়না।

নাচ জানে কত্থক
মণিপুরী ফক্সট্রট,
কালো রং নয় মোটে
যত কর ছটফট।
ছিমছাম পাত্রীর
হিসেব-নিকেশ নেই,
ন্যাকা হাবা হাড়গিলে
বাগে পেলে ধরবেই।
ঝমঝমে শাঁসালো সে
পাত্রের নাম চাও,
আন্দুলের শ্যামাদাস
রূপগুণ দেখে নাও।
সেইবার এসেছিল
জমিদার বেহালার,
বয়সে একটু বেশী
ষাট সবে হলো পার।
পাত্রীর নাম দীনু
সুন্দরী ক্ষেমদার,
বয়সেতে পঞ্চাশ
ফ্যাসানেতে রঙদার।
জমিদার চমকালে
পাত্রীকে দেখে,
হার্টফেল করে গেলো
বাপ! বাপ! ডেকে।
তাই বলি ঘটকে
রাজা হল ঘণ্টা,
হরেক রকম পাবে
ভড়কাবে মনটা।

গিরিধারী গোপাল

—শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

মেবারের অন্তর্ভুক্ত মেড়তা তালুক।

কুড়কী গ্রামাঞ্চলে রত্ন সিং-এর বাস। গাঁয়ের সকলে বলে 'রতিয়া রাণাজি'। রত্ন সিংহ মাড়বাড়-রাণা রাও যোধাজীর পৌত্র ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি মেড়তার ভূস্বামী হলেন।

মীরা রত্ন সিং-এর একমাত্র পুত্রী।

মীরার খুল্লতাত পুত্র রায়মলজী মীরার বাল্যসখা। পরম বৈষ্ণবের ঘরে লালিত-পালিত হয়ে এ দুটি শিশুর মনে বাল্যকাল থেকেই ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হয়।

রায়মল্ল রাজস্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর। চিতোর অবরোধের সময় তিনি দুর্গ-প্রাকারে আকবরের গুলিতে প্রাণ হারান। সৈনিক হয়েও তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব ও সুকবি।

মীরা তাঁর বৈষ্ণব ধর্মে শিক্ষাদীক্ষা ও সঙ্গীত সাধনা সবই এই রায়মলজীর কাছ থেকে শিশুকাল থেকেই শিখে আসছিলেন। যুবক রায়মল মীরার থেকে মাত্র সাত আট

বছরের বড়, তবে ধর্মানুশীলনে তাঁর নিবিড় আগ্রহ ছিল। বহু মহান কবিদের গান তাঁর যেমন কণ্ঠস্থ ছিল, তেমনি জানা ছিল তার অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা, যা তিনি মীরার শিশুপ্রাণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ঈশ্বর কৃপায় মীরাও ছিলেন জন্মকবি ও প্রাণবন্ত গায়িকা। রায়মলজীর হিন্দী গান শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে সুর-তান-লয়ে তা কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারতেন।

প্রত্যহ প্রাক্কালে রতিয়া রাণার বাহির প্রাঙ্গণে রায়মলজী মীরাকে নিয়ে বসেন—তানপুরা, দোতারা ও ভজনখঞ্জনী সাথ ভগবানের নাম করতেন। মীরা করতেন রচনা—তিনি সেই রচনায় সুরারোপ করে তাকে সজীব করে তুলতেন। মীরার গলায় তার জীবন্ত রূপ শুনে গাঁয়ের লোক বিমোহিত হয়ে দলে দলে জড় হত। মীরা গানটিকে বিভিন্ন ভাষায় রূপায়িত করে ছড়িয়ে দিতেন সবার অন্তরে।

গত রাতে মীরা রচনা করেছে—

মেরে তো গিরিধর গোপাল···দুসর নহি কোঈ।
যাকে শির মৌর মুকুট মেরে পতি সোঈ॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ সোঈ॥

পিছু থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠে আসে প্রতিরোধ।—বলেন, 'নহি-নহি বেটি···শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দিয়ে আমার বালক বেণুকর গিরিধর গোপালকে চতুর্ভুজ করো না—তাহলে তিনি নিমেষে দূরে চলে গিয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণু মূর্তিতে পর্যবসিত হয়ে, ঊর্ধ্বে দেবতার স্থানে বসে ভোগ খাবেন। আমাদের কাছে আর থাকবেন কেন?

হতবাক হয়ে মীরা ও রায়মলজী চেয়ে দেখেন···এক গৈরিক বসনধারী চর্মকার তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে চেয়ে আছেন। দৃষ্টিতে তাঁর জিজ্ঞাসা···

রায়মলজী বলেন, আরে হাঁ জি! তুমি তো ঠিকই বলেছো···শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী তো বিশ্বের পালন দেবতা শ্রীশ্রীবিষ্ণু! মৌর মুকুট ছেড়ে তিনি শঙ্খ চক্র ধারণ করবেন কেন? বাঃ বাঃ! কে তুমি ভাই সাধুর ছদ্মবেশে?

সাধুজি বলেন,—'চর্ম কর্ম মোর, জাতেতে চামার
রুইদাসজী হয় আত্মীয় আমার।'

মীরা অপলক দৃষ্টিতে সাধুর পানে চেয়ে বলে ওঠেন—

জাতে চামার হন আর যাই হোন—আপনি মহান্—আপনি মানুষ অবতার।

সাধুজী বলে ওঠেন—কেয়া কহা মাঈ—তু ধন্য—তেরা চিন্তা ধন্য—গাও, গাও বেটি···

মীরা বিন্দুমাত্র দেরি না করে গান ধরে—

আমার গিরিধারী গোপাল আর তো কেহ নেই।
যারই মাথে ময়ূর মুকুট আমার পতি সেই॥
পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধু আপন নহে কেউ।
ছেড়েছি দুই কুলের বাঁধন পরমপতির সন্ধানেই॥

আমার বালক বেণুকর গিরিধর গোপালকে চতুর্ভুর্জ করো না। [পৃঃ ১৭৪

সজ্জন সাধু সঙ্গ করি—লোকলাজ দেছি ছাড়ি।
নয়নের জল সিঞ্চন করি প্রেমের লতা চলি বুনেই॥
আজি সেই লতার ফুল হতে আনন্দ ফল ধরেছে—
ভকত দেখে করি সমাদর লোভাতুর দেখে মরি কেঁদেই॥
প্রভুর লগনে লগন বেঁধেছি—যা হবার তা আজ হবেই॥

সাধুজী বলেন—বাহ্‌বা বেটি !

ফল কারণ ফুল বনঈ।
উব্‌জে ফল তব্‌ সব্‌কো বিলাঈ॥

ফুল ফোটে ফলের জন্যে। ফল উপ্‌জে পড়লে সকলকে বিলানো হয়। তুই বেটি দুকূলের বাঁধন ছিঁড়ে, প্লাবন এনেছিস্‌—প্রেমের ধারা উপচে তুলেছিস্‌—পরমপতির সন্ধানে মনোনিবেশ করেছিস্‌···তব্‌ ? না-না, আজ নয়···আজ উঠি।

রায়মলজী বলেন—সে কি রুইদাসজী—আর গান শুনবেন না ?

সাধু বলেন—কুল্‌ কী বাঁধ ভি টুটা—পরম পতিকো সন্ধান মিলা—তব্‌ দাওয়াৎ তো পাক্কা। হপ্তা বাদ আমার গিরধরলালজীকে সঙ্গে এনে নিমন্ত্রণ খেয়ে যাবো।

কথা বলতে বলতে মুচিবেশী সাধু তার চামড়ার থলি থেকে বার করেন এক বংশীবাদন কৃষ্ণমূর্তি···মীরাকে দেখিয়ে বলেন—বেটি হপ্তাবাদ লগনলেগে যাবে—তৈরী থাকিস্‌।

মীরা ছুটে গিয়ে সেই গিরিধর মূর্তিকে সন্ন্যাসীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেন—বলেন—এই তো সেই স্বপ্ন কিশোর—আমার নিত্য স্বপ্নে যিনি দোল দিয়ে যান্—

সন্ন্যাসী বলে—এ যে আমার সাত জনমের আরাধনার ধন—একে ছেড়ে যাবো তোর কাছে, সে কেমন?—

মীরা কেঁদে ওঠে, বলেন—না, না যোগী, তোমার দুটি পায়ে ধরি, এ মূর্তি তুমি কেড়ে নিও না।

সাধুজী মীরার হাত থেকে মূর্তি নিতে নিতে বলে—ধৈর্য ধর বেটি, হপ্তাবাদ আবার আসবো—সাত বরষার গীত শোনাতে হবে আমার গিরিধরলালকে···তারপর যদি আমার গিরধরের থাকতে ইচ্ছে হয় তোমারা পাশ, হামি তোমায় দিয়ে দেবো।

বলতে বলতে সন্ন্যাসী চামার অন্তর্ধ্যান করলেন। মীরা 'ইষ্টদেব' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

মীরা মাকে বলে—মাগো, সাধুজী আমার জন্মজন্মান্তরের গিরধর গোপালকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন—কিছুতেই দিলেন না!

মীরার মা আশ্চর্য হয়ে রায়মলজীকে জিজ্ঞেস করেন—ব্যাপার কি?

রায়মলজী বলেন,—এক সাধুবেশে চামার এসে মীরাকে একমূর্তি দেখিয়ে পাগল করে দিয়ে গেল···চোখের সামনে দেখলাম···কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারলাম না···বললেন হপ্তাবাদ আসবে—সাত বরষার গান শুনাতে হবে তার গিরিধারীলালকে। গান শুনে গিরিধারীলাল যদি সন্তুষ্ট হন, তবেই পাবে সে মূর্তি—মীরা বোনটি আমার।

মীরার মা বলেন—এ তো খুব ভাল কথাই বলে গেছেন সাধুজী—গিরধরের ফুল আঙিনায় ঘুরে ঘুরে তুই কত গানই তো বাঁধিস—বেঁধে ফ্যাল সাতখানা বরষার গান।

মীরা কাতর হয়ে বলেন—এক বরষায় বরষার যে রূপ তা কি ফিরে বরষায় থাকে মা? সাত বরষার গান মানে সাধু বলে গেলেন সাত বছর বাদ আসবেন।

মীরার মা যত বোঝান—মীরার মন বোঝ মানে না। কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে।

* * * *

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দ্যাখেন মীরা যে তিনি যেন গৃহদেবতার সংলগ্ন ফুল বাগিচায় দাঁড়িয়ে আছেন। চারদিকে ফুলে ফুলে ছয়লাপ···তারি মাঝে যেন দাঁড়িয়ে হাসছেন সাধুজীর সেই গিরধরলাল···বাঁশীর মধুর স্বরে আকৃষ্ট করে কি যে চলেছেন···আহা-হা, কী সুন্দর নওল কিশোর রূপ···মীরা কেঁদে কন—

তৃষিত নয়ন মোর জীবনউদাসী
শুনি শ্যামল বনমাঝে শ্যামলের বাঁশী॥
সুখ নাহি শয়নে,
নিদ্ নাহি নয়নে,
ঘেরি আসে প্রিয়তম নিশাস ফুলেল-সুবাসী॥

গানের সাথে শ্যামলের দিকে এগিয়ে চলেন মীরা। অধরের বাঁশী থামিয়ে গিরিধর নিমেষে স্মিত হেসে উধাও হয়ে যান…মীরা লুটিয়ে পড়েন ভূমিতে॥

* * * *

আবার যেন মনে হয় বাহির অঙ্গন প্রাঙ্গণে বসে মীরা গান গাইছেন…এমন সময় সাধু রুইদাস এসে, হেসে হেসে তার চামড়ার থলি থেকে তাঁর গিরিধরলালকে দাওয়ার মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে বলছেন—

—কি বলবি বল্ বেটি, গিরিধরলালকে ধরে এনেছি।

মীরা গায়—

তোমার কারণে আজ, ছেড়েছি সুখের সাজ
তবে কেন আমারে কাঁদাও?
তোমারে সাজে না আর অভিনয় ছলনার
চরণেতে মোরে ঠাঁই দাও॥
মোর অন্তরে বিরহের দাহ,
প্রভু তুমি আসিয়া নিভাও,
মীরা দাসী জনম জনমের—তার অঙ্গেতে অঙ্গ মিলাও
তার চিত্তে চিত্ত পরশাও!

এই না গেয়ে মীরা ছুটে গিয়ে গিরিধর মূর্তিকে কোলে তুলে নিতে যান।

কিন্তু—উঃ, কি শক্ত করে এঁটে বসেছেন তিনি—মীরা শত চেষ্টাতেও তাঁকে এতটুকু হেলাতে পারলেন না।

সাধুজী সবই যেন দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বলেন—কি হলো বেটি, তোমার গান শুনেও গিরিধরলাল এখনও নারাজ?

মীরা ছুটে গিয়ে সাধু চামারের পায়ে লুটিয়ে পড়ে গানে গানে আবেদন করেন—

গুরুজি!
প্রণতি জানাই শ্রীচরণে
ও চরণ বিনা মোরে ঘিরে আছে মায়াডোরে,
স্বপ্ন দেখি নিদ্ জাগরণে॥
গিরিধর ধর বলে ঝাঁপ দেছি লোনাজলে
সংসার কালিদহে বিষজ্বালা শুধু জলে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে—
অমৃত কলস রাখা লবণাক্ত অতলে—
তারে তুলি আনিতে পারে শুধু গুরুবলে,
দেখাও পথ সন্ন্যাসী, কেঁদে বলে মীরা দাসী,
দেউল প্রবেশদ্বার জানে গুরুজনে॥

সন্ন্যাসী বলেন—বেটি! উঠে বসো—ঐ গিরিধরলালের দিকে চোখে চোখ রেখে

তন্ময় হয়ে শুভদৃষ্টি করত···তখনই ফুটে উঠবে তোমার ত্রিনয়ন বেটি! সেই তখন লবণাক্ত অতল সমুদ্র জল থেকে সুধার কলস তুলে এনে তোমায় পান করাবে···

মীরা গিরিধরলালের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে গেয়ে ওঠে—

আমার আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল
মোহন-মূরতি সুন্দর জ্যোতি
নয়ন অতি বিশাল।

ধীরে ধীরে মূর্তি সজীব হয়ে ওঠে—মুখে হাসি ফোটে—কটিতটে বেজে ওঠে ছোট ঘণ্টার মালা···মীরা গায়—

অধর অমৃত মুরলী বাজে, কণ্ঠে দোলে জয়মালা
কটিতটে শোভে ঘন্টি-মেখলা
মঞ্জীরে মধু ঢালা—
রুণুঝুণু রুণুঝুণু নূপুর বোলে
চরণে চরণে তোলে তাল॥

সজীব গিরিধারীলালকে মীরা বুকে তুলে নেন—সাথে সাথে বলেন—

চিত-নন্দন মেরে শ্যামল,
মনের গোপন পুরে ভাঙিলে আগল,
মীরা চিতচারী শ্যাম-গিরিধারী
ভকত-হৃদয় গোপাল॥

জীবন্ত গিরিধরলাল মীরার বুকে হঠাৎ মিলিয়ে যায়···মীরার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে।

বাহির অঙ্গনে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে···মীরা ধড়মড়িয়ে ওঠে, তারপর···

বাহিরের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বপ্নের সাধুজী।

মীরাকে দেখে বলেন—হপ্তাবাদ আমি এসে গিয়েছি···আমার গিরিধরলালকে তোমার রচিত সাত বর্ষার গান শোনাও।

মীরা বলে—সাত বরষা। এখনও তো এক বরষাও কাটে নি গুরুজী—

কেমনে পড়িবে বল সাত বরষা ঝরে?

সাধু হেসে বলেন—

সাত দিনে-রাতে চোখের বরষা ধারা সাত সমুদ্র গড়ে।

মীরা চোখের জলের বরষায় শুরু করে—

জীবনের কোলাহলে
নয়ন বরষা জলে
ধুয়ে দেছি মনের দেউল।
অঙ্গনে প্রিয়তম
চেয়ে আছে পথ মম,
পরাইব নিজ হাতে চন্দন ফুল!

আগত প্রিয়রে মোর স্বাগত জানাই হায়
ভয় হয় মনে মনে যদি না হারায়ে যায়,
মনচোর, সে যে মোর শত জনমের ডোর
অপরূপ রূপছবি বিভবে অতুল।
প্রেমের পীযুষধারা
ঢালে বাঁকা শশী—হিয়াপট আধারে
ভরিয়াছে সরসী—
মিটিয়াছে মন-আশা হারায়েছে মীরা দিশা
বারিহীন মরুতৃষা বাড়ায়েছে তিয়াষা
এ কি এ বিষণ্ণতা পরিপূর্ণ শূন্যতা
পূরব জনম সাথী করেছে বাউল।

গিরিধারী গোপালকে বুকে নিয়ে পিছু ফিরে দেখতে গিয়ে মীরা দেখেন—সাধু অন্তর্ধ্যান করেছেন।

* (ক) প্রবাদ আছে মীরা তার গিরিধারী গোপালকে এক অচ্ছুৎ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।
(খ) গানগুলি মীরা-রচিত হিন্দী হতে বাংলায় ভাবানুবাদ।

মণি ও মুক্তা

কম্পিউটার-চালিত চালক-বিহীন অভিনব জাপানী বাস্। ফোন করলেই নির্দিষ্ট স্থানে চলে এসে যাত্রী তুলে নিয়ে যায় এই বাস। জাপানে কম্পিউটার-চালিত ট্রেন-এরও প্রবর্তন হয়েছে।
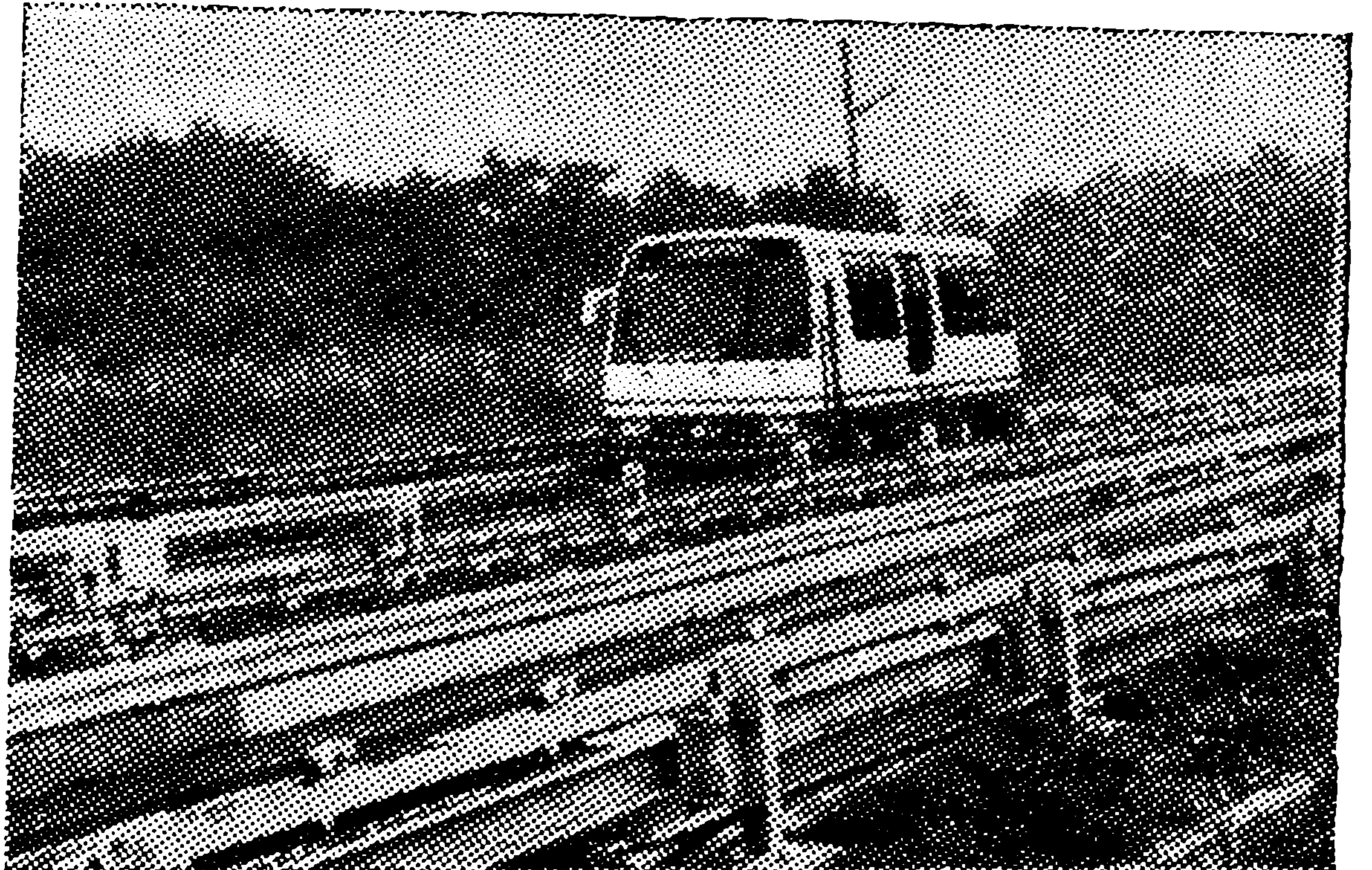
॥ নায়েগ্রা জলপ্রপাত যেদিন শুকিয়ে গেল ॥

—বীরু চট্টোপাধ্যায়
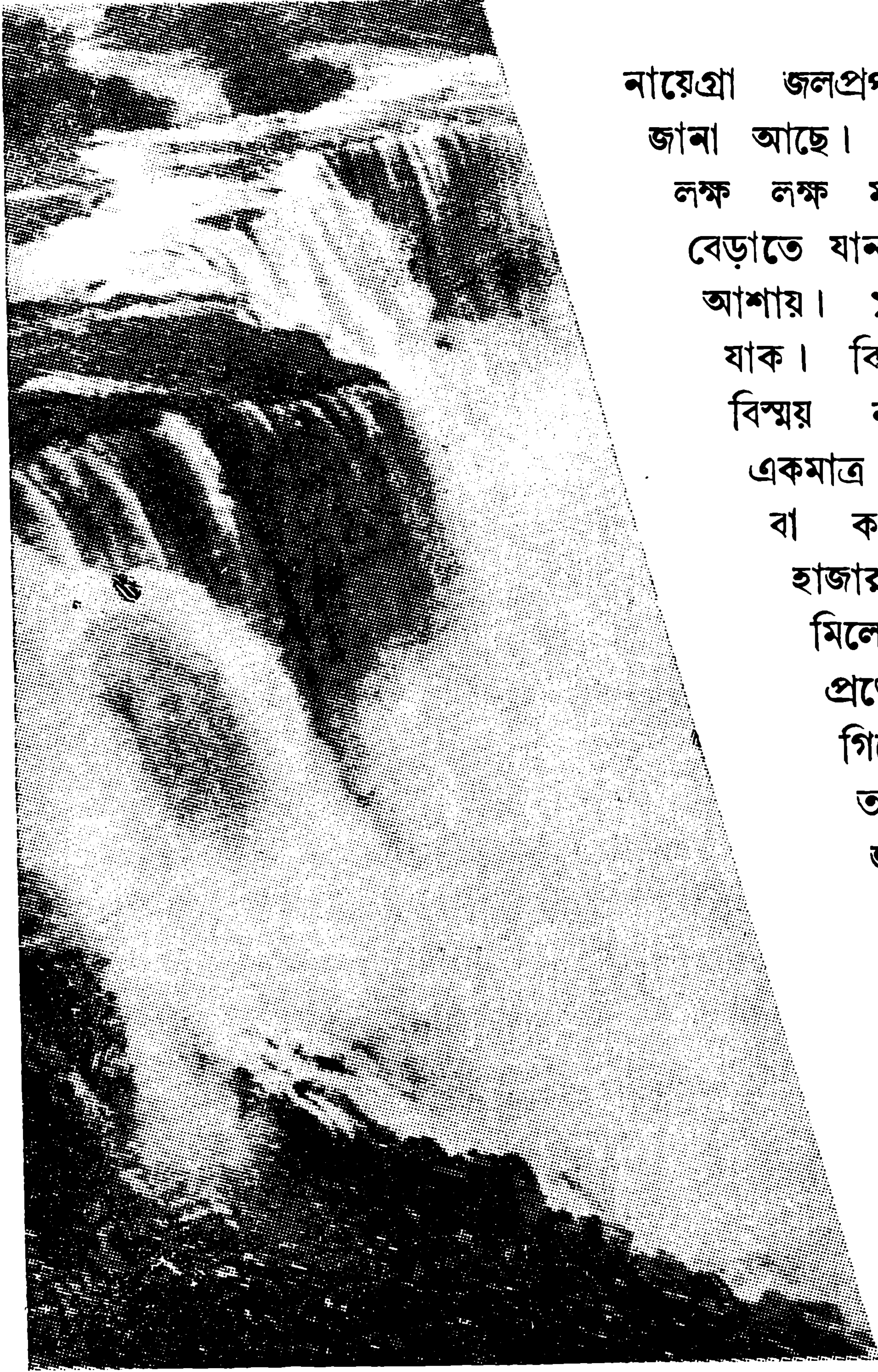
নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কথা সবারই নিশ্চয়ই জানা আছে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমেরিকা বা কানাডায় বেড়াতে যান এই জলপ্রপাতের দর্শনলাভের আশায়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের কথাই ধরা যাক। বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম সেরা বিস্ময় নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে একমাত্র ইংল্যাণ্ড থেকেই আমেরিকা বা কানাডায় গিয়েছিলেন ২০।২৫ হাজার মানুষ। আর সারা দুনিয়া মিলে তা হবে কয়েক লাখ। প্রত্যেক দর্শকই, বলা বাহুল্য, ফিরে গিয়েছে এমন এক শংকাশিহর তাজ্জব স্মৃতি নিয়ে, যা তারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারবে না।

আর ১৯৬৫-তে সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবরে যে সব মানুষজন ঐ বিশাল জল-প্রপাতের কাছে গিয়েছিল, তাদের অবশ্যই আরেক অভূতপূর্ব ও হতবাক করা এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সন্দেহ নেই। যে অবিশ্বাস্য দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, তা বুঝি এ শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার আর দেখা যাবে না।

আমেরিকার দিকের প্রপাত

১৯৬৫-র দর্শকরা তাদের ছেলেপুলে এবং নাতি নাতনীদের কাছে এই আজব ঘটনার কাহিনী বলে তাদের অবাক করে দিতে পারবে এই বলে যে তারা ঐ বিশালকায় বিস্ময় নায়েগ্রা জলপ্রপাতকে একেবারে জলশূন্য অবস্থায় দেখেছিলেন।

ঐ বছর 'নায়েগ্রা ফল্স্ সিটি কাউন্সিল' এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল যে তারা উক্ত প্রপাতের দ্বিমুখী ধারার একটি ধারা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেবে।

তোমরা বোধহয় জানো, নায়েগ্রা জলপ্রপাতটি দুটি ধারায় দু' দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দেশ দুটি হচ্ছে কানাডা এবং আমেরিকা। কানাডার ধারাটির নাম হর্সস্যু। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কানাডার হর্সস্যু ঠিকই ঝরবে, শুধুমাত্র আমেরিকার দিকের প্রপাতটিকে পরিপূর্ণভাবে শুষ্ক করে দেওয়া হবে। না, চিরদিনের জন্য বন্ধ করা হবে না পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়টিকে। ঠিক বিপরীত। অনাদিকাল থেকে প্রচণ্ড জলের তোড়ে বড় বড় পাথরের চাঁই প্রপাতের পাদদেশে জমে যাওয়ায় জলপ্রপাতটির ভয়ংকর সৌন্দর্য কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাই যেখানে নায়েগ্রা নদী বিভক্ত হয়ে উভয় দেশের প্রপাতে জল সরবরাহ করছে, সেখানে শুধুমাত্র আমেরিকার দিকটিতে বাঁধ তৈরী করে সমগ্র জলধারাকে কানাডার হর্সস্যু পথে চালিত করে এদিকটা শুকিয়ে ফেলবে। তারপর এতদিনের জমে থাকা বড় বড় পাথরগুলোকে সরিয়ে নিয়ে এবং জলধারার পাশে থাকা লৌহবেষ্টনীগুলিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে যেটুকু সময় লাগবে ততদিনই বন্ধ রাখা হবে জলধারা। ব্যস্, তারপর খুলে দেওয়া হবে জলধারা গর্জনশীল প্রপাতকে পুনরায় চালু করতে। সিটি কাউন্সিল কেবলমাত্র আমেরিকার দিকটিকেই বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল সেবার আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন নায়েগ্রা-ড্রাই।'

দুনিয়াভর ট্রাভেল এজেন্সীদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হল, কবে এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটবে? নায়েগ্রা জলপ্রপাত যেমন একদিকে জলীয় থাকায়ও চরম আকর্ষণের বস্তু, অপর দিকে তেমনি শুষ্ক হয়ে থাকাও কম দর্শনীয় বস্তু নয়।

স্থানীয় টুরিস্ট কর্তৃপক্ষের আরজি যে ব্যাপারটাকে যেন পিছিয়ে দেওয়া হয় অক্টোবর অথবা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। কেননা, তাহলে গ্রীষ্মকালীন দর্শকরা মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সজল প্রপাতকে দর্শনলাভের সুযোগ পাবে, শুষ্ক প্রপাতও প্রভূত লোক টানবে, সন্দেহ নেই। তবুও—

অবশ্য আজ থেকে ১৩৪ বছর আগে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ এর চেয়েও আজব ঘটনা ঘটেছিল ঐ জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে। আর সে ঘটনা কিন্তু ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মত কৌতূহলকর বা সুখকর ব্যাপার ছিল না।

সেই ১৮৪৮-এর ৩১শে মার্চ যা ঘটেছিল, তার কথা কিন্তু পূর্বে কেউ কল্পনায়ও আনতে পারে নি। সেদিনকার ঘটনায় অভিভূত নরনারীরা ভেবে নিয়েছিল যে পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে।

দক্ষিণ অন্টেরিও প্রদেশের সর্বত্র এবং উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের মানুষজনের কাছে

সেই মার্চের দিনগুলি এসেছিল ভয়াবহ ত্রাস নিয়ে। এক অভূতপূর্ব নৈসর্গিক বিপর্যয় শুরু হয়েছিল তার আগে থেকেই। অদ্ভুত দুর্যোগ। দেশের ইতিহাসে এত বড় ঝড়ঝঞ্ঝার দ্বিতীয় কোন রেকর্ড ছিল না। সারাটা মার্চ মাস ধরে অক্লান্তভাবে বয়ে যাচ্ছিল রোষ কষায়িত সেই প্রবল তুফান। শুধু তাই নয়, সঙ্গে ছিল বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিকট ঝড়বৃষ্টি। সমস্ত অঞ্চলটা তীব্র আতঙ্কে বিবশ হয়ে গিয়েছিল।

ভয়ঙ্কর সেই ঝঞ্ঝা নায়েগ্রা নদীতে দ্রুত প্রবহমান বিপুলকায় বরফের টুকরোগুলোকে মোচার খোলার মত ওথাল-পাথাল করতে করতে, কখনো বা পালকের মত উড়িয়ে নিয়ে নিয়ে ফেলছিল এদিক ওদিক। বরফের টুকরোগুলো চতুর্দিকে এমন বুলেটের গতিতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল যে তাদের আঘাতে যে কোন পশু বা মানুষের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি অবধারিত। ফলে নদীর তীরের একশত ফুটের মধ্যে কোন জীবিত প্রাণীর যাওয়ার সাধ্য ছিল না।

ঝড়ঝঞ্ঝার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুজবও বেড়ে চললো দ্বিগুণ ভাবে। নিউ ওয়ার্ল্ড চার্চের ধর্মযাজকরা বলতে লাগলেন, পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন দ্রুত এগিয়ে আসছে। রেভারেণ্ড গিলবার্ট ফেয়ারফোল্ড বিভিন্ন জনসভায় বলে চললেন, এই ঝড় হল তারই সূচনা মাত্র।

সবাই তখন শেষ আশ্রয় হিসেবে ঈশ্বরের স্মরণ নিতে লাগলো, উপদ্বীপের সর্বত্র মানুষ আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে শুধুমাত্র রবিবারেই নয় সপ্তাহের প্রতিদিন দলে দলে গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনারত রইল। আবালবৃদ্ধবনিতা সক্রন্দনে প্রার্থনা করে চললো, 'ঈশ্বর আমাদের ত্রাণ করো।'

মার্চের ৩০ তারিখে আগেকার সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে ঝড়ের গতিবেগ চরম অবস্থায় পৌঁছলো। ভয়ঙ্কর সে তুফান। আর নায়েগ্রা নদী ক্রমে ক্রমে বিপুলায়তন বরফের চাঁইতে চাঁইতে আকীর্ণ হয়ে প্রবলভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠলো যেন, সমস্ত নদী ভাসমান বরফে বরফে রুদ্ধ হয়ে গেল।

তারপর—অকস্মাৎ ৩১শে মার্চের প্রত্যুষে প্রচণ্ড হাওয়া মিলিয়ে প্রকৃতি যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। শিলাবৃষ্টি এবং তুষার ঝরা একেবারে বন্ধ হয়ে এল। আকাশে বজ্রবিদ্যুৎও যেন মরে গেল।

ঝড়েতে আতঙ্কিত মানুষজনের কাছে আকস্মিক এই হিমশীতল নিস্তব্ধতাও যেন আরও ত্রাস ছড়ালো। মানুষেরা, যারা পৃথিবীর অন্তিম লগ্নের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ফেলেছিল, তাদের কাছে এ নিস্তব্ধতা আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, অসহনীয় হয়ে দাঁড়ালো। সেই ছবিসহ রাত্রে বহুলোক ঘুমতে পারলো না। আর হাজার হাজার মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই অলৌকিক নিস্তব্ধতার মধ্যে নীরবে এগিয়ে যেতে থাকলো স্ব স্ব গীর্জার দিকে। তাদের দেহে যেন সাড় নেই, মনে কোন ভার নেই, সে এক পক্ষাঘাত আক্রান্ত অবস্থা।

কানাডার দিকের প্রপাত—হর্সসু

তারা যখন এগিয়ে যাচ্ছিল চার্চের পথে, তখন সহসা একটা কথা তাদের মনে অনুভূত হল। শুধু যে ঝড়ঝঞ্ঝাই থেমে গেছে তা নয়, আরেকটা অভ্যস্ত আওয়াজ অর্থাৎ অবিরাম বয়ে যাওয়া জলপ্রপাতের সোঁ সোঁ কলকল গর্জনও আর কানে আসছে না। ব্যাপার কি?

কান ফাটা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের আওয়াজও যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দুঃসহ রাত্রি শেষ হয়ে যখন ৩১শে মার্চ ১৮৪৮-এর প্রভাত শুরু হল, তখন দেখা গেল, হাজার হাজার হতবাক নীরব ও শীতাক্রান্ত বৃদ্ধ বনিতার সমাগম হয়েছে নদীর তীরভূমি বরাবর।

বিস্ফারিত তাদের দৃষ্টির সামনে যে দৃশ্য উদঘাটিত হল তা যেমন অচিন্ত্যনীয়, তেমনি অবিশ্বাস্য। জীবনে এ দৃশ্য তারা কেউ দেখে নি কখনো, দেখবার আশাও করেনি কখনো। এ দৃশ্য বুঝি সৃষ্টির আদি থেকে আর হয়ও নি কখনো।

যেখানে অহোরাত্র ধরে সগর্জনে বিকট আকারের প্রপাত পতিত হত, সেখানে এক ফোঁটা জল নেই, গর্জন নেই, মৃত্যু নীরবতা অসহনীয়ভাবে বিরাজ করছে। চবিবশ ঘণ্টা আগেও যে প্রপাত বয়ে যাচ্ছিল তা এখন পরিপূর্ণ নির্জলা। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

দর্শক সাধারণ যারা এই আতঙ্কিত ঘটনা কথা কয়ে ভোলবার চেষ্টা করছিল, তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো আপাত শুকনো অসংখ্য প্রস্তর খণ্ডের পাহাড়। প্রত্যুষের নিষ্প্রভ আলোয় তারা এ কি অবিশ্বাস্য, অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখছে! তারা জেগে আছে তো? তাদের মাথার ঠিক আছে তো? নাকি সবই দুঃস্বপ্ন?

নিস্তব্ধতা এতই প্রখর ছিল যে কানাডার দিকের জনৈক পাদ্রীর আদেশ ধ্বনিও তাদের স্পষ্ট কানে এল। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় সামিল হতে বলছেন। তৎক্ষণাৎ আমেরিকার দিকের ত্রাসাক্রান্ত যাবতীয় মানুষজন হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় রত হল।

ক্রমে ক্রমে নীল আকাশে সূর্যোদয় হল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সম্মোহিত জনসাধারণ তাদের সম্বিৎ ফিরে পেল। কিছু কিছু দুঃসাহসী লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে নদীর দুদিক থেকে নদীর তীরের পানে এগিয়েও গেল। তারা গিয়ে জলশূন্য কর্দমাক্ত প্রপাতের পাদদেশে উপস্থিত হল। তারা অনেকে ঘোড়া থেকে নেমে সেই দল্‌দলে কাদায় পা রাখলো, যা কিনা এতাবৎ কোন জীবিত মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

যখন দেখা গেল, এততেও পৃথিবীর শেষ ঘনিয়ে এল না, বেলাও গড়িয়ে চললো, তখন কিছু অতি দুঃসাহসী লোক সেই কর্দমাক্ত প্রপাতের পাদদেশে নেমে গেল কিছু অপ্রত্যাশিত বস্তুসামগ্রী প্রাপ্তির আশায়।

তাদের সে উদ্যম ভালভাবেই পুরস্কৃত হল। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তারা পেয়ে গেল বহু-শত বন্দুক, যেগুলো ১৮১২-র যুদ্ধের পর নায়েগ্রার জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রভূত মূল্যের ধাতব সামগ্রীও উদ্ধার করা গেল এই কর্দমাক্ত প্রপাতভূমিতে। কত চাঞ্চল্যকর বস্তু সামগ্রী যে পাওয়া গেল সেখান থেকে তার আর লেখাজোকা নেই।

সন্ধ্যে নেমে এল। কিন্তু হাজার হাজার সম্মোহিত নরনারীর দল তেমনি সেই নদীর তীরে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। দিনের আলোয় যে ভীতি ক্রমে ক্রমে তাদের মন থেকে মুছে গিয়েছিল, রাত্রির অন্ধকারে তা আবার তাদের মনে চেপে বসতে শুরু করলো।

মনে মনে স্থির নিশ্চিত হল তারা যে পৃথিবীর এখানেই শেষ। পাপের পৃথিবী ঈশ্বর ধ্বংস করে ফেলতে চান। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান হাত ছাড়া এমন নৈসর্গিক বিপর্যয় তো আর কারুর দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। জলপ্রপাতকে স্তব্ধ করে দেওয়া অপর কোন ইহলৌকিক শক্তিরই সাধ্যের অতীত।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে সে রাতে বিস্তীর্ণ ঐ অঞ্চলের একটি মানুষও দু-চোখের পাতা এক করতে পারে নি। কি সাহসী, কি ভীরু, কি আতঙ্কে অবশ, সব মানুষেরাই অব্যক্ত এক ত্রাসে নদীর তীরেই মোহাবিষ্টের মত দাঁড়িয়েছিল। অসহনীয় রাত্রি। কিছু স্বল্প সংখ্যক লোক এক হয়ে নিজেদের বাড়িতে কিংবা গীর্জায় চলে গিয়েছিল প্রার্থনা করতে, অন্তিম প্রার্থনা।

কান বন্ধ হয়ে যাওয়া নিস্তব্ধতা নেমে আসবার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর অর্থাৎ ১লা এপ্রিল রাত ঠিক তিনটের সময় নদীতীরে জমায়েত নরনারীর কানে এল বহু দূর থেকে আসা ক্ষীণ এক গুড় গুড় ধ্বনি।

সেটাই বুঝি যে কোন একটা গোটা জাতিকে এপ্রিল ফুল দিবসের করুণ এক হাস্যধ্বনি রূপে চিহ্নিত করে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট।

সেই দূরাগত গুড় গুড় ধ্বনি যখন ক্রমে ক্রমে বেড়ে প্রচণ্ড গর্জনে পর্যবসিত হল, তখন জ্ঞান ফিরে পাওয়া সেই জনতা প্রাণভয়ে পিছন ফিরে দৌড় শুরু করলো। যারা পারলো না, তারা ভীত অবশ দেহ নিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ঈশ্বরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করে হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়লো।

গর্জন কিন্তু তাতে থামলো না। উত্তরোত্তর বেড়েই চললো, কানের পর্দা বুঝি ফেটে যাবে সে বিকট আওয়াজে।

তারপর, হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে পাহাড় প্রমাণ এক জলোচ্ছাস নদীর উজানের দিক থেকে এগিয়ে এসে টাইভাল ওয়েভের মত প্রপাতের উপর আছড়ে পড়লো। সে উৎকট জলধারা বয়ে নিয়ে এসেছে বিশালকায় সব বরফের টুকরো, বড় বড় গাছ, এমন কি ছোট ছোট প্রচুর সংখ্যক কাঠের বাড়ি। এ সব বস্তুই মাইলের পর মাইল নদীর উজান থেকে সংগৃহীত। প্রচণ্ড জলের তোড়ে খড়কুটোর মত অকল্পনীয় গতিতে ভেসে যাচ্ছে সব।

যে অচিন্ত্যনীয় শব্দ ও গতিতে এসব এসে প্রপাতের মুখ থেকে বহু বহু নীচে আছড়ে পড়লো তা বুঝি কোন মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে শুধু দুঃস্বপ্নের মধ্যে দেখা এবং শোনা কোন কল্পনার বিভীষিকা, উপস্থিত জনতা আধমরা হয়ে গেল সে বজ্রধ্বনিতে, বহু লোক জ্ঞান হারিয়ে ভূলুণ্ঠিত হল। দুরন্ত ত্রাস, অসহনীয় প্যানিক ছড়িয়ে পড়লো জনসমাজে, প্রত্যেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে, কেউ পদব্রজে, কেউ গাড়িঘোড়ায় চেপে পালাতে লাগলো নদীর কাছাকাছি থেকে। পালাও, পালাও, যত দূরে সম্ভব পালিয়ে চল।

ঘণ্টা দুই বাদে যখন দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখন দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষজন সে অঞ্চল থেকে পালিয়ে গেছে। শুধু একটি হাসপাতালের লোকেরা পরম বীরত্ব ও চরম আত্মত্যাগ দেখিয়ে যার যার কর্মে ব্যস্ত ছিল, যদিও তাদের অনেক রোগী বিছানা ছেড়ে ইতিপূর্বেই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল।

বাদবাকি জনতা এর পর বুঝে গেল, ঘটনা বা দুর্ঘটনা যা-ই হোক না কেন, ইতিমধ্যে তার সমাপ্তি হয়ে গেছে। নদী পূর্বেকার মতই ফের প্রবহমান হয়েছে। গতি-পথের টিলা ও ভাঙা প্রস্তরখণ্ডসমূহ কোটি কোটি টন জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার বিপুল সেই জলধারা প্রপাতরূপে সগর্জনে বহু নীচেকার ভূতলে আছড়ে পড়ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

ঝড় থেমে গিয়ে নীলাকাশ বেরিয়ে পড়েছে। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে যে বসন্তকাল এসে গেছে। সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মনে হয় পৃথিবী আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দরভাবে জলধারা বয়ে চলেছে যথাপূর্বং প্রবল বিক্রমে।

এর বেশ কয়েকদিন বাদে চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী এই অদ্ভুত নৈসর্গিক বিপর্যয়ের আসল কারণটা জানা গেল।

ঝড় এবং ঝঞ্ঝা যখন থেমে যায়, তখন নায়েগ্রা নদীর জলধারার উৎস 'লেক এরী' থেকে জমে থাকা বরফের বড় বড় চাঁই এসে হ্রদের মুখ নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে ফেলে। ফলে গোটা একটি দিন ও একটি রাত্রি পরিপূর্ণভাবে জল নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং লেক এরী একটা বিশালকায় ড্যাম এর আকার ধারণ করে।

অবশেষে ১৮৪৮-এর এপ্রিল ফুলস্ ডে-তে ড্যামরূপী লেক এরীর জলধারার প্রেসার এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সকল বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করে সেই বিশাল জলরাশি সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুষ্ক নদীতটে। তাতেই প্রকৃতি সৃষ্ট আজব বাঁধকে তছনছ করে প্রলয় জলে ফের নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পুনর্জীবন লাভ হয়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে এত বড় একটা অভাবিত ঘটনায় কিন্তু একটি মাত্রও জীবনহানি হয় নি। না আতঙ্কে, না কোন আত্মহত্যায়, না জলপ্লাবনের তোড়ে।

সেই সুদূর ১৩৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৪৮-এর পর থেকে আজ অবধি ঐ ধরনের নৈসর্গিক বিপর্যয় ও আজবতা পুনরায় আর ঘটে নি। সজলা প্রপাত সগর্জনে বয়ে চলেছে অহোরাত্র। ঐ ধরনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ারও দেখা মেলে নি বা কখনো লেক এরীর মুখ বন্ধ হয়ে যায় নি বরফের চাঁই-এর দ্বারা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে দৈনিক ওয়াটার লেভেল নিয়মিত চেক করায় ঐ ধরনের দুর্ঘটনা দ্বিতীয়বার হবার আর কোনই সম্ভাবনা নেই।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর কখনো বিশুষ্ক হয়েও যাবে না।

ব্যাক্ ফায়ার

—শ্রীমতী গৌরী দে

কি চেহারায় কি স্বভাবে, দু' ভাই-এর কোথাও এতটুকু মিল নেই! বড় ভাই রিগির চেহারাটিও যেমন, স্বভাবটিও তেমনি। শুধু কি তাই! পুরুষের মত পুরুষ। নয়ত পৈত্রিক বলতে তো ছিল এই সামান্য ক'টি টাকা আর বসতবাড়িটি। তাও আবার ভাগাভাগি। তা তার থেকেই একেবারে কিনা কোটিপতি! আর ছোট ভাই রবার্ট, হাড় কিপ্পন, যেমন ছোটখাট বিদকুটে চেহারা, তেমনি ছোট মন। দু' ভাই-এ কোনদিনই বনিবনা ছিল না। সুতরাং বাপ যাবার পরই হাঁড়ি আলাদা।

কুচুটে রবার্ট দেখল, দাদা তো ব্যবসায় বেশ কিছু কামাচ্ছে, বিষয়সম্পত্তিও মন্দ করছে না! নাঃ, ব্যাপারটা অসহ্য। তাকেও দাদার ওপর উঠতে হবে, কিন্তু ওসব ব্যবসা-ট্যবসা করার মত ধৈর্য তার নেই, কি করা যায়! হঠাৎ একদিন সে ভেবে ঠিক করল, তার চেয়ে জাদুবিদ্যা শিখলে কাজ দেয়। যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। ক'দিন পরে রবার্টের কাছে অদ্ভুত ধরনের সব মানুষের আনাগোনা শুরু হল। যেমনি তাদের সাজপোশাক তেমনি চালচলন। রিগির নজরে ব্যাপারটা যে পড়ে নি তা নয়, কিন্তু তার মাথা ঘামাবার সময় কোথা! তবু ক'টা বছর যেতে না যেতেই মাথা তাকে ঘামাতেই হল। সে আর এখন একা নয়—তার বউ আর মেয়ে এলসাকে নিয়ে তিনজন। বছর পাঁচেকের মেয়ে এলসা ঐ সব লোকদের দেখে ভয় পায়। বউ লুসি হয়তো বান্ধবীদের

নিয়ে বাড়ি ঢুকছে, সামনেই মূর্তিমান গেঁয়ো ভূতের দল—বন্ধুবান্ধবীর সামনে আর মান থাকে না। বাধ্য হয়ে রিগিকে একদিন রবার্টের সীমানায় পা বাড়াতে হল। অসময়ে ঘরের দরজায় টোকা। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে রবার্ট দরজা খুলতেই দাদাকে দেখে প্রথমে বিস্মিত, পরে অসন্তুষ্ট হল। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি হঠাৎ ? কি চাই ?"

"কথা আছে, ভেতরে চল।" রিগি ঘরের ভেতর যাবার চেষ্টা করতেই দরজা আগলে দাঁড়াল রবার্ট, "কি কথা এখানে বল।"

দারুণ অপমানিত হয়ে রিগির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বলল "রাতদিন করিস কি ? কাজকর্ম করতে পারিস না ?"

"কাজকর্ম ? নিশ্চয়, করছি বৈকি।" বাঁকা হাসি রবার্টের মুখে।

"ছাই করিস। যত সব নোংরা লোকের সঙ্গে মিশে গোল্লায় গেছিস। এসব চলবে না এ বাড়িতে, বুঝেছ ?"

রবার্টের চোখ দুটো হিংস্র হয়ে উঠল। সে উত্তর দেয়—"তোমার অসুবিধে হলে অন্য কোথাও যেতে পার।"

"তার মানে ?"—চিৎকার করে উঠল রিগি।

"মানে, বাড়ি তোমার একার নয়।"

"ওঃ! আমি চলে গেলে খুব সুবিধে হয়, না ?"

"হয়ই তো।"

"করাচ্ছি তোমার সুবিধে।"

না, মুখে বললেও বাকি পাঁচ বছরেও রিগি এর কোন প্রতিকারই করতে পারল না। বরং শেষ পর্যন্ত রবার্টেরই জয় হল। এলসার তখন বয়স দশ। মেয়েকে বিধবা শাশুড়ীর কাছে রেখে রিগি স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। ক'দিন বাদে ওদের বদলে এল এক জরুরী তার। প্লেন ক্র্যাসে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শেষ। একদিনে অনাথ হয়ে গেল হতভাগিনী এলসা। ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল বটে মেয়েটা! একমাত্র আদরের মেয়ে লুসি আর জামাই-এর অকাল বিয়োগের ব্যথা আর বেশীদিন সহ্য করতে হল না এলসার দিদিমাকে। তিনিও চলে গেলেন। ভদ্রমহিলার বিষয়সম্পত্তিও কম ছিল না। বাপের বিষয়, দিদিমার বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এলসার দিকে এবার নজর পড়ল রবার্টের। শয়তানী মুখে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে গরমের ছুটিতে এলসাকে বোর্ডিং থেকে সে নিজের বাড়িতে আনতে গেল। তাছাড়া নাবালিকা ভাইঝির সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার ভারও নিল।

এলসা নেহাত ছোটটি নয়। কাকাকে চিনতে তার বাকি নেই। কিন্তু প্রতিবাদ করারও শক্তি নেই। কাকার বীভৎস মুখের দিকে তাকালে তার বুক কেঁপে ওঠে। দিদিমার কাছে সে শুনত তার কাকা নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে। এরা নাকি পিশাচসিদ্ধ হয়। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আর কাকার কাছে যারা আসে, তারা ওঝা। মাঝরাতে ওদের শুরু হয় সাধনা।

বহুদিনের অদম্য কৌতূহল ঠিক মাঝরাতে টেনে তুলল এলসাকে। আসলে বয়সটাই তো খারাপ। নয়ত এমন দুঃসাহস তার হল কেমন করে? ভয়ে বুক কাঁপছে, তবু থামতে পারছে না। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে কাকার ঘরের দিকে। সেকেলে দরজা। দরজার গায়ে চাবি লাগাবার গর্ত। বন্ধ দরজা ভেদ করে আলোর আভা— এলসা সন্তর্পণে সেই গর্তে চোখ রাখল। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা গোল বড় পাত্রে আগুন জ্বালান হয়েছে। তার সামনে গলায় মড়ার হাড়ের মালা পরে খালি গায়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে রবার্ট। মাঝে মাঝে চোখ খুলে আগুনে কি সব ফেলছে আর বিড়্‌বিড়্‌ করে মন্ত্র পড়ছে। আগুনের তাপে তাকে আরো হিংস্র দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা সোনালী রং-এর ধোঁয়া গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। ওগুলো কি! চোখ পড়তেই থরথর করে কেঁপে উঠল এলসা। আগুনের চারধারে কত হিংস্র জীবজন্তু! আর একবার দেখতেই বুঝতে পারল, ওগুলো মৃত কিন্তু ওদের চোখগুলো! কি আশ্চর্য জীবন্ত। বিশেষ করে ঐ কুমীরটা! দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে—এই বুঝি লাফিয়ে পড়ে! নাঃ, আর দাঁড়াতে পারে না এলসা। টলতে টলতে সে ফিরে আসে নিজের ঘরে। কিন্তু এ তার কেমন নেশা হল। প্রতি রাতে নিশি পাওয়ার মত কাকার ঘরে উঁকি দিতে ছোটা! কিছুতেই নিজেকে দমন করতে পারে না। এমন কি বোর্ডিং-এ ফিরে গিয়েও তার মনটা ছট্‌ফট্‌ করে সেই রহস্যময় ঘরটার জন্যে। দিন গড়িয়ে বছর কাটে। সেবারও বড়দিনের ছুটিতে এলসাকে নিয়ে এল রবার্ট।

গভীর রাত। প্রতিদিনের মত আজও গভীর রাতে চলছে রবার্টের সাধনা। কিন্তু আজ তাকে বড় অস্থির দেখাচ্ছে। এলসার সাবালিকা হতে আর মাত্র ক'টা মাস বাকি। তারপরই যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি, টাকাপয়সার হিসেব তাকে বুঝিয়ে দিতে সে বাধ্য। আর এইখানেই সে ধরা পড়ে যাবে। এই ক'টা বছরে এলসার নাম করে সে বহু টাকা খরচ করেছে। ওর দিদিমার বাড়িটা একজনের কাছে বন্ধকও রেখেছে। সাবালিকা এলসা এর জন্যে কৈফিয়ত চাইবে—হয়ত কোর্টঘর করতে হবে—কিংবা জেল—অথবা চোর বদনাম—না না, তার চেয়ে—চমকে উঠল রবার্ট—কুমীরটা—কুমীরটা নড়ছে! প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—হ্যাঁ, তার ভুল হয় নি—মৃত কুমীর জেগেছে— ঐ তো! ওটার চোখ দুটো নড়ছে, বন্ধ মুখটা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে রবার্ট। আজ তার সাধনার সিদ্ধি। এখন সে তার ব্ল্যাক ম্যাজিক দিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। এক একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এক একটি মৃত জন্তুই হবে তার হাতিয়ার। প্রবল উৎসাহে সে নিজের গলা থেকে মালাটা খুলে কুমীরের গায়ে ছুড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কুমীরটা আবার আগের মত প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

অন্য রাতের মত আজও এলসা এসেছিল কাকার ঘরে উঁকি মারতে। অন্য দিনের মত আজও সে কুমীরটাকে দেখছিল। কি বীভৎস দেখতে ওটাকে। কিন্তু এ কি দেখছে সে! চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার সে তাকাল—নাঃ, ঐ তো কুমীরটা নড়ছে! জ্বলন্ত চোখে দেখছে তাকে। কি ছিল সে চোখে—এলসা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে। কই,

চোখ দুটো আর বীভৎস জ্বলন্ত লাগছে না তো! তার বদলে পরম আপনার জনের মত সে চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠছে করুণ মমতা মাখানো। এলসা কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! তা কি করে হয়! ঐ তো তার কাকা কিসের আনন্দে চিৎকার করছে—এমন তো কখনও হয় নি। আরে! মালাটা কুমীরের গায়ে এসে পড়তেই কুমীরটা আবার স্থির হয়ে গেল! এই কি তবে ব্ল্যাক ম্যাজিক! ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে এল এলসা।

পরের দিন সকালবেলাই রবার্ট যেন কোথায় বেরিয়ে গেল। ফিরল একেবারে সন্ধ্যে সাতটা বাজিয়ে। এলসা ড্রইংরুমে একটা বই পড়ছিল, সোজা এসে দাঁড়াল ওর সামনে। মুখে মিষ্টি হাসি আর দরদী স্বরে বলল—"আহা-হা, দিন দিন চেহারাটা তোর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দেখবারও সময় পাই না, এমন ছাই কাজ।" তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়েছে, এমন ভান করে পকেট থেকে বার করে একটা সুদৃশ্য লাল ভেলভেটের ছোট্ট বাক্স। ঢাকনাটা খুলতেই দেখা যায় একটি ব্রেসলেট। রবার্ট এলসার ডান হাতে সেটা পরিয়ে দিয়ে বলে—"বড়দিনের উপহার। আগাম দিয়ে রাখলাম। চল্, আজকে আমরা হোটেলে খাব, বড়দিনের খাওয়াটাও না হয় আগাম হয়ে যাক্।" হাঃ-হাঃ-হাঃ করে হাসল রবার্ট আর সেই হাসিতে এলসার বুকের ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

গাড়ি চালাচ্ছে রবার্ট। পাশে এলসা, দেখে মনে হচ্ছে সে যেন সম্মোহিত। কিন্তু এলসা চুপ করে বসে নেই। সে ভাবছে—আজকের ঘটনার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে রবার্টের? হঠাৎ তার নজরে পড়ল ব্রেসলেটটা। চমকে উঠল সে। ব্রেসলেটের ওপরে মিনে করা একটা কুমীরের ছবি। ছোট্ট কিন্তু নিখুঁত, ঠিক যেমনটি সে দেখে কাকার ঘরে। এমন কি, সেই চোখ দুটোও তেমনি—না, হিংস্র নয়, সে-রাতের মত নরম মমতা মাখানো। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল—সে একা নয়—তার সঙ্গে এমন একজন কেউ রয়েছে যে তাকে সব বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।

একে শীতকাল, তার ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টি, এরই মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা। রবার্ট গম্ভীর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু এ কোথায় যাচ্ছে তারা? লোকালয় ছাড়িয়ে নির্জন পথ ধরে। বেশ খানিকটা পরে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে এলসার দিকে তাকাল রবার্ট। জবাফুলের মত টকটকে লাল চোখে শয়তানের হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—"এই যে ভালমানুষের মেয়ে, চুপচাপ নেমে যাও দেখি।"

এলসা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে—"এখানে কেন?"

সাপের মত হিস্‌হিস্ করে শয়তানটা বলল—"হ্যাঁ, এইখানে তোকে নামতে হবে—নেমে যা ভালোয় ভালোয়, নয়ত গলা টিপে মেরে ফেলব।"

এলসা কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ে পথের ওপর। অধৈর্য রবার্ট আর অপেক্ষা করতে পারে না, ওকে ফেলে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যায়। কান্না ছাড়া আর কি করার আছে এলসার? সেই ঠাণ্ডা বাদল রাতে কোথায় যাবে সে? যতদূর চোখ যায়, কেবল মাঠ আর মাঠ—ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটলেও সে বাড়ির পথ

খুঁজে পাবে না। তাছাড়া কে আর আছে তার আপনার বলতে? কথাটা মনে হতেই ডুক্‌রে কেঁদে উঠল এলসা। হঠাৎ তার ডান হাতটা খুব ভারী হয়ে উঠল। এত ভারী যে হাতের ভারে সে বসে থাকতে পারল না। ক্রমশঃ শুরু হল যন্ত্রণা। এক বিপদের ওপর আর এক বিপদ। ভয়ে, ভাবনায়, আতঙ্কে এলসা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। কতক্ষণ বাদে চোখ খুলে সে অবাক হয়ে গেল। ওর কাকার দেওয়া ব্রেসলেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সেই কুমীরটা। প্রথমে এতটুকু, তারপর ক্রমশঃ বড় হতে হতে প্রমাণ সাইজ কুমীরটা এলসার মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। ও কি! কুমীরের মুখের হাঁ-টা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। একটু যেন এগিয়েও এল ওর দিকে। হ্যাঁ, ঐ তো ওর অসংখ্য ধারাল দাঁত দেখতে পাচ্ছে এলসা। ব্ল্যাক্ ম্যাজিক্! সব বুঝল এলসা। ওর এইজন্যে অসময়ে এই ব্রেসলেট দেওয়া। না, এলসা আর ভয় পায় না। সে এখন মরতেই চায়। এত উত্তেজনা তার আর সহ্য হয় না। চোখ বন্ধ করে ও প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করতে লাগল এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর অনুভূতির। কিন্তু কই? সময় বয়ে যায়, চারদিক চুপচাপ, কি ব্যাপার? ধীরে ধীরে চোখ খুলল এলসা। এই তো কুমীরটা, ঠিক তেমনি ভাবে বসে আছে তার সামনে। সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো—না, লোভে নয়, মমতায় চিক্‌চিক্ করছে আগের মত। এলসা নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে—"কই এস, আমাকে মুক্তি দাও—দেরী করছ কেন?" কুমীরটা যেন ওর কথা বুঝল। ওর বিরাট শরীরটা এলসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর চলতে শুরু করল। এলসার ভূমিকাটা আগাগোড়াই দর্শকের। তখনও সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দু'-তিন গজ গিয়েই কুমীরটা মুখ ঘুরিয়ে এলসার দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে, এলসা সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়াল, তারপর ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল।

চোখের পলকে ছুটে এল সেটা রবার্টের দিকে। [পৃঃ ১৯২

রাত প্রায় শেষ হতে চলল। সেই কোণের ঘরে রবার্ট অস্থির উত্তেজনায় পায়চারি করছে আর বার বার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এতক্ষণে তার মন্ত্রপূত

ভুডু* কুমীরটা এলসাকে মেরে ফেলেছে। এটাই স্বাভাবিক। ভুডু জেগে ওঠার পর প্রাণ সে নেবেই, তারপর সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবে। হঠাৎ দড়াম করে ঘরের দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠল রবার্ট। দরজার কাছে কি ওটা? কুমীরটা? না—না, তা কি করে হয়? এলসাকে মারবার পর আর তো ওর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়? তবে? তবে কি—আর ভাববার সময় পেল না রবার্ট। চোখের পলকে ছুটে এল সেটা রবার্টের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রবার্টের ছোটখাট শরীরটা প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দরজায় দাঁড়িয়ে এলসা লক্ষ্য করল, কুমীরের বিশাল শরীরটা তার মৃত দিদিমার রূপ নিচ্ছে। ঐ তো সেই মমতা মাখানো নরম দৃষ্টি, যা সে বারবার দেখেছিল কুমীরের চোখে। তবে কি—নাঃ, সে আর কিছু ভাববার সময় পায় না, কোথায় তার দিদিমা? সে জায়গায় পড়ে আছে নরকঙ্কাল। অসহ্য ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এলসা। ঘরের মধ্যে কঙ্কালটা তখন ধীরে ধীরে ধুলো হয়ে যাচ্ছে।

* আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ অনুষ্ঠিত এক ধরনের পিশাচ সাধনা।

———

মণি ও মুক্তা

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিব মরুভূমি অঞ্চলের এক ভয়াল "অক্টোপাস গাছ"। এর খপ্পরে পড়লে কীট-পতঙ্গ-পাখী টিকটিকি গিরগিটির আর রক্ষে থাকে না। আঠায় আটকে ও এর বজ্র পেষণে পড়ে অচিরেই প্রাণত্যাগ করে। এ গাছ তিন ইঞ্চি পরিমাণ বাড়তে সময় লাগে বিশ বছর। পূর্ণ বয়স্ক অর্থাৎ তিন ফুট ব্যাসের বয়েস মোটামুটি ২৫০ বছর ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ময়ূখ চৌধুরী
রচিত

স্মারক

তোমার কাছে এমন ব্যবহার আশা করি নি, অভয়!...

আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না?

পরেশ, তোমার কথা বিশ্বাস করা যায় না।

এই প্রমাণটাও কি বিশ্বাসযোগ্য নয়?

ঐ নখটা অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু ওটা যে কৃত্রিম নয়, তার প্রমাণ কি? তুমি পরীক্ষা করার সময় দিতে চাও না, এই মুহূর্তেই তোমার টাকা চাই। তাই তো তোমার সম্পর্কে সন্দেহ — কে?... ভিতরে এস।

আসতে পারি?

কে? ভিতরে এস।

বসন্ত যে! এস, এস!

এলাম একটু আড্ডা দিতে — আরে! পরেশ না?

তারপর পরেশ, এখানে কি মনে করে? ছাত্রজীবনে একসঙ্গে পড়েছি বটে, কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে একথা স্বীকার করতেও লজ্জাবোধ হয়।

মুখ সামলে কথা বলো, বসন্ত!

আহা! তোমরা ঝগড়া কোরো না।

2

পরেশ! তুমি মাথা গরম কোরো না। তুমি জানো আমি দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করি, এটা আমার HOBBY বা শখ, তাই তুমি মস্ত বড় একটা নকল নখ নিয়ে এসে অবিশ্বাস্য গল্প বলে জিনিসটা গছিয়ে দিতে চাইছ, কিন্তু…

কিন্তু আমি জানি তুমি ভারতের বিভিন্ন সংরক্ষিত অরণ্যে অবৈধভাবে চোরাই-শিকার বা 'পোচিং' করো, নিহত জানোয়ারের নখ, দাঁত, শিং, চামড়া তুমি বিক্রি করো…

অসাধু ব্যবসায়ীরা ঐসব জিনিস বিদেশে পাচার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকে একথা আমি জানি। এই নখটা কোন জানোয়ারের আমি জানি না, কিন্তু পরেশ, কৃত্রিম জিনিস বানিয়ে লোক ঠকানো তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। অতএব এই নখটা আমি কিনব না।

তোমাকে সব ঘটনাই বলেছি, তবু—

তবু না হয় আরও একবার বললে! অভয় তোমার গল্প শুনেছে, আমি তো শুনি নি।

আষাঢ়ে গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

সাবধান বসন্ত!

বসন্ত! আমার ধৈর্যের সীমা আছে।

পরেশ, আমার ধৈর্যও অসীম নয়। লোক-ঠকানোর অনেক কায়দা তুমি জানো— কিন্তু এখানে সুবিধা হবে না।

৩

বসন্ত, ছাত্রজীবনে একসঙ্গে পড়েছি, দিনের পর দিন আড্ডা দিয়েছি আমরা তিনজন — তোমার বিদ্রূপ, অপমানসূচক কথাবার্তা তাই আমি হেসে উড়িয়ে দি', গায়ে মাখি না। তবে সব কিছুরই সীমা আছে। অভয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত, তুমি ভালো চাকরি করছ, কিন্তু আমার জীবন-ধারণের পদ্ধতি ভিন্ন। তাই বলে আমি কারও বিদ্রূপের পাত্র নই। আমার টাকার দরকার, একটা দুষ্প্রাপ্য বস্তু অভয়ের কাছে বিক্রি করতে এসেছি। বসন্ত, এই ব্যাপারে তোমার কথা বলার অধিকার নেই।

অভয় আমার বন্ধু, তার ভালোমন্দ দেখার অধিকার আমার আছে।

কথাটা সত্যি। শোনো পরেশ, টাকা দিয়ে খাঁটি জিনিস কিনতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি আমাকে পরীক্ষা করার সময় দিতে রাজী নও, বৈজ্ঞানিকের নামটাও বলতে চাও না।

আমি কথা দিয়েছি তাঁর নাম কারুকে বলব না।

ব্যাপারটা যদি এতই গোপনীয় হয়, তাহলে নামটা শুনতে চাইব না। কিন্তু এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কেমন করে পরেশ?

ঘটনাটা অভয়কে বলেছি, তবে তুমি যদি শুনতে চাও তো আর একবার ঘটনাটা বলতে আমার আপত্তি নেই। শোনো…

"কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল; রাত তখন প্রায় বারোটা – দেখলাম, এক ভদ্রলোকের টাকা পয়সা ছিনতাই করার চেষ্টা হচ্ছে। শরীরের রক্ত হঠাৎ মাথায় উঠে গেল…

4

"আমিও যে অন্ধকারের জীব এবং ওদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী, সেকথা গুণ্ডাদুটো বুঝতে পারে নি — মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে রিভলভার বার করে গুলি ছুঁড়লাম…

"একটা গুণ্ডা সেখানেই পড়ে রইল, আর একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। আমিও ভদ্রলোকের সঙ্গে দৌড় দিলাম আর একদিকে…
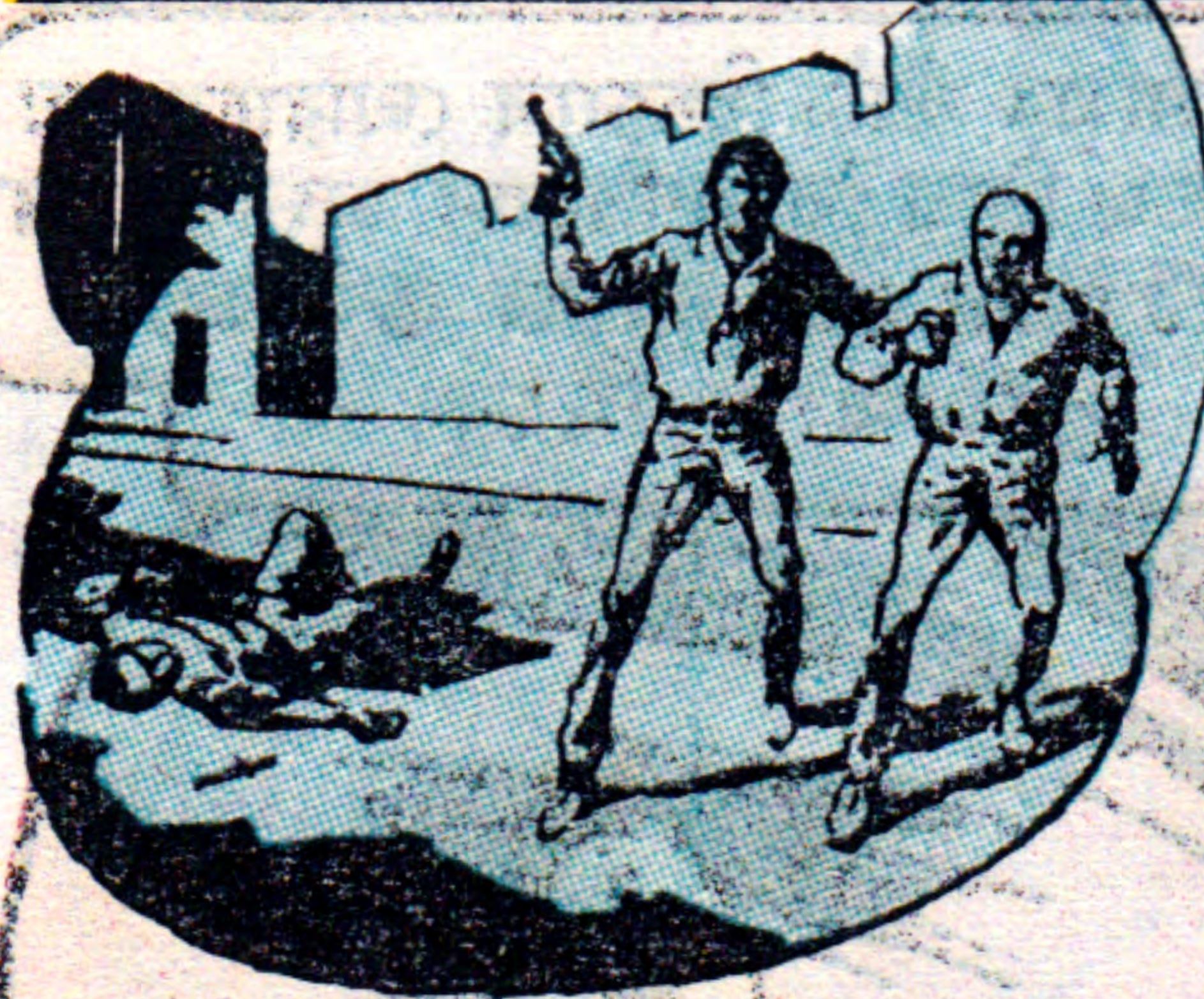
"অনেকটা রাস্তা পার হয়ে আসার পর ভদ্রলোক মুখ খুললেন…

আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমার বাড়ি খুব কাছে। দয়া করে পৌঁছে দিন।

বেশ তো, চলুন।

আপনি কি শাদা পোশাকে পুলিস?

না, এইমাত্র আপনি যাদের খপ্পরে পড়েছিলেন, আমি তাদেরই শ্রেণীভুক্ত…

তবে আমি এদের মতো ছ্যাঁচড়া নই। আমরা 'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার'।

আপনার মতো লোককেই খুঁজছি — চলুন আমার বাড়িতে।
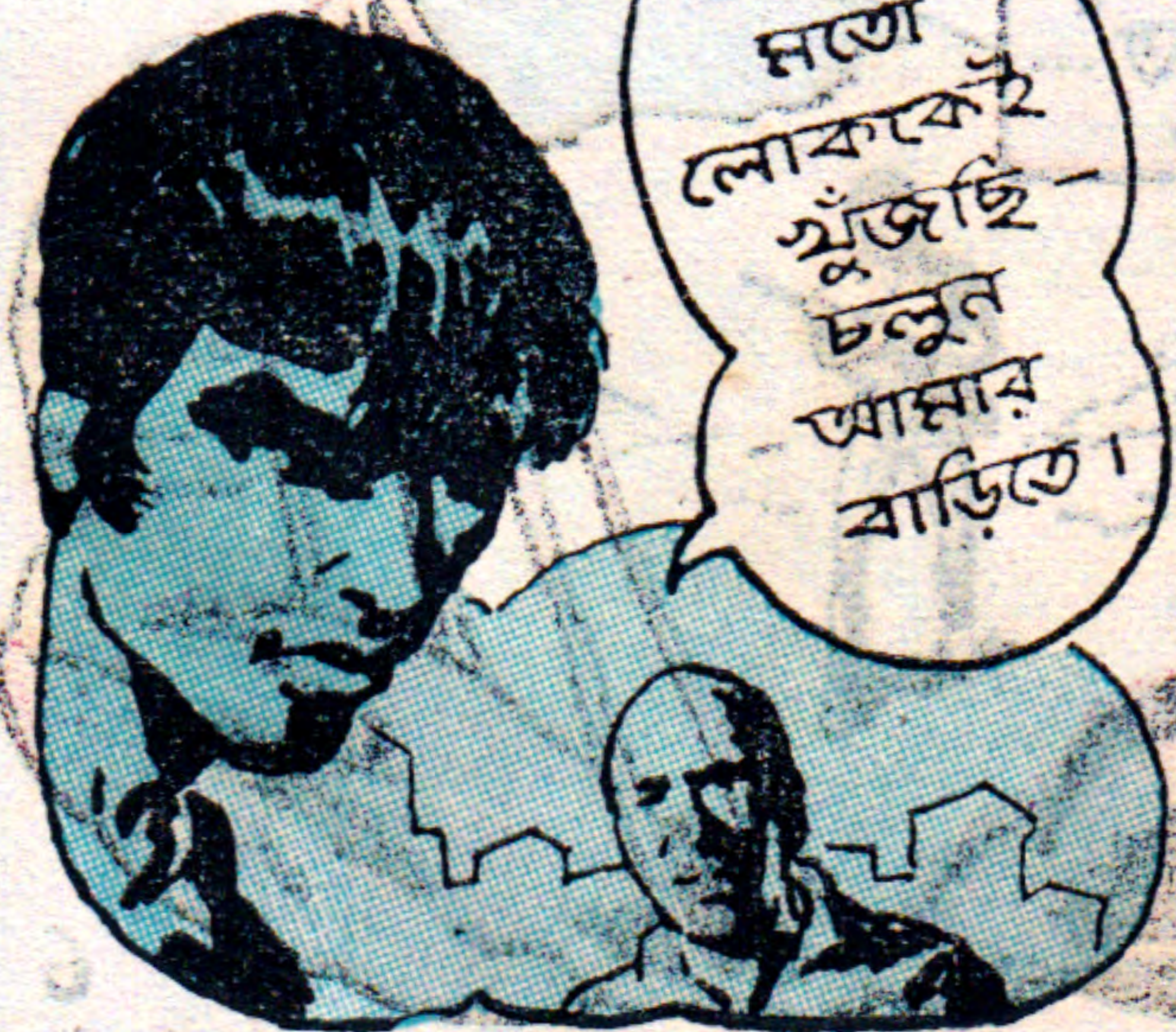
তারপর তো ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সেখানেই জানতে পারলাম তাঁর পরিচয়। ভদ্রলোক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁর নামটা প্রকাশ করা চলবে না, তাই "মিঃ সেন" বলেই তাঁকে উল্লেখ করছি, পরবর্তী ঘটনা বলছি শোনো…

তোমার গল্পটা দারুণ জমছে পরেশ!
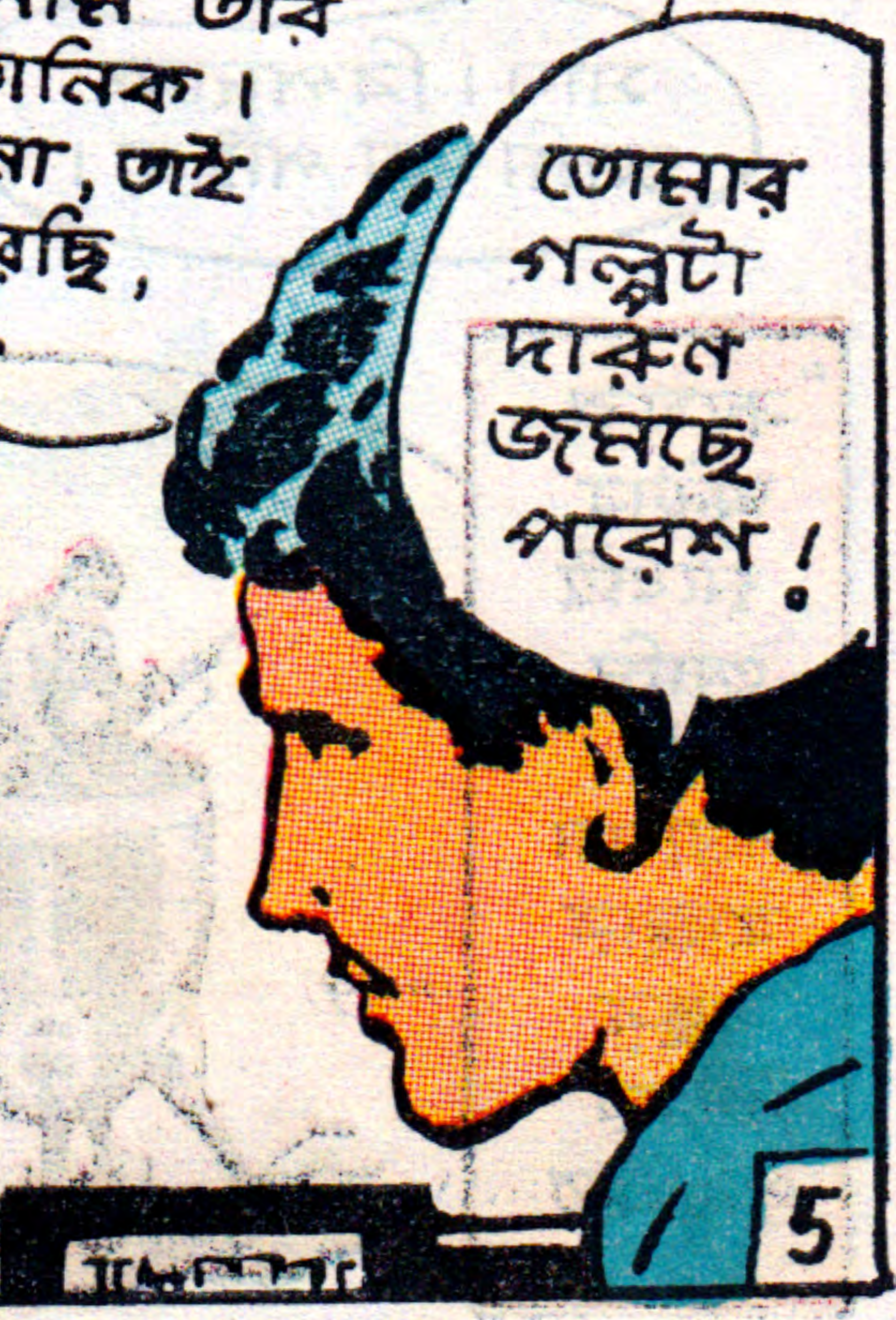
আপনার কথা শুনে আর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক। রিভলভারে তো দারুণ টিপ দেখলাম, আশা করি বন্দুকটাও চালাতে পারেন ?
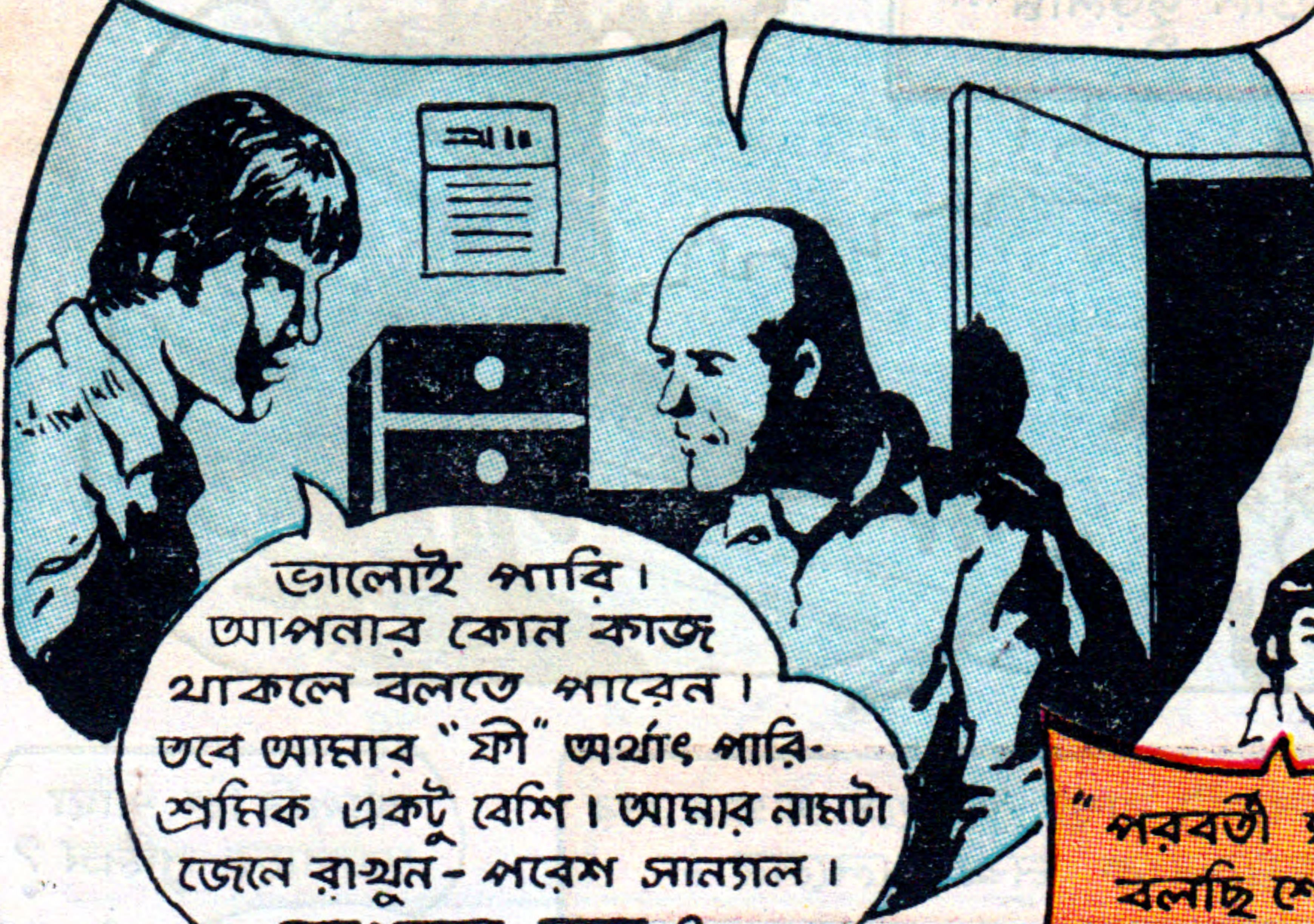
ভালোই পারি। আপনার কোন কাজ থাকলে বলতে পারেন। তবে আমার "ফী" অর্থাৎ পারিশ্রমিক একটু বেশি। আমার নামটা জেনে রাখুন- পরেশ সান্যাল। আপনার নাম ?

"পরবর্তী ঘটনা বলছি শোনো...

আমি বৈজ্ঞানিক নাম "—" সেন। শোনো পরেশ, তুমি বয়সে অনেক ছোট, তোমাকে আপনি বলব না। এবার আসল কথাটা শোনো - আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছি, কিন্তু এখনও জন-সাধারণের কাছে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করার সময় আসে নি। যন্ত্রটাকে তুমি 'সময়যান' বলতে পারো। ঐ যন্ত্র চালিয়ে অতীত বা ভবিষ্যতের পৃথিবীতে যাওয়া যায়। আজ থেকে পাঁচশো বছর পরের পৃথিবী আমি দেখে এসেছি...

সেই পরিবেশ বিপজ্জনক। আমি হাজার বছর পরে পৃথিবীর অবস্থা দেখতে চাই, কিন্তু সেখানে গেলে আমি জীবিত ফিরতে পারব বলে মনে হয় না। হাজার বছর পরে পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে আসতে পারো, তাহলে তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী আছি। তবে জায়গাটা বিপজ্জনক - এখন যাবে কিনা ভেবে দেখ।

যাব। বিপদকে আমি ভয় পাই না।

"সময়ের কাঁটা কিভাবে ঘোরাতে হয় দেখে নিয়ে বৈজ্ঞানিকের সময়যানে উঠে আমি পাড়ি দিলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিকে...
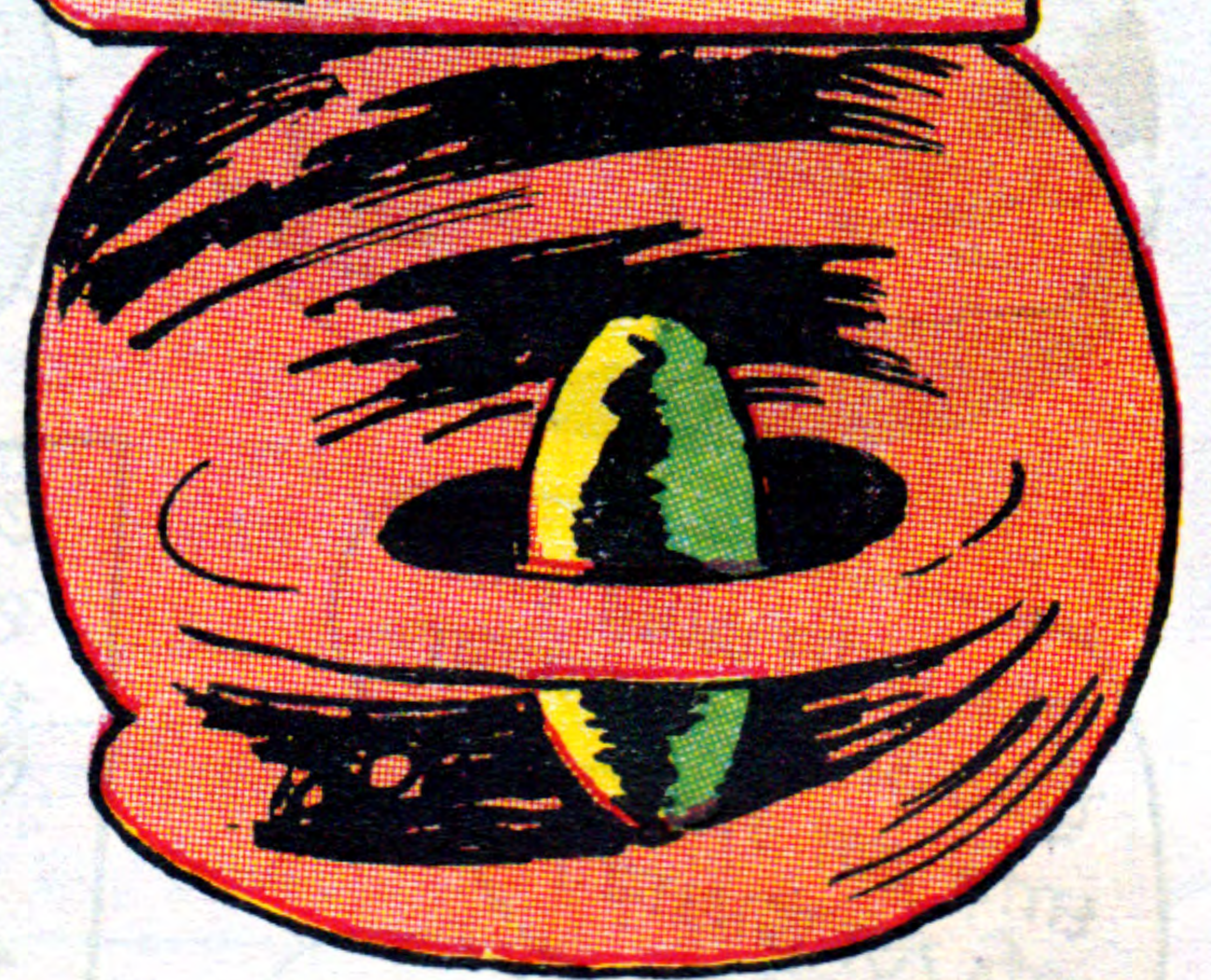
"কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি এসে পড়লাম হাজার বছর পরের পৃথিবীতে...

"এই পৃথিবীর চেহারা অদ্ভুত"...

6
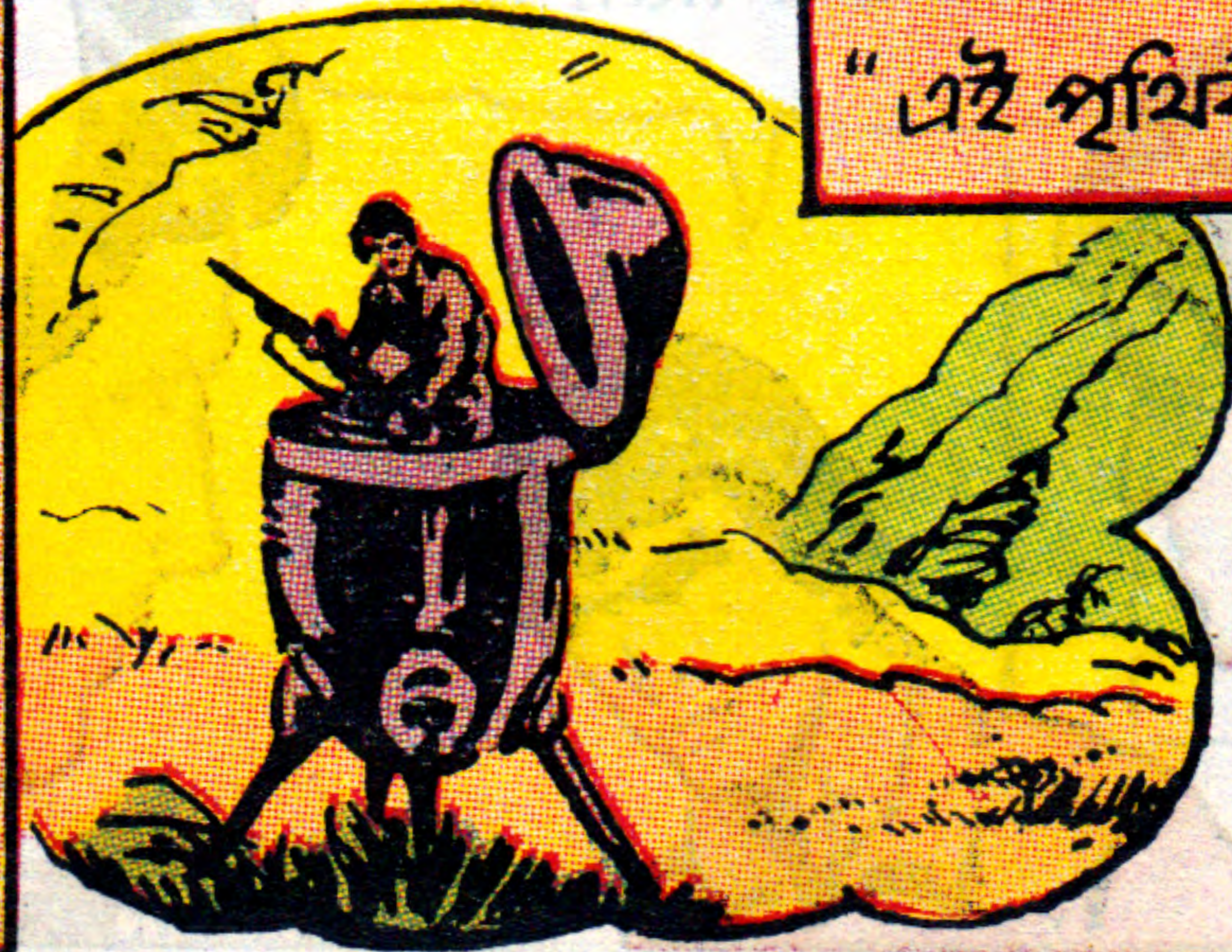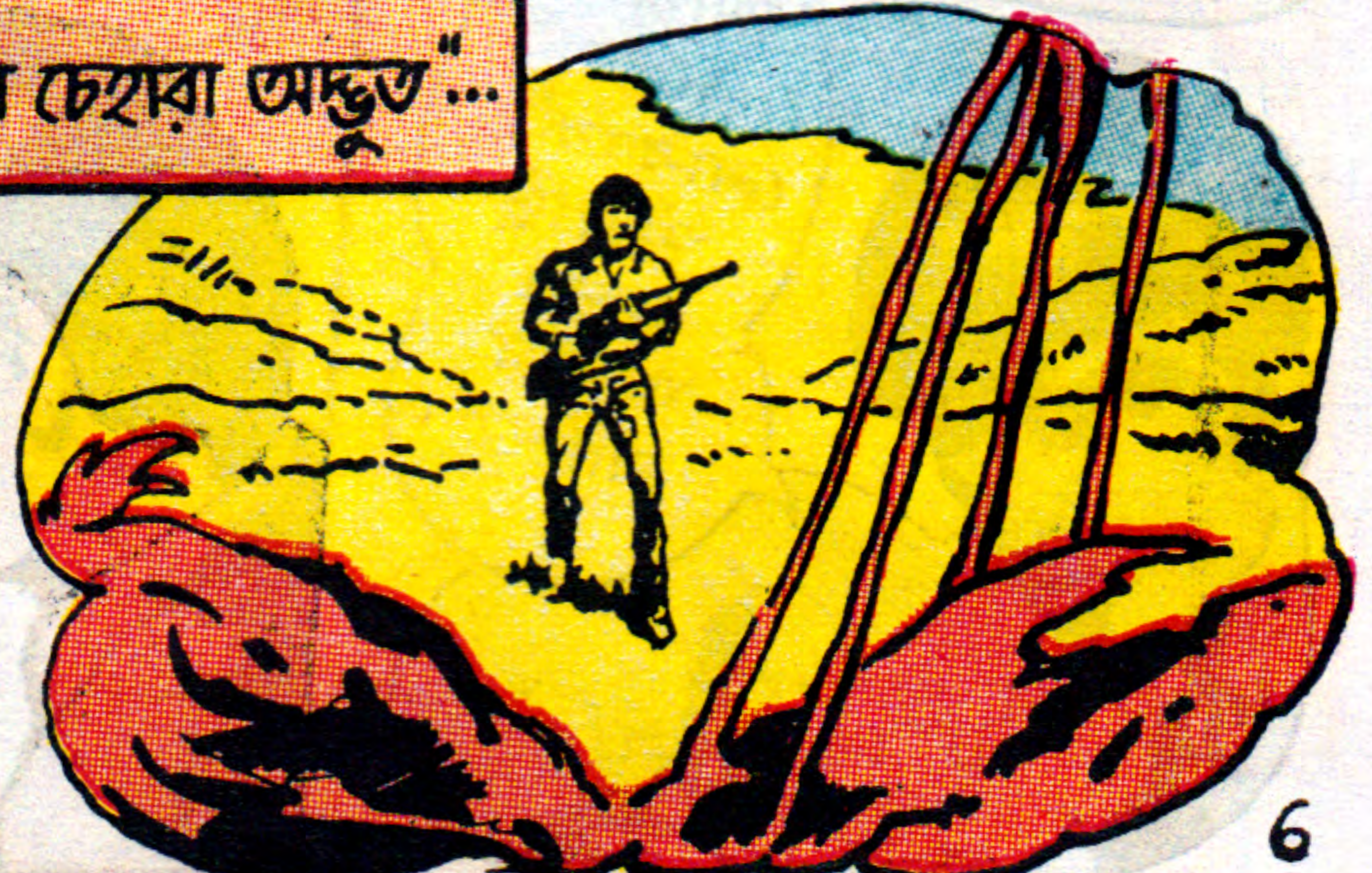
"চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম — আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ভয়ংকর জানোয়ার...
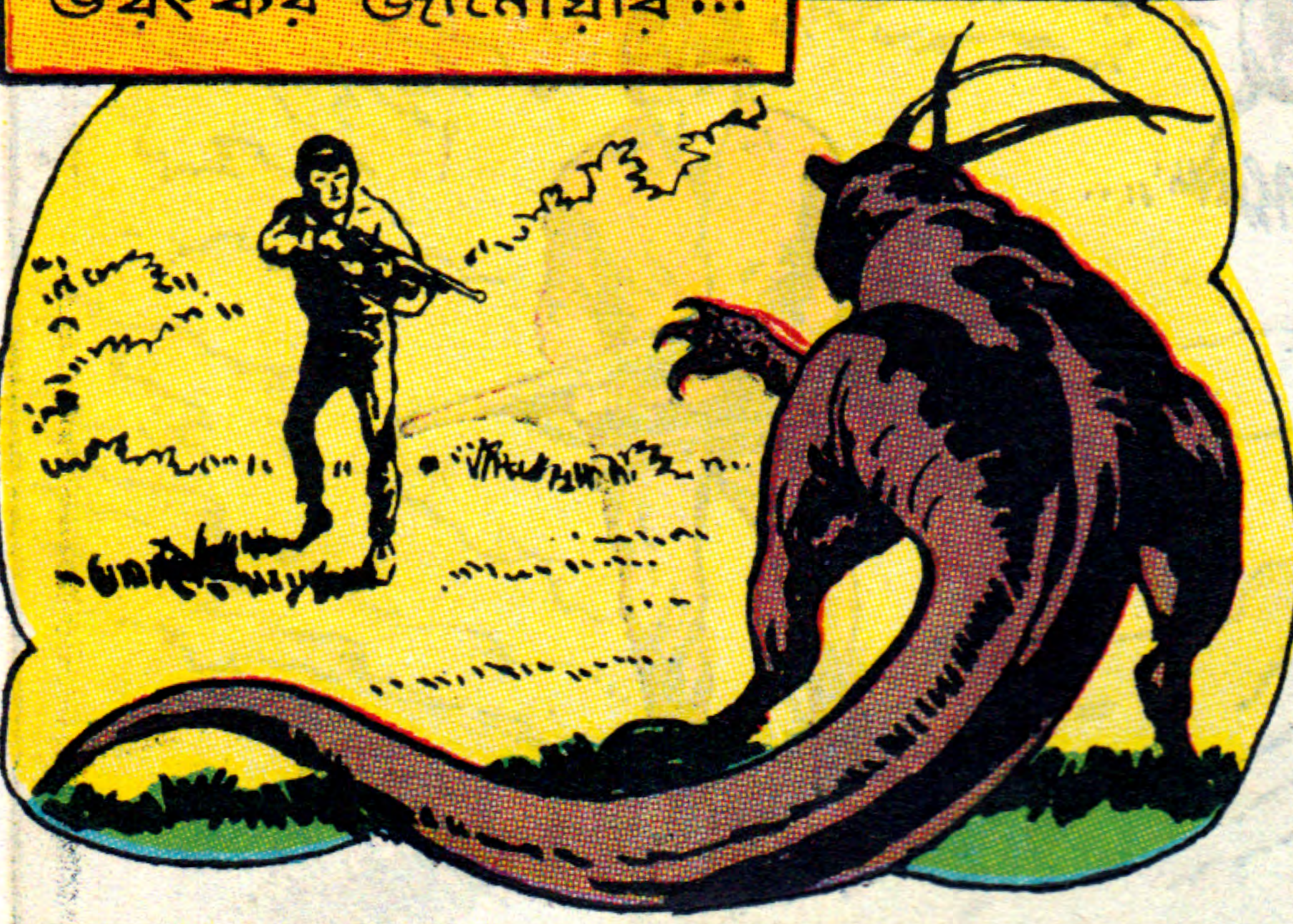
"জন্তুটা ঝাঁপ দিল, আমিও গুলি ছুঁড়লাম...

"জন্তুটার দেহের আয়তন বাঘের মতো, গঠনে বর্তমান পৃথিবীর কোন জীবের সঙ্গেই মিল নেই"

এই হল ঘটনা। জন্তুটার দুটো নখ কেটে এনেছিলাম। একটা নখ বৈজ্ঞানিক মিঃ সেনকে দিয়েছি, আর একটা নখ অভয়কে বিক্রি করতে এনেছি। জরুরী কাজে পরশু চলে যাব, তাই টাকাটা এখনই চাই। সব তো শুনলে,

এখন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে?

শোনো পরেশ, — তুমি বলছো জন্তুটার দেহের আয়তন বাঘের মতো। এমন কিছু বড় জানোয়ার নয়, তার মাথাটা তুমি সহজেই কেটে ফেলতে পারবে। যদি তুমি জন্তুটার মাথা আমায় এনে দিতে পারো, তাহলে তোমায় আমি পাঁচহাজার টাকা দেব — রাজী?

নিশ্চয়। আমি এখনই বৈজ্ঞানিক মিঃ সেনের বাড়িতে যাচ্ছি।

আমাকে সময়যান আর রাইফেলটা একবার দিতে হবে। আমি আর একবার ঘুরে আসব। তবে এবার আমাকে টাকা দিতে হবে না।

তুমি হঠাৎ যেতে চাইছ কেন জানি না। যেতে চাও যাও, তবে জায়গাটা আদৌ নিরাপদ নয়।

7

ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা হল শুরু!...

এই তো সেই জায়গাটায় এসে পড়েছি...

!
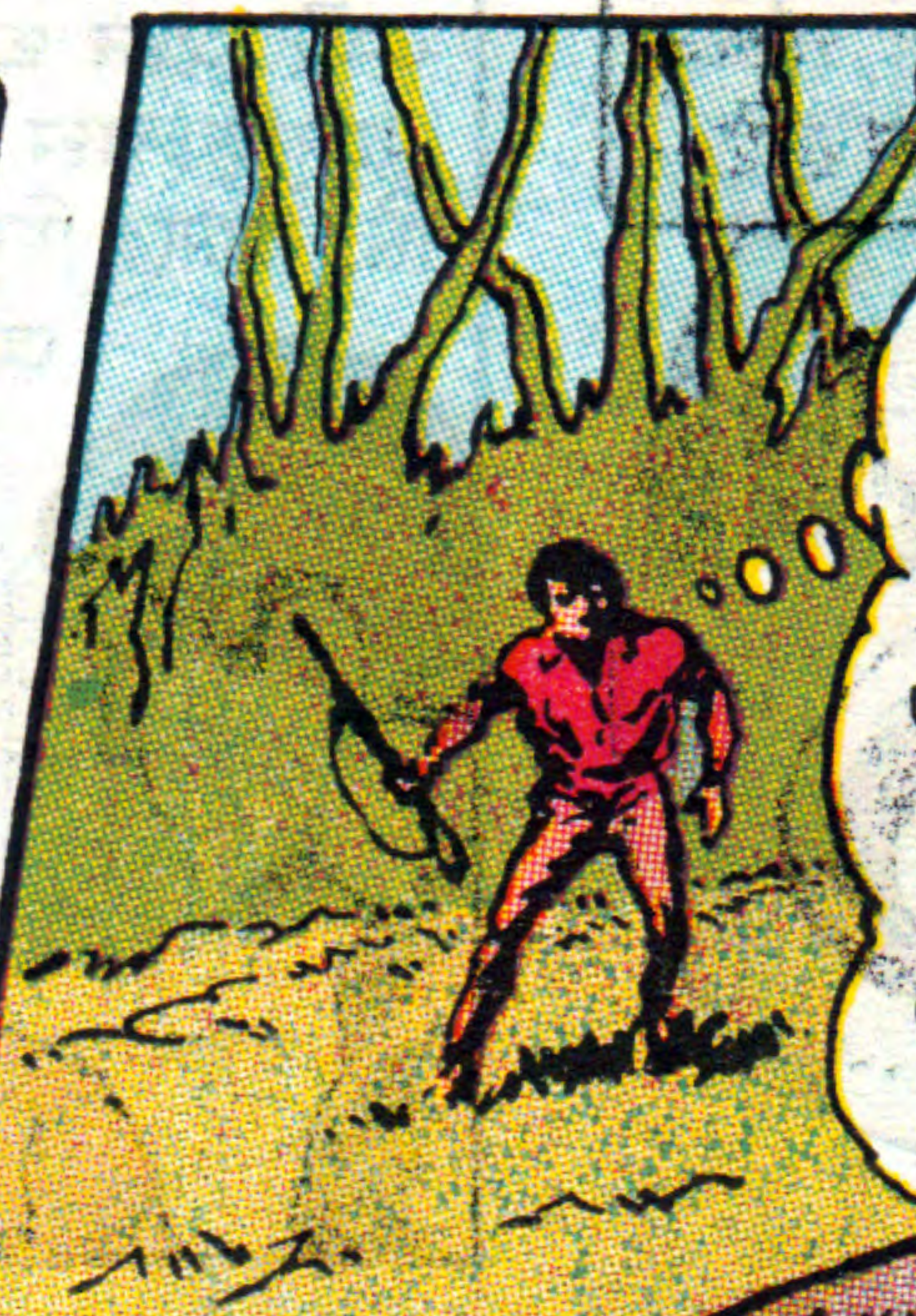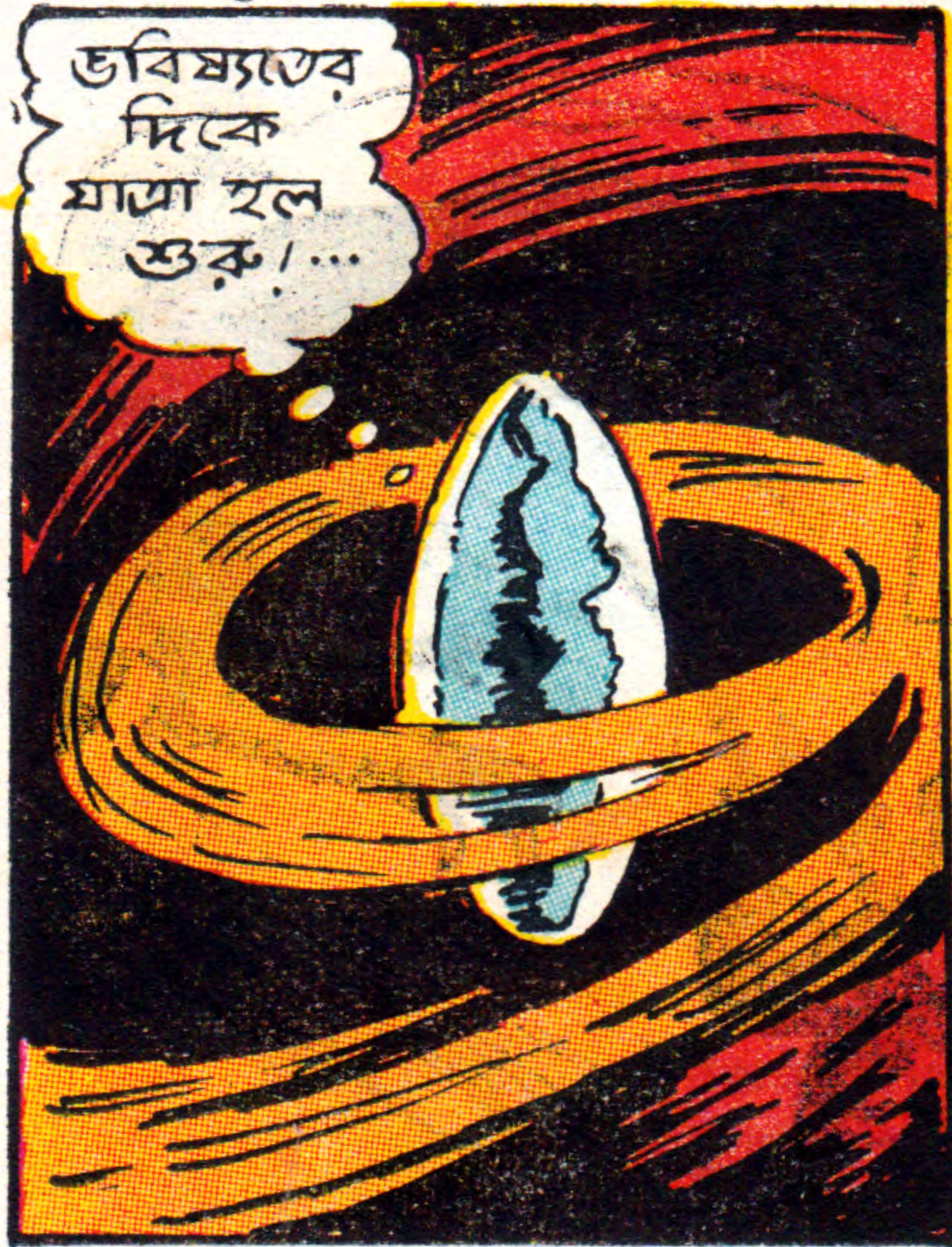
মৃত্যুর পর অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া ঘটে গেছে জন্তুটার দেহে। ছোটখাটো জন্তুটা প্রায় হাতির মতো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে মৃত্যুর পরে! হাজার বছর পরে পৃথিবীর আবহাওয়া মৃত জীবের শরীরে এমন আশ্চর্য পরিবর্তন আনবে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। এর মাথাটা অতিকষ্টে যদি কাটতে পারি, অত ভারি জিনিসটা সময়যানের ভিতর তুলতে পারব না। বন্ধুদের কাছে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। পাঁচ হাজার টাকাও পাব না।

পিনুডিদা ও মা উৎকোচেশ্বরী
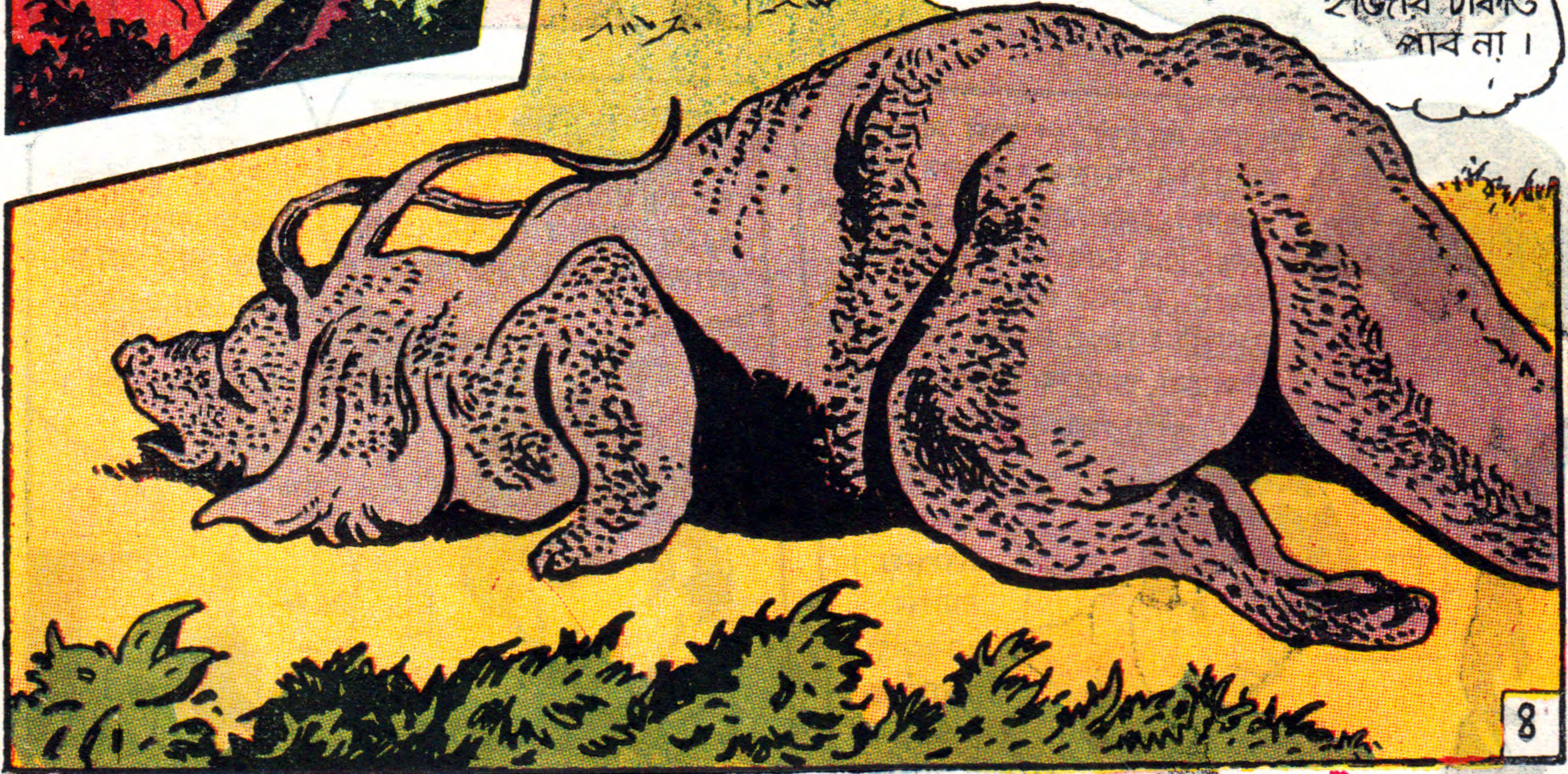
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

খবরটা গোটা বর্ধমান শহরেই ছড়িয়ে পড়ল বোধহয়। আমার বাড়ি থেকে বেরুনো দায়। চেনাজানা যার সঙ্গেই দেখা হয়, মুখে এক প্রশ্ন, ব্যাপারখানা কি? তোমার বাবার মতো মানুষ, তাঁর নামে কিনা…ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হয়, ওই সরল বিস্ময়ের পিছনে একটা হুল উঁচিয়ে আছে। আসলে তারা যেন বলতে চায়, তোমার বাবাটির বাইরে এমন ভালো মানুষের মুখোশ, আর ভিতরে এই চীজ্।

আমার রাগ হয়ে যায়। আর শেষে এমন দাঁড়ালো যে যাকে নিয়ে হঠাৎ এত কাণ্ড, তার ওপরেই, অর্থাৎ কিনা, আমার বাবার ওপরেই রাগ হতে লাগল। না, আমার বাবা যথার্থই এমন একটা ছোট কাজ করতে পারে এ আমি একটুও বিশ্বাস করি না। বাবার সঙ্গে আমার হাজারো ব্যাপারে মতের অমিল। বাবা ডাইনে যেতে বললে ভিতরে ভিতরে আমার বাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বাবার উপদেশগুলো অনেক সময় আমার চিরতরে জলের থেকেও তেতো লাগে। তার হুকুমেই সক্কালে উঠে রোজ ওই অখাদ্য তরল জিনিসটা আমাকে গিলতে হয়। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলেই দেখা যাবে আমি প্রথম না হই, প্রথম দশ জনের মধ্যে একজন হয়েছি, তবু

বাবার ধারণা, আমি এক নম্বরের ফাকিবাজ, আর যেভাবে একজন স্কলারের নিজেকে তৈরি করা দরকার, আমি নাকি তার কয়েক মাইলের মধ্যেও নেই। অথচ আমি মাকে বুঝতে না দিয়ে গপ্পের ছলে মায়ের কাছ থেকে কথায় কথায় জেনেছি, বাবা তার সময়ের টায়েটোয়ে ফার্স্ট ডিভিসন, ইণ্টারমিডিয়েটে তার থেকে সামান্য ভালো। বাবার ভালো রেজাল্ট শুরু হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে। সেই বাবা যখন একজন হবু জেনারাল স্কলারকে উঠতে বসতে টাইট্ দেয়, তখন কার ভালো লাগে? তবু আমি ভাবতেই পারি না, বাবা কক্ষণো কোনো ছোট কাজ করতে পারে। এই বর্ধমান শহরে বাবা সেরা ডাক্তারদের একজন। এখন তো এ-জায়গায় বিলেত-ফেরত ডাক্তারের ছড়াছড়ি। কিন্তু মনে মনে বোধহয় বাবাকে তারাও হিংসে করে। আমার ধারণা, পুরনো দিনের সম্পর্ক ছাড়াও এর একমাত্র কারণ, বাবা রোগীকে ভালবাসে, তার সুবিধে-অসুবিধের কথা বোঝে। সকলে বলে, এই পসারে বাবার অঢেল টাকা। অঢেল কাকে বলে, আমার তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে এটা ঠিক, আমাদের অভাব-টভাব কিছু নেই। কিন্তু একমাত্র ছেলে হয়েও টাকার দরকারে আমাকে মায়ের পিছনে ঘুরঘুর করতে হয়, ফাঁক পেলে ঠাকুমার হাত-বাক্স হাতাতে হয়। অঢেল কথাটার অর্থ আমি বুঝব কি করে? যাই হোক, যদি ধরেই নেওয়া যায় আমাদের অবস্থা মোটামুটি ভালো, সেটা কি বাবার রোগীর মাথায় ডাণ্ডা মেরে, না রোগী ঠকিয়ে? বাবা কত রোগীকে বিনে পয়সায় দেখে, দরকার হলে যেচে বিনে পয়সায় ওষুধপত্র পর্যন্ত দেয়, এ আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি! বাবার প্রতি দারুণ বিশ্বাস না থাকলে, এই গোটা এলাকার রোগীরা এত ডাক্তার থাকতে সবার আগে বাবার কাছে ধর্না দেয় কেন?

এই বাবাকে নিয়ে এত কথা, এত কৌতূহল আর হয়তো বা এত কানাকানি ছেলে হয়ে আমি বরদাস্ত করি কি করে! আমি বাবার সুপুত্তুর না হই, নিজেকে খুব কুপুত্তুরও ভাবি না। ভাবি না বলেই, থেকে থেকে আমার বাবার ওপরে পর্যন্ত রাগ হয়। আমি তার একমাত্র ছেলে। আর দু'দিন বাদে হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট বেরুবে। আমার ধারণা, এই বর্ধমানের চেনা-মহলে তখন অন্তত একটা হইচই পড়ে যাবে। (ঠাকুর দোষ নিও না, আমি গর্ব করে কিছু বলছি না—বাবার জন্যে মনের তাড়নাতে এমন চিন্তা মাথায় আসছে।) সেই আমি কি না যাকে বলে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছি! বিষয়ের লোভে বাবা এত ছোট আর এত নীচ কাজ করতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু কৌতূহল যাদের হয়, এ নিয়ে যারা আমাকে পাঁচ কথা শুধোয়, সহানুভূতিও দেখায়, তাদের মুখ ভোঁতা করে দেবার মতো কিছু হদিশ তো আমাকে পেতে হবে। বাবা তো যেচে আমাকে একটি কথাও বলে না। মাকে জিগ্যেস করলে ধমক খেতে হয়, বলে, তুই ছেলেমানুষ, তোর এ সবে মাথা দেওয়ার দরকার কি—পড়াশুনার পাট কি শেষ হয়েছে, না বাকি আছে?

আমার ধারণা, ব্যাপারটা নিয়ে মায়েরও ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তা আছে। নইলে

আমি হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি—তাই ভুলে গেল কি করে? ঠাকুমা যেটুকু জানে তাও বোধহয় ভাসা ভাসা। রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে (এ আমার বরাবরকার অভ্যাস) কথাটা তুলতে রাগে দুঃখে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতেই লাগল, আর সেই সঙ্গে গলা দিয়ে গরম আগুন ছড়াতে লাগলো—যারা বলে লোভে পড়ে তোর বাপ অন্যের বিষয় গেলার চেষ্টায় আছে, তাদের অদেষ্টে অনেক দুঃখু আছে—বুঝলি? মাথার ওপর একজন আছে না, সব দেখছে না—সব বুঝছে না? এত বড় মিথ্যের জাল ফেলে বসে ওই সাধন উকিলের ভালো হবে—আমার অমন শিবের মতো ছেলের মাথায় এত বড় অপমানের বোঝা চাপিয়ে সে পার পাবে ভাবিস?

গণ্ডগোলটা বেঁধেছে পাশের বাড়ির উকিল সাধন চট্টরাজের সঙ্গে, এ আমি জানি। আর এও জানি, গণ্ডগোল শুরু হয়েছে আমাদের দু'বাড়ির মাঝে পার্টিশন ওয়াল অর্থাৎ দেয়াল তোলা নিয়ে। সাধন চট্টরাজ দেয়াল তুলতে গিয়েছিল। বাবা লোক ডাকিয়ে সেই দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। আর তার পরেই কোর্ট-কাছারি শুরু হয়ে গেছে, এটুকু আঁচ করার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

কিন্তু মূল ব্যাপারখানা কি, আমি তাই জানি না। বাবা এ এলাকার নামডাকের ডাক্তার—তার একটা বিশেষ মান-সম্মান আছে। সেই মান-সম্মানের আমিও একটু ভাগীদার এ অস্বীকার করব না। ওই বাবার ছেলে বলে এ এলাকার অনেকেই আমাকেও একটু খাতির-টাতির করে। আরো খাতির করে এইজন্যে যে, বাবা পাড়ার কোনো লোকের থেকে ফীজ্ নেয় না। সকলেই অনেক দিনের পুরনো চেনাজানা। তাদের জন্য বাবার একটু দরদ থাকা তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু পাড়ার লোক এটুকুই বড় করে দেখে। অসুখ না হলে তারা বাবার নাগাল পায় না, আমার নাগাল হামেশাই পায়। ফলে বাবার পাওনা খাতির যত্নটুকু অনায়াসে আমার দিকে গড়ায়।

যাক, বাবাকে দিনকে দিন একটু বেশি গম্ভীর দেখে আর তার মন-মেজাজের হাল দেখে আমার চিন্তা বেড়েছে। গোটা ব্যাপারখানা জানার জন্য আমি ছটফট করছি। কারণ ঠারে-ঠোরে পাড়াপড়শীর কৌতূহল আমারও বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। শেষে সবকিছু জানা বা বোঝা গেল চটপটির চেষ্টায়। আমি জানতাম বাবার সঙ্গে সাধন চট্টরাজের কেস শুরু হয়ে গেছে—আর এও জানতাম বাবার দিকের উকীল চটপটির এক দূর সম্পর্কের কাকা। তার নাম ধূর্জটি ঘোষাল, বাবার খুব বন্ধু মানুষ। আমাদের বাড়িতে আত্মীয়ের মতো বহুকালের যাতায়াত। উকীল হিসেবেও বেশ নামডাক আছে তার।

আমার দুশ্চিন্তা তো দেখছেই, তার ওপরে পাঁচ মনের পাঁচ রকম কথা শুনে চটপটি নিজের থেকেই তৎপর হয়ে উঠল। দূর সম্পর্কীয় কাকার বাড়িতে তার যাতায়াত শুরু হল। দূর সম্পর্কের সেই কাকিমা আর খুড়তুতো ভাইবোনের সঙ্গে নতুন করে ভাব জমিয়ে ফেলল। আমার থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তাই দিয়ে একটা কাতলা মাছ কিনে ওই মাছ ওমুক বন্ধুর পুকুরে ধরেছে বলে তাদের দিয়ে এলো। তারা নিতে

আপত্তি করেছিল, অত বড় একটা মাছ ধরা হয়েছে যখন, বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে এখানে কেন? অম্লানবদনে চটপটি মিছে কথা বলেছে। বলেছে, এমনই বরাত জোর, একটা নয়, দু' দুটো মাছ ধরা হয়েছে। বাড়িতে যেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা এর থেকেও বড়। এমন সাধের মাছ পচবে, নষ্ট হবে? তাই ওখানে নিয়ে আসা।

এর পর ওই মাছ নিতে কার আর আপত্তি হতে পারে? মোট কথা, সাত দিনের মধ্যে অনেক দিনের অদেখা ধূর্জটি ঘোষালের ভাইপোটি ভারী আপনার জন হয়ে উঠল। চটপটি তাদের কাছ থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করল।

ওদিকে ধূর্জটি কাকিমা বা তার ছেলেমেয়ের সঙ্গেও আমাদের বাড়ির সঙ্গে খাতিরের সম্পর্ক। আমাদের বাড়িতে তাদের যথেষ্ট আনাগোনা। ফলে প্রসঙ্গ উঠতে তারাই গলগল করে সব বলে দিলে। এমন এক চক্রান্ত যা শুনে আমারও শিরায় শিরায় আগুন জ্বলতে থাকল।

চটপটির আর আমাদের বাড়ির খবর জুড়লে যা দাঁড়ায় তা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার মতোই। আট মাস হল বর্ধমানে খুব কড়া এক নতুন সাব-জজ এসেছে। সে নাকি আবার শাখায়-প্রশাখায় সাধন চট্টরাজের আত্মীয়। ওই হাকিম আসার পর থেকেই অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। বাবার বিরুদ্ধে তার কাছে একের পর এক উড়ো চিঠি যাচ্ছে। অভিযোগের সার কথা একই।—ওমুক টাকার পিশাচ ডাক্তার (অর্থাৎ আমার বাবা) নানা ছলে-বলে-কৌশলে রোগীর হাড় নিঙড়ে টাকার পাহাড় করেছে। এখনও করছে। গরিবেরা তাই ধর্মাবতারের শরণাপন্ন—এমন বিপজ্জজনক মানুষ সমাজের বুকে দুষ্ট ক্ষতের মতো, এর বিহিতের জন্য গরিবেরা কার কাছে যাবে? অভিযোগ, অমুক বাড়ির ওমুক রোগী মারা গেল (সত্যিই মারা গেছে) স্রেফ ওমুক ডাক্তারের (অর্থাৎ আমার বাবার) গাফিলতিতে। ওই অর্থগৃধ্নু ডাক্তার এতটুকু কর্তব্যপরায়ণ হলে একটি গরিবের সংসার বেঁচে যেত। কিন্তু অনেক আগে খবর পেয়েও ওই ডাক্তার যখন এলো তখন সব শেষ। মৃতের অসহায় বিধবা পত্নীর কাছ থেকে ওই অর্থপিশাচ ডাক্তার তার ফী আদায় করে তবে ডেথ্ সার্টিফিকেট দিলে। ফী না পেলে সে ডেথ্ সার্টিফিকেট দেবে না এবং তার ফল কি হবে, সেই হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে চলে গেছে। এদেশে কি আইন নেই, বিচার নেই? বাবার বিরুদ্ধে ওই সাব-জজের কাছে বেনামী চিঠি আসছেই, আর অভিযোগেরও শেষ নেই।—ওমুক ডাক্তারের সঙ্গে (বলা বাহুল্য আমার বাবার সঙ্গে) অনেক নিকৃষ্ট স্তরের সমাজবিরোধীর যোগসাজস, টাকার বিনিময়ে সে তাদের অসুস্থতার সার্টিফিকেট দেয়—অর্থাৎ ওমুক ডাকাতি বা ওমুক খুনের সময় অভিযুক্ত লোক তার চিকিৎসাধীনে ছিল। এরকম সার্টিফিকেট পেলে ফাঁসীর আসামীও কলা দেখাবে না তো কী?

একজন সাব-জজের সঙ্গে আমার বাবার মতো এক প্রাইভেট ডাক্তারের সম্পর্কটা কি, যে এমন করে তার কান বিষনো হচ্ছে! সমস্ত ব্যাপারখানা বোঝা গেল যখন এসবের পরে পাশের বাড়ির উকীল আমাদের খানিকটা জমি দখল করতে গেল, আর

বাবা রেগে-মেগে লোক ডাকিয়ে সেই দেয়াল ভেঙে দেবার ফলে সাধন চট্টরাজ বাবার নামে কোর্টে কেস ঠুকে দিলে। বিচারক তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সব জানার পর আমার এখন বদ্ধ ধারণা, কেস শুরু করার আগেই সাধন চট্টরাজ যেভাবে হোক, ওই কড়া সাব-জজের কাছে ধর্না দিয়ে বুঝিয়েছে, আমার লোভী বাবা কিভাবে তার জমি দখল করার মতলবে পার্টিশান দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে। বাবার বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি পেয়ে পেয়ে যার কান-মন এত বিষিয়েই আছে—সে সাধন চট্টরাজের কথা বিশ্বাস করবে, এ আর বিচিত্র কি? এমনও হতে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয় সাধন চট্টরাজকে সে-ই কেস ঠুকে দেবার পরামর্শ দিয়েছে। আগে থাকতে আট-ঘাট বেঁধে বাবার বিরুদ্ধে ওই সব উড়ো চিঠি যে সে-ই পাঠিয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কি? নইলে কে কবে শুনেছে যে প্রাইভেট ডাক্তারের বিরুদ্ধে একজন সাব-জজের কাছে গাদা গাদা উড়ো চিঠি যায়?

কিন্তু তখনো আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই জমি আমাদের না হলে বাবা চট্টরাজের তোলা দেয়াল ভেঙে দিত না। আরো বিশ্বাস, চট্টরাজ যদি তার সুবিধের জন্যে বাবার কাছে আগে থাকতে ওই জমিটুকু চাইতো, বাবা তাও দিয়ে দিত। কারণ বাবা সর্বদা মিষ্টিমুখ ওই চট্টরাজকে তো একটুও অপছন্দ করত না। তার ওই বাড়ির জমিও তো এক সময় আমাদেরই ছিল। সতীর্থ ধূর্জটি ঘোষাল চট্টরাজের হয়ে অত সুপারিশ করতেই না বাবা জলের দরে ওই জমিটুকু তাকে ছেড়ে দিয়েছিল! ধূর্জটি ঘোষালও কি তখন জানত চট্টরাজ এই চরিত্রের মানুষ! ইদানীং এই অশান্তির মধ্যে মা আর ঠাকুমার কথাবার্তা থেকে জেনেছি, জমি কেনার সময়েই চট্টরাজ নাকি ওই বাড়তি জমিটুকুর দখল পাবার জন্য বাবার কাছে অনেক হাত কচলেছিল। কিন্তু বাবা রাজি হয় নি, কারণ সময়ে তার সামনের দিকেও ঠাকুমার জন্য একটু জবা ফুলের বাগান করে দেবার ইচ্ছে ছিল। আমার বিশ্বাস, বাবা বরাবরই অনুনয়ে গলে যায়, তার বদলে চট্টরাজ কয়েক বছর বাদে ওই জোচ্চুরির রাস্তায় এগোতে বাবা ক্ষেপে গিয়ে তার দেয়াল ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, চট্টরাজ কি করে কোর্টে প্রমাণ করবে যে ওই জমি তার? কিন্তু কেস-এর ফলাফল যে ক্রমশ তার দিকেই ঢলছে, এ বাবা মায়ের মুখ দেখে আর ঠাকুমার গণগণে কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে। আমি মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারছি না চট্টরাজ কোন্ জোরে কেসে জেতার আশা করছে? করছে যে, এ তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। আসতে যেতে তার মুখে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ উছলে পড়ে। যেতে আসতে দেখা হলে বিনয়ের যেন একেবারে আমসত্ত্বখানা, দুধে গলানোর মতো করে এখনো জিগ্যেস করে, ভালো আছ তো? কিন্তু আমার তাকে দেখলে একটা হিংস্র জানোয়ারের মতো মনে হয় এখন। ওই হাসির তলায় তলায় যেন দাঁত কড়মড় করছে আর বলছে, দেখো, তোমাদের এত সুনাম কেমন চিবিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিই আমি।

সাধন চট্টরাজের ওই মুখ দেখলে এক কথায় এখন আমার গা জ্বলে যায়, মুখের দিকেও তাকাই না।

চট্টরাজের এই জোরের খবরটা বাবার বন্ধু উকীল ধূর্জটি ঘোষালের বাড়ি থেকেই চটপটি সংগ্রহ করল। আপনার জনের মধ্যে এমন একখানা ব্যাপার, ঘোষাল গিন্নি নিজে থেকেই সোয়ামীকে জেরা করে করে সব খবর শোনে। চটপটি যা বলল, শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ।

চার মাস আগে বাবার কাছে এক পেশেণ্ট এনে হাজির করেছিল সাধন চট্টরাজ। তারই বড় সম্বন্ধী। কলকাতার কোন্ এক মার্চেণ্ট অফিসের ভালো চাকুরে। ক্রমাগত অসুখে ভোগার ফলে বাধ্য হয়েই তখন সদ্য সদ্য রিটায়ার করেছে। গল ব্লাডার, ডায়বেটিস, সঙ্গে আরো কত কি। আমরাও সপরিবারে তাকে সাধন চট্টরাজের বাড়িতে থাকতে দেখেছি। বড় সম্বন্ধীকে সে বুঝিয়েছে, ডাক্তার বলতে বিধান রায়ের পরে পশ্চিম বাংলায় একজনই আছে—সে হচ্ছে ওমুক, অর্থাৎ আমার বাবা। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, তার মনে জন্মজন্মান্তরে বাবা নিশ্চয় অশ্বিনী ভাই দু'জনের একজন ছিল। তাই প্রাণের দায়ে ভদ্রলোক কলকাতা ছেড়ে ভালো চিকিৎসার আশায় এই বর্ধমানে ছুটে আসবে, সে আর বেশি কি। প্রাণের মায়ার থেকে বড় আর কিছু আছে না কি।

সাধন চট্টরাজ বাবাকেও ঠিক ওই এক কথাই বলেছে—বড় আশা করে আর বড় মুখ করে বড় শালাকে আপনার হাতে সঁপে দিচ্ছি—দেখলাম তো অনেক, আমার এত বিশ্বাস ভূ-ভারতের আর কোনো ডাক্তারের ওপর নেই—আপনি দয়া করে ভার নিন, যা করা দরকার করুন, খরচের জন্য কিছু ভাববেন না—একটি অবধি পয়সার জন্য আমি দায়ী থাকলাম।

এ কথার অর্থ, ওই বড় সম্বন্ধী ভদ্রলোক সবে রিটায়ার করেছে, তার আগে এদিকে কলকাতায় চিকিৎসা করতে করতে ফতুর হয়ে গেছে না কি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা পেতে মাস দেড় দুই লাগবে—চিকিৎসা খরচের কড়াক্রান্তি তখন দিয়ে দেবে।

কলকাতায় ডাক্তারের চিকিৎসা বন্ধ করে বড় সম্বন্ধীকে বাবার চিকিৎসার জন্য এই বর্ধমানে ধরে আনা হয়েছে শুনে বাবা বেশ বিব্রত হয়েছিল। কিন্তু অমন তোয়াজে কার না মন ভেজে। এনেই ফেলেছে যখন, বাবা চিকিৎসায় মন দিল। সত্যিই অনেক রকমের ব্যাধি ভদ্রলোকের—সবার ওপর গল ব্লাডারে স্টোনের ব্যাপার তো আছেই। বাবা চিকিৎসা শুরু করে দিল। আর একটা সুবিধে, বাবা এখানকার সব থেকে বড় হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচড। সমস্ত ডাক্তার আর সার্জন বাবার বন্ধু। অন্যদিকে, রোগী হাতে নিলে বাবা টাকার কথা মোটে ভাবেই না।

তাছাড়া পাশের বাড়ির অমন অমায়িক ভদ্রলোক যখন দায়িত্ব নিয়েছে ভাবার আছেই বা কি।

প্রায় দু'মাস চিকিৎসার পর ভদ্রলোকের সত্যিই অনেকটা উপকার হল, অনেক উপসর্গ কমল। কিন্তু গল ব্লাডারের গণ্ডগোল গেল না। ওদিকে রোগীটি বেজায় ভীতু, অপারেশনে কিছুতে রাজী না। শেষে বাবা তাকে এমন কথাও বললে, আপনি নির্ভয়ে

অপারেশন করুন, আপনার জীবনের জন্য আমি জামিন থাকলাম। এতদিন চিকিৎসার ফলে বাবার ওপর ভদ্রলোকের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। শেষ পর্যন্ত অপারেশনে রাজি হল। বাবাই সব ব্যবস্থা করল। এখানকার সব থেকে নামী সার্জন দিয়ে অপারেশন হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত রোগী বা সাধন চট্টরাজের এক পয়সাও খসে নি। মাঝখানে বাবা আছে, বাবারই পেশেণ্ট—টাকার প্রশ্ন ওঠেই নি। ও তো পাওয়া যাবেই।

ভদ্রলোক মোটামুটি সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফেরার দিন কতকের মধ্যেই টাকা পাওয়া গেছে। সাধন চট্টরাজই তাগিদ দিয়ে বাবার কাছ থেকে বিল নিয়েছে। সেই বিলে বাবা হাসপাতালে থাকার চার্জ, অপারেশনের চার্জ আর ওষুধপত্রের চার্জ আর বাবার যা খরচ হয়েছিল, তাই শুধু ধরেছে। নিজের চিকিৎসার ফী ধরেও নি। হাসপাতালের চার্জ বাবা নিঃসন্দেহে আগেই নিজের পকেট থেকে মিটিয়ে দিয়েছিল। এ রকম একজন রোগী ভালো হয়ে গেল, বাবার এইতেই আনন্দ। তাই বিল-এ নিজের ফি আর ধরে নি।

একটি অবধি পয়সার জন্য আমি দায়ী থাকলাম। [পৃঃ ২০৬

সর্বসাকুল্যে বিল হয়েছিল তিন হাজার টাকা। কৃতজ্ঞতায় পঞ্চমুখ হয়ে সেই টাকা সাধন চট্টরাজ নিজে হাতে করে দিয়ে গেছে। কিন্তু দিতে এসেছিল এমন সময়, বাবা যখন এক-ঘর রোগী নিয়ে বিষম ব্যস্ত। বাবা নগদ তিন হাজার টাকা পকেটে পুরতেই সাধন চট্টরাজ বলেছে, আপনি তো ভীষণ ব্যস্ত দেখছি, আমি আবার এই দশটার গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি—আপনি রোগী দেখুন, আমি আপনার হয়ে একটু কাজ সেরে নিই।

বাবা সঠিক না বুঝেই পরের রোগী দেখার জন্য ভিতরের চেম্বারে ঢুকল। সেই রোগী দেখা শেষ করে বাবা আবার বাইরে এসে দেখে, সাধন চট্টরাজ তারই ছাপা প্যাডে তিন হাজার টাকার একটা রিসিট লিখে অপেক্ষা করছে। বাবা আসতেই সেটা তার সামনে ধরে বলল, কলকাতায় যাচ্ছি যখন, আপনি আমার কাছ থেকে টাকাটা

পেলেন এই শুধু লিখলাম—ডিটেলড রিসিট দরকার হলে পরে জানাব'খন, আপনি এটা সই করে দিন।

বাবা পড়ে দেখল, লেখা আছে সাধন চট্টরাজের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নগদ পেলাম।

ব্যস্ত বাবা সই করতে যেতেই সাধন চট্টরাজ সবিনয়ে বাধা দিয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে একটু ভাঁজ করে বলল, এখানটায় সই করুন, মাঝখানে একটা রেভেনিউ স্ট্যাম্প এঁটে ক্রস করে দেব'খন।

বাবা কিছু না ভেবেই সই করে দিল।

কিন্তু কেস-এ নেমে দেখা গেল, সেই রিসিটে লেখা আছে, সাধন চট্টরাজের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নগদ পেলাম। তার এবং আমার বাড়ির মাঝের জমিটুকুর এই টাকার বিনিময়ে বিক্রির লেখাপড়া যথাসময়ে হবে। তার নিচে ক্রস করা রেভিনিউ স্ট্যাম্প এবং তার নিচে বাবার নিজের হাতেই সই।

অর্থাৎ ওই প্রথম লেখাটুকুর চার আঙুল নিচে বাবাকে দিয়ে সই করে নিয়েছে ধূর্ত সাধন চট্টরাজ। আগেরটুকুও তার লেখা, পরে যেটুকু যোগ করেছে, তাও তারই লেখা। ওদিকে বাবার নিজের নামের ছাপা প্যাড। কড়া সাব-জজ সেটাই বিশ্বাস করবে, তাতে আর অবাক হবার কি আছে। বিশেষ করে এর আগে বাবার বিরুদ্ধে পরপর উড়ো চিঠি পেয়ে তার মন যখন বিষিয়েই আছে।

ধূর্জটি ঘোষালের উকীল হিসেবে নামডাক আছে। হাকিমরাও তাকে একটু-আধটু খাতির করে। ওই সাব-জজকে সে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কড়া হাকিম বলতে গেলে তাকে অপমান করেই তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, ও রকম একটা হীন চরিত্রের ডাক্তারকে সে এবারে দেখে নেবে। ও রকম লোকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত, এমন কথাও বলেছে।

সব শোনা আর বোঝার পর আমার ভেতরটা যেমন মুষড়ে গেল, তেমনি ওই সাধন চট্টরাজকে জ্যান্ত ভস্ম করতে ইচ্ছে করল। বাবার ওপর যে আমার এত মমতা নিজেই জানতাম না। তার ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকাতে পারি না। রাগের মাথায় সেদিন ঠাকুমাকে বলেই ফেললাম, কেস-এর রায় যদি বাবার বিরুদ্ধে হয় তো ওই সাধন চট্টরাজকে হাসপাতালে যেতে হবে জেনে রেখো।

কিন্তু ঠাকুমা যে ওই শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে আবার মাকে বলবে, আর মা বাবাকে বলবে, এ কি জানতাম। পরদিনই বিপত্তি। বাবা আমাকে ডেকে জিগ্যেস করল, এ কি শুনছি?

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। বুঝতেই পারলাম না বাবা কি শুনেছে। বাবাই কঠিন গলায় আবার বলল, ঠাকুমাকে বলেছিস আমি কেস-এ হারলে সাধন চট্টরাজকে হাসপাতালে যেতে হবে?

আমার তো মাথায় আকাশ ভাঙার দাখিল। মনে মনে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কি করার আছে?

বাবার মুখ থমথমে—দিনকে দিন একটা বাঁদর তৈরি হচ্ছিস—বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে গেছে—কেমন? খবরদার এসব কথা যেন আর না শুনি। বিনা দোষে কেস-এ হারলে এর ওপর হাইকোর্ট আছে, তার ওপর সুপ্রিম কোর্ট আছে—এটুকু কমন সেন্স তোর আছে স্টুপিড কোথাকার?

মাথা নিচু করে চলে এলাম। না, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের কথা আমার মাথায়ও আসে নি। প্রথমে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। সব বিচারকই তো আর সাধন চট্টরাজের দূর সম্পর্কের আত্মীয় নয়, বা সব বিচারকের কাছেই সে আগে থাকতে বাবার বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি পাঠিয়ে তাদের মন বিষিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই আবার আমার মন খারাপ। পরের বিচারে কি হবে না হবে, সে তো ঈশ্বর জানে। কিন্তু এখানকার বিচারে বাবা হারলে তো চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে—বাবার মুখে চুনকালি পড়বে।

পরপর তিন দিন মাঠের আড্ডায় যাই নি। চটপটি ডাকতে এসে ফিরে গেছে। বলেছি, মন-মেজাজ কেমন খিঁচড়ে আছে জানিস তো, কিছু ভালো লাগে না। আর নিজেই বেরিয়ে পড়লাম যদি খানিকটা অন্যমনস্ক থাকতে পারি। পিন্‌ডিদার ভাণ্ডারে তো অনেক ঘটনা, হয় তো আমার মন খারাপ দেখেই নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলবে যা শুনতে শুনতে খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত এই কুচ্ছিত ব্যাপারটা থেকে মন দূরে সরবে।

পিন্‌ডিদা তার সেই উঁচু ঢিবির আসনে বসে আছে। তার সামনে হোঁতকা হাবুল চটপটি কেবলু কার্তিক। ওদের আবার ভালো জমছে না, এ আমি দূর থেকে দেখেই বুঝলাম। কারণ পিন্‌ডিদার আসর জমাতে হলে পকেটে কিছু রেস্ত থাকা চাই। জিভের খোরাক না পেলে পিন্‌ডিদার রসনায় ভাঁটা পড়ে। ঠাকুমার কাঠের হাত-বাক্স মেরে হোক, বা মাকে জ্বালাতন করে হোক, এ রসদ বরাবর আমিই যোগান দিয়ে থাকি। আজ আমার পকেট কলকাতার গড়ের মাঠ—পয়সা আনার কথা মনেও ছিল না আর সেরকম মনও ছিল না।

আমাকে দেখা মাত্র সংস্কৃতনবিশ কেবলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, স্বাগতম্—স্বাগতম্! আমি মনে মনে তোকেই স্মরণং কৃত্বা—আমরা ভাবছিলাম মনের দুঃখে তুই বনং ব্রজেৎ। মা শোচং—মা শোচং।

এই তড়বড়ানি কার্তিকেরই প্রথম অসহ্য হল। ও ধমকে উঠল, এই কেবলুং! চুপ করং—চুপ করং!

পিন্‌ডিদার বাঁ পাশে আমি বসে থাকি—এগিয়ে গিয়ে তাই বসলাম। আসতে না আসতে কেবলু হতভাগা আমার মেজাজ চড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সামনে আসা আর বসার পর পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম, পিন্‌ডিদা কুত-কুত করে আমাকেই দেখছে—যেন আমি বেশ একটা দ্রষ্টব্য জিনিস। কোন কারণ নেই, তবু কেন যেন আমার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। কারণ নেই-ই বা বলি কেন, আমার বাবা লোকসমাজে এত হেয় হতে চলেছে—

তার ছেলেকে এমন ঘটা করে দেখার কি আছে? বরং দু'চারটে সহানুভূতির কথা শুনলে ভালো লাগত।

আমি জানি, আমাদের এ ক'জনের মধ্যে হাবুল, মানে হেবো হোঁতকাই সব থেকে নিরেট। আমার এই মনের অবস্থা, তার মধ্যে ওর গুরু পিন্‌ডিদার ক'টা বিকেল ধরে জিভ উপোস করছে—আগে সেটাই ওর মনে হল। দু'তিন বার গলা খাঁকারি দিয়ে ও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। শুধু আমার কেন, সবারই যে করল, এ কাণ্ডজ্ঞানও নেই, এমনি নির্লজ্জ মোসায়েব বটে পিন্‌ডিদার। আমি তাকাতেই হাবুল ডানের হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল যুক্ত করে টাকা বাজানোর কল্পিত শব্দ করে ইশারায় জিগ্যেস করল, পকেটে আছে কিছু?

রাগে আমার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। একে একে সক্কলের মুখ ক'টা দেখে নিলাম। এমন কি পিন্‌ডিদারও। তারপর সোজা হাবুলের দিকে চেয়ে জামার দু'পাশের দুই পকেট উল্টে দেখালাম। একটি কপর্দকও যে নেই, মুখে ওই মোসায়েবকে সেটা বলতেও আমার ঘেন্না ধরে গেল।

আমার মেজাজের অবস্থা অল্প-বিস্তর সবাই টের পেয়েছে। কিন্তু সকলের থেকে বেশি বুঝেছে বোধহয় স্বয়ং পিন্‌ডিদা। তার মগজের ধার কে অস্বীকার করবে?

বেজায় গম্ভীর মুখ করে পিন্‌ডিদা হাঁক পাড়ল, হেবো—!

হাবুল হোঁতকা তটস্থ—কি পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা জবাব না দিয়ে চোখ দুটো দিয়ে ওই হাতির শরীরখানা গিলতে চাইল। ব্যাপার কিছু না বুঝে হাবুল হোঁতকা কেঁচো একেবারে।

পিন্‌ডিদার দু'চোখ এবারে কেবলুর দিকে—কেবলু!

কেবলুও হকচকিয়ে গেল—কি পিন্‌ডিদা?

—তুই মনের সাধে হাবুলকে সংস্কৃততে কিছু বল্ তো—ব-ল্ বলছি!

ঘাবড়ে গিয়ে কেবলু হাবুলের দিকে ফিরল। তারপর হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, জাহান্নমেং গচ্ছ!

আমার হাসিই পেয়ে যাচ্ছিল। তবু চেষ্টা করে গম্ভীর থাকলাম।

কিন্তু তার পরেই আমার আবার গা গরম হতে থাকল। হাবুলের শাস্তি বিধানের পরেই আবার তার সেই মজা-ছোঁয়া কুতকুতে চাউনি। ঘটা করে আমাকেই দেখছে।

—হ্যাঁ রে সোনা—ব্যাপারখানা কি র‍্যাঁ তোর?

কেবলুর মতোই একটা সংস্কৃত গাল দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছিল আমার। কিন্তু পিন্‌ডিদা পিন্‌ডিদা-ই। জবাব দিলাম, জানই তো, আবার জিগ্যেস কচ্ছো কি?

এটুকু ঝাঁজিয়ে কথা বলতে দেখেও মোসায়েব হাবুলের সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, সুখ-দুঃখু সকলের জীবনেই আসে, তা বলে পিন্‌ডিদার মুখের ওপর তুই এভাবে কথা বলবি? আর আমরা তা সহ্য করব ভাবিস?

আসলে একটু আগে পিন্‌ডিদা যে ওর ওপর তেতে উঠেছিল, সেটুকুই জল করার
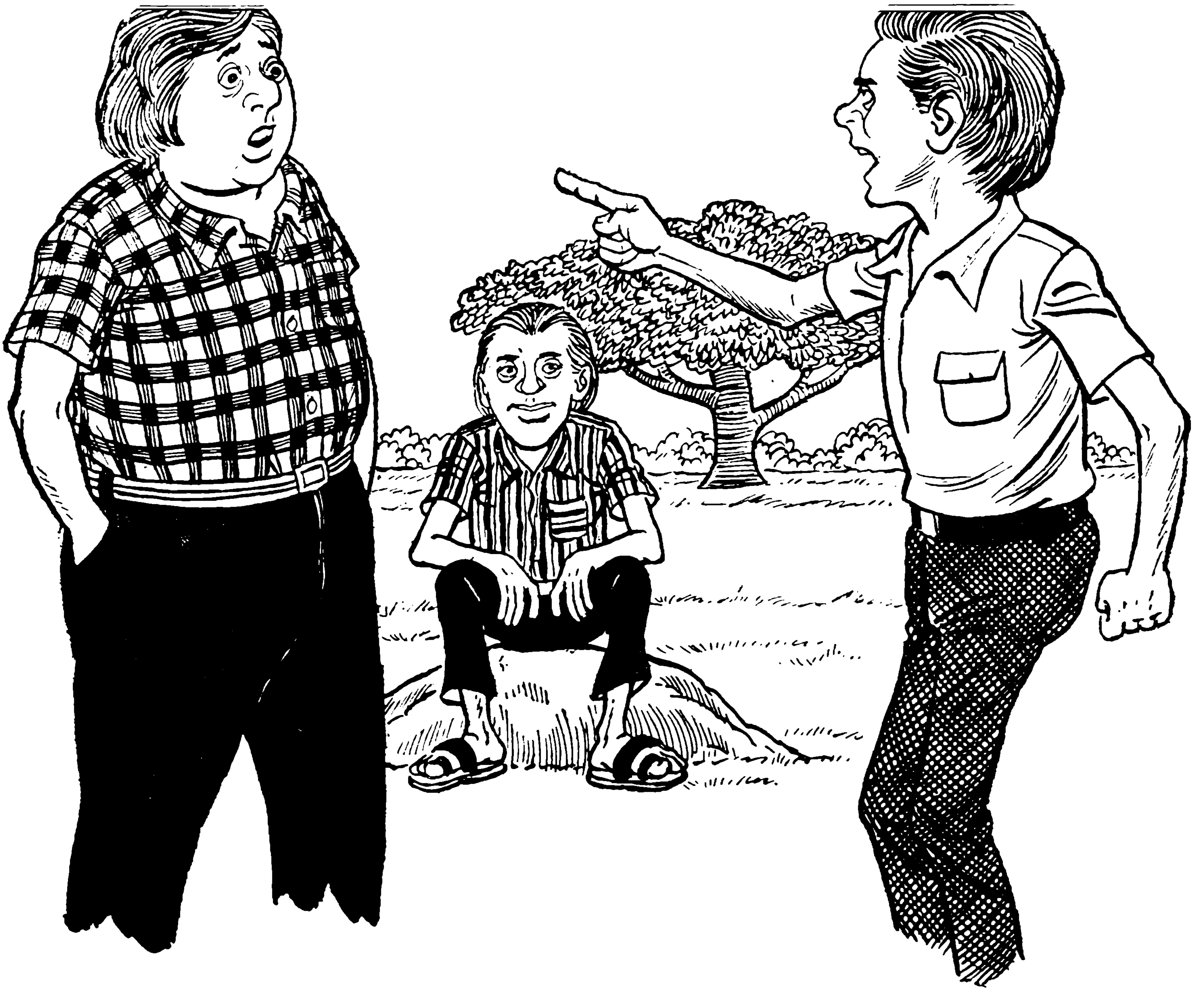
কেবলু চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, জাহান্নমেং গচ্ছ ! [পৃঃ ২১০

চেষ্টা। আমার ইচ্ছে করছিল, ইয়ে, না লাথি কথাটা খারাপ শোনায়—ইচ্ছে করছিল ওকে একটা পদাঘাত করি। কিন্তু পরমুহূর্তে পিন্‌ডিদার বজ্রকণ্ঠ শুনে চকিতে ঘুরে তাকালাম।

—হেবো !

ওই গলা শুনেই হাবুলের হয়ে গেল। কুতকুতে চোখ দুটোকে কোন রকমে তার মুখের ওপরে রাখল।

—তোর বাবা নেই ?

করুণ সুরে হাবুল বলল, ছিল পিন্‌ডিদা—এখন নেই।

—যখন ছিল বাপকে কখনো শ্রদ্ধাভক্তি করেছিলি ?

—অত সুযোগ পাই নি পিন্‌ডিদা, মুখোমুখি হলেও খড়ম পিটুনির ভয়ে পালিয়ে যেতে হত।

—হতভাগা কোথাকারের, তাহলে আর বাপের মর্ম বুঝবি কি করে ?

কেবলু ফসফস করে উঠল, পিতাহি পরমং তপঃ !

টিকটিকি যেমন করে দেয়ালের আরশোলার দিকে তাকায়, হাবুলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পিন্‌ডিদা খানিক কেবলুর দিকে চেয়ে রইল—তার আগের দুটো পঙক্তি কি বনবাসং গতঃ?

কেবলু মাথা চুলকে আগের কথাগুলি চিন্তা করতে লাগল।

—স্টুপিড!

কেবলু কেঁচো। হাবুলের মুখে স্বস্তির হাসি।

—তুই নয়, আমি হেবোকে বলছি। পিন্‌ডিদা হাবুলের দিকে চোখ পাকালো।

এবারে আবার হাবুল কেঁচো।

দাঁতে দাঁত ঘষে পিন্‌ডিদা বলল, তুই একটা হাতির মতো গাধা—বাপের অপমানে যে ছেলে অপমান বোধ না করে—যে ছেলের মন-মেজাজ তিরিক্ষি না হয়ে যায়, সে একটা কুলাঙ্গার—বুঝলি? সোনার কথায় আমি রাগ করেছি?

পিন্‌ডিদার কথায় আমার রাগ জল। হেবো মিনমিন করে জবাব দিল, তোমার যে কচ্ছপের মতো ধৈর্য পিন্‌ডিদা—

—তার মানে? ভুরু কুঁচকে পিন্‌ডিদা চাপা গর্জন করে উঠল।

হাবুল আরো ভেবাচাকা—ইয়ে—বলছিলাম কি কচ্ছপ গলা কাটলেও রাগ করে না।

পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, বলিহারি উপমা তোর—ফের কচ্ছপ-মচ্ছপ বলবি তো খাট্টা হয়ে গাট্টা মেরে বসব বলে দিলাম!

কেবলু মোলায়েম মন্তব্য করল, কূর্মঃ বললেও হত, সোজা কিনা অলুক্ষণে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা দিলি পিন্‌ডিদার!

—চটপটি!

পিন্‌ডিদার গলা শুনে এবার চটপটি আঁতকে উঠল—কি পিন্‌ডিদা?

—ওদের দু'জনেরই চুলের ঝুঁটি ধরে মাথা দুটো বেশ করে ঠুকে দে তো!

পিন্‌ডিদার হুকুম। চটপটি কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হাসি চেপে এবারে আমিই বললাম, যাক গে পিন্‌ডিদা, এবারকার মতো ওদের ক্ষমা করে দাও।

পিন্‌ডিদা আমার দিকে থমকে চেয়ে রইল একটু। তারপর প্রশংসার সুরে বলল, তোর মনটা বেজায় নরম রে সোনা। যাক, ক্ষমা করেই দিলাম।—তা এখন বল দেখি, তোর বাবা, মানে আমাদের মেসোমশাইয়ের নামে যতটা রটেছে, তার কতটা বটে?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় চড়াত করে রক্ত উঠে গেল। ঝাঁঝালো চোখে তাকালাম—তার মানে?

পিন্‌ডিদার অমায়িক গলা।—এটা আর বুঝলি না? শাস্ত্র বচন আছে না—যা রটে তার কিছু বটে—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তোর বাবার বেলায়—থুড়ি, আমাদের মেসোমশাইয়ের বেলায় কতটা বটে?

রাগের চোটে আমি ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগলাম। আমার বাবা কি মানুষ খুব ভালো করে জানে, বাবাকে সামনে দেখলে বিনয়ে গলে যায়, বাবা-মা-ঠাকুমা সবাই

নানা অঘটের ফলে তার ওপর বেজায় খুশি বলে বাবারই টাকায় খাওয়া, দেওঘর বেড়ানো, কি না হয়েছে? শুধু তাই নয়, বাবা খরচপত্র দিয়ে আমাদের দেওঘর বেড়াতে পাঠিয়েছিল—সে টাকা তো গোটাগুটি বেঁচেই গেছে—তার ওপর আমাকে টোপ বানিয়ে স্বামী পাকড়াওনন্দজী ওরফে রামবাদশার মতো দুঁদে ডাকাতকে হাজতে পুরতে পারার জন্য মোটা টাকা পুরস্কার পেয়ে বাবার টাকা আর সে টাকা মিলিয়ে বেড়ানোর তহবিল করা হয়েছে—সবই বাবার দৌলতে হয়েছে ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়।)—আর সেই বাবার সম্পর্কে কিনা এই কথা—এমন জঘন্য সন্দেহ! কোন্ ছেলে তা সহ্য করতে পারে?

আমি রাগে চিড়বিড় করে উঠলাম। উপযুক্ত জবাব দিতে সময় লাগল একটু। তারপর পাথর ঠুকে আওয়াজ বার করার মতো গলায় বললাম, বাবাকে তোমার নাম করে জিগ্যেস করব।

পিন্‌ডিদা সচকিত—কি জিগ্যেস করবি?

—জিজ্ঞেস করব, পিন্‌ডিদা জানতে চেয়েছে তুমি কতটা চোর আর কতটা নও।

—সে কি রে—পিন্‌ডিদার রণে ভঙ্গ দেওয়ার গলা। তুই এই বুঝলি?

তবু আমার মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। চনমনে গলায় ফিরে ফললাম, আর কি বোঝবার আছে? আর কি বোঝাতে চাও তুমি? কেবল তোমার মাথাতেই মগজ বলে কিছু আছে আর সকলের মাথায় গোবর—কেমন? বাবাকে চেন না তুমি? বাবার সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

রাগে আমারই মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল—নইলে পিন্‌ডিদাকে কিনা এরকম বললাম! কিন্তু বলার পরেও রাগে ফুঁসছি আমি। ওদিকে চটপটি কেবলু কার্তিক বোবা মেরে গেছে। ওরাও ভেবে পাচ্ছে না আমার মাথাই বিগড়ে গেল কি না। প্রথম ধাক্কা সামলে হাবুল মোটা শরীরটাকে আস্তে আস্তে দু'পায়ের ওপর টেনে তুলেছে। পিন্‌ডিদার একটু ইংঙ্গিতের অপেক্ষা কেবল, আমাকে ইঁদুরের মতো টেনে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে আছাড় মারার ইচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ পিন্‌ডিদা। তার এমন হাবা-গোবা গোছের চাউনি দেখেই রাগ সত্ত্বেও আমি কেমন ভড়কে যাচ্ছি। তারপর আরো অবাক কাণ্ড, পিনডিদা এবারে হাসতে শুরু করেছে। আমার দিকে চেয়েই হাসছে। প্রথমে অল্প অল্প হাসি। তারপর খিক খিক হাসি। তারপর বেদম হাসি। এত হাসি যে শেষে নিজের পেটটা নিজেই দু'হাতে চেপে ধরেছে। তবু হাসি আর থামেই না—থামেই না।

আমরা সঙের মতো পিন্‌ডিদাকেই দেখছি। হাবুল দাঁড়িয়েই আছে। বসতেও ভুলে গেছে।

কোন রকমে হাসি থামিয়ে পিন্‌ডিদা প্রথমে ওকেই ধমকে উঠল—এই গাধা কোথাকারের—বোস্!

আবার একপ্রস্থ হাসির দমক সামলে পিন্‌ডিদা বলল, সোনা রে—সত্যি তুই একটা

সোনার ছেলে! এতটুকু খাদ নেই, এতটুকু ভেজাল নেই—শেষের এই পরীক্ষায়ও পাস করে গেলি—একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!

আমি এত বোকা! অনুশোচনায় আমার ভিতরটা মুচড়ে উঠছে—পিন্‌ডিদা পরীক্ষা করছে আর আমি কি না তা বুঝতেও পারি নি! কোনরকমে বললাম, আমাকে ক্ষমা করো পিন্‌ডিদা, আমি একটা অপদার্থ।

সঙ্গে সঙ্গে হাবুল খেঁচিয়ে উঠল, অপদার্থ? যা নয় তাই বললি পিন্‌ডিদাকে আর এখন নাকে কান্না! পিন্‌ডিদাকে জানতে বুঝতে তোর ক'জন্ম লাগবে রাসকেল কোথাকারের, সে কাণ্ডজ্ঞান আছে?

এবারে ওরই মুণ্ডুটা আমার চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে। তবু হাসি-হাসি মুখ করে পিন্‌ডিদার দিকে ফিরলাম।—আচ্ছা পিন্‌ডিদা, এবারে তুমিই বলো, হেবোটা আমার থেকেও কত টাইমস হাঁদা-গাধা, তুমি হেসে ওঠা মাত্র আমি নিজের বোকামি বুঝতে পেরেছি—আর ও এখন পর্যন্ত গণ্ডারের মতো গাঁ-গাঁ করছে!

তুই এই বুঝলি? [পৃঃ ২১৩

হাবুল ঘুঁষি বাগিয়ে তেড়ে আসতে যাচ্ছিল, পিন্‌ডিদা একটা হাত তুলতেই থমকালো।

পিন্‌ডিদা বলল, এই ইডিয়েট্ লাইক্ ননসেন্স—শাট্ আপ্ অ্যাণ্ড্ সীট্ ডাউন্।

কেবলু খুশি মুখে সংস্কৃত ঝাড়ল, সব বালভাষিতং অমৃতং পিন্‌ডিদা।

চটপটি ঝংকার দিয়ে উঠল, থাম! আর ন কচকচং—পিন্‌ডিদা, এবার আসল যেটা ব্যাপার, সোনার বাবার—মানে অমন ভালো মানুষ মেসোমশাইয়ের প্রবলেমটা নিয়ে একটু সীরিয়াস্‌লি ভাবো—ওই জোচ্চোর উকীল সাধন চট্টরাজকে আমারই আলুকাবলি বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে—সোনার তাহলে কি অবস্থা ভাবো।

—আ-হা রে, সহানুভূতিতে পিন্‌ডিদার মাখন গলা মুখ।—আচ্ছা সোনা, সমস্ত ব্যাপারটা তুই আমাকে একবার বল্ দেখি—যদিও মোটামুটি জানি, তবু আর একবার ঝালিয়ে নিই।

আমি আজ মাঠে এসেছি অশান্তিটা দু'দণ্ড ভুলে থাকতে, উল্টে কিনা এখানেও এই শুরু হল। যেখানে বাবার বন্ধু, আর চটপটির দূর সম্পর্কের কাকা ওই দুঁদে

উকীল ধূর্জটি ঘোষাল ঘোল খেয়ে গেল—সেই কোর্ট-কাছারির ব্যাপারে পিন্‌ডিদা কি করবে?

তাই খুব উৎসাহ বোধ না করে বললাম, বাবার উকীল ধূর্জটি ঘোষাল সম্পর্কে চটপটির কাকা হয়—আমার থেকে চটপটি ভালো জানে—ওর মুখেই শোনো।

—তুই বেজায় মিইয়ে গেছিস দেখছি, আচ্ছা চটপটি, খুব পটপট না করে চটপট বল্।

চটপটি কর্তব্য পালন করল। ব্যাপারটা মোটামুটি স্পষ্ট করেই বোঝালো।

উঁচু ঢিবির আসনে বসে পিন্‌ডিদা দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল।

শেষ হতে কার্তিক বলে উঠল, উঃ, আমার যদি নিজের নামের মতো শক্তি থাকত তাহলে সাধন চট্টরাজের মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনতাম।

চটপটি বলল, আর আমি তখন ব্রেজিলের ফুটবল স্টার পিন্‌ডিদার মতো ওই মুণ্ডুর ওপর একটা টেরিফিক সট্ নিতাম।

কেবলু বলল, আমি তাহলে ওই মুণ্ডুটাকে মন্ত্র ভস্মিতং করতাম।

এর পর হেবোই সব থেকে বুদ্ধিমানের মতো বলে উঠল, এরা সব জেগে স্বপ্ন দেখছে, তুমি একবারটি শুধু হুকুম দাও পিন্‌ডিদা, আমি ওই সাধন চট্টরাজের কীচক বধ করে আসি।

কিন্তু পিন্‌ডিদার কোন সাড়াশব্দ নেই। দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে দু'চোখ বুজে ভেবেই চলেছে। অনেকক্ষণ বাদে চোখ-বোজা অবস্থাতেই প্রশ্ন ছুঁড়ল, লোক কেমন?

আমরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, কে লোক কেমন রে বাবা!

কিন্তু কতক্ষণ আর বোবা বনে বসে থাকা যায়। ভয়ে ভয়ে কার্তিক গলায় বিনয়ের মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করল, কার কথা বলছ পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা তেমনি হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখ বুজে জবাব দিল, কার আবার—ওই জজ সাহেব—লোক কেমন?

এবারে চটপটি ফটফট করে বলল, দারুণ খাস্তা মানুষ পিন্‌ডিদা—মানে টেরিফিক অনেস্ট—কিন্তু আগে থাকতে ওই উড়ো চিঠির ঝাঁকে অন্ধ হয়ে এখন সোনার বাবার ওপর বেজায় খচে আছে—ধূর্জটি ঘোষালের মতো উকীলকে পর্যন্ত পাত্তা দিচ্ছে না।

আবার দু'মিনিট পিন্‌ড্রপ্ সাইলেন্স।

—ঘুষ-টুষ খায়?

পিন্‌ডিদার প্রশ্ন শুনে আমি একেবারে হতাশ। এতক্ষণ বাদে কিনা পিন্‌ডিদার এমন সহজ রাস্তা ধরে মুশকিল আসানের চিন্তা!

চটপটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অমন চিন্তা মনেও এনো না পিন্‌ডিদা—কেউ ঘুষ দিতে গেলে ওই সাবজজ তার একেবারেই বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। এদিক থেকে লোকটা একেবারে হরিদ্বারের গঙ্গাজল, এমন চেষ্টা করতে গেলে সোনার বাবাকে উল্টে বর্ধমান ছাড়া করে ছাড়বে।

পিন্‌ডিদা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিল।

আবার সেই বিতিকিচ্ছিরি রকমের চুপচাপ সকলে। আমার মনে হল দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাবতে ভাবতে পিন্‌ডিদা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল। হঠাৎই একটা বোমা পড়ার শব্দে যেন আমরা বাকি পাঁচ জনই একসঙ্গে চমকে উঠলাম।

—চানাগ্রাম!

দুই হাঁটুতে মুখ গোঁজা, কিন্তু হুঙ্কারটা পিন্‌ডিদার। নিজেদের দিকে একবারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে করে মাঠের পারের রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই সকলে অবাক। রাস্তা দিয়ে চানাওঅলা ব্যাটাই চলেছে বটে।

আমি আর কি করতে পারি? যে মেজাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আমার পকেটে কানাকড়িও নেই। বাকি চারজনের উদগ্রীব চার জোড়া চোখ আমারই দিকে। অর্থাৎ যদি আমার কোমরেটোমরে টাকা গোঁজা থাকে—পকেট তো আগেই উল্টে দেখিয়েছি। পিন্‌ডিদার মুখ এখনো হাঁটুতে গোঁজা, দেখে ফেলার ভয় নেই—তাই আমি ওদের দিকে হাতের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম, আমার কাছে এক কপর্দকও নেই। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বিরস বদনে চটপটি উঠে গেল আর হনহন করে হেঁটে গিয়ে চানা-ওলাকে গিয়ে ধরল। ফিরল যখন, দেখেই বুঝলাম তার হাতে এক সিকির একটাই ঠোঙা।

পিন্‌ডিদা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিল। কিন্তু সে কি আর এ জগতে আছে যে আমাদের মধ্যে যে আর কেউ যাচ্ছে না সেটা লক্ষ্য করবে? চোখ বুজে দুই হাঁটুতে

থুঁতনি গুজে চানা-গ্রাম চিবুতে চিবুতে ভাবনা সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে মসলা-চানা মুখে পুরে চিবুচ্ছে, আবার ভাবনায় তলিয়ে যাচ্ছে।

চানা শেষ হতে ঠোঙাটা হাত থেকে খসে পড়ল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই। ভাবতে ভাবতে পিন্‌ডিদা আবার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

—আলুকাবলি।

তেমনি হঠাৎ আবার হুংকার পিন্‌ডিদার। আমি তো হতভম্ব। পাঁচজনের দশখানা চোখ আবার মাঠের শেষের রাস্তার দিকে। আশ্চর্য, সত্যি আলুকাবলিওলাটা ঢিমেতালে দূরের রাস্তা দিয়ে চলেছে। আবার সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি। এবারে উঠল বিরসবদন কার্তিক। কোণাকুণি মাঠ ভেঙে আলুকাবলিওলাকে ধরল। ফিরল যখন, শালপাতার ঠোঙা দেখেই বুঝলাম, ওর হাতেও চার আনারই মাল। ওদের পকেটে পয়সা—আজ ব্যাপারখানা কি মাথায় ঢুকছে না!

না, পিন্‌ডিদা বুঝি সত্যিই এজগতে নেই। আলুকাবলি মুখে দেবার জন্য এক একবার চোখ খুলছে যখন, চাউনিই অন্য রকম। ঢুলুঢুলু চোখ। সেই চোখজোড়া এক একবার টান করে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে! যেন কিছু দেখার বা কাউকে দেখার আকুতি। তারপর খানিকটা আলুকাবলি মুখে দিয়ে আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজছে। এই করে ঠোঙাটা শেষ হতে আপনি ওটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। পিন্‌ডিদার হুঁশ নেই।

উদগ্রীব মুখে আমরা জোড়া জোড়া ঠোঁট সেলাই করে বসে আছি তো বসেই আছি।

—ঝালমুড়ি!

এবারকার হুংকার শুনে আমরা অতটা না চমকালেও নড়েচড়ে বসলাম। হ্যাঁ, ঝালমুড়িওলাও যাচ্ছে ঠিকই। হোঁতকা হাবুলকে ছেড়ে আমি কেবলুর দিকে তাকালাম। ঠিকই ধরেছি। এবারে কেবলুরই পালা। শুকনো মুখে ও উঠল। চলল। দু'হাঁটুতে মুখ গোঁজা পিন্‌ডিদা আবার ঝিমুনির জগতে চলে গেছে।

আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে আমি খুব নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। পা টিপে আট দশ গজ গিয়ে তারপর ছুটে কেবলুকে ধরলাম। আমাকে দেখেই তিরিক্ষি মেজামে কেবলু বলে উঠল, কড়কড়ে চার আনা খসিতং!

—খসিতং তো বুঝলাম, কিন্তু তোরা সব চার আনা করে আনিতং—কি ব্যাপার?

পাল্টা ঝাঁঝে কেবলু বলল, না এনে কি করব? তুই না থাকলে পিন্‌ডিদার খাই-খাই রোগ সামলাবে কে? ক'দিন ধরে তোর পাত্তা নেই, আর পিন্‌ডিদাও খিঁচড়িফাই—কাল রাগ করে বলেই উঠল, বাতাস গিলিয়ে পিন্‌ডিদাকে ধরে রাখা যায় না বুঝলি—মগজের এক রত্তি ঘিলুও নড়াচড়া করতে চায় না—কাল সোনা এলো তো এলো, নইলে পরশু থেকে আর আসবই না।...তুই আসবি কি আসবি না ঠিক নেই বলে কোন রকমে চার আনা পয়সা যোগাড় করে এসেছিলাম—এখন দেখছি চটপটি আর কার্তিকও তাই এনেছে। তোকে দেখে ভেবেছিলাম পয়সা ক'টা বাঁচল, তা যস্মিন কপালে যা—আজ তোরই পকেট ফাঁকা।

কেবলুকে ছেড়ে আমি দ্রুত ফিরে এলাম। কাছে এসে আবার পা টিপে নিজের জায়গায় বসলাম।

কেবলু ফিরল। চার আনার ঝালমুড়ির ঠোঙাটা সামনে ধরল। কিন্তু পিন্‌ডিদাকে কি কেউ হিপনোটাইজ করে ফেলল! সে এখন কোন্ জগতে? নরম করে কেবলু দু'বার গলা খাঁকারি দিল, তাতেও সাড়াশব্দ নেই।

এবারে কেবলু গলায় মিছরির জল ঢেলে বলল, গ্রহণং কুরু পিন্‌ডিদা—

—হ্যাঁ, সংস্কৃত বটে কেবলুর। হাঁটুর ওপর থেকে পিন্‌ডিদার মাথাটা আস্তে আস্তে উঠল। কিন্তু ফ্যালফেলে চাউনি। টেনে টেনে জিগ্যেস করল, কি?

—ঝালমুড়ি পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে—কি বল-ছি-স বু-উ-ঝতে পা-রছি না।

কেবলু হকচকিয়ে গেল। সংস্কৃত শুনে সাড় এলো অথচ বাংলা বুঝতে পারছে না! এবারে গলা চড়িয়ে বলল, ঝাল মু-ড়িং পিন্‌ডিদা!

কাজ হল—ও, দে।

আবার সেই একই দৃশ্য। পিন্‌ডিদা এক একবার আকাশের দিকে তাকায়, ঝাল-মুড়ি মুখে দেয়, আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে কোথায় যেন চলে যায়। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে এক সময় ঝালমুড়ির ঠোঙাও শেষ হল। ওটা হাত থেকে খসেও পড়ল।

এবার আমি উদ্‌গ্রীব, এবার পিন্‌ডিদা কোন্ দ্রব্যটির জন্য হাঁক পাড়ে? তাহলে হাবুলের পালা হবে। কিন্তু হাবুলের পকেটেও কিছু থাকতে পারে, এ আমার বিশ্বাসই হয় না। একটু বাদেই হতাশ হলাম। দূরের ওই রাস্তা দিয়ে ফুচকাওলা চলে গেল, চিনেবাদামওলা চলে গেল, কুলপিমালাই চলে গেল—নাঃ, পিন্‌ডিদা আর এই জগতেই নেই।

আরো ছ'সাত মিনিট। এই ছ'সাত মিনিট যে কত লম্বা তা এই প্রথম জানলাম। তারপর অনড় দেহে প্রাণের সাড়া এলো। পিন্‌ডিদার রোগা শরীরটা এক একবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে সোজা হতে লাগল। চাউনি বদলে যাচ্ছে। দু'চোখ আমার মুখের ওপর ঝকঝকে হয়ে উঠছে। যেন আমি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি। তারপর উল্লাসে চেঁচিয়েই উঠল, সোনা রে! মা মুখ তুলে চেয়েছে—পথ পেয়ে গেছি! কি আনন্দ—কি আনন্দ—সোনা তুই বুঝবি না!

এবারে আমার খাবি খাবার দাখিল। বলে উঠলাম, মা পথ দেখিয়েছে মানে? কোন্ মা—কার মা?

পিন্‌ডিদা দারুণ বিরক্ত, কোন্ মা মানে? তুই দুনিয়ার সব মা-কে চিনিস না জানিস?

নিরাপদ ভেবে চুপচাপ চেয়ে রইলাম।

পিন্‌ডিদা হাসতে লাগল—সোনা রে সোনা, কি ভাগ্যি—মা পথ দেখালো! এর আর কোনো মার নেই—তোর বাবা মানে, আমাদের মেসোমশাই, হিমালয়ের মতো মাথা

উঁচিয়ে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—মা দেখিয়ে দিল। যাক, তোর আর সে চোখ কোথায়। তোকে আর ভাবতে হবে না, কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কর।

পিন্‌ডিদার মুখে টাকার কথা শুনলেই আমি গার্ড নিতে শুরু করি।—ট-টাকা… আমার কাছে তো এখন বিশেষ কিছুই নেই।

—ধেৎ, তোর কাছে কে চাইছে, এবারে আর তোর হিম্মতে কুলোবে না—তোর মাকে, মানে আমাদের মাসিমাকে বল কিছু টাকা বার করতে—আমার নাম করে বলবি, কোনো মার নেই, পুজোটা দিয়ে ফেলতে পারলেই সাধন চট্টরাজ জন্মের মতো ঢিট।

পিন্‌ডিদা এমন কথা বললে ভাবতেই হয়। অবশ্য মা-ঠাকুমার কাছে পিন্‌ডিদার এখন দারুণ খাতির কদর—এমন কি আমার রাশভারী বাবা পর্যন্ত স্বীকার করে, ছেলেটার একখানা মাথা বটে। হবে না কেন, হাড় কাঁপানো ডাকাত রামবাদশার কব্জা থেকে জমিদার গিন্নির গোপালের হীরের চোখজোড়া উদ্ধার করা আর শেষে মাথার জোরে দেওঘরে বসে তাকে হাজতে পোরার পর থেকে (‘লিডার বটে পিন্‌ডিদা’ পড়) সমস্ত বর্ধমান জুড়ে এখন পিন্‌ডিদার নাম। ওই রামবাদশার কল্যাণে সরকারী পুরস্কার পেয়ে আর বাবার দেওয়া টাকা মিলিয়ে এখন আমাদের এই পিন্‌ডিদা অ্যাণ্ড কোম্পানীর আড়াই হাজার টাকার মতো একটা ফাণ্ড পর্যন্ত হয়েছে।

জিগ্যেস করলাম, মায়ের কাছে কত টাকা চাইব?

পিন্‌ডিদা বেশ ভেবে-চিন্তে জবাব দিল, শ’তিনেকে হয়ে যাবে মনে হয়—

আমি আঁতকে উঠলাম, পুজোর জন্যে তিনশো টাকা!

কেবলু কার্তিক চটপটি, এমন কি হোঁতকা হাবুলের মুখও তিনশো টাকা শুনে ভিজে পাঁপড় খানা। কিন্তু পিন্‌ডিদা রেগেই গেল। তোর বাপ, মানে আমাদের মাননীয় মেসো-মশায় যে গাড্ডায় পড়েছে, তাতে তিনশো টাকা বেশি? নস্যি না? বলিস সেন্ট পারসেন্ট গ্যারান্টি, পুজোর পর মা যদি ভোজবাজী না দেখায় তো নাকে খত দেব—আর আমাদের ফাণ্ড থেকে ওই তিনশো টাকা রিফাণ্ড করব। জয় মা উৎকোচেশ্বরী, অধমের মুখ রেখো!

মা উৎকোচেশ্বরী শুনে আমরা তো হাঁ। আমি বলে উঠলাম, উৎকোচ—উৎকোচ মানে তো ঘুষ—তারও আবার দেবী আছে নাকি?

—যাঃ কলা! পিন্‌ডিদার মুখ কাঁচুমাচু, আনন্দে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই চোখ লাল—একটু আগে বললাম না, কোথায় কত দেবী আছে তুই জানিস?

আমি সাফ বলে দিলাম, কিন্তু মা উৎকোচেশ্বরী শুনলে মা, মানে আমার মা টাকা দেবে না।

—নাঃ, পিন্‌ডিদা তেতেই উঠল, এত বুদ্ধিমান হয়েও মাঝে মাঝে এমন বোকার মতো কথা বলিস সোনা—মাসিমাকে তুই ও কথা বলতে যাবি কেন—বলবি পিন্‌ডিদার এক উপাস্য দেবীর পুজো হবে—ফুরিয়ে গেল।

তবু আমি মরিয়া হয়ে বললাম, কিন্তু ঘুষের দেবীর পুজো কি ভালো?

পিন্‌ডিদা এবার খেঁকিয়েই উঠল। কেন, ফল ভালো হলে ভালো নয় কেন? মা

শীতলার পুজো দিলে ফল ভালো হয়, না বসন্ত বাড়ে? মা মনসার পুজো দিলে ফল ভালো হয়, না সাপে বেশি কামড়ায়? খারাপ জিনিসের দেবীকে পুজো দিলে ফল কখনো খারাপ হয় বোকা কোথাকারের? কিন্তু খবরদার, মেসোমশায় যেন জানতে না পারে!

অকাট্য যুক্তি।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মা আর ঠাকুমাকে একসঙ্গে ডেকে পিন্‌ডিদার কথা সব বললাম; তার এক উপাস্য দেবীর পুজোর জন্য তিনশো টাকা চাই—বাবা তাহলে কেস-এ জিতবেই জিতবে—না জিতলে পিন্‌ডিদা নাকে খত দেবে বলেছে আর আমাদের ফাণ্ড থেকে তিনশো টাকা ফেরত দেবে বলেছে।

মা-ঠাকুমা কেন, বর্ধমানের অনেকের কাছেই এখন প্রদীপনারায়ণ দত্তর পিন্‌ডি নাম জানা হয়ে গেছে। ঠাকুমা তো শুনে লাফিয়েই উঠল, দিয়ে দাও—দিয়ে দাও বউমা—পিন্‌ডি যখন বলেছে আর একটুও দ্বিধা রেখো না। আমার অমন ছেলে—মা একটা রাস্তা করবে না? এক্ষুনি তিনশো টাকা নিয়ে এসো—

মাও তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এগোতে আমি সাবধান করলাম, বাবার নামে পুজো—বাবা যেন কক্ষণো আগে না জানতে পারে—পিন্‌ডিদা বারণ করে দিয়েছে।

তিনশো টাকা এত সহজে হাতে আসবে ভাবি নি। টাকা নিয়ে ওই রাতেই পিন্‌ডিদার বাড়ি এলাম। টাকা নিয়ে গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা বলল, এখন যা—এখন থেকেই আমার অনেক কাজ।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ্ পিন্‌ডিদা আমাদের বাড়ি এলো। এক মুখ হাসি। বাবা তখন রোগী দেখতে বেরিয়েছে। তাকে দেখে মা-ঠাকুমাও শশব্যস্তে এগিয়ে এলো। পিন্‌ডিদা বলল, আজ সকালে পুজো হয়ে গেল, আপনারা আর কোনো দুশ্চিন্তা মাথায় রাখবেন না, আমার মনে হয় আজকালের মধ্যেই ফল বুঝতে পারবেন।

মা আর ঠাকুমার আনন্দ ধরে না কিন্তু অত আশা করতেও ভয়।

বাইরে এসে পিন্‌ডিদা বলল, আজ রাতে তুই বাড়িতে খাবি না বলে দিস, বিনোদের দোকানে আজ আমাদের গ্র্যাণ্ড ফিস্ট—হাঁ করে আছিস কি রে—মা কি আর নিজে প্রসাদ খায়? পুজোর প্রসাদ তো সব ভক্তরাই খায়—আমার বাড়িতে তো আর কিছু হবার জো নেই—সব বিনোদের দোকানে তুলে দিয়েছি—বিকেলে মাঠে আসিস, সেখান থেকে চলে যাব।

পিন্‌ডিদা চলে গেল। আমি বিস্ময়ে হাবুডুবু। মায়ের এমন কি প্রসাদ যা সকলের বাড়ি বাড়ি না দিয়ে বিনোদের দোকানে চালান দিল!

কিন্তু বিস্ময়ে আনন্দে আমি একেবারে দিশেহারা বিকেলে। সবে মাঠের দিকে পা বাড়াবো ভাবছি, দেখি বাবা আর তার উকীল ধূর্জটি ঘোষাল খুব হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। বাবার মুখে অন্তত এমন হাসি শীগগির দেখি নি। ঘরে পা দিয়েই জোর গলায় হাঁক দিল, কই গো, ধূর্জটিবাবু এসেছেন—খুব ভালো খবর আছে।

আনন্দে আমার বুকের ভিতরে ঢিপঢিপ। ওদিকে মায়ের পিছনে ঠাকুমাও ছুটে

বোধহয় কি, হানড্রেড পারসেণ্ট সিওর !

এসেছে। বাবা হেসে হেসে বলল, ধূর্জটিবাবু এক মস্ত সুখবর এনেছেন, আজ একটা ম্যাজিকই হয়ে গেল—আমি বোধহয় কেস-এ জিতেই গেলাম।

ধূর্জটি ঘোষাল বাধা দিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, বোধহয় কি, হানড্রেড পারসেণ্ট সিওর !

মা-ঠাকুমা দু'জনেই উদ্‌গ্রীব, তাদের পিছনে আমিও।

ধূর্জটি ঘোষাল যা বলে গেল, শুনে আমারও স্থানকাল ভুল। এ কি আজব কাণ্ড দেখালে পিন্‌ডিদা !

শুনলাম, বাবার কেস্ প্রায় শেষই হয়ে গেছে, বলতে গেলে কড়া সাব জজ সাহেবের শুধু রায় লিখতে বাকি। রায়ে বাবার হার যে নির্ঘাত তাতে বাবা আর ধূর্জটি ঘোষালের কোনো সন্দেহ ছিল না। সাব জজ সাহেব আজ বিকেল তিনটের সময়ে কোর্টে এসেছে। তার পরেই ভোজবাজীর ব্যাপার। এসে জজ সাহেব ধূর্জটি ঘোষালকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। তার থমথমে মুখ। ধূর্জটি ঘোষাল আগে তাকে কি বোঝাতে চেয়েছিল আর এই কেস সম্পর্কে সত্যি ব্যাপারটা কি, জজ সাহেব আদ্যোপান্ত

শুনতে চাইল। আর খুব মন দিয়ে আগাগোড়া শুনেও গেল। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, ওই স্কাউনড্রেল সাধন চট্টরাজের ওকালতির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত। বলল, এমন ধূর্ত লোকটা যে আমার মন বিষিয়ে রাখার জন্য একের পর এক কত আগে থেকে আপনার ডাক্তার ক্লায়েণ্টের এগেন্সট-এ বেনামী চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়ে গেছে! আজ সকালে একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটে গেছে, যার জন্য আমার সমস্ত কিছু নতুন করে ভাবতে হয়েছে—তারপর আমি বহু জায়গায় আপনার ডাক্তার ক্লায়েণ্টের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি—সকলেই খুব প্রশংসা করেছে—আর আমি কিনা একটা ঠগবাজের পাল্লায় পড়ে এমন অবিচার করতে যাচ্ছিলাম! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর আপনার ক্লায়েণ্টকেও নিশ্চিন্ত থাকতে বলুন, এর পর যা করার আমি করছি—কিন্তু আপনাদেরও চেস্টা করতে হবে 'বার' থেকে ওই ক্রিমিন্যাল উকীল লোকটাকে তাড়াতে।

ঠাকুমা একেবারে হাঁউমাউ করে উঠল, ওরে সোনা, ওই পিন্‌ডিকে ডাক্ একবার—ও-ই আমার গোপাল ঠাকুর—ওকে আমি পুজো করব—তুই ডেকে নিয়ে আয় ওকে!

বাবা আর ধূর্জটি ঘোষাল বিষম অবাক। বাবা মাকে জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার?

আনন্দে মায়ের চোখেও জল আসার দাখিল। জবাব দিল, প্রদীপের কথা বলছে—আজ সকালেই কোন্ মায়ের কাছে পুজো দিয়ে এসে বলেছিল, নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ কালের মধ্যেই ফল পাবেন।

বাবার দেব-দেবীতে বিশ্বাস নেই। তাই আমি বলে উঠলাম, আর পিন্‌ডিদা আমাদের বলেছিল, ফল না পেলে নাকে খত্ দেবে, আর আমাদের ফাণ্ড থেকে পুজোর তিনশো টাকাও ফেরত দেবে!

বাবা আর ধূর্জটি ঘোষাল হাঁ করে চেয়ে রইল খানিক। বাবা বলল, তিনশো টাকার পুজো! তোর মা দিয়েছে? আমি তো কিছু জানি না!

মা বলল, তোমাকে জানানো নিষেধ ছিল।

বাবা আর ধূর্জটি ঘোষাল খানিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর বাবা আমার দিকে ফিরল।—কি ব্যাপার রে?

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, পিন্‌ডিদা মায়ের পুজো দিয়েছিল শুনলে তো।

—কোন্ মায়ের?

আমি চুপ। বাবার কাছে মিছে কথা বলা যে কি শক্ত।

—কোন্ মায়ের পুজো বলছিস না কেন?

—মা উৎকোচেশ্বরীর। ফল যখন হয়েছে বলেই ফেললাম।

—উ-উৎকোচেশ্বরী! বাবা ধমকেই উঠল, কি বলছিস হাঁদার মতো? উৎকোচ মানে তো ঘুষ!

মহা ফ্যাসাদ—পিন্‌ডিদা বলেছে, শীতলার পুজো দিলে যেমন বসন্ত না হয়ে ফল ভালো হয়, আর মনসার পুজো দিলে যেমন সাপে কামড়ায় না, তেমনি ঠিকভাবে মা উৎকোচেশ্বরীর পুজো দিলেও ফল ভালো হয়। তাই তো হয়েছে।

আবার বাবাতে আর ধূর্জটি ঘোষালে মুখ চাওয়া-চাওয়ি।

বাবা গম্ভীর।—প্রদীপ কোথায়?

—ওরা সকলেই এখন মাঠে।

—আমার নাম করে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয়।

আমি পাঁইপাঁই করে ছুটলাম।

কিন্তু পিন্‌ডিদা শুনেই কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করে উঠল, আমার যে হার্টফেল হয়ে যাচ্ছে রে সোনা!

আমি আশ্বাস দিলাম, কিছু ভয় নেই—বাবা কেসে জিতেই গেছে ধরে নিতে পারো—ধূর্জটি কাকাও আছে—সক্কলে দারুণ খুশি তোমার ওপর!

—খুশি তো আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন! বল্ গে আমার হঠাৎ দারুণ জ্বর হয়েছে—আমি বাড়ি চলে গেছি।

—কি মুশকিল! বাবা ডাক্তার না, তক্ষুণি তোমাকে দেখতে ছুটবে না?

সকলে মিলে টানাটানি করে তাকে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকেই পিন্‌ডিদা বাবার পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম।

—থাক, থাক। কি ব্যাপার বলো তো, তুমি আজ সকালে কার পুজো দিয়ে বাড়িতে বলে গেছো কেসে আমি জিতবই—আর আজকের মধ্যেই বুঝতে পারব?

—আজকের মধ্যে বলি নি মেসোমশাই—আজকালের মধ্যে বলেছিলাম। পিন্‌ডিদার গলার স্বর কাঁদো কাঁদো।

—ওই হল···কার পুজো?

—শুনলে আপনি রেগে যাবেন মেসোমশাই।

বাবা অবাক, তুমি যা বলেছ, তাই হয়েছে, আমি রেগে যাব কেন? তার পরেই বাবার কি রকম সন্দেহ হল। গম্ভীর।—শোনো, আমি সোনার বাবা, তাই তোমারও গুরুজন, কোন রকম বাজে কথা না বলে ঠিক ঠিক বলো কি করেছ?

মিনমিন করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, ভেট নিয়ে গেছলাম মেসোমশাই···।

—ভেট!—মানে ঘুষ? কার কাছে?

ঘরের সক্কলে উদ্‌গ্রীব। কেবলুর গলা দিয়ে একটা সংস্কৃত গোছের শব্দ বেরিয়ে এলো, ই···ই···ং!

পিন্‌ডিদা জবাব দিল, ওই জজ সাহেবের কাছে।

—হোয়াট! ধূর্জটি ঘোষাল লাফিয়ে উঠল—ওই সাব জজ ঘুষ ছোঁবে—ইম্‌পসিব্‌ল!

পিন্‌ডিদা সবিনয়ে জবাব দিল, ছোঁয় নি তো। আমাকে আর যে লোকের মাথায় চাপিয়ে সব নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল।

আমরা সকলে হতভম্ব। বাবা জিগ্যেস করল, তাহলে?

পিন্‌ডিদা বলল, আমি শুনেছিলাম ওই জজ সাহেব ঘুষ শুনলে তার পাঁচশো ব্লাড প্রেসার চড়ে যায়—তাই কার্ডে সুন্দর করে লিখে সাধন চট্টরাজের নামে ভেট নিয়ে

গেছলাম—মুখে বলেছিলাম, তিনি আপনার কাছে চিরঋণী তাই আপনাকে এই সামান্য জিনিস ক'টা পাঠিয়ে কৃতার্থ হতে চেয়েছেন।

ঘরসুদ্ধু লোক নির্বাক, হতভম্ব, বিমূঢ়। বুঝতেও সময় লাগছে।

সর্বপ্রথম ধূর্জটি ঘোষালের ঘর ফাটানো অট্টহাসি। ফলে সকলেই আত্মস্থ। বাবা হেসেই বলল, হাসছেন বটে, কিন্তু এ ছেলে তো একেবারে ডাকাত!

সাধন চট্টরাজ বলে উঠল, যে ডাকাতিতে সত্যের অনুসন্ধান হয় আমার তাতে আপত্তি নেই।

বাবা আর চেষ্টা করেও তেমন গম্ভীর থাকতে পারছে না—তুমি তিনশো টাকার কি ভেট নিয়ে গিয়েছিলে?

আমতা আমতা করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, একশ টাকা দিয়ে একটা পাঁচ কেজি রুই, ষাট টাকার তিনটে ড্রেসড্ ব্রয়লার মুরগি, নব্বুই টাকার সন্দেশ আর রাজভোগ··· দশ টাকার ফুল···আর···আর···

—আর কি?

—ইয়ে, আর চল্লিশ টাকার একটা ছোট বোতল।

—বোতল! কিসের বোতল?

—হু—হুইস্কির।

ঘরের সকলে আর এক দফা তাজ্জব! বাবা এবার সত্যি গম্ভীর—সে সব কি করেছ?

—আজ্ঞে মাছ মাংস টাংস সব বিনোদের দোকানে দিয়ে এসেছি, রাতে ফিস্ট হবে—তাছাড়া তার ফ্রিজ আছে। আর হুইস্কির বোতলটা পাঁচ টাকা কম নিয়ে আবার সেই দোকানেই ফেরত দিয়ে এসেছি, বাকি পঁয়ত্রিশ টাকা ব্যাঙ্কে আমাদের ফাণ্ডে জমা করে দিয়েছি।

আমাদের দলের সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কারণ বাবাও আর হাসি চাপতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদা এগিয়ে এসে আর এক দফা বাবার পায়ের ধুলো নিল।

ধূর্জটি ঘোষাল তখনও বেদম হাসছে।

বাবা বলল, শোনো প্রদীপ, আমি কিন্তু তোমার ওপর রেগেও গেছি। যদি প্রতিজ্ঞা করো আর এমন দুঃসাহসের কাজ করবে না, তাহলে কেস এর রায় বেরুলে আমি তোমাদের ফাণ্ডে আরো এক হাজার টাকা দেব।

পিন্‌ডিদা তক্ষুণি নিজের দুই কান মুললো—এই প্রতিজ্ঞা করলাম মেশোমশাই। চল রে সোনা, ওদিকে বিনোদটা কি করছে—

সবার আগে পিন্‌ডিদা ঘর ছেড়ে উঠোনে নামল। পিছন থেকে বিগলিত ঠাকুমা বলে উঠল, ও পিন্‌ডি, গোপাল আমার, সামনের রোববারের দুপুরে তোমাদের সক্কলের এখানে নেমন্তন্ন রইল।

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা ফিরে এসে ঠাকুমা আর মায়ের পায়ের ধুলো নিয়েই আবার সবার আগে হনহন করে এগিয়ে চলল।

নক্ষত্র লোকের প্রহরী

—অদ্রীশ বর্ধন

তার জ্বলন্ত চাহনি আজও যেন আমি দেখতে পাই।

গনগনে স্থিরচোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে সে বলেছিল—"অবিনাশ, তোমার বড় অহংকার।"

আমি বলেছিলাম—"এই কথাটা বলার জন্যেই কি আজ ডেকে এনেছো?"

সে বললে—"তোমার অহংকার চূর্ণ করার জন্যে ডেকে এনেছি। তুমি বড় বৈজ্ঞানিক। আমাকে তুমি ছোট বৈজ্ঞানিক মনে করো, তোমার সমতুল্য বলে মনে করো না। হয়তো তোমার পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে একই ক্লাসে একই কলেজে একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এসেছি। বরাবর তুমি হয়েছো ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড। তোমার মধ্যে এই দেমাক তাই স্বাভাবিক কারণেই এসেছে। আমাকে তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেই মনে করেছো।"

আমি বললাম—"এসব কথা এতদিন পরে তোমার মনে জাগছে দেখে অবাক হচ্ছি। পড়াশুনার প্রতিযোগিতা চিরকালই করে এসেছি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই প্রতিযোগিতা থেমে থাকে নি—থাকবেও না। তুমিও বিদেশে গেছো, আমিও গেছি। জয়ের মুকুট সেখানেও আমি পেয়েছি। সেটা কি আমার অপরাধ?"

সে বললে—"তুমি টেকনোলজির বর্মতে মুড়ে রেখেছো নিজেকে—শামুকের মত খোলার মধ্যে বন্দী হয়ে আছো। তোমার চোখ খুলে দেওয়া দরকার।"

"তোমার এই অভিমত নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে আমার কাছে। এই বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিতর্ক এর আগে তো ঘটে নি।"

সে বললে—"বারবার তুমি আমাকে আক্রমণ করেছো তোমার জ্ঞান দিয়ে। বারবার তুমি প্রমাণ করতে চেয়েছো, তোমার জ্ঞানের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীতে।"

বিদ্রূপের স্বরে আমি বললাম—"আমার জ্ঞান বোলো না। বলো, বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যার অস্তিত্ব স্বীকার করে না—আমি তা মানি না। যেমন ধরো, তুমি বলেছিলে, বুধ গ্রহের অসম গতির মূল আর একটা ছোট গ্রহ—যে গ্রহ রয়েছে বুধ গ্রহের চাইতে সূর্যের কাছে। তুমি তার নামকরণও করেছিলে—ভলকান। আমি প্রমাণ করে দিয়েছিলাম, তোমার থিওরি ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কাছে তোমার অনুমিতি ধোপে টেঁকে নি।"

শুনে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেল তার। গলা কাঁপতে লাগল। গালের মাংসপেশী কাঁপতে লাগল। বললে গলা চড়িয়ে—"ঠিক এইভাবেই তুমি আমার আর একটা অনুমিতি অমূলক প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছো।"

আমি বললাম—"তা তো লাগবই। তুমি প্রমাণ করতে চাও সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্ আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে—পরমাণুর চাইতেও ছোট এই বস্তুকণার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ কিন্তু হাজির করতে পারো নি।"

সে বললে জ্বলন্ত চাহনিকে আরো জ্বলন্ত করে—"সেই জন্যেই আজ তোমাকে ডেকে এনেছি।"

আমি আবার একটু ব্যঙ্গের সুরে বললাম—"এইখানে—এই ঘরে তুমি প্রমাণ করবে সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্‌য়ের অস্তিত্ব? বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তো কিছু দেখছি না। সাদামাটা একটা গেরস্ত ঘর, ঐ তো একটা ক্যাম্পখাট। একটা মাত্র টেবিল। ঘরের কোণে স্টোভে ওটা কি ফুটোচ্ছো? খিচুড়ি? নিজের হাতে রেঁধে খাও? একলা থাকো এই একখানা ঘরে? কিছু বই আর ঐ বড় আলমারিটা ছাড়া তোমার ঘরে আর কোনো সরঞ্জাম আছে বলে তো মনে হয় না। পাশের ঘরটা বোধ হয় গুদোম ঘর। ঐখানে নিশ্চয় তোমার ল্যাবোরেটরী নেই।"

সে বললে—"বিদ্রূপ তোমার শক্তির হাতিয়ার। বিদ্রূপ করেই তুমি বরাবর আমাকে ছোট প্রমাণিত করে এসেছো। তোমার বিদ্রূপের জ্বালা সইতে না পেরেই আজ আমি লোকালয় থেকে পালিয়ে এসে সন্ন্যাসীর মত নিরালায় থাকি। তুমি ভাবছো, রণে ভঙ্গ দিয়ে এখানে রয়েছি। অবিনাশ, তোমার এই ভুল ধারণা ভাঙবার জন্যেই আজ তোমায় এখানে ডেকে এনেছি। আমি সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্‌য়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করব এই ঘরেই—তার জন্যে কোনো সরঞ্জামের দরকার হবে না—কোনোদিনই হয় নি।"

আমি বললাম—"তুমি বোধ হয় এটুকু অন্ততঃ জানো, আমি বড় ব্যস্ত। নেহাত

বাল্যবন্ধু বলে তোমার কথা রাখতে এসেছি। আমার পক্ষে এভাবে অবান্তর কথা শোনা সম্ভব নয়।"

সে বললে—"কিন্তু তোমাকে এত সহজে আমি ছাড়ছি না।"

আমি বললাম—"আমি জানি, জীবনের আঘাত তোমার হৃৎপিণ্ডকে দুর্বল করে তুলেছে—তুমি সম্প্রতি ই-সি-জি করিয়ে দেখেছো তোমার ব্লাডকোলেসটেরল অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, তোমার হার্ট আগের মত সুস্থ সবল আর নয়। তোমার কথাবার্তা চোখ-মুখ তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই তোমার ভালর জন্যই বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও।"

সে বলল অস্বাভাবিক গলায়—"না।"

"তুমি বড় উত্তেজিত হয়েছো, তোমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, কূট তর্কের অবসান অস্থির মস্তিষ্কে সম্ভব নয়—অসম্ভবকে সম্ভব করা তো নয়ই। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নিশ্চয় বসব, কিন্তু আজ এ অবস্থায় নয়।"

সে বলল—"আজ এই অবস্থাতেই তোমার কাছে যা অসম্ভব, আমার কাছে তা কতখানি সম্ভব, তা প্রমাণ করব। তুমি তোমার পাঁচটা ইন্দ্রিয়র ওপর বড় বেশী আস্থাবান। তুমি বিশ্বাস করো, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়র বাইরে আর কোনো ইান্দ্রয় নেই। তাই জগতের বহু বিষয় আজও তোমার কাছে অজ্ঞাত। সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্‌য়ের অস্তিত্ব তাই তোমার কাছে একটা অলীক কল্পনা মাত্র।"

আমি বললাম—"তুমি যদি অকাল্ট সায়ান্টিস্ট হতে, সাগ্রহে তোমার বক্তৃতা শুনতাম। কিন্তু তুমি তো তা নও। ইলেকট্রনিকস্ আর জেনেটিক্সে তোমার মত বড় বিজ্ঞানী ওয়ার্ল্ডে খুব কম আছে। জাপানে এত বছর এই সম্পর্কেই কি সব কাজ করছিলে। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থেকে তোমার মস্তিষ্ক দেখছি আর সুস্থও নয়।"

সে বললে—"তোমার বিদ্রূপ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে অবিনাশ। আমাকে পাগল বলেছো এর আগেও—আমার আড়ালে। আজ বললে আমার সামনে। তাই হেস্তনেস্ত করার জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি।"

ঘড়ি দেখে বললাম—"কি হেস্তনেস্ত করতে চাও?"

সে বললে—"সময় দেখবার জন্যে ঘড়ির দিকে তাকাবার কোনো দরকার ছিল না। জানলা দিয়ে ঐ দেখো চাঁদ উঠছে। পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো কত সুন্দর দেখেছো? বাতাসে রাতের ফুলের গন্ধ পাচ্ছো না? ভিজে মাটি আর পচা ঘাসের সুবাস পাচ্ছো না? রাতের পোকাদের হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছো না?"

আমি বললাম—"একটা পেঁচার ডাক এইমাত্র শুনলাম বটে। এমন রাতে অলুক্ষুণে ডাকটা শুনে গা-টা যতটা না সিরসির করছে, তার চাইতেও বেশী করছে তোমার কথা বলার ঢং-টা দেখে। অন্য সময় হলে বলতাম, তুমি বিজ্ঞান ছেড়ে কাব্যসাধনা আরম্ভ করেছো। কিন্তু এখন তা বলতে পারছি না। প্রকৃতির ওপর তোমার এই হঠাৎ অনুরাগের মূলে কি কারণ থাকতে পারে জানি না, ভাববার চেষ্টা করছি—অকাল্ট সায়ান্স নয় তো?"

জানলা দিয়ে ঐ দেখো চাঁদ উঠছে। [পৃঃ ২২৭

সে বললে—"পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই চোখ বন্ধ করে সত্যানুসন্ধান করে—তাই তাদের প্রগতি এত মন্থর। প্রকৃতিকে অনুসরণ করো অবিনাশ—চোখ খুলে ভাল করে ছ্যাখো—বিজ্ঞান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কল্পনাও করতে পারবে না।"

"তোমার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই। আমি উঠি।"

সে গর্জে উঠল—"খবরদার। ঐখানে বসে থাকো। বিজ্ঞানের প্রগতি তোমার ল্যাবোরেটরীতে নেই—আছে প্রকৃতির মধ্যে। সাব-অ্যাটমিক বস্তুকণার প্রমাণ আসবে এই শূন্যতার মধ্যে থেকেই—যে শূন্যতার মধ্যে অসংখ্য জগৎ, অগণিত বিস্ময় লুকিয়ে আছে। অসীম অনন্ত সেই রহস্যের কিছুটা আজ তোমার সামনে খুলে ধরব।"

আমি নাচার হয়ে বললাম—"যা করবে, তাড়াতাড়ি করো।"

সে বললে—"তুমি আমার অনেক খবরই রাখো। জাপানে আমি বহু বছর ইলেকট্রনিক্স আর জেনেটিক্স নিয়ে গবেষণা করেছি। ওরা চোখ খোলা মানুষ—ঐ জাপানীরা। প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের বহু অজ্ঞাত অব্যাখ্যাত রহস্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল দেখে তাই তোমার মত আমাকে বিদ্রূপ করে নি, আমাকে মদত দিয়েছে। তুমি তো জানো, রোবট উৎপাদনে জাপান আজ পৃথিবীতে অগ্রণী দেশ। আমি ছিলাম সেই রোবট গবেষণায়—এমন এক রোবট গড়তে চেয়েছিলাম যা মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে। মানুষ তো প্রকৃতির এক অসহায় জীব। নিজের শরীরের কোনো ত্রুটি ঘটলে নিজে সারিয়ে নিতে পারে না। তোমার নিজের ওপরেই তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, পা জখম হলে দৌড়োও ডাক্তারের কাছে, সমুদ্রের তলায় নামবার দরকার হলে অ্যাকুয়ালাঙের দরকার হয়। ম্যারাথন দৌড় দৌড়ে এসে জিভ বার করে কুকুরের মত হাঁপাও—শরীরের অসম্পূর্ণতার জন্যে মানিয়ে নিতে পারো না। কল্পনার সঙ্গে আবিষ্কার মিশিয়ে এমন এক ভবিষ্যতের রোবট তৈরী করতে চেয়েছিলাম যে হবে আজকের এই অশক্ত অপটু দুর্বল মানুষের প্রভু।"

আমি বললাম—"সর্বনাশ! এই জন্যেই জেনেটিক্সের গবেষণায় যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনি পইপই করে বারণ করেছিলেন দানবে দানবে পৃথিবী ছেয়ে যাবে, যদি জেনেটিক্স নিয়ে লাগাম ছাড়া গবেষণা চলতে থাকে। যাক সে কথা, তোমার গবেষণা সফল হয়েছে? না, আবার ভুল করেছো?"

সে বললে—"বিদ্রূপ করার সময় হয়ত আর নাও পেতে পারো, অবিনাশ। তাই যত পারো বিদ্রূপ করে নাও। রোবট আমি গড়েছিলাম। সে এক আশ্চর্য রোবট। নিজেই নিজেকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই রোবটের ওপর খবরদারি করা আমার সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াল একদিন। লক্ষ্য করলাম, আমি যে ইলেকট্রনিক সার্কিট অনুসারে তাকে গড়েছিলাম, সে তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই নতুন ইলেকট্রনিক জটাজাল আমার অচেনা। তারপরেই তার ক্ষমতার পরিচয় পেলাম। অবাক হলাম তার দৃষ্টিশক্তি দেখে। আমাদের কাছের এই জগৎ—যা আমাদের কাছে অদৃশ্য, তা তার কাছে যেমন দৃশ্যমান, ঠিক তেমনি লক্ষ কোটি মাইল দূরের অসীম মহাশূন্যের নক্ষত্রলোকের বিস্ময়ও তার চোখে সুস্পষ্ট।"

আমি হেসে বললাম—"রাশিয়া আমেরিকা ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বহু বড় বৈজ্ঞানিক আজকাল কল্প বিজ্ঞান লিখছেন এবং বেশ ভালই লিখছেন। তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। ভাল লাইন ধরেছো। সস্তায় খ্যাতি পেয়ে যাবে অতি সহজেই।"

দাঁত কিড়মিড় করে সে বললে—"হ্যাঁ, তোমাকে ছাড়িয়ে যাবো। তোমার ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়র জগৎটার ওপারে বিশাল অদৃশ্য জগৎটাকে দৃশ্যমান করে তোলার খ্যাতি শুধু আমারই প্রাপ্য—বাবুন কথা দিয়েছে, খ্যাতির কোনো লোভ তার নেই।"

"বাবুন বুঝি তোমার নতুন রোবটের নাম?"

"হ্যাঁ। সে এখানেই আছে।"

উঠে দাঁড়ালাম আমি—"কোথায়?"

"ঐ আলমারির মধ্যে। জাপান থেকে যখন আসি, আমার সমস্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুধু তাকে নিয়ে এসেছি—শুধু তোমার চোখ খুলিয়ে দেব বলে।"

বলে সে উঠে গিয়ে আলমারির পাল্লা দু' হাট করে খুলে দিল।

ভেতরে কোনো তাক নেই। আসলে একটা বড় বাক্স। কফিনের সাইজের বাক্স। খাড়া করে দাঁড় করানো। ভেতরে সটান দাঁড়িয়ে আছে একটা কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি। রোবট নিঃসন্দেহে। কিন্তু অবিকল মানুষের মত দেখতে। হঠাৎ দেখলে ভ্রম হয়। তারপরেই ভ্রান্তি কেটে যায় বুক আর পেটজোড়া একটা স্ক্রীন দেখলে। টি. ভি. স্ক্রীনের মত ঘসা কাচের একটা বড় স্ক্রীন। মূর্তিটা নিরাবরণ। মানুষের পরিচ্ছদ নেই শ্রীঅঙ্গে।

হ্যারিকেনের আলোয় তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল মূর্তিটা নিষ্প্রাণ রোবট নয়—প্রাণময় মনুষ্য। কেন না, তার চোখের কোটরে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ দেখলাম। সে স্ফুলিঙ্গ নীলাভ—অমানবিক।

বসে পড়লাম। বললাম—"ও কি আমাদের কথা শুনেছে?"

সে বললে—"হ্যাঁ। এবং রেগেছে। ওর চোখের চাহনি আমি চিনি। তোমার দম্ভ আর সীমাহীন অজ্ঞতা ওকে শোনাবো বলেই তোমাকে এতক্ষণ ওর উপস্থিতির কথা বলি নি। প্রাণের আশ মিটিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করে ওকে আরও রাগিয়ে দিয়েছো। ও অকৃতজ্ঞ নয়—স্রষ্টার লাঞ্ছনা ও সহ্য করে না।"

আমি শুধু বললাম—"ও যে অদৃশ্য জগৎ দেখতে পায়, তার প্রমাণ?"

সে বললে—"শুধু দেখতে পায় না, দেখাতেও পারে। কিন্তু তুমি কি তা সহ্য করতে পারবে?"

"কেন সহ্য করতে পারব না?"

"অবিনাশ, এতক্ষণে তোমার গলায় অকৃত্রিম কৌতূহল প্রকাশ পেল। মনে হচ্ছে, আমার আবিষ্কারকে সম্মান দেওয়ার মত মন তোমার প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু বড় দেরী করে ফেলেছো, বাবুন কিছু ভোলে না। তাই পরমাণু জগতের চাইতেও সূক্ষ্ম বস্তুকণায় গড়া জগৎটা তোমাকে দেখিয়ে হয়তো তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতাও কেড়ে নিতে পারে।"

আমি বললাম—"ভয় নেই। পঞ্চাশ পেরোনোর পর থেকে নিয়মিত কার্ডিওলজিস্টকে দিয়ে হার্ট চেক-আপ করাই। আমার হার্ট তোমার চাইতেও সবল—নার্ভও। তোমার মত আঙুল কাঁপছে না, মুখের মাংসপেশীও কাঁপছে না। ভয় তুমি পেয়েছো। কিন্তু কিসের ভয়?"

সে বললে—"ইথারের মধ্যে যে যে সূক্ষ্মদেহীরা আছে, তাদের আভাসটুকুও দেখলে তোমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হবে অবিনাশ। তারপর যখন দেখবে দূর নক্ষত্রলোকের বাসিন্দাদের কল্পনাতীত কাণ্ডকারখানা, আত্মা আর ঐ দেহের খাঁচায় থাকবে না।"

আমি বললাম—"আমি যে বৈজ্ঞানিক, সে কথাটা সবিনয়ে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিস্ময় সৃষ্টি করা এবং বিস্ময় প্রত্যক্ষ করাই আমার কাজ।"

হিংস্র নেকড়ের মত চাপা গজরানির সুরে সে বললে—"তাহলে দেখো আগে কাছের জগৎকে।—বাবুন!"

আচম্বিতে তীব্রতর হল বাবুনের নীলাভ চক্ষুর দীপ্তি। একই সঙ্গে ঘন বেগনী আভায় প্রদীপ্ত হল তার বুক আর পেটের স্ক্রীন। গাঢ় বর্ণের মধ্যে অনেকগুলো ছায়ামায়ার কুণ্ডলী পাকানো আবর্ত রচনা দেখলাম, সুস্পষ্ট কিছু বুঝলাম না—কিন্তু অজান্তেই আমার প্রতিটি লোমকূপ শিহরিত হল অব্যাখ্যাত এক আতঙ্ক-অনুভূতিতে। অনুভূতিটা জাগ্রত হল আচমকা—জানি না তা ক্ষণপূর্বে শোনা ঘোর চাপা গজরানির প্রভাবে কিনা। যেন মনে হল, অন্ধকারের বিভীষিকারা পুঞ্জিত হচ্ছে ঐ বেগনী পর্দায়। যে কোনো মুহূর্তে দুঃস্বপ্নেরও অতীত বিকট রূপ পরিগ্রহ করে তারা আমার জ্ঞানবুদ্ধি চেতনার শেকড় পর্যন্ত উপড়িয়ে ফেলে দিতে পারে। সেই সঙ্গে জাগ্রত হল আর একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি—না, না—উপলব্ধি। যেন প্রতিটি কোষ দিয়ে উপলব্ধি করলাম, আমার চারদিকে কারা যেন জড়ো হচ্ছে···ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে কারা যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাতাসের ওপরে পা ফেলে ফেলে আমার নিকটবর্তী হচ্ছে···তারা আসছে শুধু ঘরের নিরন্ধ্র তমিস্রা ভেদ করেই নয়···আসছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিথর মাঠ-বন-প্রান্তরের ওপর দিয়ে···জলাভূমির পুঞ্জীভূত কুহেলীর আকার নিয়ে···তারা আসছে···আসছে

…আসছে…তাদের অগ্রসর সমাচার ঘোষিত হচ্ছে বনভূমির পত্রমর্মর এবং সহসা উচ্ছ্বসিত আরণ্যক দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে…

আমি সভয়ে শিহরিত রোমকূপে চাইলাম আমার পাশে উপবিষ্ট ঈর্ষা-কাতর উন্মাদ বন্ধুর পানে। যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রবোধ দিয়ে বোঝাতে প্রয়াস পেলাম, এ নিশ্চয় তার বাক্য-জালের সূক্ষ্ম প্রভাব…তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আজকের সম্মেলনের শেষে দুষ্পাচ্য গুরুভোজের প্রতিক্রিয়া…

বন্ধুটি নিবিষ্ট কিন্তু বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল শবাধার-সম কাঠের বাক্সটার ভেতর দিকে—যেখানে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে গড়া নিরাবরণ কলের পুতুলটা। তার বুকের পর্দায় রঙের খেলা তখন ঘোর হতে ঘোরতর আকার ধারণ করছে। অনেক স্ফুলিঙ্গ…অনেক দংষ্ট্রা…অনেক তির্যক রশ্মিরেখা অবিশ্বাস্য বেগে আসছে যাচ্ছে…একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল আমার মস্তিষ্কের অণু-পরমাণুর মধ্যে…

কারা যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার নিকটবর্তী হচ্ছে। [পৃঃ ২৩০

সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—"ঢের হয়েছে। তোমার ভি.ডি.ও. গেম দেখবার জন্যে এতদূর না এলেও চলত—এক টাকা দিয়ে এসপ্ল্যানেডেই দেখতে পেতাম।"

খপ্ করে আমার বাহু আঁকড়ে ধরে সে বলল—"যাচ্ছ কোথায়? এই তো শুরু।"

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম আমি। তাল সামলাতে না পেরে সে ছিটকে গেল জ্বলন্ত স্টোভের ওপর—উল্টে গেল স্টোভ।

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে—"বাবুন!"

কফিন-বাক্সের মধ্যে থেকে এক পা বেরিয়ে এল বিদঘুটে মূর্তিটা।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে। আচমকা একটা ফ্ল্যাশ দেখা গেল। যেন

জানলার মধ্যে দিয়ে আলোক ঝলকটা একরাশ জমাট জ্যোৎস্নালোক নয়ে ধেয়ে এসেই আছড়ে পড়ল চলমান মূর্তিটার ওপর।

নিমেষ মধ্যে তার বুক পেটের স্ক্রীনের বিভীষিকালোক অদৃশ্য হল—তার জায়গায় আবির্ভূত হল মহাকাশ···অগণিত নক্ষত্র···আর একটা বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জ···আমার অতি পরিচিত!

কলের মানুষ কি বিস্মিত হতে পারে? কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার সেই রকমই মনে হল। বিষম বিস্ময়ে যেন একটা অদৃশ্য ধাক্কায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়ে বিদঘুটে মূর্তিটা আড়ষ্ট ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জানলা দিয়ে বাইরে।

সরু পেন্সিলের চাইতেও সরু একটা আলোকরশ্মি ধেয়ে এল জানলা দিয়ে··· উজ্জ্বল সবুজ পান্নার মতই সেই আলোকরশ্মির উৎস পলকের জন্য চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম···জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ ভেদ করে অনেক উঁচু থেকে নামছে সেই আশ্চর্য আলোকরশ্মি—আসছে সেইদিক থেকে—যেদিকে রয়েছে আমার সুপরিচিত সেই নক্ষত্রমণ্ডলী—যার ছবি এইমাত্র প্রতিভাত হয়েছে রোবটের বুকের পর্দায়···

অমানুষিক গর্জন শুনে দৃষ্টি ফিরে এসেছিল ঘরের মধ্যে। আলোক-শর স্পর্শ করে রয়েছে বাবুনকে···স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে স্পর্শকেন্দ্র থেকে।

আর কিছু দেখি নি আমি—দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি নি। রক্ত জমানো চিৎকারের পর চিৎকার ছেড়ে উন্মাদের মত ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম আমি। আসবার সময়ে দেখেছিলাম, মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে আমার হার্ট-উইক বন্ধুটি—ধাক্কার সংঘাত বোধহয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি দুর্বল হৃৎপিণ্ড—স্টোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পরিধেয় বস্ত্রে···

পরের দিন পোড়া ঘরটার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল কেবল একটা দগ্ধ নরদেহ··· আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিস্তর যন্ত্রাংশ!

হাসিমারায় হাঁস শিকার

যাদুকর এ. সি. সরকার

ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে
মেজো মামা হাসিমারা,
প্ল্যান করে কোন ভাবে,
যাবে উড়ো হাঁসই মারা।

গায়েতে লাগে না গুলি,
উড়ে যায় হাঁসগুলি।
তাই দেখে করে সুরু,
প্রাণ খুলে হাসি মা-রা!

একটি আবিষ্কারের কাহিনী

অরিকল্
ভেন্ট্রিকল্

—ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

শরীরের মধ্যে কীভাবে রক্ত চলাচল হয়, আজ প্রায় সকলের কাছেই সোজা, কিন্তু বহুদিন ধরেই লোকের ধারণা ছিল, বুকের মাঝখানে একটা ছাকনি আছে, সেই ছাকনির ভেতর দিয়ে রক্ত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যায় এবং ছাকনির ভেতর দিয়ে যাবার সময় রক্ত পরিষ্কার হয়ে যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে বহু জ্ঞানীগুণী রক্ত চলাচলের আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রিয়ালডো কলম্বাস, মাইকেল সরিভেটাস, হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস এবং আন্দ্রেঁ সিসালপিনো। ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হারভে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত আসে শরীরের নানা জায়গা থেকে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যায় ফুসফুসে। সেখানে ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেনের সাহায্যে রক্ত পরিস্কৃত হয়, তারপর আবার ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে। হৃৎপিণ্ড পাম্প করে সেই রক্ত শরীরের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেয়, তারপর আবার ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে। এই ভাবে ক্রমাগত পাম্প করে চলেছে হৃৎপিণ্ড।

উইলিয়াম হারভের জন্ম দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের ফোকস্টোন গ্রামে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে। ক্যাণ্টারবেরী এবং কেমব্রিজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে পাডুয়ায় গমন করেন মেডিসিন

(১) (২) (৩) (৪)
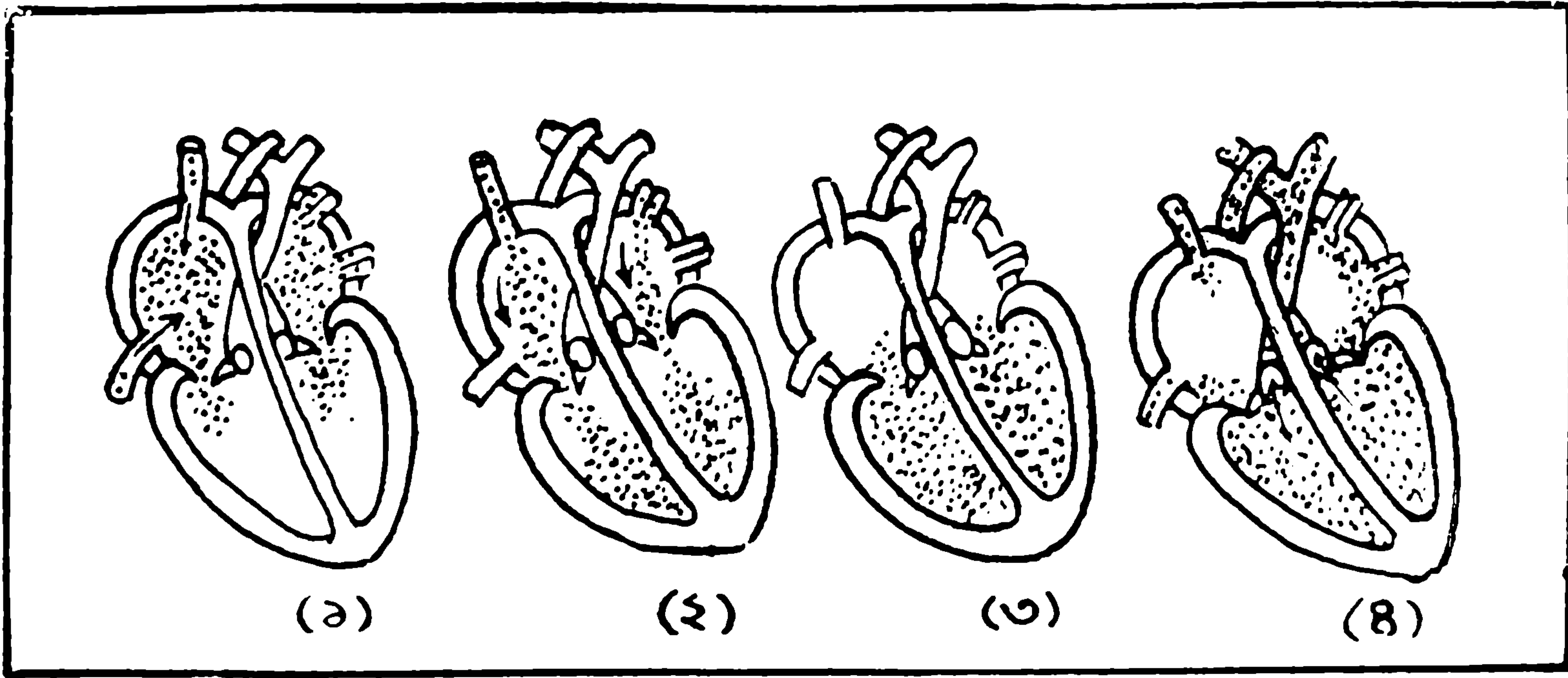
শিক্ষা গ্রহণের জন্য। পাডুয়ায় হারভের মাস্টারমশায় ছিলেন হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস, যিনি অ্যানাটমি ও ফিজিওলজিতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। হারভে পাডুয়া থেকে ইটালিতে যান এবং গ্রেট ইটালিয়ান ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে হারভে ইটালি থেকে ডাক্তারী পাস করে আবার পাডুয়ায় ফিরে এলেন। সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে হারভে চাকরি নিলেন এবং রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান-এর লেকচারার হলেন। কিছুদিন পরে উইলিয়াম হারভে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লস-এর চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময় রাজসভা থেকে হারভেকে একটি অদ্ভুত ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে কাউকে ডাইনী বা ডাইনীর সহচরী বলে সন্দেহ করলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত হারভের কাছে। হারভের ওপর নির্দেশ ছিল, যাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের গায়ে কোন পোড়া বা ঘায়ের দাগ আছে কি না লক্ষ্য করা। দাগ থাকলে তাকে ডাইনী বলে ঘোষণা করা হত। হারভে যতদিন পরীক্ষা করেছেন, একজনের গায়েও কোন কাটা দাগ দেখতে পান নি বলে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। হারভের সময়ে একজনকেও ডাইনীর অপরাধে শাস্তি পেতে হয় নি।

হারভে তাঁর চিকিৎসাকার্যের মধ্যেই রক্ত চলাচল কি করে হয়, সে বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা শুরু করলেন। শূকর, ভেড়া, কুকুর, ব্যাঙ, সাপ, বাণ মাছ, ছোট ছোট মাছ, কাঁকড়া, শাঁখ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখলেন, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে আর্টারির (Artery) ভেতর দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর আবার ভেন্ (Vein)-এর ভেতর দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে।

হারভে আবিষ্কার করলেন, হৃৎপিণ্ড একটি মাংসপেশীর গ্রন্থি। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চারটে খোপ আছে। ওপরের খোপ দুটির নাম অরিক্ল্ (Auricle), নীচের খোপ দুটির নাম ভেন্ট্রিক্ল্ (Ventricle), হৃৎপিণ্ড যখন স্ফীত হয় (Diastole), তখন ডান দিকের অরিক্লে রক্ত আসে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আর বামদিকের অরিক্লে

রক্ত আসে ফুসফুস থেকে। বাম অরিক্‌ল থেকে রক্ত ডান অরিক্‌লে যেতে পারে না, মাঝখানে পার্টিশন আছে। অরিক্‌ল থেকে রক্ত ভেন্টি্রক্‌লে চলে যায়। অরিক্‌ল এবং ভেন্টি্রক্‌লের মাঝখানে ভালবের পার্টিশন আছে। রক্ত একবার পার্টিশনের এপারে চলে এলে আর ওপারে ফিরে যেতে পারে না। রক্ত অরিক্‌ল থেকে ভেন্টি্রক্‌ল-এ আসে। আবার যেই হৃৎপিণ্ডের সংকোচন (Systole) ঘটে, বাম ভেন্টি্রক্‌ল থেকে রক্ত এয়োর্টার (Aorta) মধ্যে দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আর ডান ভেন্টি্রক্‌ল থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে চলে যায়। হারভে আবিষ্কার করেন আর্টারীর মাঝে মাঝে ভালব আছে, সেইজন্যে আর্টারির মধ্যে রক্ত প্রবেশ করলে, সে রক্ত পেছন দিকে আর ফিরে আসতে পারে না, সে রক্তকে সামনের দিকেই যেতে হয় এবং ভেনের ভেতর দিয়ে আবার অরিক্‌লে ফিরে আসে।

হারভের আবিষ্কারের খানিকটা বাকি থেকে গিয়েছিল, কারণ হারভের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। শিরা-উপশিরাগুলি ক্ষুদ্র হতে হতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শেষ সীমায় এসে যেখানে ভেনের সঙ্গে আর্টারির যুক্ত হয়, (Capillaries), সেই জায়গায় কি হয় সে কথা হারভে আবিষ্কার করতে পারেন নি। হারভে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারেন নি। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ফুসফুসে গিয়ে কী হয়, এ কথা হারভে বুঝতে পারেন নি। হারভেরও ধারণা ছিল, অ্যারিসটটল-এর মত, সে রক্ত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে ঠাণ্ডা হয়, তারপর ঠাণ্ডা রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে।

হারভের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী একটা ধারণা ছিল, খুব মিহি একটা ছাঁকনি আছে বুকের মাঝখানে। সেই ছাকনির ডান দিক থেকে যখন বাঁ দিকে রক্ত যায়, তখন রক্ত পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কোন ভাইটাল স্পিরিট (pneuma) এই রক্ত পরিচালনা করে থাকে। গ্যালেন (Galen)-এর সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বিচিত্র চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেছিলেন কি জন্যে, সে কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

হারভেও এক সময়ে বলেছিলেন, আমি ফ্রাকাস্টোরোর মত প্রথমে ভেবেছিলাম, হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি নির্ধারণ করেন স্বয়ং ভগবান।

উইলিয়াম হারভে প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লস-এর চিকিৎসক নিযুক্ত হন কিন্তু এই সময় ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। হারভে প্রথম চার্লস-এর সঙ্গে লণ্ডন ছেড়ে অক্সফোর্ডে পালিয়ে যান, এই সময়ে হারভের লণ্ডনের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর গবেষণার কাগজপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়।

কথিত আছে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এজহিল যুদ্ধের সময় একটি ঘরের খাটের তলায় বসে বই পড়ছিলেন। যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষ চলে যায়, তখন খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে আহত মানুষদের চিকিৎসা করেন।

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লস-এর মৃত্যুদণ্ড হবার পর উইলিয়াম হারভে লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং তারপর সারা জীবন লণ্ডনেই ছিলেন। উইলিয়াম হারভে প্রাইভেট প্রাকটিসে

অসাধারণ নাম করেছিলেন। ফ্রান্সিস বেকন-এর মত খ্যাতিমান লোকও হারভের রোগী ছিলেন।

উইলিয়াম হারভে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রক্ত চলাচল বিষয়ক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত করেন। গ্রন্থটির বিষয় কিন্তু বহু আগেই হারভে 'রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান' এ বক্তৃতা দেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করার দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় হারভে বলেছিলেন, আমি আরও গবেষণা করে আরও প্রমাণাদি গ্রন্থে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলাম।

১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সকলে একসঙ্গে এক মতে উইলিয়াম হারভেকে রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান-এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেন, কিন্তু তিনি প্রবীণ বয়সের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম হারভে দেহত্যাগ করেন।

———

মণি ও মুক্তা

উপরের গাড়িটি চলে পেট্রল বা ডিজেল ছাড়াই। ইউকা-লিপটাস পাতা থেকে তৈরী তেল-এ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ তেলের দ্বারা গাড়িটি ঘণ্টায় ১০৩.২ কিমি চলতে সক্ষম। একদল জাপানী কৃষি বিজ্ঞানী, প্রফেসর সাকুজো টাকেডার (গাড়ির পাশে দাঁড়ানো) নেতৃত্বে এই অভিনব উদ্ভাবন করেন।

দেখতো চেখে কেমন লাগে

—গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দুধ তো ছিল আড়াই কিলো।
কিলো তো না, আড়াই লিটার দুধের মধ্যে একখানা ব্যাঙ!
ভেবে দেখলুম, মন্দ তো না, আরশোলাদের চেয়ে ভালো
টিকটিকি আর ধনেশ পাখির লেজ কিংবা ঠ্যাঙ।

সব দিয়েছি। আর কি দেব? বাড়িতে ঢের
ছুঁচো এবং ইঁদুরটিঁদুর মজুত ছিল। ঠিক সময়ে খুঁজে পাই নি
উচ্চিংড়েদের।
পেলেই দেব পাঁচটা ছ'টা।

এদিকে আয়, পালাচ্ছিস যে, এই ছেলেটা
দেখ না চেখে, পায়েসটা কি খারাপ হল? হাঁ কর, হাঁ কর।
একটা হাতা দিচ্ছি ঢেলে মুখের ভেতর।

খেয়েই যে তুই মিথ্যে বলবি, তা হবে না,
মিথ্যে বলার অনেক ঝুঁকি। মারব গালে এইসা থাপ্পড়।

খাওয়ার পরই জানি তো তুই
বলবি, 'দাদা, আরেকটু দিন, আরেকটু দিন।'
দিতে কিন্তু পারব না আর। পাড়ার অন্য বাচ্চাদের তো
দিতে হবে! এই পাড়াতেই বাচ্চা আছে হাজার দু'তিন।

———

ফা-হিয়েনের নৌকা
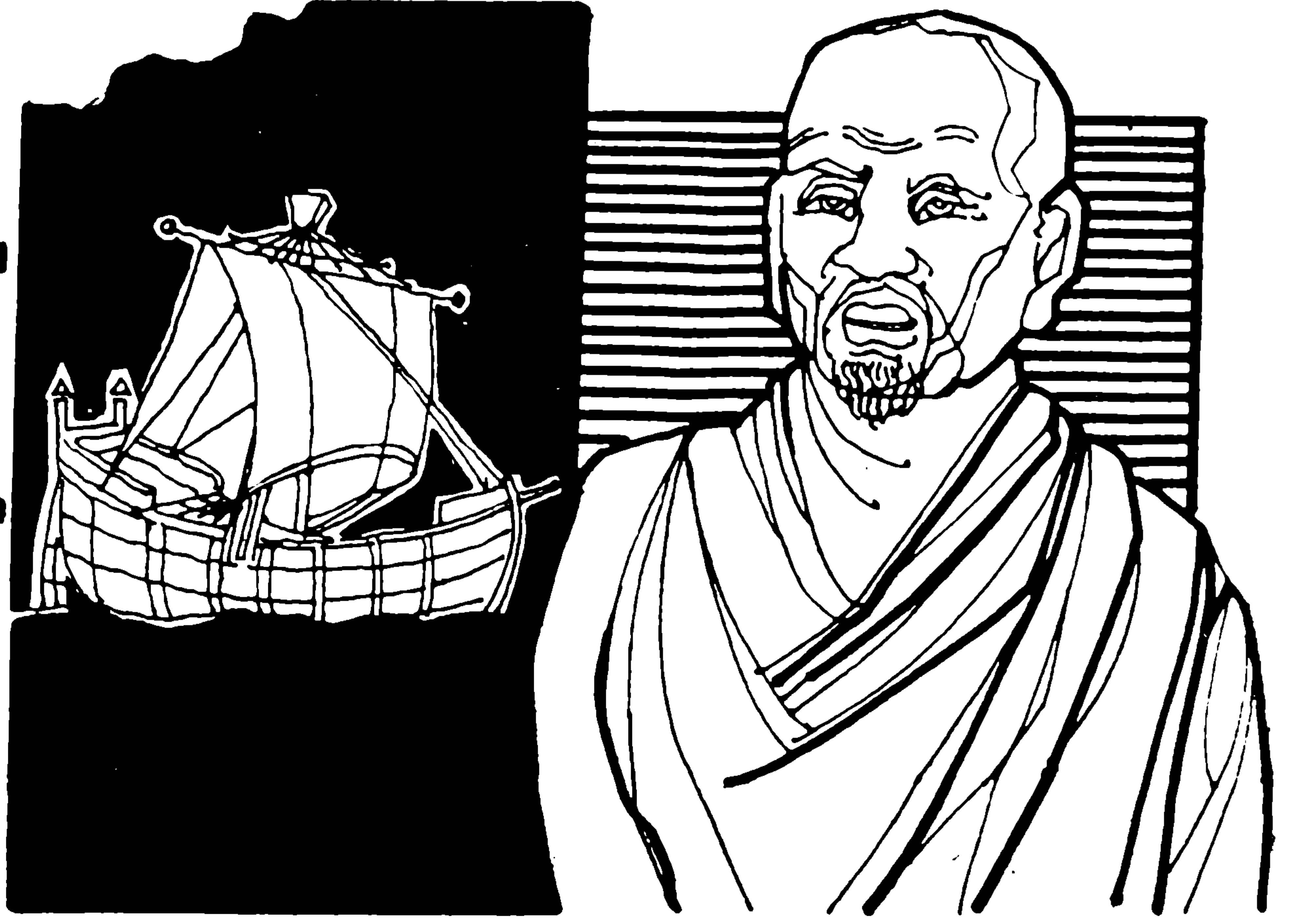
—কবিতা সিংহ

অমল আর বড়দা শ্যামল পড়ার টেবিলে বসে বসে গল্প করছিল। আজ আর বড়দা অমলকে অঙ্ক কষাচ্ছে না। বড়দার মেজাজ আজ খুব শরিফ। মিউজিওলজি আর চীনা ভাষায় পাস করে বড়দা বাড়িতে বসেছিল। আজ আমেরিকা থেকে চিঠি এসেছে বড়দার স্কলারশিপ মঞ্জুর হয়ে গেছে। তাই আজ অমলের ছুটি। জমিয়ে শীত পড়েছে। নীচ থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে মাংস রান্নার চমৎকার গন্ধ। অমল গায়ের সোয়েটারের কলারটা একটু তুলে দিয়ে বলল,—দাদা, তুমি তো আমেরিকায় চলে যাবে, তখন কার কাছে আর এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প শুনব?

শ্যামল হেসে বলল,—আরে যাবো তো সেই মে মাসে। তোর অত ভাবনা কি? ঠিক আছে, আজ একটা দারুণ এ্যাডভেঞ্চারের বই শেষ করেছি। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় লেপের তলায় শুয়ে তোকে সেই গল্পটা বলব।

দুই ভাই গল্প করছে,—এমনি সময় নীচ থেকে হরিসাধন এসে ডাকল,—বড়দা, নীচে বাবুমশায় আপনাকে ডাকছেন।

শ্যামল তাড়াতাড়ি উঠে নীচে চলল। অমলও দাদার সঙ্গ নিল। সন্ধ্যেবেলা বাবা লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়াশুনো করেন। কোনো কোনো দিন খাওয়ার পরও খানিকক্ষণ লাইব্রেরীতে কাটান। ইতিহাসের নামকরা প্রফেসর ছিলেন। পড়াশোনার পুরনো অভ্যাস রিটায়ারমেণ্টের পরেও ছাড়তে পারেন নি। মাঝে মাঝে অমল শ্যামলও বাবার কাছে বসে। মাও নেমে এসে বসেন। নানারকম গল্প হয়। অমলের

টেবিলের ওপাশে অদ্ভুত চেহারার একটি লোক বসে আছে।

এই লাইব্রেরী ঘরটা খুব ভালো লাগে। তিন পুরুষের লাইব্রেরী। অমলের দাদু এবং দাদুর বাবা, তার প্রপিতামহও এই লাইব্রেরীতেই পড়াশুনো করে সময় কাটাতেন। লাইব্রেরী ঘরে তিন পুরুষের সঞ্চিত স্তূপ স্তূপ বই।

মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। বাবা বসেন চামড়া মোড়া নরম একটি সোফায়। ঘরের হাওয়ায় সব সময়ে বাবার বর্মা চুরুটের গন্ধ। বাবার পাশেই পার্চমেণ্ট কাগজের হল্‌দেটে শেড্ দেওয়া একটা দাঁড়ানো আলো। বাকি সব অন্ধকারে আবছা। সেই অন্ধকারে সোনালী কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের আলমারিগুলির লাইনগুলো শুধু দেখা যায়।

লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে ওরা দেখল, বাবার সামনে টেবিলের ওপাশে অদ্ভুত চেহারার একটি লোক বসে আছে। মুখখানা চামড়ার থলির মত ঝলঝল করছে। চোখের কোলে কমলালেবুর কোয়ার মত ফোলা ফোলা মাংস। কুতকুতে চোখে লোকটা একবার বাবার মুখের দিকে, একবার বড়দার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বাবার সামনের টেবিলের উপর রাখা রূপোলী রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের জিনিস।

শ্যামল কোনো কথা বলার আগেই, সাগ্রহে রূপোর জিনিসটা হাতে তুলে নিল। তারপর গভীর আগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। জিনিসটা ঘটি না বালতি, ঠিক বোঝা যায় না। টোল খাওয়া কলঙ্ক ধরা অদ্ভুত চেহারার। বাবা খানিকক্ষণ শ্যামলের পর্যবেক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করলেন,—কি? কিছু বুঝলে?

দাদা একবার সেই লোকটার উদগ্র চোখের দিকে তাকাল। তারপর প্রশ্ন করল,—এটা আপনার জিনিস?

লোকটা হাসল একটু। কালো কালো একরাশ দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বাবা বললেন,—ওর নাম নন্দীরাম ভিমানী। আমার বন্ধু তোদের রাজশেখর কাকার সাপ্লায়ার। রাজশেখরের প্রাইভেট কালেকশনের জন্য নানারকম পুরণো লিপি, মুদ্রা, মূর্তিটূর্তি এনে দেয়। সেই যে তুই বজ্রতারার মূর্তিটা দেখে খুব তারিফ করছিলি, সেটা ওরই আনা। রাজশেখরই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। এই জিনিসটা নিয়ে রাজশেখরের কাছে গিয়েছিল। আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। রাজশেখর জিনিসটা কি, তাও বুঝতে

পারে নি। অমল লক্ষ্য করল,—বড়দা বাবার কথা এড়িয়ে গিয়ে আবার লোকটাকেই জিজ্ঞেস করল,—আপনি এ জিনিসটা পেলেন কোথা থেকে?

—একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের থেকে!

—ট্যাক্সি ড্রাইভার! তার ট্যাক্সির নম্বর আপনার কাছে আছে?

—নেহি!

অমল দেখল, বড়দা জিনিসটা হাতে তুলে নিল। বলল,—বেশ তো, আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন, আমি জিনিসটা ওপরে আমার ল্যাবরেটরিতে একবার টেস্ট্ করে দেখে আসি।

বড়দা বাইরে যাবার উপক্রম করতেই লোকটা হাঁ হাঁ করে উঠল।

বাবা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,—আরে কোনো চিন্তা নেই। ও আমার ছেলে। ও তোমার জিনিসটার কোনো ক্ষতি করবে না।

নন্দীরাম ভিমানী বলল,—না বাবু, দোরকার নেই। হামার মাল আপনি হামাকে দেন। হামি আন্যে জায়গায় পরখ করে লিবো।

বড়দা বলল, এত অবিশ্বাস—আচ্ছা, আপনার মাল আপনি রাখুন। নমস্কার। কথাটা বলেই দাদা আর দাঁড়াল না। ছুটে ওপরে চলে গেল। অমলও দাদার পিছন পিছন গেল। যাবার সময় শুনতে পেল, বাবা ভিমানীকে বলছেন,—তোমার জন্য চা বলেছি, চা-টা খেয়ে যাও।

অমল ওপরে এসে ছ্যাখে, বড়দা সামনের বাড়ির অমুদাকে ফোন করছে। অমুদা আর সমুদা দুই যমজ ভাই। বড়দার চেলা।

—কে অমু? ছ্যাখ্ আমাদের বাড়ি থেকে একটা লোক একটা কালো ব্যাগ নিয়ে এক্ষুণি বেরোবে। তোরা তাকে ফলো করবি। কাজটা করতেই হবে। আমার নাম ঠিকানা সব চাই।

অমুদাকে ফোন করে, বড়দা টেলিফোন গাইডটা খুলে ডঃ রাজশেখর রায়ের টেলিফোন নাম্বারটা বের করে তাঁকে রিঙ্ করল।

—ডঃ রাজশেখর রায় কথা বলছেন?

—আমি শ্যামল। কাকু, আপনি কি একটু আগে নন্দীরাম ভিমানী বলে কাউকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন?

—পাঠান নি? আপনার ওই নামের কোনো সাপ্লায়ার নেই?—এ্যাঁ, ওই নামের একটা লোক আমার বাবার কাছ থেকে আসছি বলে আপনার কাছে বিকেলে গিয়েছিল?

—আপনাকেও দেখিয়েছে?

—যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। কিন্তু কাকু, জিনিসটা জেনুইন। জিনিসটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?—আমিও না। কিন্তু রূপোর পাতের উপর—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওই চিহ্নটার কথাই বলছি। আপনি লক্ষ্য করেছেন? ইস্ জিনিসটা হেলায় হারালাম।

বড়দা খুব মুষড়ে পড়া মুখ করে ফোনটা রেখে দিল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অমুদা আর সমুদা অমলদের বাড়ি এল। ওরা মাঝে মাঝে স্ক্র্যাবল্ খেলতে আসে। তাই মা-বাবা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ঘরের দরজা ভেজিয়ে বড়দা চাপা গলায় বলল,—কিরে? কিছু খবর করতে পারলি?

—পারব না মানে? লোকটা ট্যাক্সি চড়ে আরো দু' জায়গায় গেল। দুজনের ঠিকানাই রেখেছি। দুজনেই পণ্ডিত ব্যক্তি। তারপর সেখান থেকে বাসে চড়ে সোজা শিয়ালদায়। ওখানে একটা সস্তা হোটেলে লোকটা উঠেছে। হোটেলের নাম 'সোনালী' হোটেল। হোটেলের ভিতর ঢুকে গিয়ে নিজের চোখে লোকটার ঘরটর দেখে এলাম। ওর সঙ্গে একটা অমলের বয়সী গেঁয়ো ভালোমানুষ চেহারার ছেলেও আছে। হোটেলের ওয়েটিং রুমটা কাউণ্টারের পাশে। সমু সেখানে বসেছিল। ম্যানেজার লোকটাকে ডাকল মিঃ সিং বলে। জিজ্ঞেস করল,—আপনি কি কালই চলে যাচ্ছেন মণিপুরে? লোকটা বলল,—না, আরো একদিন থাকবো! ম্যানেজারের সামনে হোটেল রেজিস্টারটা খোলা ছিল। কি একটা কাজে ম্যানেজার চলে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে রেজিস্টারটা দেখে নিয়েছি। লোকটার নাম রামসেবক সিং, ছেলেটার নাম যশবীর সিং। ওরা আসছে মণিপুর থেকে।

বড়দা প্রশ্ন করল,—ছেলেটা কি মণিপুরীদের মত দেখতে?

—একদমই না। বাংলার টিপিকাল গ্রামের ছেলে।

বড়দা বলল,—অমল, কাল তো শনিবার। তোর ইস্কুল ছুটি। তোকে একটা কাজ করতে হবে। ছোকরা গেঁয়ো চাকর সাজতে পারবি?

অমল মহা উৎসাহে বলল,—হ্যাঁ দাদা পারব!

—বেশ, কাল তোর পরীক্ষা। যদি সাকসেসফুল হতে পারিস তাহলে অমু সমুর পর তোকে আমার থার্ড এ্যাসিসট্যাণ্ট করে নেব।

ছেলেটি ফিরে দাঁড়িয়ে অমলকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল,—কোন্ বাবু?

অমল বলল—রাখালবাবু! আমাকে রাখবেন বলেছিলেন। দেশে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন—

—রাখালবাবুকে তো চিনি না ভাই। এই ঘরে আমি আমার নতুন কাকুর সঙ্গে এসেছি আজ তিন দিন। কাকু বলেছেন, কাল আমরা চলে যাব।

—তোমরা কোথা থেকে এসেছো ভাই?

—তমলুক থেকে।

—তমলুক? সে কোথায় ভাই, যেন কিছু জানে না এমনি সুরে শুধোল অমল!

—মেদিনীপুরে।

—ও! তা সেই মেদিনীপুর কোথায় ভাই?

ছেলেটির বিষণ্ণ মুখে এবার একটু সরল হাসি ফুটল।

—ও মা, তুমি যে দেখছি, আমার চেয়েও বোকা। মেদিনীপুর জেলার নাম শোন নি?

অমল বলল,—তা কোন্ গাঁ থেকে এসেছো তুমি?

—আমি এসেছি তেগঙ্গা গাঁ থেকে। আমার বাবা কূয়ো খুঁড়ছিল। কূয়োর ভিতর থেকে একটা জিনিস পায়। তা যে বাবুদের বাড়ি কূয়ো খুঁড়ছিল, তাদের বুড়ো গিন্নিমা বলেন, বাবা হিরু ও জিনিস তোর ভাগ্যে উঠেছে—তুই-ই নে। বাবুদের অনেক টাকা পয়সা কিনা? কলকেতায় থাকে। গেরামে থাকে ঠাকুমা বুড়ি। তা এই নতুন কাকু নাকি গেরামে গেরামে ঘুরে পুরনো জিনিস অনেক দাম দিয়ে কেনে। তাই বাবা তো আর নেই। মা নতুন কাকুকে দ্যাখালে জিনিসটে। নতুন কাকু বললে, তোমার ছেলেরে আমায় দ্যাও। আমি নে যাই। জিনিসটে বেচে ছেলের হাতে ভালো পয়সা পাঠিয়ে দেব। এই যাঃ—বলে ছেলেটি জিভ্ কেটে বসলো। কথাগুলো কাউকে বলো না ভাই। তোমায় সব কথা বলে ফেললাম। ভাই সাধে মা আমায় বলে, আমার ভোলানাথ বড্ড ভোলা!

রাখালবাবুকে তো চিনি না ভাই। [পৃঃ ২৪২

অমল ভোলানাথের কাঁধ জড়িয়ে বলল,—না ভাই, কাউকে বলব না। তবে তুমি খুব সাবধানে থেকো। কাল আবার আসবো। আমি ওই গলির মোড়ে ভুজিয়ার দোকানে চাকরি করি। পাঁচ টাকা করে দেয়। মাস চলে কি করে বলো?

ছেলেটি বড় বড় চোখ তুলে সায় দিয়ে বলল,—সত্যিই তো!

অমল বলল,—আচ্ছা ভাই, যাই। রাখালবাবু চাকরের একটা কাজ দেবে বলেছিল। তাই এসেছিলাম।

অমলের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর বড়দা সমুদা অমুদা ছোট্ট একটা বৈঠক করে নিল। দাদা ভুরু কুঁচকে বলল,—খুব খারাপ একটা কাজ করতে হবে। তাই ভাবছি, প্রথমে লোকটার হ্যাণ্ডব্যাগটা সরাতে হবে। তারপর ছেলেটাকে। মহা মুশকিল! আস্ত একটা ছেলে সরিয়ে ফেলা—

—সে কী রে?

সমুদা বলল। বেআইনী কাজ করবি!

দাদা বলল, কিছুই বেআইনী কাজ নয়। দাঁড়া, ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের সতুদাকে

সব জানিয়ে রাখি। লালবাজারের ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে সতুদার সঙ্গে আর একটা বৈঠক হল। সতুদা সমস্ত বিবরণ শোনবার পর একটা ফাইল চেয়ে পাঠালেন। কয়েকটা পাতা উল্টোনোর পরই বেরোল থলিমুখোর ফটোগ্রাফ। দাদা উত্তেজিত গলায় বলল,—হ্যাঁ সতুদা এইই—রুমি, এলিয়াস, ভিমানী।

সতুদা বললেন—আরে এর নামে তো কেস্ ঝুলছে। ওর কাজই হল বোকা-সোকা গেঁয়ো লোকদের কাছ থেকে পুরাকীর্তির নানান নিদর্শন যোগাড় করে ঝেঁপে দেওয়া। বিশেষতঃ ও ওই তমলুক সাইডে ঘোরে। ওখানে এখনো অনেক রকম পুরনো জিনিস পাওয়া যায়। চল্, লোকটাকে পাকড়ানো যাক। কিছুদিন আগে ও বিদেশে কি পাচার করে দিচ্ছিল?

দাদা বলল,—কি বল তো?

একটা পোড়ামাটির ফলক। তাতে একজন নাম-না-জানা গ্রীক নাবিক লিখছে অদ্ভুত কয়েকটা কথা—"আমার নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার জন্য পুবের হাওয়াকে ধন্যবাদ।"

দাদার চোখ জ্বলে উঠল। বলল,—হ্যাঁ, সে ফলকটার ফটোগ্রাফ আমি সেদিনই দেখেছি। অদ্ভুত পরিষ্কার আর নিখুঁত রয়েছে ওটা। ওটা তো এখন মিউজিয়মে চলে গেছে, তাই না?

সতুদা বলল,—হ্যাঁ!

শিয়ালদার 'সোনালী' হোটেলের চারপাশে দাঁড়িয়ে রইল সাদা পোশাকের পুলিস। অমল তার সেই চাকরের ছদ্মবেশে দাদার সঙ্গে রইল—বারো নম্বর কামরার পাশে। যাতে ভোলানাথের কোনো রকম ক্ষতি না হয়। সমুদা অমুদাও রইল কাছাকাছি।

অমল চাপা গলায় বলল,—দাদা, লোকটা না হয় ধরা পড়ল, তারপর কি হবে? ভোলানাথ বেচারী যে টাকার আশায় এসেছে। জিনিসটা তো গভর্নমেণ্ট নিয়ে নেবে।

দাদা সান্ত্বনার সুরে বলল,—না রে পাগল, না। ছাখ না শেষ পর্যন্ত কি হয়! অনেক কথা চেপেচুপে বসে আছি। পুরো গল্পটা যখন শুনবি, জানবি, দেখবি, তখন তোর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি থেকে নামল থলিমুখো। হাতে সেই কালো ব্যাগ। আর বেশ বড়-সড় একটি খাবারের প্যাকেট। সাদা পোশাকে দাঁড়িয়েছিল সতুদা। পলকের মধ্যে গ্রেপ্তার করে লোকটাকে পুলিসের গাড়িতে তুলল। কেবল ভিমানীকে নয়, ভোলানাথকেও তোলা হল ভ্যানে। অমলরাও চলল থানায়। কালো ব্যাগ থেকে বেরোল সেই রূপোর জিনিসটা। দাদা সেটা হাতে করে ধরে যেন 'সাত রাজার ধন মাণিক' খুঁজে পেয়েছে এমনি করে কেঁদে ফেলল। রাতে যখন ভোলানাথকে নিয়ে বাড়ি ফিরল অমলরা, তখন বাবা-মা সবাই জেগে বসে আছেন।

অমলের বড়দার মুখের হাসি দেখে ওঁদের দুশ্চিন্তা কেটে গেল।

বড়দা বললেন,—কোনো চিন্তা নেই। সব মিটে গেছে। আমাদের সরল ভোলানাথ

এতক্ষণ নতুন কাকুর জন্যে কান্নাকাটি করছিল। এবার নতুন কাকুর টেপ্ রেকর্ডারে তোলা স্বীকারোক্তি শুনে ওর মুখে হাসি ফুটেছে।

রাতে অমলের ঘরেই একটা ক্যাম্প-খাটে ভোলানাথের বিছানা হল। ভোলানাথ বলল,—অমল দাদা, তোমরা আমাকে কি বাঁচা বাঁচিয়েছো গো। আমি যে আমার মায়ের একটা মাত্তর ছেলে—নতুন কাকু কেমন রেকর্ডে বলল, জিনিসটা বেচে আমাকে একটা ভুল ট্রেনে চাপিয়ে দে, ও পাইলে যেত—

অমল হেসে বলল,—ও তো ভালো লোক, তোমাকে প্রাণে মারে নি। তার চেয়েও খারাপ হত যদি, ও তোমাকে মেরে ফেলত।

ভোলানাথ ঘুমিয়ে পড়ার পর অমল জেগে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, রূপোর জিনিসটা সত্যিই কি এমন মূল্যবান জিনিস যে দাদা ওটাকে দেখে একেবারে কেঁদে ফেলল। তারপর ফ্লাশ ক্যামেরায় কতগুলো ছবি তুলে নিল জিনিসটার।

থানা থেকে ফিরে হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়িতে আসতে আসতে দাদা অমলকে জিজ্ঞেস করছিল,—হ্যাঁরে অমল, তুই তো অঙ্কে একেবারেই জিরো, তা ইতিহাসে তোর কি রকম দখল দেখি?

অমল বলল,—আমি খুউব মন দিয়ে ইতিহাস পড়ি!

—আরে পড়তেই তো হবে। বাবা কত বড় ঐতিহাসিক। বাবার নাম রাখতে হবে না?

—আচ্ছা বল তো, ফা-হিয়েনের কথা ইতিহাসে কি পড়েছিস?

—এ তো সোজা প্রশ্ন!

অমল গড়গড় করে বলতে আরম্ভ করল—ফা-হিয়েন একজন চীনা পরিব্রাজক। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়া দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। অগ্নিদেশ পেরিয়ে দুর্গম মরু পেরিয়ে খোটানে কাটিয়ে তিনি পামির পার হয়ে গিলগিটের পথে কাশ্মীর দিয়ে ভারতে আসেন। তারপর একা একা উত্তর ভারতে উড্ডীয়ান, সুবাস্তু, পুরুষপুর, তক্ষশীলা, মথুরা, রাজগৃহ, গয়া, কাশী, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, পাটলীপুত্র ভ্রমণ করে মগধ থেকে তিনি চম্পায় যান। তারপরে—এই রে, বাকিটা যে একদম ভুলে গেছি দাদা—

বড়দা ওর গড় গড় মুখস্থ বলা শুনে এতক্ষণ হাসছিলেন। এবার বললেন—তুই যে দেখছি, আসল জায়গাটাই ভুলে মেরে দিয়েছিস।

অমল খুব লজ্জিত হয়েছিল। তাই বাড়ি পৌঁছে যাবার সময় হয়ে যাওয়ায় দাদার গল্পটা আর শেষ হল না।

অমলের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দুটো বাজল। পাশ ফিরে শুতে যেতেই সদ্য জেগে ওঠা ভোলানাথ বলল,—অমল দাদা, আমি কবে তেগঙ্গায় ফিরে যাবো?

অমল বলল,—কাল ভাই আমরা তোমাকে তেগঙ্গায় নিয়ে যাবো। দাদা বলেছে—ওখানে গিয়ে খুব মজা হবে!

ভোলানাথ অমলের কথায় বোধ হয় নিশ্চিন্ত হল। আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অমলের কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সে আস্তে আস্তে নীচে নামল। নীচে লাইব্রেরী ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

দরজার পাশে অমলকে উঁকি মারতে দেখে অমলের বাবাই তাকে ভিতরে ডাকলেন। বললেন,—কি, খুব উত্তেজনা? ঘুম আসছে না? এসো বসো। গল্প শোনো—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তা সমুদ্রযাত্রার যে সব বিবরণ পাই, তার অনেকগুলোই ওই তমলুক থেকেই। ওরা বলেছে, তাম্রলিপ্তিকা, দামলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত, আবার বেলাকুলও বলেছে। এই ছ্যাখো, মহাবংশে কি লিখছে—বাবা একটা পুরনো লালচে অদ্ভুত গড়নের বই খুলে পড়তে লাগলেন।

লিখছে—অশোকের ছেলে মহেন্দ্র তার বোন সংঘমিত্রাকে নিয়ে, পুণ্য বোধিদ্রুম নিয়ে ওই তাম্রলিপ্তের বন্দর থেকেই সিংহলে রওনা হয়েছিলেন।

এই যে, এই বইটায় ছ্যাখো লেখা আছে আর একজন চীনা পরিব্রাজকের কথা। তাঁর নাম ঈ-ৎ সিভ। তিনি সুমাত্রা থেকে ছিপ নৌকোয় এসেছিলেন খানিকটা। তমলুকের কথায় বলেছিলেন তিনি বন্দর নগরী। পাশে সংকীর্ণ খাড়ি। এখানে তিনি তিন বছর সংস্কৃত পড়েছিলেন। এটা সপ্তম শতকে। আরো পিছনে যাও, তিন শতকে। প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—তাম্রলিপ্তিকা থেকে চীনের পীততোরণে ভারতের দূত যাচ্ছে।

দাদা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। অমল দেখছিল, বাবার মুখটা নতুন একটা উদ্দীপনায় যেন ঝলমল করে উঠছে।

দাদা বলল,—বাবা, অনেক তলার স্তরে, কুষাণ যুগের চিহ্ন দেওয়া সেই অদ্ভুত ঘোরানো ঘোরানো রেখা তোলা মাটির বাসনও তো তমলুকে পাওয়া গেছে?

বাবা হেসে বললেন, শুধু কুষাণ কেন? মৌর্য সুঙ্গ,—সব যুগেরই প্রায় কিছু না কিছু চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়।

দাদা বলল,—অমল তো জানেই না, চম্পা থেকে যখন ফা-হিয়েন তমলুকে আসেন, তখন তমলুকে বাইশটা বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। সেখানে তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়তেন, পুঁথি সংগ্রহ আর নকল করতেন আর বুদ্ধদেবের নানা ধরনের ছবি নকল করতেন। দু' বছর তিনি তমলুকে ছিলেন।

বাবা বললেন, যাক্, অনেক আলোচনা হল। কাল তাহলে তোমরা তেগঙ্গা রওনা হচ্ছো?

দাদা বললেন, হ্যাঁ, আমি, অমু, সমু, আর ভোলানাথ।

অমল চমকে তাকাল,—আমি?

দাদা বাবার দিকে হেসে তাকিয়ে বলল,—তুই ছোট পিসিমার শ্বশুরবাড়ি যাবি। বাবার সঙ্গে!

বাবা বললেন,—হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই চল্ না।

অমল ছোট পিসিমাকেই খুব কম দেখেছে। ছোট পিসিমারা পাটনায় থাকেন। পাটনায় অমল একবার গিয়েছিল। ছোট পিসিমার শ্বশুরবাড়ি যে কোথায়, তা তার জানা নেই। অন্য সময়ে হলে এসব কথা ভালোই লাগত অমলের। বাবার সঙ্গে কোথাও যাওয়া মানেই দারুণ আরামে বেড়ানো আর পেটপুরে খাওয়া। কিন্তু আজ ব্যাপারটা ভালো লাগল না তার। এত বড় একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপারের যবনিকা পড়তে যাচ্ছে—আর অকুস্থলে সে নেই। এ কথা ভাবতেও পারছিল না অমল। বাবা, দাদা আর অমল সিঁড়ি দিয়ে উঠল। বাবা ঘরে শুতে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদা বললেন,—সত্যি অমল আমি যেন দেখতে পাচ্ছি রূপোর গলুই, রূপোর বৈঠা, ফা-হিয়েনের জাহাজ—

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তার মায়ের কুঁড়েঘরের দিকে। [পৃঃ ২৪৮

হঠাৎ অমল দেখল সে এক অজানা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল, তরতর খরতোয়া নদী বহে যাচ্ছে। তীরে দাঁড়িয়ে তাকালে ওপার দেখা যায় না। জলের রঙ গেরুয়া, নদীতে অনেকগুলি নৌকো। খুব সাজানো রঙচঙ্ করা। দূরে নদী গিয়ে যেখানে সমুদ্রের ছাইরঙা জলের সঙ্গে মিশেছে—

অমল দাঁড়িয়ে দেখছিল ঝক্‌ঝকে বাঁধানো ঘাট। পোড়ামাটির লাল চক্‌চকে ইঁটে বাঁধানো। ছোট ছোট ইঁট। ইঁটের গায়ে কারুকাজ করা ফলক।

কত রকম মানুষজন যাচ্ছে আসছে। তাদের পরনে নানা রকম অচেনা পোশাক। কারো সোনালী চুল, ফরসা রং। খালি ঊর্ধ্বাঙ্গ। পরনে চামড়ার বক্ষত্রাণ। পায়ে চটি। কারো পরনে আরবী পোশাক। কেউ কেউ আবার শ্রমণের পোশাক পরেছেন। কটিবস্ত্র মাত্র পরা ঘর্মাক্ত শ্রমিকেরা নৌকো থেকে মাল নামাচ্ছে, মাল তুলছে। দূরে ছায়ার মত সংঘারামের মধ্য থেকে অদ্ভুত ধরনের ঘণ্টা বাজছে। অমল মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। এমন সময় একজন অদ্ভুত চেহারার শ্রমণ এলেন। চিবুকে সাদা দাড়ি ফুরফুর উড়ছে। স্পষ্ট চৈনিক চেহারা। দু' কাঁধে দুটি বড় বড় ঝোলা। পিছনে দুজন শ্রমিকের বাঁকে ভরা প্রচুর পুঁটলি চলেছে। কাছাকাছি চোখ মুছতে মুছতে চলেছেন অনেক অধিবাসী

এবং পাশে পাশে বৌদ্ধ শ্রমণেরা। একটি নৌকা দাঁড়িয়েছিল। নৌকাটিতে উঠলেন তিনি। মাথা নীচু করে সবাইকে অভিবাদন করলেন। তারপর নৌকোটি গিয়ে লাগল একটি বড় নৌকোয়। মালপত্র সব তোলা হতে হতে হঠাৎ প্রবল হাওয়া উঠল। সেই হাওয়া কাটিয়ে বড় নৌকাটি চলল দূরের জাহাজে। জাহাজটি ভাসছিল সমুদ্রে। এমন চেহারার জাহাজ অমল আগে কখনো দেখে নি। তারপর অমলের আর কিছু মনে নেই। যেন সে ঝড়ে হাওয়ায় ওলট-পালট খেতে খেতে একটা সরু খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কি যেন একটা ধরে সে নৌকোয় লেগে থাকার চেষ্টা করছিল ঘুমের মধ্যে। জিনিসটা হল রূপো বাঁধানো একটা গলুই। গলুই!—আরে—গলুইই তো। ঘটি নয়। বালতি নয়। আসলে ওটা একটা গলুই!

ঘুম ভেঙে ছট্‌ফট্‌ করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সকালের ঝলমলে রোদ তখন ওর বিছানায়।

অমল চেঁচিয়ে উঠল—দাদা, দাদা—

অমলের চিৎকার শুনে দাদা ছুটে এল পাশের ঘর থেকে—কি রে? অত চেঁচাচ্ছিস কেন?

অমল রুদ্ধশ্বাসে বলল,—দাদা, তুমি বোঝো নি? ওটা হল গলুই—গলুই—

দাদা ওর মাথায় হাত রেখে বলল,—বুঝেছি রে বুঝেছি। আমি অনেক আগেই বুঝেছি ওটা গলুই। ওটার গায়ে এক লাইন চীনা লিপিও লেখা আছে।

অমল বলল,—দাদা আমাকে তেগঙ্গা নিয়ে যাবে না—

দাদা হেসে বলল,—বোকা ছেলে, তুই তো বাবার সঙ্গে যাবি।

পোশাক-আশাক পরে নিজের ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে অমল যখন নীচে নামল তখন গাড়ি বারাণ্ডার তলায় দুটো স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে। একটিতে উঠেছেন দাদা, অমুদা, সমুদা, ভোলানাথ আর দুজন পুলিশ। আর একটিতে অমলের বাবা আর পুলিস অফিসার সতুদা।

ট্রেনে নয়। গাড়িতেই যাওয়া হবে। অমলের দু'চোখ অভিমানে ছলছল করে উঠল।

বাবা বললেন,—শ্যামল, আর অমলকে আঁধারে রেখো না, সব বলেই দাও!

দাদা হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বললেন—তেগঙ্গা আমাদের পৈত্রিক গ্রামেরই পিছনের গ্রাম। সেখানকার চাষবাড়িতে বাবার জেঠিমা থাকেন। তিনি চাষবাস সব দেখাশোনা করেন তো। আমি তো তেগঙ্গা আর বুড়োমার নাম শুনেই বুঝেছিলাম যে ভোলানাথ আমাদের বাড়ির কথাই বলছে। তাই বাবাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম, আমাদের তেগঙ্গার চাষবাড়িতে কোনো পুরনো কূয়ো আছে কি না? অমল, বুঝলি তো, আমরা আগে ছোট পিসির বাড়ি যাবো। সেখানে একরাত থেকে তারপর তেগঙ্গায় যাবো।

অমলের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। এর আগে দেশের বাড়ি কখনো যায় নি।

তেগঙ্গায় পৌঁছেই ভোলানাথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তার মায়ের কুঁড়েঘরের দিকে।

আর অমল বড়দার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তাদের চাষবাড়ি। সবচেয়ে ভালো লাগল বাবার পঁচাশি বছরের জেঠিমা কমলা ঠাকরুণকে।

সেবার তেগঙ্গার সেই পুরনো কূয়ো শেষ পর্যন্ত খুঁড়তে মাসখানেক লেগে গেল। পাওয়া গেল এক পুরনো খাড়ির চিহ্ন। সেই পুরনো খাড়িতেই কি রকম ভাবে যেন ঢুকে পড়েছিল একটা বড় নৌকো। সে নিশ্চিহ্ন নৌকোর পচা কাঠ কবেই মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। কেবল আছে বৈঠার রূপোর হাতল, রূপোর গলুই আর তামার বাসন। দাঁড়ের লোহার বাজু—ধাতুর আংটার মত জিনিস, গজাল—গোঁজ—

অমলের সারা শরীর সেই ধ্বংসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ফা-হিয়েনের নৌকোর কাঠ পচে গেছে তাম্রলিপ্তের মাটিতে। তাম্রলিপ্ত বন্দরটাই চাপা পড়ে গেছে মাটির তলায়। কেবল লিপিটুকুই রয়ে গেছে। রূপোর পাতের উপর চীনা ভাষায় লেখা আছে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

অমল ঠিক করে ফেলল,—তার স্বপ্নের কথা সে কাউকে বলবে না, দাদাকেও না।

মণি ও মুক্তা

●• প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন অভিনব চাকাবিহীন জাপানী ভবিষ্যৎ ট্রেনের চলন পরীক্ষা। সাময়িক সাত কিলোমিটার পথ তৈরী করে, রেললাইনের থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় চুম্বক শক্তি চালিত এ ট্রেন দুরন্ত গতিতে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪৫৮ কি.মি. (২৮৫ মাইল) বেগে চলতে সক্ষম। জাপানী বিজ্ঞানীদের অসাধারণ চমকপ্রদ আবিষ্কার এটি।

হরু
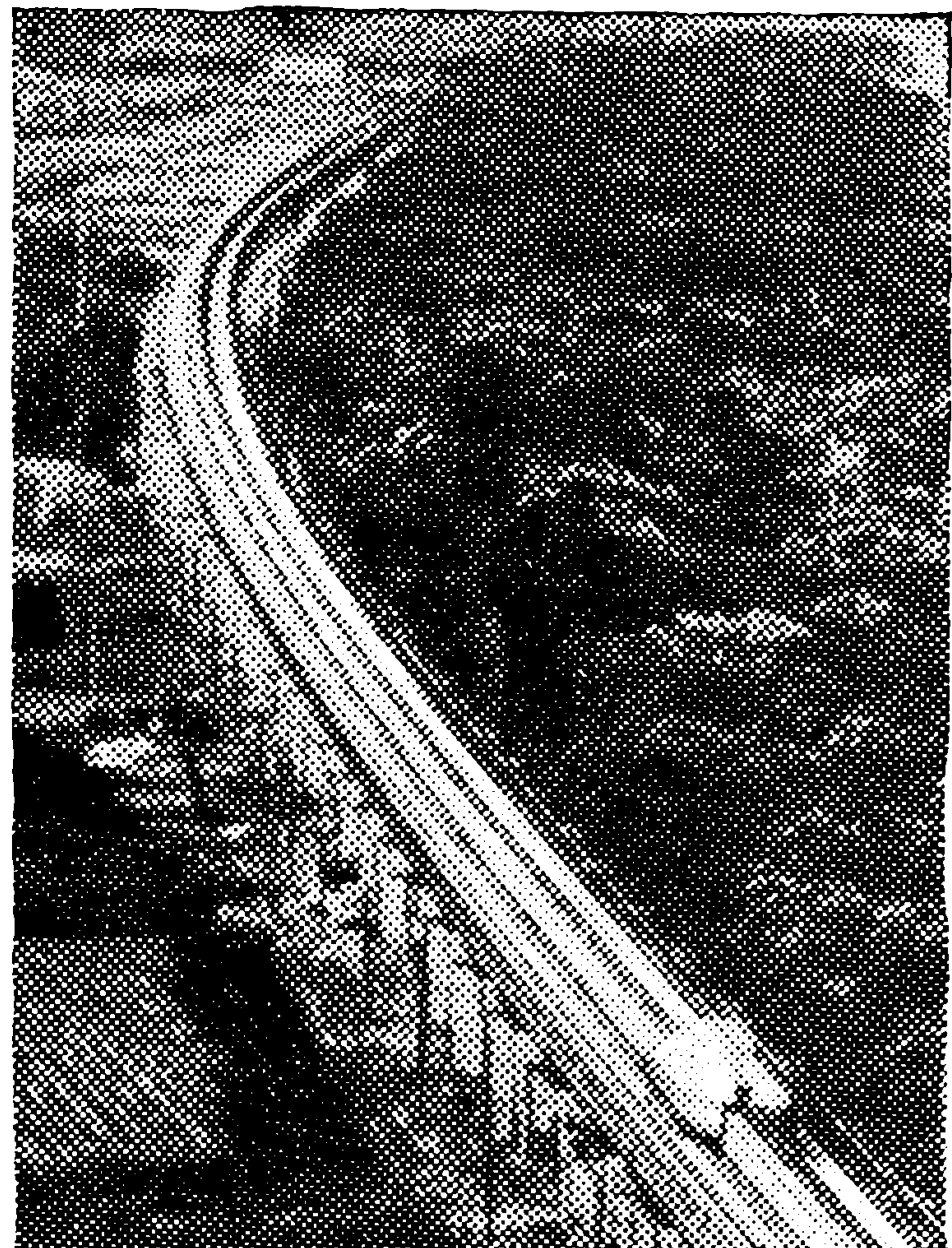
—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মেম্‌সাব্‌, ন্যাড়াদের বাড়ির বন্ধ খিড়কির দুয়ারের ওধারে এই ডাকটা এলেই ন্যাড়ার মা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'ঐ এসছে ঠিক মুশল' ন্যাড়ার মা বিরক্ত হয়ে বাড়ির ঝি চাঁপাকে বলেন—'বাসন-কোসন, বালতি-মগগুলো কলতলা থেকে সরা।' চাঁপাও তাড়াতাড়ি অর্ধ সমাপ্ত বাসনগুলো মাজতে আরম্ভ করে।

'মেমসাব', বন্ধ দুয়ারের ওধারে আবার সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা চিৎকার।

'কেবাড়ি খুলিয়ে।'

'খুলছি খুলছি', ন্যাড়ার মা খিড়কি দরজাটা খুলতে খুলতে রেগে-মেগে বলে, 'আর একটু পরে আসতে পার না', দরজাটা খুলে যায়, দরজার ওধারে একটা ছেঁড়া খাকি হাফ্‌প্যাণ্টের ওপর একটা ময়লা হাফশার্ট পরা বিরাট একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। তার এক হাতে বালতি আর এক হাতে ঝাড়ু। মাথায় ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল, মুখে মৃদু হাসি। হরু। ন্যাড়াদের বাড়ির জমাদার। প্রতি সোম, বুধ, শুক্রবারে সকালে এসে ন্যাড়াদের

বাড়ির নালি, বাথরুম পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। হরু থাকে ন্যাড়াদের বাড়ির কাছেই একটা ফিল্ম স্টুডিওতে এবং যেখানে ন্যাড়ার বাবা ছবি তোলেন। ঐ স্টুডিওরই মাইনে করা জমাদার হরু। ন্যাড়া এবং এই পাড়ার অন্য বাড়ির এই কাজগুলো ওর পার্ট-টাইম। হরু বাইরে ছেঁড়া চটিটা খুলে যেই ঢুকতে যাবে, ন্যাড়ার মা আর্তনাদ করে ওঠেন—'দাঁড়া দাঁড়া', তারের ভিজে গামছা, কাপড়গুলোকে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বুকে করে এমনভাবে ভেতরে চলে যান, যেন কোন হিংস্র গণ্ডারের সামনে থেকে তাঁর শিশুকে তুলে নিয়ে কোন রকমে যেন তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন। ন্যাড়া, ন্যাড়ার বাবা কিন্তু ন্যাড়ার মায়ের এই শুচিবাঈ, নীচ জাতির প্রতি ঘৃণাকে মোটেই পছন্দ করে না।

ন্যাড়ার বাবা বুঝিয়ে বলেন—'জানো গান্ধীজীই ওদের বলেছেন—হরিজন।'

ন্যাড়ার মা ঝংকার দিয়ে বলেন—'রাখো তোমার হরিজন, আমরা সবাই হরিজন—তা বলে মেথর মুচিও যে আমার ঘরসংসারের কাপড়-চোপড় ছুঁয়ে মেটে করে দেবে। এটা একটা কম হল নাকি?

ন্যাড়া তার বাবাকে সমর্থন করে কবি সত্যেন দত্তর 'মেথর' কবিতার দুটো লাইন আবৃত্তি করে দেয়। ভেতরের ঘর থেকে ন্যাড়ার দাদা বিবেকানন্দর বাণী আওড়ায়, 'চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই—'

'চুপ কর, চুপ কর', ন্যাড়ার মা চিৎকার করে ওঠেন। ন্যাড়ার মা দেখতে ছোট-খাটো মানুষটি, কিন্তু তাঁর চিৎকার ও দাপটে তাবড়-তাবড় মানুষ ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে। লেখাপড়া বিশেষ করেন নি, ঘরসংসারের কাজ-টাজ নিয়ে থাকেন। বারো মাসে তেরো পার্বণ। মাইনে করা পুরুত আছে, নাম বুড়ো। সে প্রতিদিন ঠাকুর ঘরে এসে ঘন্টি বাজিয়ে মন্ত্র আউড়ে কি পুজো করে, ন্যাড়া ও তার দাদা বোঝে না। দেখে, প্রতিদিন এক প্যাকেট মাদার ডেয়ারীর দুধ নিয়ে যায়, এটি তার মাইনের একটা অংশ, তাছাড়া মা নগদ কি দেয়, তা ন্যাড়া কেন, ন্যাড়ার বাবাও জানে না। প্রতি পুজোয়, জামাকাপড়টা ভালো দামেরই দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজোয় নগদ দক্ষিণাও আছে। এই সত্যনারায়ণ পুজো নিয়েই ন্যাড়ার মায়ের সঙ্গে তার বাবার বিরাট তর্ক।

'জানো' ন্যাড়ার বাবা বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'এই সত্যনারায়ণ পুজোটা, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পুজো।'

'কে তোমায় এমন আজগুবি কথা বলেছে' ন্যাড়ার মা সত্যনারায়ণের সিন্নি মাখতে মাখতে বলেন। উত্তরে ন্যাড়ার বাবা বলেন—'সেইজন্যেই তো সত্যনারায়ণের প্রসাদকে সিন্নি বলে—সত্যনারায়ণ আসলে পীর, সিন্নীটা মুসলমানদের ব্যাপার।'

ন্যাড়ার মায়ের ফরসা মুখটা রাগে টকটকে হয়ে ওঠে। গস গস করে বলেন—'তুমি থামো তো, ঠাকুরঘরে ওসব কথা বললে মহাপাপ হয়।'

কিন্তু যাকে নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক, সেই মজাদার হরু কিন্তু এই ব্যাপারে নির্বিকার,

নালী বাথরুম ভাল করে অ্যাসিড ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে, নর্দমার কাছে রাখা ভাঙ্গা কাপটা ধুয়ে আবার হাঁক দেয়—'মেম্‌সাব, হামারা চায়ে লেআও।'

তাপুর শোবার ঘর থেকে জোর গলায় ডাকেন ন্যাড়ার মা বাড়িতে যে রান্নার কাজ করে, সেই তাপুকে। তাপু রান্নাঘর থেকেই উত্তর দেয়, 'দিচ্ছি মা দিচ্ছি, হরুকে চা দিচ্ছি।'

ন্যাড়ার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন—'বাসি রুটি দুটো ও একটু তরকারি দিয়ে দিস।'

প্রায় বৃদ্ধ হরু জমাদারের মুখে নিশ্চয় হাসি ফুটে ওঠে।

হরুর আর একটা ব্যাপারে ন্যাড়ার মা তিতি-বিরক্ত। কামাই। সপ্তাহে তিন দিনের জায়গায় দুদিন একদিন হয়ে যায়। এর জন্যে অনেকবার বরখাস্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'র কেষ্টর মতন হুঁকাটি বা ঝাঁটাটি বাড়ায়ে আবার হরু তার বিশালকায় দেহ নিয়ে ঢুকে পড়েছে।

কে তোমায় এমন আজগুবি কথা বলেছে। [পৃঃ ২৫১

এবার কিন্তু পরপর দু' সপ্তাহ কামাই করল। ন্যাড়ার মা ব্যস্ত হয়ে ন্যাড়ার বাবাকে বলেন—'তুমি স্টুডিওতে গিয়ে খোঁজ কর—হরুর খবর কি, ও যদি না কাজ করতে চায়, অন্য জমাদার দেখি।'

ন্যাড়ার বাবা স্টুডিওতে গিয়ে দু নম্বর ফ্লোরের পাশে, যেখানে টিনের আর কর-গেটের মতন ছোট ঘরগুলোয় হরুরা থাকে, খোঁজ করে জানলেন, হরু মুলুক গেছে। শুনে ন্যাড়ার মা ক্ষিপ্ত হয়ে মন্তব্য করেন—'মুখপোড়ার এত বড় আস্পর্দা, না বলে দেশে চলে গেল।'

কর্পোরেশনের একটা নতুন জমাদার রাখা হল। রাখলে কি হবে, তার কাজ ন্যাড়ার মায়ের একেবারে পছন্দ নয়। মনে মনে গজগজ করে বলেন—'কি সুন্দর কাজ ছিল হরুর!' কিন্তু বিলাপ করে কি হবে? কিছুদিন পর দেশ থেকে ফিরে হরু জানতে পেরেছে, অন্য জমাদার রাখা হয়েছে। ন্যাড়াকে বলেছে—'ঠিক হ্যায়, তুমার মাঈকে বাকি মাহিনা দিতে বলে দিও।' প্যাশেই ন্যাড়ার দাদা দাঁড়িয়েছিল। বললে—'আজকেই নিয়ে যাও, খিড়কির দরজায় দাঁড়াও, মাকে বলছি।'

খিড়কির দরজায় ঢুকে হরু ন্যাড়ার মাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। চেহারাটা

হলদে হয়ে গেছে, ধুঁকছে। কি হুয়া বেটি, হরু ন্যাড়ার মাকে 'মেমসাব' সম্বোধন না করে বেটি বলায় চমকে ওঠেন ন্যাড়ার মা, নিজেকে সামলে উত্তর দেন—'জনডিস। এই নাও' বলে রকে ওর মাইনেটা রেখে দেন। মাইনেটা নিতে নিতে হরু অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতন বিধান দেয়—'পীত্‌কা বেমারি। নেমু, পপিতা আর কেতাড়ি খেতে হবে।'

'কেতাড়ি কি?'—ন্যাড়া জিজ্ঞেস করে।

'আখ আখ।' হরু দাঁত দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে আখ খাবার কায়দাটা দেখিয়ে দেয়।

'পপিতা কাকে বলে?' ন্যাড়া আবার প্রশ্ন করে।

'পেঁপে' ন্যাড়ার মা, বেহারের মেয়ে বুঝিয়ে দিলে! হরুকে বলেন—'পেঁপে, নেবু তো রোজই খাচ্ছি, কিন্তু এ বাজারে আখ পাওয়া যায় না।' হরু মাইনে নিয়ে কিছু না বলে চলে যায়।

দুদিন পর 'বেটি, বেটি' বলে ন্যাড়াদের বাড়ির খিড়কি দরজায় হরু হাঁক দেয়। ন্যাড়ার মা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতে খুলতে বলেন—'মাইনে তো দিয়ে দিয়েছি, আবার কেন এসেছ—'

'কেন'টা আর বলতে পারেন না, দেখেন হরু চার-পাঁচটা বড় বড় আখ লাঠির মতন কাঁধে করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা পুঁটলি।

'হাটিয়ে' বলে উঠোনে ঢুকে রকের ওপর আখগুলো রাখে। পুঁটলিটা খুলে দুটো হলদে হলদে বাতাবি লেবু বার করতে করতে বলে—'ইসব খাও, ঠিক হো জায়গা।'

হরুর গলা শুনে ন্যাড়ার বাবা বেরিয়ে এসে বাতাবি নেবু আর আখ দেখে বলেন, 'বাঃ, আখ কোথা থেকে পেলে হরু?'

'নু মার্কেট থে' হরু হেসে জবাব দেয়।

'নিউ মার্কেটে!' ন্যাড়ার বাবা জিজ্ঞেস করেন।

'হাঁ', হরু বলে, 'শুয়ার বেচনে গিয়া থা।'

ন্যাড়াদের বাড়ির কাছের পুকুর ধারের জঙ্গলটায় হরুর অনেকগুলো শুয়োর আছে। একবার ন্যাড়ার দাদার বন্ধুরা হরুর একটা শুয়োর বাচ্চা মেরে খেয়েছিল। তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করেছিল হরু। শেষটায় পাড়ার বড়রা চাঁদা তুলে হরুর শুয়োরের দাম দিয়েছিল।

'তোমার এই আখ আর বাতাবি লেবুর কত দাম পড়েছে?' ন্যাড়ার বাবা জিজ্ঞেস করেন।

হরু লজ্জায় মাথা চুলকে মৃদু হেসে বলে—'কুছ নেই।'

—'না—না, তোমায় দাম নিতে হবে।'

—'শুয়োর বেচকে হামরা আচ্ছা নাফা হুয়া। উ হামরা বেটি কা বাস্তে, মাঈজীকা বাস্তে লায়া।' কথাটা শেষ করেই একরকম পালিয়ে যায় হরু।

ন্যাড়ার বাবা উৎসাহিত হয়ে বললেন—'ডাক্তারবাবু বলেছেন জনডিস হলে খুব আখ খাবে।'

'ও আখ আমি খেতে পারব না।' ন্যাড়ার মা গম্ভীরভাবে জানায়।

'কেন?' বুড়ো মানে পুরুত ঠাকুর খিড়কি দুয়ারে ঢুকে প্রশ্নটি করেন।

ন্যাড়ার মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—'ম্যাথরের ছোঁয়া কি খাওয়া যায়?'

'প্রবাসে, ফলে, দুগ্ধে নিয়ম নাস্তি।' বুড়ো পুরোহিত বিধান দেন।

বুড়ো পুরোহিত কিন্তু বুড়ো নয়, যুবক। কিন্তু সর্বদা ধুতির সঙ্গে সাদা ফতুয়ার ওপর সাদা চাদর ও কে. এম. দাসের চটি পরে ঘুরে বেড়ায়।

'মানে?' ন্যাড়ার মা জিজ্ঞেস করেন।

বুড়ো হাত নেড়ে বোঝায়—প্রবাসে—ফলে আর দুধে কোন জাত বিচারের নিয়ম নেই। আপনি ঐ বাতাবি লেবু আর আখগুলোর ওপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে খান, ন্যাবা দুদিনে সেরে যাবে।

হরুর দেওয়া আখ আর বাতাবি লেবুর জন্যেই হোক, অথবা ডাক্তারের ওষুধের গুণেই হোক, ন্যাড়ার মায়ের জনডিস সেরে গেল। এবং যথাযথ কর্পোরেশনের জমাদারের কাজ পছন্দ না হওয়ায় হরু আবার পুরনো কাজে বহাল হল।

ন্যাড়া আর তার দাদা পরস্পর বলতে লাগল—'হরুটা খুব চালু আছে। কি রকম আখ আর বাতাবি দিয়ে আবার ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ঢুকলে কি হবে, আবার আগের মতন ওদের মায়ের অচ্ছুত হরুকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। বাড়িতে ঘোর অশান্তি। কিছুদিন পর হরুর আর দেখা নাই। স্বভাব যায় না মলে।

ন্যাড়ার মা ন্যাড়ার বাবাকে বললেন—'তুমি স্টুডিওতে গিয়ে খোঁজ নাও তো হরুর কি হল।'

সেই দিন রাত্রে ন্যাড়ার বাবা জানালেন—'হরুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বললে—বোখার হয়েছে।'

'ওর জ্বর হয়েছে—ওর বৌকে পাঠিয়ে দিলেই পারে'—ন্যাড়ার মা বলেন।

—'বলেছিলাম, ওর বৌ বললে, ওর কাজ নাকি তোমার ভাল লাগে না।'

—'হ্যাঁ—খুব নোংরা কাজ। তবু এসে গলিগুলো পরিষ্কার করে দিক—আজ সাত দিন ধরে ভটভট করছে।'

আরো সাত দিন পর হরু-বৌ এলো, কোনরকমে গলিগুলো পরিষ্কার করে জানিয়ে গেল, হরুর খুব কঠিন ব্যামো হয়েছে।

—'কোন ডাক্তার দেখছে?'—ন্যাড়ার মা জিজ্ঞেস করেন।

'বোস ডাক্তার।' হরুর বৌ উত্তর দিয়ে বলে, "কুছ রুপিয়া দিজিয়ে মাঈ, দাবাই কিননে হোগা।'

'এতো কামাই করলে পুরো মাসের মাইনে পাবে কি করে?'—ন্যাড়ার মা বলেন।

হরুর বৌ বলে—'যা পাবো বুঝবেন দেবেন।'

ন্যাড়ার মা দশ টাকা এনে রুকে রাখলেন। হরুর বৌ সেটা নিয়ে সেই যে গেল, দশ দিন আর দেখাই নেই।

'কি গো, হরুটার খোঁজ কর।' ন্যাড়ার মা ন্যাড়ার বাবাকে বলেন—'না হলে অন্য জমাদার দেখ।'

সন্ধ্যে বেলায় ন্যাড়ার বাবা স্টুডিও থেকে ফিরে বিমর্ষভাবে বললো—'হরুর অসুখটা খুব সিরিয়াস।'

'কি হয়েছে?' ন্যাড়ার মা উদ্বিগ্ন হন।

ন্যাড়ার বাবা জামা খুলতে খুলতে বললেন—'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে।'

'এদিকে আমার কি হবে বল তো?' ন্যাড়ার মা হরুর উৎকণ্ঠা ছেড়ে নিজের সমস্যায় এসে পড়লেন—'কাল শেতলা ষষ্ঠী, খালি বাথরুমে কত দিন ঝাঁট পড়ে নি হায়?'

সন্ধ্যে বেলায় ন্যাড়ার বাবা স্টুডিও থেকে ফিরে।

'তোমরা বড্ড সেলফিস'—ন্যাড়ার বাবা বিরক্তি প্রকাশ করেন।

ন্যাড়ার মা প্রথমে চুপসে যায়, তারপর আসতে আসতে রাগে ফুলতে ফুলতে বলেন—'কোন ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীকেই ঘরে আনলে পারতে।'

আজ শীতল-ষষ্ঠী। ন্যাড়ার মায়ের আজ সারাদিন উপোস, সন্ধ্যে বেলায় পুজো দিয়ে তবে মুখে কিছু দেবেন।

ন্যাড়ার দাদা বাজার থেকে মায়ের জন্যে অনেক রকম ফল এনে দিয়েছে, আপেল, লেবু, আখ।

'এই সময় আখ পেলি কোথায়?' ন্যাড়ার মা জিজ্ঞেস করেন।

ন্যাড়ার দাদা সগর্বে বলে—'ভুবনদার দোকানে বিক্রী হচ্ছিল।'

ন্যাড়ার মা আখ, আর লেবুগুলো দেখে কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে যান।

বিকেল বেলা, স্টুডিওতে ন্যাড়ার বাবা আর্ট ডিরেক্টার বুদ্ধদেবের সঙ্গে দু' নম্বর ফ্লোরের সামনে আগামী যে সেট'টার সুটিং হবে, সেইটে নিয়ে আলোচনা করছেন। হঠাৎ আচমকা হরুদের ছোট্ট নোংরা ব্যারাকের মতন ঘর থেকে ন্যাড়ার মায়ের গলা শুনে চমকে ঘুরে তাকান।

—'আরে কুছ ডর নেহি। ন্যাড়ার মায়ের কণ্ঠ।'

'বৌদির গলা নয়', আর্ট ডিরেক্টার বুদ্ধদেব বলে। হতবাক ন্যাড়ার বাবা নির্বাক হয়ে হরুর ঐ ভাঙ্গা কুঠরির দিকে এগিয়ে যান। ছোট্ট দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখেন—তাঁর স্ত্রী—ওরফে ন্যাড়ার মা হরুর মাথার কাছে বসে আছেন। হরু বিরাট শিশুর মতন চোখ বুজে শুয়ে আছে, মুখে মৃদু হাসি, পেছনে হরুর স্ত্রী।

ন্যাড়ার মা হরুর মাথায় শীতলা ষষ্ঠীর ফুল ঠেকিয়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন—'সব ভাল হয়ে যাবে, ডাব টাব এনে খাওয়া।'

হরুর স্ত্রীকে মুখ তুলে নির্দেশ দিতে গিয়ে দরজার কাছে নিজের স্বামীকে দেখে চমকে বলেন—'তুমি!'

'না মানে—' ন্যাড়ার বাবাও অপ্রস্তুত হয়ে বলেন—'হরুকে দেখতে এলাম। কিন্তু তুমি এখানে—'

'ঐ—ঐ হরুর নামেও ষষ্ঠীর পুজো দিলাম তো—তাই!' ন্যাড়ার মা জবাবদিহির ভঙ্গীতে বলেন—'মন্দির থেকে ফেরার পথে একবার দেখে গেলাম', বলে কথাগুলো কোন রকমে শেষ করে। পুজোর থালাটা নিয়ে ঘর থেকে ছোট্ট মেয়ের মতন ছুটে বেরিয়ে যান।

বিস্মিত ন্যাড়ার বাবাও ঘুরে দেখেন, ন্যাড়ার মা ঘোমটা টেনে পুজোর থালা নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টুডিওর গেটের দিকে যেতে যেতে বলছেন—'এই অবেলায় আবার চান করতে হবে।'

ন্যাড়ার বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে ফেলেন, স্টুডিওর ওধারের নারকেল গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সূয্যি ঠাকুর যেন ন্যাড়ার মায়ের এই কীর্তি দেখে ফিক করে হেসে ফেলেছেন, আর তাঁর হাসিতে সারা পশ্চিম আকাশটা লালে লাল হয়ে গেছে।

মণি ও মুক্তো

বড় বড় গাছেদের হুবহু সঠিক আকৃতি রেখে ছোট্ট টব-এ মিনি গাছ তৈরী করবার পদ্ধতির জাপানী নাম হল, বনসাই। ঘরে বসে প্রকৃতির কাছাকাছি যাবার এই অভিনব জাপানী প্রক্রিয়া বিস্ময়কর।

বাঙ্‌লার সালামিস্

—প্রসিত রায়চৌধুরী

স্বাধীন রাজ্য গড়েছে বাঙালী বীর,—
রোষে ওঠে ফুঁসে, আগ্রায় বসে
বাদশা জাহাঙ্গীর।
গৌড়ের যশ হরণ করেছে যশোর ধাম,
ঘরে ঘরে ওঠে মহাগৌরবে প্রতাপ নাম।
ইছামতী আর মাতলা বিদ্যাধরী,
নদীতে নদীতে টহল দিচ্ছে
প্রতাপের রণতরী।
মগ, ফিরিঙ্গী, বোম্বেটে যত,
ভয়ে প্রতাপের হয়ে আছে নত।
যমুনার কূলে ধূমঘাটে তাঁর
অরণ্য রাজধানী,
তাজ্জব কথা, এতে হল নাকি
মোগলের মানহানি!
জব্দ করিতে বিদ্রোহী "বেইমান",
তখুনি বেরুলো বাদশাহী ফরমান।

জাহাঙ্গীরের পেয়ারের দোস্ত
বঙ্গের সুবাদার,—
ইসলাম খাঁর মোগল বাহিনী
হল পদ্মার পার।
বাগোয়ান গ্রামে শ্রীভবানন্দ
মোগলের ক্রীতদাস,
ঘরের খবর শত্রুর কাছে
গোপনে করিল ফাঁস।
তারই এঁকে দেওয়া, গুপ্ত সড়ক দিয়ে,
মির্জানথন, এনায়েৎ এল,
তুরুক সৈন্য নিয়ে।
প্রতাপ গড়েছে বিশাল দুর্গ,
সাল্‌খা গাঙের ধারে;
মোগল বাহিনী বাজাইয়া ভেরী
এল সে দুর্গদ্বারে।
সভয়ে হেরিল দুর্গ বুরুজে
বিশাল কামান সারি,
সালখার খালে অগণিত "কোশা"
করিছে পাহারাদারী।

প্রতাপ-পুত্র উদয়াদিত্য
তরুণ বাঙালী বীর,
তীরের ফলায় ছিন্ন করেন,
তুরুক সেনার শির।
রণতরী তাঁর পশ্‌তা, জল্‌বা,
ঘুরাব, কোশা ও পিয়ারা,
তোপের আঘাতে করিল চূর্ণ
বাদশাহী ‘নওয়ারা’।
বীর সেনাপতি কমল খোজার
হাতে হয়ে নাজেহাল,
মোগল সেনারা পলায় সভয়ে
ছেড়ে সালখার খাল।
জয় নিশ্চয়, এমনি সময়,
সহসা একটি গুলি,
কোথা হতে আসি, ফুটো করে দিল
কমল খোজার খুলি।
বন্ধুবিয়োগে উদয়াদিত্য,
করিলেন মহাভুল,
জড়ো করিলেন সব রণতরী,
ভরি সালখার কূল।

মির্জানথন করিল তখন
সুচতুর কৌশল,
গড়ি তুলে 'থানা' সরু হয়ে যেথা
বহিছে নদীর জল।
তুরুক সেনারা অপটু জলেতে
ডাঙায় ভয়ঙ্কর,
তীর হতে তোপ দাগিয়া ধ্বংস
করিল নৌবহর।
তীর ও গুলিতে পড়িল বাঙালী,
যেন সব পাকা ফল,
বীরের শোণিতে লাল হয়ে গেল,
সালখার কালো জল।
ইছামতী খাল, 'সালখাই' হল
যেন নব 'সালামিস্', *
জারাক্‌সিস্‌কে হারালো যেথায়
নবজাগ্রত তরুণ গ্রীস।
কমল খোজার পতনেতে দিশেহারা,
উদয়াদিত্য কোশায় পালান,
পশ্চাতে নওয়ারা।
কুমারে বাঁচাতে প্রাণ দিল বলি,
পাঁচশ বাঙালী বীর,
নৌযুদ্ধের সে কাহিনী জানে,
ইছামতী নদীনীর।
দেখা যায় দূরে উড়িছে পতাকা,
বিশাল দুর্গশিরে,
শেষ আশ্রয় বাঙালী রাজার
যমুনা নদীর তীরে।
দিন শেষ হল, সূর্য বসিল পাটে,—
রাত্রে আঁধার গাঢ়তর হল,
রাজধানী ধূমঘাটে।

---

* এথেনীয় গ্রীকবীর থেমিস্টোক্লিসের নেতৃত্বে সালামিসের সংকীর্ণ সমুদ্রে পারস্যরাজ জারাকসিসের বিশাল নৌবহর ধ্বংস হয় ৪৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে।

যুবরাজ রহস্য

—বারীন্দ্রনাথ দাশ

প্রায় নয়শো বছর আগে পূর্ববঙ্গে বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করতো। গৌড়দেশে তখন পাল রাজবংশের পরাক্রম কমে আসছে। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে বিক্রমপুরেই ছিল তাদের রাজধানী। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম মহারাজ জাতবর্মা।

যেদিন সকালে আমাদের কাহিনী শুরু হচ্ছে, সেদিন রাজধানীতে খুব ধুমধাম। ভোর থেকেই শোনা যাচ্ছে রাজপুরীর তোরণশীর্ষে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশী। মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি। চারদিকে পতাকা ও আম্রপল্লব দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুন জামাকাপড় পরে নাগরিকেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে।

সেদিন যুবরাজ হরিবর্মার অভিষেক। মহারাজ জাতবর্মা যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করবে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে। এখন থেকে হরিবর্মা রাজকার্যে সহায়তা করবে মহারাজকে। মহারাজের বয়েস হয়ে গেছে। জাতবর্মার পরে সিংহাসনে আরোহণ করবে হরিবর্মা।

রাজ্যের সাধারণ প্রজারা কুমার হরিবর্মাকে খুব ভালোবাসতো। তার মন খুব দয়ালু। যুদ্ধবিদ্যার চাইতে জ্ঞানচর্চায় তার আগ্রহ অনেক বেশী। এই অল্প বয়েসেই

সে অনেক টোল ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে নানা দেশ থেকে পণ্ডিত অধ্যাপক মণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলো। রাজকার্যে তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতো না। পণ্ডিতদের সঙ্গে বসে শাস্ত্র ও কাব্য আলোচনাতেই তার উৎসাহ অনেক বেশী। এবং তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ভবদেব ভট্ট নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণ।

তাই বলে যে যুদ্ধবিদ্যার চর্চা সে অবহেলা করতো তা নয়। বেশ যত্নের সঙ্গে নানা রকম অস্ত্রচালনাও সে আয়ত্ত করেছিল। তার ব্রাহ্মণ বন্ধু ভবদেব ভট্টও সমরশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। নিয়মিত ব্যায়াম করে তার শরীরও খুব সুগঠিত।

কিন্তু রাজ্যের একদল অমাত্য চায়নি যে হরিবর্মা যুবরাজ হোক। তাদের বক্তব্য, হরিবর্মার প্রকৃতি একটু দুর্বল। রাজকার্যের চাইতে শাস্ত্র ও কাব্যে যার আগ্রহ বেশী, এমন লোককে রাজা করলে দেশের বিপদ হতে পারে। বঙ্গ রাজ্যের দু'দিকে দুটি প্রবল শত্রু, পূর্বদিকে কামরূপ, পশ্চিমে গৌড়। জাতবর্মার অন্য ছেলে কুমার সামলবর্মা অনেক বেশী উপযুক্ত। এরই মধ্যে সে তিন চারবার যুদ্ধে গিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছে। একদল অমাত্য চেয়েছিল, তাকেই যুবরাজ করা হোক।

জাতবর্মা বললো, সে কি করে হয়? হরিবর্মা আমার বড় ছেলে। যুবরাজ হবার অধিকার শুধু তারই।

সে-সব অমাত্য বললো,—কিন্তু সামলবর্মা বড় রানীর ছেলে। হরিবর্মা ছোট রানীর ছেলে। পট্টমহিষীর ছেলেই যুবরাজ হবে।

এ নিয়ে বেশ কিছুদিন বাদানুবাদ চলেছিল। প্রধান মন্ত্রীও তাদেরই দলে। পট্টমহিষী দেবী বীরশ্রী কলচুরিরাজ কর্ণের মেয়ে। মহারানীর দিদি দেবী যৌবনশ্রী গৌড়ের রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের পট্টমহিষী। তাই সামলবর্মার দাবীদারেরা দলে ভারী।

কিন্তু জাতবর্মা কারো কথা শুনলেন না। তিনি জানতেন কুমার হরিবর্মাকে প্রজারা ভালোবাসে। একদিন তিনি রাজসভায় ঘোষণা করলেন, যুবরাজ হবে হরিবর্মা।

বেলা দ্বিপ্রহরের একটু পরে যুবরাজের অভিষেক। তার বন্ধু ভবদেব ভট্ট সেই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত। স্নান আহ্নিক করে সে তৈরী হচ্ছিলো রাজপ্রাসাদে যাওয়ার জন্যে।

তখন সকাল বেলা। ভোর হওয়ার পর থেকে চার পাঁচ দণ্ড মোটে কেটেছে। হঠাৎ তার বাড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামলো মহারাজ জাতবর্মার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীর একজন সৈনিক। সঙ্গে আরেকটি ঘোড়া। সে ভবদেবকে জানাল,—মহারাজ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। খুব জরুরী দরকার। এক্ষুণি যেন চলে আসে সেই সৈনিকের সঙ্গে।

একলা ঘরে পায়চারি করছিল মহারাজ জাতবর্মা। ভবদেব ঘরে ঢুকতে পেছন দিকে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

—কী আদেশ মহারাজ?

ভবদেব, তুমি হরিবর্মার বন্ধু। তুমিও আমার ছেলের মতো। একটা সাংঘাতিক বিপদ হয়েছে। আমি কারো উপর ভরসা করতে পারছি না। প্রধান মন্ত্রীর উপরও না।

অমাত্যদের উপরও না। আমার প্রধান সহায় নগর রক্ষীবাহিনীর প্রধান ভুজঙ্গধর আর আমার রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক যক্ষপাল। কিন্তু এখন আমি কাউকে কিছু জানাতে চাই না। কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে, আজকের সমস্ত উৎসব আয়োজন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তুমি খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাই তোমাকেই ডেকে পাঠালাম।

বিস্মিত ভবদেবকে ব্যাপারটা খুলে বললো জাতবর্মা।

কাল রাত্রি প্রথম প্রহরের পর কুমার হরিবর্মা একবার মন্দিরে গিয়েছিল দেবীকে প্রণাম করার জন্যে। দেবী চামুণ্ডার মন্দির রাজবাড়ির ভেতরেই। সেখান থেকে ফিরে প্রাসাদের ভেতর নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। সঙ্গে ছিল কুমারামাত্য লক্ষ্মীনাথ। এই রাজবংশের কুলাচার অনুযায়ী অভিষেকের আগের দিন রাত্রে যুবরাজকে উপবাস করে থাকতে হয়। তাই জাতবর্মার সঙ্গে খেতে আসেনি প্রত্যেক দিনকার রীতি অনুযায়ী। লক্ষ্মীনাথ হরিবর্মাকে তার ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। রাজা বা রাজকুমারদের শয়ন প্রকোষ্ঠে অন্য কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। হরিবর্মা ঘরে ঢোকার পর চারজন রক্ষী সে-ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে পাহারায় রইল। লক্ষ্মীনাথ যাওয়ার সময় রক্ষীদের বলে গেল, মহারাজকুমার উপবাস করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তাকে যেন আর বিরক্ত করা না হয়।

রাত কেটে গেল। সকাল হলো। রাজকুমারের দরজা আর খোলে না। এমনি নিয়ম হলো, দরজা ভেতর থেকে আগল দেওয়া থাকে না, কিন্তু রাজা বা রাজকুমার ভেতর থেকে না ডাকলে কেউ দরজা খুলে ভেতরে যায় না। আর রক্ষীরা অত্যন্ত সজাগ ও বিশ্বস্ত। ওরা কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না। না ডাকলে নিজেরাও যাবে না।

মহারাজের কাছে খবর গেল যে দু'দণ্ড বেলা হয়ে গেল, এখনও হরিবর্মা ঘর থেকে বেরোয়নি। অথচ তার বেরিয়ে আসার কথা প্রত্যুষেই। ভোর থেকেই নানারকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা।

জাতবর্মা নিজে এসে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। ঢুকে দেখে ঘর ফাঁকা। হরিবর্মা ঘরের ভিতর কোথাও নেই। এমন কি তার শয্যাও তেমনি পরিপাটি করে রাখা আছে। রাত্তিরে সেই শয্যা কেউ ব্যবহার করেছে বলে মনে হলো না।

জাতবর্মা বললো,—কিন্তু সে কোথায় যেতে পারে? সে ঘরে ঢুকেছে রক্ষীদের চোখের সামনে। লক্ষ্মীনাথ নিজে তাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে। সারারাত দরজার বাইরে রক্ষীদের সজাগ পাহারা। সুতরাং দরজা দিয়ে বেরোয় নি। সে ঘরে কোনো গুপ্ত দ্বারপথ নেই যে অন্যের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়বে। ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই। এবং লুকিয়ে থাকবেই বা কেন? ঘরের ওপাশে একটি অলিন্দ আছে, আর একটি গবাক্ষ আছে। কিন্তু এ-ঘর পাঁচতলায়। ওখান থেকে লাফিয়ে নিচে নামা অসম্ভব। কেউ যে ঘরে ঢুকে হরিবর্মাকে তুলে নিয়ে যাবে, সেটা আরো বেশী অসম্ভব। উপরে ষষ্ঠতলে মহারাজ জাতবর্মা নিজে থাকে। তার উপরে সপ্তমতলে মহারাজের বিলাসগৃহ। রাত্রিবেলা সেখানে কেউ বড় একটা যায় না।

এখন সমস্যা হলো, হরিবর্মা গেল কোথায়? কেনই বা সে নিখোঁজ হলো? তোমায় এ সমস্যার সমাধান করতে হবে ভবদেব।

সে জানতে চাইলো,—প্রাসাদে এ খবর আর কে জানে?

জাতবর্মা বললো,—শুধু ওই চারজন রক্ষী জানে আর প্রাসাদরক্ষীদের অধিনায়ক যক্ষপাল জানে। খবরটা খুব গোপন রাখা হয়েছে। হাতে বেশী সময় নেই। হরিবর্মাকে না পেলে কি হবে কে জানে? কাউকে ডেকে যে জিজ্ঞেস করবো, জেরা করবো, তারও উপায় নেই।

—না, না, তা করবেন না,—ভবদেব বললো,—তাহলেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।

—তুমি কোনো উপায় করতে পারবে না ভবদেব?

সে এক মুহূর্ত রাজার দিকে তাকালো, তারপর শান্তভাবে বললো,—হ্যাঁ, পারবো। মানুষের বুদ্ধির অসাধ্য কিছু নেই।

—কিন্তু কি ভাবে পারবে, আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

ভবদেব উত্তর দিলো,—বেশ বুঝতে পারছি মহারাজকুমারকে কেউ সরিয়ে গুম করেছে। স্বার্থ শুধু একটাই। যাতে কুমার সামলবর্মাকে যুবরাজ করার সুযোগ তৈরী করা যায়। যদি এই পরিকল্পনা আমাকে তৈরী করতে হতো, আমি কি করতাম? আমাকে বেশীক্ষণ ভাবতে হয় নি মহারাজ। ব্যাপারটা অতি সহজ। এত সহজ যে, বিশ্বাস করা যায় না, তাই এত জটিল মনে হচ্ছে। কিন্তু মহারাজ, যক্ষপালকে হুকুম দিন প্রাসাদের চারদিকে নজর রাখতে। কাউকে আটকানোর দরকার নেই। শুধু নজর রাখবে, সবার অলক্ষ্যে যুবরাজকে যেন প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না হয়।

—চারদিকে কড়া পাহারার হুকুম আমি এরই মধ্যে দিয়ে রেখেছি। কিন্তু তোমার কি ধারণা হরিবর্মা এখনও প্রাসাদের ভেতরেই আছে?

—মহারাজ, রাত্তিরে কাউকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দিনের বেলা আজ অনেক লোকের যাওয়া-আসা চলতে থাকবে। তখন অনেক সোজা।

—কিন্তু হরিবর্মাকে তখন বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে তো সবাই টের পেয়ে যাবে। ওকে তো সবাই চেনে।

ভবদেব একটু হাসলো। বললো,—আমি হলে কি করতাম? এ কথা আগেই ভেবে নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করতাম। আপনি ভাববেন না মহারাজ, আমি একটু পরে খুঁজে আনছি মহারাজকুমারকে।

—চলো, আগে তোমায় হরিবর্মার শয়নকক্ষটা দেখিয়ে আনছি।

—কিছু দরকার নেই মহারাজ। আমি সে ঘরের অবস্থান মোটামুটি জানি। অলিন্দের ওপারে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর উদ্যান। সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ থাকে না। সুতরাং ওদের কাজ খুব সহজ হয়েছে।

—কিন্তু ভবদেব, ওকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে গেল কি করে? হরিবর্মা দুর্বল নয়, নিশ্চয়ই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো, রক্ষীদের ডাকতো। সামনের দরজা দিয়ে নিশ্চয়ই বেরোয়নি। রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যেতো। অলিন্দ দিয়ে ভেতরে ঢোকা বা কাউকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসা অসম্ভব, কারণ হরিবর্মার কক্ষ প্রাসাদের পঞ্চম তলে।

ভবদেব একথার উত্তর দিলো না। শুধু একটু হাসলো। তারপর বললো,—আমার শুধু একটি প্রশ্ন। মহারাজকুমারের প্রকোষ্ঠের নিচের তলার কক্ষে কে থাকে?

—ওখানে আগে থাকতো আমার ছোটো ভাই, কুমার কাঞ্চনবর্মা। কিন্তু অভিষেক উপলক্ষে কলচুরিরাজ কর্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার চন্দ্রসেন এখানে এসেছেন বলে তাঁকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

কুমার চন্দ্রসেন?—ভবদেবের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো,—মহারাজ, আমার যেটুকু সংশয় ছিলো, তাও মিটে গেল। আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা। আমার দুটি অনুরোধ রাখতে হবে মহারাজ। এক, আপনি কুমার সামলবর্মা, কুমার চন্দ্রসেন ও কুমারামাত্য লক্ষ্মীনাথকে এখানে ডেকে পাঠান। ওদের আর কিছু বলবেন না, শুধু নানা রকম কুশল প্রশ্ন করবেন। এবং পরেও বলবেন না কোনো কথা। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওরা যেন এখানেই থাকে। দুই, আমার সঙ্গে আসতে বলুন প্রাসাদরক্ষীদের অধিনায়ক যক্ষপাল ও দুজন রক্ষীকে। আমার অনুরোধ, পরে আপনি মহারাজকুমার হরিবর্মাকেও কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। পরে শুধু আপনাকে আমিই যা জানানোর জানাবো।

কাউকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। একদণ্ড কালের মধ্যেই ভবদেব ভট্ট আর যক্ষপাল ফিরে এলো। সঙ্গে মহারাজকুমার হরিবর্মা।

সামলবর্মা, চন্দ্রসেন আর লক্ষ্মীনাথ ভীষণ চমকে উঠলো, যেন ভূত দেখেছে। বিস্মিত হলো মহারাজ জাতবর্মাও।

হরিবর্মার চুলগুলো এলোমেলো, পরনে খুব সাধারণ নাগরিকের পোশাক। চোখে কালি পড়ে গেছে।

কোনো প্রশ্ন করলো না জাতবর্মা। শুধু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো,—সারারাত ঘুম হয় নি বুঝি? এখন গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। তারপর স্নান করে আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরী হতে হবে।

এর পর মিষ্টি কথায় বিদায় দিলো চন্দ্রসেন, সামলবর্মা আর লক্ষ্মীনাথকেও। ঘরের মধ্যে রইলো ভবদেব ভট্ট আর যক্ষপাল।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ভবদেব,—জাতবর্মা বললো,—হরিবর্মাকে তুমি কোথেকে খুঁজে বার করলে?

ভবদেব বললো,—আপনাকে এক্ষুণি সব বুঝিয়ে বলছি। আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে মহারাজ। এ-ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বেরিয়ে আসতে হবে।

তিনজনেই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ভবদেব বললো,—মহারাজ, এটি ষষ্ঠতলের কক্ষ। দরজায় পাহারা আছে। ওদের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব, কেমন, তাই না? আর ওদিকে যে অলিন্দ, সেখান থেকে কারো নিচে নামা অসম্ভব, বা নিচে থেকে ওপরে ওঠা অসম্ভব, আচ্ছা, এই আমি ভেতরে ঢুকছি, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক। এক থেকে গুনতে থাকুন, যখন একশো পর্যন্ত হবে, ঘরে ঢুকে পড়বেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জাতবর্মা আর যক্ষপাল ঘরে ঢুকলো। ঘরের ভিতর কেউ কোথাও নেই। অলিন্দে বেরিয়ে এসে নিচের দিকে তাকালো জাতবর্মা। জিজ্ঞেস করলো,—কোথায় গেল ভবদেব ভট্ট?

যক্ষপালের মুখে একটু হাসি। বললো,—মহারাজ, উনি নিজে এসেই বলবেন। ওই তো উনি আসছেন।

জাতবর্মা ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ভবদেব হাসিমুখে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে।

—এসব কি ভোজবাজি নাকি ভবদেব?

—সত্যিই ভোজবাজি মহারাজ, এবং ভোজবাজি বলেই সবটাই চালাকি আর চোখের ফাঁকি।

—কি রকম?

ভবদেব অলিন্দে এসে দাঁড়ালো। চিৎকার করে একটা সঙ্কেত পাঠালো নিচে। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীর সাঁ করে উপর দিকে উঠে গেল, তার পেছনে একটা দীর্ঘ মজবুত দড়ি বাঁধা। ভবদেব হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরে ফেললো, দড়িটা ভেতরে টেনে এনে তার থেকে তীরটা খুলে বাইরে ফেলে দিলো। দড়ির অন্য প্রান্ত তখন নিচে কেউ ধরে আছে। ভবদেব দড়িটা অলিন্দের একটি থামের এ পাশ দিয়ে এনে অন্য দিকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দিলো। তারপর বললো,—মহারাজ, দড়িটা খুব শক্ত। যার অভ্যেস আছে, যার শরীর খুব ব্যায়ামপুষ্ট, যার অনুশীলন আছে, সে এই দড়ি বেয়ে নিচের অলিন্দে নেমে যেতে পারবে। নিচে একজন দড়ির অন্য প্রান্ত খুব জোরে চেপে ধরে আছে। পরে সে দড়িটা টেনে নামিয়ে নেবে। কেউ যে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেছে, তার প্রমাণ আর থাকবে না। আমিও তাই করেছি। মহারাজ, রাজকুমারকে আমি সব বলেছি। সেই তীরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে উপর দিকে ছুঁড়েছিলো, সেই দড়ি ধরে আমি নিচে নেমে গেছি। তাই মহারাজ ঘরে ঢুকে আমায় আর দেখতে পান নি।

—দড়ি কোথায় পেলে?

—কুমার চন্দ্রসেনের ঘরে। মহারাজ তাঁকে এখানে ডেকে আনার পর আমি আর যক্ষপাল তাঁর ঘরে একটু খোঁজাখুঁজি করেছি, সেখানে দড়ি পেয়েছি, তীর-ধনুক পেয়েছি, এবং কাল রাতে মহারাজকুমার যে পোশাক পরেছিলেন, সে-সবও পেয়েছি।

—কিন্তু ভবদেব, আমি বুঝতে পারছি না, ওরা দড়ি দিয়ে হরিবর্মাকে ওখানে নামালো কি করে, হরিবর্মার ঘরে ঢুকলোই বা কি করে? তুমি কি বলতে চাও হরিবর্মা কাল সারারাত চন্দ্রসেনের ঘরেই আটক হয়েছিল?

ভবদেব উত্তর দিলো,—না মহারাজ। কাল রাতে মহারাজকুমার এ ঘরে ছিলেনই না। যিনি এ ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি কুমার চন্দ্রসেন। তাঁর ঘরে তখন ছিলো কুমার সামলবর্মা আর লক্ষ্মীনাথ। ওদেরই একজন তীর ছুঁড়ে দড়ি উপর দিকে পাঠিয়েছিল, আর দড়িটা চেপে ধরেছিল যখন কুমার চন্দ্রসেন নিচে নেমে গেল।

শুনে খুব অবাক হলো মহারাজ জাতবর্মা। বললো,—হরিবর্মা কাল তার ঘরে যায় নি?

—না মহারাজ, তার পোশাক পরে গিয়েছিল কুমার চন্দ্রসেন।

—সে কি? কেউ টের পেলো না?

—মহারাজ, এই ষড়যন্ত্রের আরেকজন নায়ক কুমারামাত্য লক্ষ্মীনাথ। তার সঙ্গে কুমার চন্দ্রসেন যখন উপরে উঠে এলেন, যদি কেউ দেখে থাকে তো কিছু সন্দেহ করে নি। এখানে রক্ষীরা ভাবলো, মহারাজকুমার
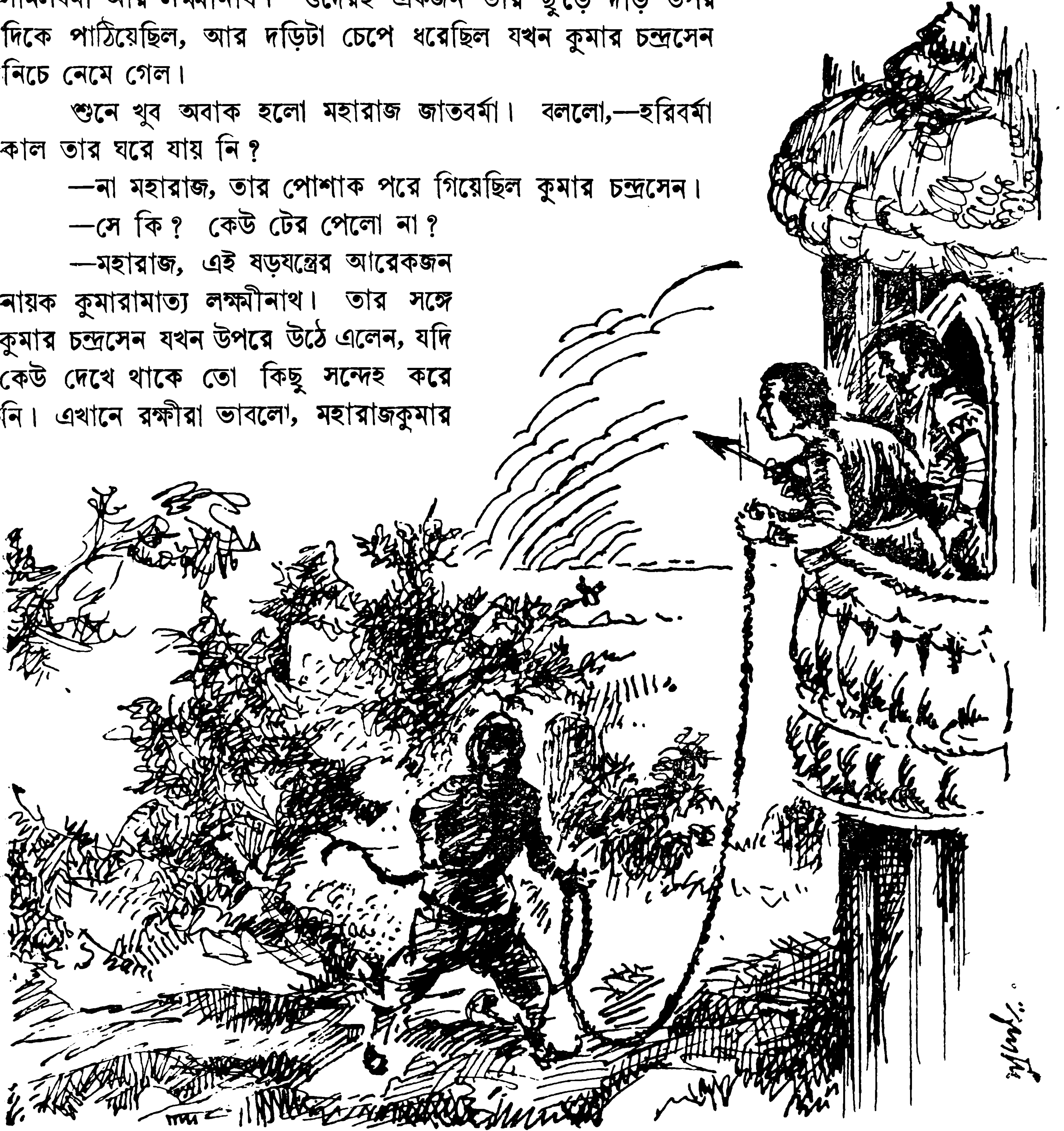
ভবদেব হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরে ফেললো। [পৃঃ ২৬৬

হরিবর্মা আসছেন, ওরা রীতি অনুযায়ী চোখ নিচু করে রইলো। বাইরের দিকে তখন মৃদু প্রদীপের আলো। কুমার চন্দ্রসেনের পরনে মহারাজকুমারের পোশাক। সঙ্গে কুমারামাত্য লক্ষ্মীনাথ নিজে। তাই রক্ষীদের মনে কোনো সন্দেহ হলো না। কেউ চোখ তুলে তাকালোও না। কুমার চন্দ্রসেন আর মহারাজকুমার হরিবর্মার শরীরের গঠনের একটা মিল আছে, এবং দুজনেরই গায়ের রং খুব ফরসা। তাই রক্ষীরা চোখ তুলে কেউ তাকায়নি বলে কারো মনে কোনো সন্দেহ হয়নি।

জাতবর্মা বললো,—এখন থেকে আমি নিয়ম করে দেব রাজা বা রাজকুমারদের দেখে রক্ষীরা কখনও চোখ নিচু করবে না। কিন্তু ভবদেব, চন্দ্রসেন হরিবর্মার পোশাকই বা পেলো কি করে আর হরিবর্মাই বা সারারাত ছিলো কোথায়?

ভবদেব উত্তর দিলো,—মহারাজ, মন্দিরের মধ্যে আমাদের শত্রুরা মহারাজকুমারকে কাবু করে ফেলেছিল। মন্দিরের পূজারীও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। মন্দিরের পেছন দিকের একটি প্রকোষ্ঠে মহারাজকুমারকে সারারাত হাত পা মুখ বন্ধ করে ফেলে রাখা হয়েছিলো। আজ সকালে তাকে বাইরে পাচার করে দেওয়া হতো।

—কি করে?

—সেটা আমি ঠিক জানি না। তবে আমি হলে কি করতাম? মন্দিরের পাশেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অসংখ্য বড় বড় ঝুড়ি। তাতে করে ফল মিষ্টি যাবে মহারাজের প্রিয়পাত্রদের বাড়ি বাড়ি। মহারাজ, হয়তো একটি ভালো করে ঢেকে দেওয়া বেশ বড়ো ঝুড়ি বেরিয়ে আসতো মন্দিরের পেছন দিকের প্রকোষ্ঠ থেকে, অসংখ্য ঝুড়ির সঙ্গে সেই ঝুড়িও একজন কেউ বয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে যেত প্রাসাদ থেকে, কেউ আটকাতো না। তারপর কোথায় যেতো, মহারাজকুমারের কি হতো, সেটা আমরা শুধু অনুমান করতে পারি মাত্র।

মহারাজ জাতবর্মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো,—তুমি কি করে সব জেনে গেলে ভবদেব?

—খুব সহজ যুক্তি মহারাজ। ঐ শয়নকক্ষ থেকে মহারাজকুমার কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে না। কেউ তাকে বার করে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, নিচের তলার অলিন্দে যদি কোনো সহযোগী থাকে তাহলে উপর থেকে একজনের নিচে নেমে যাওয়া দুঃসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু মহারাজকুমার নিজে ওরকম নেমে যাওয়ার চেষ্টা করবেন কেন? তাহলে হয়তো অন্য কেউ নেমে গেছে, এবং সেই ঘরে ঢুকেছিল রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে। আমি ভেবে দেখলাম, কুমারামাত্য লক্ষ্মীনাথের সহায়তা থাকলে এভাবে রক্ষীদের চোখে ধুলো দেওয়া খুব শক্ত নয়। তাহলে মহারাজকুমার কোথায়? তার সম্বন্ধে শেষ নিশ্চিত খবর, সে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, তাহলে অনুসন্ধান সেদিকেই করতে হবে। ব্যাপারটা খুব সরল মহারাজ, আমাকে বেশী মাথা ঘামাতে হয়নি। ওরা বড্ড বেশী ঝুঁকি

নিয়েছিল। তবে রাজত্ব পাওয়ার জন্যে লোকে কত রকম ঝুঁকি নেয়, তা তো আপনি জানেন।

মহারাজ জাতবর্মা ভবদেবের হাত চেপে ধরলো। বললো,—তুমি আমার ছেলের মতো, তোমায় কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না। আজ থেকে তুমিই হবে যুবরাজ হরিবর্মার কুমারামাত্য।

ইতিহাস বলে, মহারাজ জাতবর্মার পর যুবরাজ হরিবর্মাই রাজা হয়েছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট হয়েছিলেন মহারাজ হরিবর্মার মন্ত্রী। তিনি বাংলার ইতিহাসের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

মহারাজকুমারকে হাত পা মুখ বন্ধ করে সারারাত··· [পৃঃ ২৬৮

কুমার সামলবর্মাকেও হতাশ হতে হয়নি। হরিবর্মার পর তার এক ছেলে রাজত্ব করেছিলো কিছুদিন। তার নাম ইতিহাস ভুলে গেছে। এই ছেলের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের পর বঙ্গের সিংহাসনে বসেছিলেন কুমার সামলবর্মা। ইতিহাস তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। শুধু তার নামটি মনে রেখেছে।

মণি ও মুক্তা

পাশের ছবির বিরলতম প্রায় লুপ্ত হয়ে আসা জন্তুটির নাম মাস্ক-অক্স (Mask-Ox)। এদের বাস গ্রীনল্যাণ্ডের অন্তর্গত ড্যাস মার্কসেভেন নামক স্থানে। ষাঁড় ও ভেড়ার মিশ্র আকৃতির এই আজব জীবটি দেখতে বড়ই কদাকার।

সেই একলা নীলমানুষ

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[রণজয় নামে একটি ছেলে তাদের গ্রামের নদীতে একদিন সকালবেলা একটা গোল ধাতুর বল ভাসতে দেখে। সেটা সে ছোঁয়ার পর থেকেই তার চেহারার বদল হতে থাকে। তার গায়ের রং হয়ে যায় কলমের কালির মতন নীল আর সে লম্বা হতে হতে প্রায় সাড়ে সাত ফুট হয়ে যায়। তখন গ্রামের সব লোক, এমন কি তার মা-বাবাও তাকে দৈত্য ভেবে ভয় পায়। কিন্তু তার মনটা রয়ে গেছে ঠিক আগেরই মতন। এরপর তাকে একদিন ধরে নিয়ে যায় অন্য গ্রহের নীল মানুষরা। সেই অদ্ভুত গ্রহে কিছুদিন থাকবার পর সে একদিন কোনো ক্রমে সেখান থেকে পালায়। কিন্তু রণজয় রকেট চালাতে জানে না, ঐ রকেট চালাচ্ছিল একটা পুতুল-মেয়ে। রণজয় আর একটা গ্রহ দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা আরও বিপজ্জনক। সেখান থেকেও সে অতি কষ্টে পালিয়ে আবার রকেটে চেপে বসেছে। কিন্তু পুতুল-মেয়েটিরও দম ফুরিয়ে গেছে। এখন চলন্ত রকেটে রণজয় একদম একা। তারপর—।]

রণজয় মেয়ে-পুতুলটিকে দু' একবার উল্টে-পাল্টে দেখলো। তার ধারণা, স্প্রিং-এর পুতুলের মতন এরও নিশ্চয়ই গায়ে কোথাও চাবিটাবি আছে। দম দিয়ে দিলেই আবার চলবে। কিন্তু এ তো সাধারণ পুতুল নয়, এ হচ্ছে রোবো। দারুণ সূক্ষ্ম এর যন্ত্রপাতি। ওকে ঠিক করার সাধ্য রণজয়ের নেই।

শুয়ে থাকা পুতুলটিকে অবিকল একটা মেয়েরই মতন দেখতে। ওর জন্য খুব দুঃখ হলো রণজয়ের। পুতুলটি কথা বলতে পারতো না বটে কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে তাকাতো, হাসতো আর মাঝে মাঝে ওর গা থেকে টুং-টাং শব্দ হতো, তবু মনে হতো, একজন কেউ সঙ্গে আছে।

কিন্তু এখন রণজয় একদম একা।

রকেটটা কত মাইল গতিতে যাচ্ছে রণজয় জানে না। মহাকাশে মহাশূন্যে কোথাও কিছু দেখা দেয় না। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন রণজয়ের ভয় হয় যে হঠাৎ কোনো গ্রহতে ধাক্কা লাগলে একেবারে সবসুদ্ধু ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু রণজয়ের কিছু করবারও তো নেই। সে দু' একবার রকেটটার নানান বোতাম টিপে দেখেছে, কিন্তু তাতে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে না। এই রকেটটা যেন সোজাই চলতে জানে শুধু।

অন্ধকার কেটে গিয়ে মাঝে মাঝে আলোর মধ্যেও এসে পড়ে রকেটটা। আমরা যে আলো চিনি, শুধু সেই আলো নয়, কত রকমের অদ্ভুত আলো। কমলা-বেগুনি-নীল-সবুজ রঙের আলো।

মাঝে মাঝে খুব দূরে একটা কোনো জ্বলজ্বলে নক্ষত্র বা উল্কাও সে দেখতে পায়, কিন্তু সেদিকে সে তো ইচ্ছে করলেও যেতে পারবে না।

রকেটটাই বা এরকম ভাবে কতদিন চলবে? এক সময় নিশ্চয়ই জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। তখন কী হবে? রণজয় আর ভাবতে পারে না।

রণজয়ের খিদে পেয়েছে। বেঁচে থাকতে হলে তো কিছু খেতে হবেই।

রণজয় চালকের আসন ছেড়ে উঠে সারা রকেটটা ঘুরে দেখতে গেল।

রকেটটা বেশ ছোট। ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিই বেশি। তা ছাড়া আছে একটি মাত্র ঘর, আর একটা বাথরুম। খাবার জিনিস রাখবার কোনো ব্যবস্থাই নেই।

তখন রণজয়ের মনে পড়লো এটা আকাশে-ওড়া পরীক্ষার রকেট। মানুষ নেবার কথা নয়। সারি সারি এরকম অনেক অনেক ছোট রকেট সাজানো ছিল নীল মানুষদের গ্রহে, প্রত্যেকটিতেই একটা করে পুতুল-মেয়ে। রণজয় সেই রকমই একটা রকেট চুরি করে পালিয়েছে।

আকাশে-ওড়া পরীক্ষার রকেট বলেই এতে কোনো খাবার রাখা নেই। রোবো পুতুলগুলোর আরও কম। তাহলে জালানিও তো বেশি থাকবার কথা নয়, তবু রকেটটা দিনের পর দিন চলছে কী করে?

কিন্তু মানুষ, সব সময়ই বাঁচতে চায়। রণজয় ভাবলো, না খেয়েও তো মানুষ

অনেকদিন বাঁচতে পারে। শহীদ যতীন দাস জেলখানার মধ্যে বাষট্টি দিন না তেষট্টি দিন যেন অনশনে ছিলেন। তার মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটে যাবে। তবে রণজয় কি অতদিন পারবে? এর মধ্যেই তার পেটে খিদের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

কিছুই করবার নেই বলে রণজয় নিরাশভাবে চোখ বুজে বসে রইলো। একটু বাদেই ঘুম এসে গেল তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে জানে না, হঠাৎ একটা কর্কশ শব্দে তার ঘুম ভাঙতেই সে চমকে লাফিয়ে উঠলো।

কোথা থেকে এলো আওয়াজ। এই মহাশূন্যে তো কোনো রকম শব্দ নেই। এমন কি রকেটের শব্দও ভেতরে বসে শোনা যায় না। চারদিকের স্বচ্ছ কাচের জানলায় রণজয় ঘুরে ঘুরে দেখে এলো। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু অসীম শূন্য। তবে এ জায়গাটা অন্ধকার নয়, পাতলা নীল আলো ছড়িয়ে আছে।

তখন রণজয় ভাবলো, তাহলে নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখেছে। এই কথা ভাবতে না ভাবতেই আবার সে শুনতে পেল সেই রকম শব্দ। দুর্বোধ্য ভাষায় কে যেন তাকে ধমকে কিছু বলছে।

এবারে সে লক্ষ্য করলো, ইঞ্জিন ঘরের ওপর দিকে একটা জাল ঢাকা দেওয়া গোল গর্ত। আওয়াজটা আসছে সেখান থেকে। ওটা নিশ্চয়ই খবর পাঠাবার যন্ত্র। বহু দূর থেকে কেউ তাতে ডাকছে?

কিন্তু একটা অক্ষরও যে বোঝবার উপায় নেই। এমন কি মানুষের গলার আওয়াজ কিনা তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টিয়াপাখি মানুষের মতন কথা বলতে শিখলে যেমন হয়, অনেকটা যেন সেই রকম শোনাচ্ছে।

বসবার জায়গাটার ওপর দাঁড়াতেই রণজয়ের মুখ সেই গোল গর্তটার কাছে পৌঁছে গেল।

সে বাংলাতেই চেঁচিয়ে বললো, তোমরা কে? কোথা থেকে কথা বলছো? আমি তোমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিশ্চয়ই রণজয়ের কথা ওরা শুনতে পেয়েছে, কেন না তক্ষুণি আরও এক গাদা ক্যাঁকো-ম্যাকো-ট্যাঁকো ধরনের শব্দ ভেসে এলো।

রণজয় বললো, আমি পৃথিবীর মানুষ। আমি শুধু বাংলা ভাষা জানি। আর একটু একটু ইংরিজি। তোমরা কি পৃথিবীর নাম শুনেছো?

আবার ভেসে এলো সেই ক্যাঁকো-ম্যাকো-ট্যাঁকো।

রণজয় বললো, দূর ছাই! এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

তখন সেও ওদের নকল করে ক্যাঁকো-ম্যাকো-ট্যাঁকো ধরনের শব্দ করতে লাগলো।

তাতেই ওদিককার শব্দ থেমে গেল হঠাৎ।

তারপর অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। রণজয় গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো, কারা এরকম ভাবে কথা বলছিল তার সঙ্গে। কত দূরে তারা আছে। জানলার দিকেও সে চোখ রেখেছে, যদি কিছু দেখা যায়।

যদি রণজয়ের মন ভালো থাকতো, যদি খাবার-দাবারের কোনো অভাব না থাকতো, যদি বাড়ি ফিরে যাবার সব রকম সুবিধে থাকতো, তাহলে এই রকম সময়ে বাইরের দৃশ্য দেখতেও খুব ভালো লাগতো তার।

খুব নরম নীল আলো ছড়িয়ে আছে বাইরে। তার মধ্যে এখন কোথা থেকে উড়ে আসছে কমলা রঙের থোকা থোকা মেঘ। দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো তারা, ঠিক হীরের মতন ঝকঝকে।

সেই তারা দুটো ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। আরও একটু বাদে বোঝা গেল, সে দুটো তারা নয়, দুটো উজ্জ্বল রকেট।

রণজয়ের মনে হলো, ওরা নিশ্চয়ই তাকে তাড়া করে আসছে। ওরাই তা হলে ক্যাঁকো-ম্যাকো-ট্যাঁকো করেছিল।

রণজয় মরীয়া হয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে বোতাম টিপতে লাগলো। যদি রকেটের মুখ অন্য দিকে ঘোরানো যায়। কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। কমপিউটারে বারবার লাল আলো জ্বলতে লাগলো।

ঐ রকেটে কী রকমের প্রাণী আছে কে জানে? হয়তো তারা খুবই হিংস্র। লড়াই করবার মতন কোনো অস্ত্রও নেই রণজয়ের কাছে। বাবা মা তার নাম রেখে-ছিলেন রণজয়, কিন্তু এরকম যুদ্ধে সে কী করে জিতবে!

রকেট দুটো আর একটু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল রণজয়ের রকেটের কাছে। ওদের রকেট অনেক বড়। ওদের দুটো চলে গেল দু' পাশে। তারপর চলতে লাগলো সমান গতিতে।

রণজয় ভাবলো, ওরা কি তাকে বন্দী করবে, না দূর থেকে একটা অস্ত্র ছুঁড়ে পুরো রকেটটাই ধ্বংস করে দেবে! চলন্ত রকেট থেকে তাকে বন্দী করবে কী করে? কাছাকাছি এলেই তো ধাক্কা লাগবে।

তারপর রণজয় দেখলো, ডান দিকের রকেটটা থেকে একটা সুতো ছুটে আসছে তার দিকে। ঠিক গুলিসুতোর মতন পাতলা, আসছে একেবারে সোজা। সেই সুতোটা তার রকেটে লাগতেই তার রকেটের গতি কমতে লাগলো। একটু বাদে একদমই থেমে গেল।

রণজয় যাকে পাতলা গুলিসুতো ভেবেছে, তা আসলে চুম্বক-আলো। এই চুম্বক-আলো দিয়ে যে কোনো গতিশীল জিনিসকে থামিয়ে দেওয়া যায়। এই চুম্বক-আলোর ব্যবহার পৃথিবীর মানুষ জানে না।

তারপর লাটাই গুটিয়ে যে রকম ঘুড়ি নামানো হয়, সেই রকম ভাবেই সেই আলোয় সুতো টেনে টেনে রণজয়ের রকেটটা কাছে নিয়ে গেল ওরা।

এখন ওদের হাতে ধরা দেবার বদলে আর একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। রকেটের দরজা খুলে রণজয় মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ঝাঁপানো মাত্রই অবশ্য সে মরে গিয়ে তার শরীরটা একটা শক্ত পাথরের টুকরোর মতন হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় অনন্তকাল ধরে ঘুরবে।
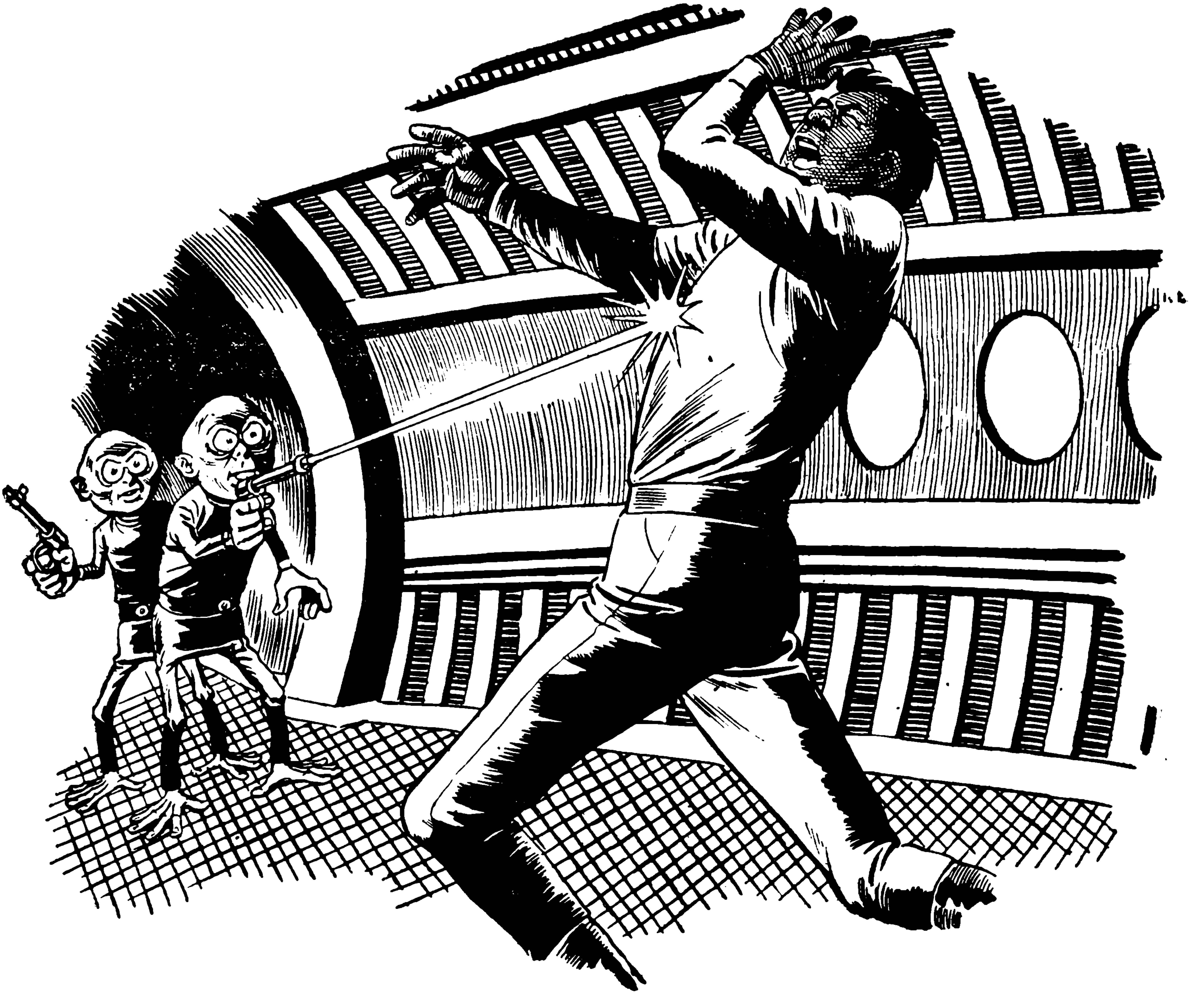
ওদের একজন পিচকিরি থেকে খানিকটা আলো ছুঁড়লো।

দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে রণজয় দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে।

দরজা কিন্তু তক্ষুণি খুললো না। রণজয়ের রকেটটা পুরোই ঢুকে গেল অন্য রকেটটার পেটের মধ্যে। একটা বিরাট তিমি মাছ যেমন অন্য মাছ খেয়ে ফেলে, সেই রকম বড় রকেটটা খেয়ে ফেললো ছোট রকেটটাকে। তারপর আপনা আপনিই দরজা খুলে গেল।

মাত্র সাত জন প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। তাদের মানুষ বলা যায়, না-ও বলা যায়। উচ্চতায় তারা তিন চার ফুট মাত্র, তাদের পাগুলো খুব সরু সরু, পায়ের পাতা নেই বললেই চলে, পাখির মতন শুধু পাঁচটা আঙুল রয়েছে। শরীরও রোগা, হাতগুলো ছোট ছোট কিন্তু হাতের মুঠো বেশ বড়। মুখগুলো মানুষের মতন হলেও চোখগুলো অস্বাভাবিক বড়। কারুরই মাথায় চুল নেই। সবাই পরে আছে অয়েল ক্লথের মতন জিনিসের চকচকে পোশাক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে পিচকিরির মতন অস্ত্র।

কেউ কিছু কথা বলার আগেই ওদের একজন পিচকিরি থেকে খানিকটা আলো ছুঁড়লো, তাতেই ইলেকট্রিক শক্ খাবার মতন যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠলো রণজয়। তার মাথা ঠুকে গেল নিজেরই রকেটের ছাদে।

রণজয় বুঝলো, ওরা প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিতে চায়, ওদের কাছে কী রকম অস্ত্র আছে। কিংবা এটা খুবই সাধারণ। এর চেয়েও অনেক ভয়ংকর কিছু আছে ওদের কাছে।

সে হাত দুটো সামনে এগিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে এক পা এক পা করে নেমে এলো নিচে।

তখন আর দু'জন কাকুম-সাকুম-মাকুম ট্যাঁকো-ম্যাকো বলে বকুনি দিয়ে আবার আলো ছুঁড়লো রণজয়ের দিকে।

রণজয় এবার যন্ত্রণায় ডিগবাজি খেতে লাগলো। মনে হলো যেন তার শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। এরপর সবাই মিলে একসঙ্গে আলো ছুঁড়লে রণজয় সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।

রণজয় ছেলেটি আসলে খুব গোঁয়ার। খুব রেগে গেলে তার আর ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না। আর এইটুকু এইটুকু বাচ্চা বাচ্চা বেঁটে বেঁটে মানুষরা তাকে কষ্ট দেবে, এই অপমান সহ্য করে বেঁচে থেকে লাভ কী! তবু ওরা জানুক, পৃথিবীর মানুষ বীরের মতন লড়াই করে মরতে জানে।

উঠে দাঁড়িয়েই সে একসঙ্গে লাথি আর ঘুঁষি চালালো। তিন-চারজন তাতেই ধরাশায়ী হয়ে গেল একেবারে। যদিও রণজয়ের মতন অত বড় চেহারার মানুষের হাতে মার খেয়েও তারা মরে গেল না কিন্তু। কোনো ব্যথার শব্দও করলো না। অন্য ক'জন রণজয়ের পিচকিরির আলো ছোঁড়ার চেষ্টা করতেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো রণজয়। সে নিজেও দুটো পিচকিরি কেড়ে নিয়ে ওদের দিকে আলো ছুঁড়ছে আর লাথিও চালাচ্ছে। এক একবার রণজয়ের গায়েও লেগে যাচ্ছে সেই আলো। কিন্তু সে অনবরত লাফাচ্ছে বলে পুরোটা লাগছে না।

এই রকম লড়াই চললো বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু ক্ষুদে মানুষরা কেউ মরছে না। এমন কি রণজয় ওদের এক একজনকে চ্যাংদোলা করে তুলে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারছে দেয়ালে, তবু ওদের মাথা ভাঙছে না, শরীরের কোথাও কেটে রক্তও পড়ছে না।

রণজয় বুঝতে পারলো, এই লড়াইতে তাকেই হেরে যেতে হবে। এর মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এই সময় সেই রকেটের অন্য দিকের একটা দরজা খুলে গেল। তারপর শোনা গেল একটা তীব্র বাঁশীর সুর। একই রকমের কয়েকজন ক্ষুদে মানুষ এসে ঢুকলো প্রথমে। কিন্তু কে যে বাঁশী বাজাচ্ছে তা বোঝা গেল না। এরা অন্য রকেটটা থেকে এসে পড়েছে বুঝতে পেরে রণজয় লড়াই থামিয়ে থমকে দাঁড়ালো। আর কোনো আশা নেই!

সেই দ্বিতীয় দলের পেছনে পেছনে এলো একটি মেয়ে, সে এদের চেয়ে অনেক লম্বা। প্রায় মানুষের কাছাকাছি, তবে এরও চোখ অস্বাভাবিক বড়।

তার হাতে কোনো বাঁশী নেই, সে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করছে, সেটাই বাঁশীর মতন শোনাচ্ছে।

রণজয়কে দেখে সে অস্বাভাবিক চমকে উঠলো। তার বড় চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে গেল। সেটা ভয়ে না রাগে তা বুঝতে পারলো না রণজয়।

সে খুব দ্রুত চিন্তা করলো, এই মেয়েটিই নিশ্চয়ই এদের রানী। পিঁপড়েদের দলে যেমন একজন করে রানী থাকে, তার চেহারা অনেক বড় হয়, এদেরও নিশ্চয়ই সেই রকম।

বাঁশীর শব্দ থামিয়ে মেয়েটি অন্য রকম একটা অদ্ভুত চিৎকার করতেই ক্ষুদে মানুষরা সবাই বসে পড়লো মাটিতে। অস্ত্র পাশে নামিয়ে রাখলো।

মেয়েটিও মাটিতে বসে পড়ে খুব মিষ্টি গলায় কী যেন বললো রণজয়কে। কিন্তু সে এক বর্ণও বুঝলো না।

রণজয় এক হাত নেড়ে জানালো সে ওদের ভাষা জানে না।

রণজয়ের হাত নাড়া দেখেই মেয়েটি মেঝেতে মাথা ঠেকালো, তার দেখাদেখি অন্য আর সবাই। তারপর সেই রানী মাথা তুলে তার একজন অনুচরকে কী যেন হুকুম করলো।

সেই ক্ষুদে মানুষটি ছুটে গেল রকেটের ভেতরের দিকে। দুটো রূপোলি গোল বল নিয়ে ফিরে এলো। একটা দিলো তাদের রানীর হাতে। আর একটা নিয়ে এলো রণজয়ের দিকে।

রণজয় প্রথমে বলটা নিতে দ্বিধা করলো। একবার অন্য গ্রহের একটা বল ছুঁয়েই তো তার এই অবস্থা। আবার এই বলটা ছুঁলে কী হয় কে জানে? যদি তার চেহারা এই মজার ক্ষুদে মানুষদের মতন হয়ে যায়? না, না, তা সে কিছুতেই চায় না।

সে হাত নেড়ে বললো, চাই না, চাই না!

তখন ওদের রানী সেই বলটা মুখের কাছে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললো, হে নীলদেবতা, আপনি এই জিনিসটা মুখের কাছে ধরলেই আপনার ভাষা আমরা বুঝতে পারবো, আপনিও আমাদের ভাষা বুঝতে পারবেন।

বাংলা কথা শুনে এমনই চমকে গেল রণজয় যে সে আর কোনো দ্বিধা না করেই টপ করে তুলে নিল বলটা। কতকাল পরে সে বাংলা শুনলো। কী অদ্ভুত যন্ত্র বানিয়েছে এরা। এর থেকে শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে অন্য লোকের গায়ে ধাক্কা মারলেই তা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে।

রণজয় বললো, আপনারা কে? আমাকে বন্দী করতে চান কেন?

আশ্চর্য, রণজয় কিন্তু নিজের বাংলা কথাটা শুনতে পেল না। সেটা হয়ে গেল ওদের ভাষা।

রানী বললো, আপনাকে বন্দী করবো? সে কি? আপনি তো আমাদের দেবতা। আপনার দেখা যে আজ পেয়েছি, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রণজয় বললো, আমি দেবতা? না, না, তোমাদের ভুল হয়েছে। আমি পৃথিবী গ্রহের সামান্য একজন মানুষ!

রানী বললো, কেন আমাদের ছলনা করছেন প্রভু? আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আছে, একদিন আমরা এই মহাশূন্যে আমাদের দেবতাকে খুঁজে পাবো। তিনি উচ্চতায় আমাদের দ্বিগুণ। তাঁর গায়ের রং মহাশূন্যের মত নীল, তাঁর মাথায় চুল আছে। তাঁর দেখা পেলে আমরা হবো এখানকার গ্রহমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ জাতি। চলুন প্রভু, আমাদের গ্রহে চলুন, আপনাকে আমরা সব কিছু দিয়ে সেবা করবো।

রানীর কথা শেষ হওয়া মাত্রই সব ক্ষুদে মানুষরা হৈ হৈ করে উঠে রণজয়কে ঘিরে নাচতে লাগলো।

রণজয়ের একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা। কোথায় সে এক্ষুণি মরতে বসেছিল, তার বদলে হয়ে গেল দেবতা? যা বাবাঃ! সবাই তাকে অনেক রকম খাবার এনে দিল আর তাকে ঘিরে ঘিরে কী সব গান গাইতে লাগলো।

আমাকে বন্দী করতে চান কেন? [পৃঃ ২৭৬.

এই রকম ভাবে কতক্ষণ কাটলো কে জানে? রণজয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর রানী তার কাছে এসে বললো, হে দেবতা, দেখুন, ঐ আমাদের গ্রহ।

রণজয় জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখলো, এদের গ্রহটি বেশ সুন্দর। অসংখ্য পাহাড় দেখা যায় আর হাল্‌কা হাল্‌কা কমলা রঙের মেঘ। গাছপালা অবশ্য চোখে পড়লো না।

রণজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো, পৃথিবীতে তো আর ফেরা হবে না। তা হলে এই অচেনা গ্রহেই দেবতা কিংবা রাজা সেজে থাকা যাক। খাতির-যত্ন তো পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সুখভোগ রণজয়ের ভাগ্যে সইলো না।

ক্ষুদে মানুষদের গ্রহে নেমে সে সবে মাত্র কয়েক পা হেঁটেছে, অমনি তার দম আটকে আসতে লাগলো। যেন সে এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবে। এখানকার বাতাস দারুণ ভারী।

বিদ্যুৎ চমকের মতন তার মনে পড়লো, এই গ্রহে গাছ নেই। এই গ্রহের

হাওয়া মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যতই দৈত্যের মতন চেহারা হোক, সে আসলে মানুষ, অক্সিজেন ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে রানীকে বললো, আমাকে এক্ষুণি একবার যেতে হবে। আমার গ্রহ থেকে একটা যন্ত্র না আনলে আমি শ্বাস নিতে পারবো না। তোমার কয়েকজন লোককে দাও আমার সঙ্গে। আমি রকেটে করে ঘুরে আসছি। আমার জন্য চিন্তা করো না, সময় হলে আমি ঠিক ফিরে আসবো।

আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই, রণজয় টলতে টলতে উঠে পড়লো রকেটে। রানী তক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিল।

ক্ষুদে মানুষরা যদিও পৃথিবীর নামও শোনে নি, তবে সূর্য নামে একটা ছোট্ট তারার কথা তারা জানে। সেই হিসেবে খুঁজে খুঁজে ওরা একদিন পৌঁছোলো পৃথিবীতে। সন্ধ্যের দিকে একটা পৃথিবীতে নামলো রকেট।

রণজয় ভাবছে, এখন এই ক্ষুদে মানুষদের সে কী বলবে? তার পক্ষে তো আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, ওখানে ও একদিনও বাঁচবে না। এরা তাকে দেবতা ভেবেছে, কিন্তু সে দেবতার মতন অমর তো নয়।

সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে গেল।

ক্ষুদে মানুষেরা রণজয়ের সঙ্গে রকেট থেকে নামতেই ছটফট করতে শুরু করে দিল। পৃথিবীর বাতাস আবার তাদের একেবারেই সহ্য হয় না। ঠিক কাটা পাঁঠার মতন ধড়ফড় করতে লাগলো তারা মাটিতে পড়ে।

রণজয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওদের কোলে করে করে তুলে দিল রকেটে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললো, তোমরা চলে যাও। আমার সময় হলে আমি যাবো। তোমাদের ভালো হোক।

তারপর রকেটটা উড়ে যেতেই রণজয় পৃথিবীর প্রতি প্রণাম জানিয়ে কাঁদো কাঁদো ভাবে বললো, মা, তুমিই আমার সবচেয়ে ভালো। তোমায় ছেড়ে আমি..আর কোথাও যাবো না!

মহাপ্লাবন

—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সেই ভয়ানক দিনটার কথা মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তারিখটা ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। রাত বারোটা প্রায় বাজে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি চলছে। এক্ষুণি বেজে উঠবে বিগ্‌ল্‌, সঙ্গে সঙ্গে আরও নানারকম বাজনা। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে পর পর কয়েকটা তোপের আওয়াজ। কারণ সেদিনটা তো শুধু একটা বছরেরই শেষ দিন নয়, একটা শতাব্দীর শেষ দিন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন। একটু পরেই শুরু হবে ২০০০ সাল।

না, আমি সেদিন কলকাতা শহরে বসে ছিলাম না। প্রায় দেড় কোটি বাসিন্দার এই লোক-গিজগিজ শহরে প্রাণ হাঁসফাঁস করছিল। অবশ্য গত পনেরো-বিশ বছরে কলকাতায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রিক্‌শ-টিক্‌শ কবে উঠে গেছে, মাটির তলা দিয়ে চলছে টিউব রেলের গাড়ি, দোতলা-তেতলা রাস্তাও হয়েছে অনেকগুলি। মাথার ওপর হেলিকপ্টার সব সময়েই উড়তে দেখা যায়,—মোটর গাড়ির চেয়ে এটাই এখন বেশি জনপ্রিয়। একটু অবস্থাপন্ন অনেকেই ছোট ছোট হেলিকপ্টার প্রাইভেট মোটর গাড়ির বদলে কিনতে শুরু করেছেন। নিজেরাই চালান। গ্যারেজ লাগে না, রাত্তিরে ছাদের ওপরে রেখে দেওয়া যায়, আর পেট্রোলও তো বেশ সস্তা। তার জন্য আর বিদেশের প্রত্যাশায় হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয় না। কলকাতার প্রায় গা-ঘেঁষা সুন্দরবনেই

প্রচুর পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে। দেশের পেট্রোলের চাহিদা এখন দেশ থেকেই দিব্যি মিটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু—

হ্যাঁ, সেই "কিন্তু"টা কিন্তু তেমনি রয়ে গেছে। একদিক্ দিয়ে যেমন "আরাম" বাড়ছে, অন্য দিকে তেমনি বাড়ছে "হারাম"। গত পনেরো বছরে শহরের জনসংখ্যা তিন গুণ বেড়ে গেছে। রাস্তায় হাঁটতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে ভিড়ের ঠেলায়। বারো মাসই যেন রথের বা চড়কের মেলা! বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্।

তাই পালিয়ে এসেছিলাম একেবারে পৃথিবীর ওপিঠে পসিডনেরিওর নিরিবিলি আশ্রয়ে।

চিনতে পারলে না তো জায়গাটা? আচ্ছা, দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপটা খুলে বস। নামতে নামতে নামতে নামতে আর্জেন্টিনা পেরিয়ে, পাটাগোনিয়ারও দক্ষিণ প্রান্ত প্রায় ছুঁয়ে দেখবে একটা জলপ্রণালী রয়েছে ভূগোলে যার নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাগেলন প্রণালী। সেই ম্যাগেলন, যিনি জাহাজে পৃথিবীকে একটা পাক খেয়ে প্রথম প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে পৃথিবী গোল। সেই প্রণালী পার হয়ে আরও নীচের দিকে নেমে এলে পাওয়া যাবে কেপ্ হর্ন্। তারপর একটুখানি সমুদ্র পেরিয়ে ডিয়েগো রামিরিয়া দ্বীপপুঞ্জে এই পসিডনেরিও শহর।

এত জায়গা থাকতে এখানে কেন এলাম? সেই কথাই তো বলতে চাইছি। এসেছিলাম আমার বন্ধু সহ্যাদ্রির পাল্লায় পড়ে।

সহ্যাদ্রি! না না, পশ্চিম ভারতের সহ্যাদ্রি পাহাড়ের সঙ্গে নামের একটু মিল থাকলেও সহ্যাদ্রি খাঁটি বাঙ্গালীর ছেলে। ওর পুরো নাম সহ্যাদ্রি ভট্টশালী। কিন্তু কাগজে-কলমে থাকলেও নামের শেষে পদবীটা বড় কেউ একটা আজকাল ব্যবহার করে না তো, কাজেই শুধু সহ্যাদ্রিই যথেষ্ট।

তবে সহ্যাদ্রি নামকরণেরও একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে।

ওদের বংশের সকলেই খুব বিদ্বান। বাবা, ঠাকুরদা দু'জনেই পরম পণ্ডিত। কিন্তু দু'জনেরই স্বভাবে ছিল দারুণ একটা অস্থিরতা। একটুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারতেন না কেউ। ব্যাপার দেখে ওর ঠাকুমা নাতির নাম রাখলেন সহ্যাদ্রি,—অদ্রি অর্থাৎ পাহাড়ের মত সহ্য করবার ক্ষমতা যার। হয়তো ভেবেছিলেন ঐ নামকরণের জোরেই নাতিটি তাঁর কিছু সহ্যগুণ আয়ত্ত করবে। কিন্তু ফুঃ, কোথায় কি! সেই শৈশব থেকে বাপ-ঠাকুরদার মতই অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠেছে সে।

যাক্, এসব অনেক দিন আগেকার কথা। ঠাকুরদা, ঠাকু'মা, বাবা—এঁরা কেউই এখন নেই। সহ্যাদ্রিও আর কচি খোকাটি নেই। তবে বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে সে শুধু অস্থিরতাটুকুই পায় নি, তাঁদের পাণ্ডিত্যেরও কিছুটা পেয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞান-বিশারদ্ হিসেবে তার নাম এখন দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর তারই ফলে তার ডাক পড়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার নীচে এই একদা

অখ্যাত কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের নামকরা প্রগতিশীল শহর পসিডনেরিওতে। এখানকার মেটিরিওলজিক্যাল অর্থাৎ আবহবিজ্ঞান বিভাগের সে-ই এখন বড়কর্তা।

আমার দেশভ্রমণের বাতিক বহুদিনের। ভারতবর্ষ তো যাকে বলে গুলে খাওয়া, তাই খেয়েছি আমি। ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, এমন কি অস্ট্রেলিয়াও ঘোরা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ক্যানাডা তো রাম-শ্যাম-যদু-মধুও যাচ্ছে, আমার না যাবার কারণই নেই। বাকি শুধু এই দক্ষিণ আমেরিকা বা তার আশপাশের কয়েকটা দ্বীপ।

এখানে আমার একটু পরিচয় দিয়ে দিলে বোধ হয় ভালো হয়। সহ্যাদ্রি আমার সহপাঠী বন্ধু—সেই ইস্কুল থেকে। ওর মত পণ্ডিত না হলেও লেখাপড়ায় আমিও নেহাৎ কাঁচা ছিলাম না। ফলে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে নামের পাশে, পি. এইচ্. ডি., ডি. এস্. সি. ইত্যাদি আরও গোটা কতক ডিগ্রী বসিয়ে নিতে তেমন কষ্ট হয় নি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক পদে জাঁকিয়ে বসেছি। আর, সবাই জানে, এ কাজে ছুটিছাটা খুব বেশি। তার ওপর শিক্ষা-অভিযানের নাম করে আরও কিছু ছুটি বাগিয়ে নেওয়াও তেমন কঠিন নয় আমার কাছে।

আমার যা চাকরি তাতে এভাবে পৃথিবী চষে বেড়ানোর মত আর্থিক সঙ্গতি আমার থাকার কথা নয়। কিন্তু সে বাধা কাটাবার সুযোগও জুটেছে বারে বারে। ভালো ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমার কিছু নাম-ডাক আছে। তা ছাড়া ইংরেজী বাদেও আরও কয়েকটা ভাষা আমি বেশ বলতে পারি। নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাই বক্তৃতা দেবার জন্য আমার ডাক পড়ে। (সত্যি কথা বলতে, আমিই নানা সূত্রে সেই আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়ে নিই।) যাই হোক, ডাক সত্যিই পড়ে এবং আমিও এক পায়ে খাড়া। এমনি করেই পসিডনেরিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও একটা ডাক এল—সহ্যাদ্রিরই চেষ্টায় তা বলা বাহুল্য। ব্যস্, আর কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম, আর ওদেরই পয়সায় একদিন উড়ে এলাম এই অজানা শহরে। সহ্যাদ্রি এয়ারপোর্টে এসে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

কাজ যথা সময়ে চুকে গেল কিন্তু সহ্যাদ্রি সহজে ছাড়ল না। বলল, “থেকে যা দিন কতক। কি করবি দেশে গিয়ে সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় ঘেঁটে ঘেঁটে?” সহ্যাদ্রি-গৃহিণী বললেন, হ্যাঁ, তাই থেকে যান দম্‌বাবু! তবু একটু বাংলা কথা বলে তৃপ্তি পাই। এ পোড়ার দেশে বাংলায় কথা বলার লোক কই, এক আপনার বন্ধু ছাড়া?”

আমার নাম দম্‌বাবু মোটেই নয়—অরিন্দম, কিন্তু বন্ধুরা ছেলেবেলা থেকেই আমাকে দম্ বলে ডাকে। বলে, নামের আগে একটা শত্তুর রেখে কি হবে? সহ্যাদ্রি-গিন্নী সুরসিকা, তিনিও স্বামীর দেখাদেখি প্রথম থেকেই আমাকে দমবাবু বলতে শুরু করেছিলেন।

অগত্যা রয়ে গেলাম। তা ছাড়া আর একটা মতলবও ছিল। পসিডনেরিও থেকে ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ খুব একটা দূরে নয়। ১৭।১৮ বছর আগে এই ফক্‌ল্যাণ্ড নিয়ে ইংরেজ

আর আর্জেন্টিনিওদের মধ্যে বেশ এক হাত লড়াই হয়ে গিয়েছিল এবং সে জল গড়িয়েছিল অনেক দূর। সেই ফক্‌ল্যাণ্ডের এত কাছে এসে একবার দেখে যাব না কি মধু আছে এখানে যার জন্য অত কাণ্ড?

সহ্যাদ্রিকে বললাম। সেও এক পায়ে খাড়া। বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও দেখা হয় নি জায়গাটা। ওখানে নাকি ইদানীং মাঝে মাঝে কারণে অকারণে আচমকা একটা হাওয়া ছাড়ছে যা অনেকটা সাইক্লোনের মত। কেন হচ্ছে সে খবরটা ভালো করে জানতে হবে। তবে তার আগে ভাবছিলাম, তুইও এসে গেছিস, একবার অ্যাণ্টার্কটিকার ধার-পাশটা ঘুরে এলে কেমন হয়?"

"বাঃ, ভালো বলেছিস। এখনও ওখানে গ্রীষ্মকাল। ওখানকার টেম্পারেচার বড়জোর মাইনাস্ দশ কি বারো ডিগ্রী হবে। খুব একটা অসহ্য শীত নয়। অন্ততঃ উপকূল পেরিয়েও খানিকটা ভেতরে চলে যাওয়া যেতে পারে।"

আমার কথা শুনেই হঠাৎ সহ্যাদ্রি লাফিয়ে উঠল। তারপর?

তারপর ওর যা স্বভাব, অমনি ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিল। কিছু একটা মাথায় এলে যতক্ষণ না তা হাসিল হচ্ছে তাই নিয়ে ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। ওর পায়চারিও বন্ধ হয় না।

ঠিক হল কয়েক দিন পরেই নববর্ষ আসছে; শুধু নববর্ষ নয়,—নব শতাব্দী। ঐ দিনই গিয়ে নামতে হবে অ্যাণ্টার্কটিকা—কিনা কুমেরুর চিরতুষার ময়দানে। তাঁবু ফেলে চালাতে হবে সমীক্ষা। আমার সমীক্ষা হবে ভৌগোলিক, ওর হবে আবহাওয়ার ওপর, একই সঙ্গে চলবে দুটো।

শুনেছি এই চিরতুষারের রাজ্যে নাকি জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট হ্রদের মত আছে—ঠিক মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত। যদি খুঁজে পাই, ও নিয়ে জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এবারে ওপর ওপর দেখে নিয়ে পরে আরও তৈরি হয়ে আসব। সহ্যাদ্রি বলল, এখানকার বাতাসটা সে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবে। এই বাতাসে নাকি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। কতটা বাড়ছে জানা দরকার।

জনা চার পাঁচ সাহসী এবং অভিজ্ঞ সঙ্গী সহ্যাদ্রিই জুটিয়ে নেবে। কয়েকটা বড়সড় শীততাপনিয়ন্ত্রিত হেলিকপ্‌টার ওদের আবহাওয়া অফিসেই আছে, তা থেকে বড়সড় শক্ত পোক্ত দেখে একটা বেছে নিলেই হবে। হেলিকপ্‌টার হলে জাহাজের মত বরফ ভেঙ্গে চলতে হবে না, ওপর থেকে দেখে, সুবিধে মত জায়গা বেছে নিয়ে ধীরে ধীরে হেলিকপ্‌টার নামিয়ে নিলেই হবে।

জোর প্রস্তুতি শুরু হল। সহ্যাদ্রিকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তার ধৈর্য প্রায় ভাঙ্গো-ভাঙ্গো।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯। কাল ভোরেই হবে আমাদের যাত্রা শুরু। হেলিকপ্‌টারটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরি রাখা হয়েছে বাড়ির প্রশস্ত ছাদে। সঙ্গীরা শেষ রাত্রেই এখানে এসে জড় হবেন। তার পরই শুরু হবে আমাদের যাত্রা।

রাতে আর ঘুম আসতে চায় না। সহ্যাদ্রির ড্রইংরুমে বসে বসে সময়ের প্রতীক্ষা করছি। সামনে টেলিভিশনে নানা দেশের শতাব্দী সমাপ্তির প্রস্তুতি দেখানো হচ্ছে। গৃহকর্ত্রী, সহ্যাদ্রির স্ত্রী মিসেস্ ভট্টশালী বা মিসেস্ সহ্যাদ্রি ট্রে-তে করে তিন পেয়ালা কফি এনে সামনের টেবিলে রাখলেন। আমাদের দিকে টিপয়টা একটু এগিয়ে দিয়ে নিজেও এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। মুখে মিষ্টি হাসি। সহ্যাদ্রি যখন গোমড়া মুখে অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে তখন উনি ঐ হাসি দিয়েই ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সহ্যাদ্রির বাড়িটা ঠিক সমুদ্রের গা ঘেঁষে। ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। আজ চাঁদের আলোয় তা ঝলমল করছিল। এই ঝলমলানির সঙ্গে ঐ হাসিটারও যেন বেশ মিল আছে।

কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজে সে হাসি থমকে গেল। খুব দূরে বজ্রপাত হলে যেমন হয় সেই রকম একটা অস্পষ্ট গুরুগম্ভীর আওয়াজ! পরমুহূর্তেই পায়ের তলায় মেঝেটা কেমন দুলে উঠল। আমি কফির পেয়ালাটা তুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। খট্ খট্ করে ঘরের আসবাবপত্রগুলো সব নড়ে উঠল।

একটু পরেই সোরগোল শোনা গেল চারদিকে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বাইরে তখন প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সমুদ্রও সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেছে গর্জন। সহ্যাদ্রির স্ত্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে এলাম ব্যাল্‌কনিতে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে বাঁধ, তার পাশে কুচকুচে কালো মসৃণ বাঁধানো রাস্তা। সারি সারি আলোর থাম, তার তীব্র আলোয় চারদিক চক্‌চক্ করছে। সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে বাঁধের গায়ে, তারপর সাদা ফেনা নিয়ে বাঁধ ডিঙ্গিয়ে কালো রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এতদিন এখানে আছি, সমুদ্রের এ মূর্তি আর দেখিনি।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না। ভূমিকম্প একবার থামছে, আবার দুলে উঠছে সমস্ত বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা। হঠাৎ ফস্ করে সব আলো নিবে গেল।

"কী দেখছেন? চলে আসুন, চলে আসুন। দরজা বন্ধ করুন। আপনার বন্ধুকে সামলান।" মিসেস্ সহ্যাদ্রির প্রচণ্ড হাঁকডাকে ফিরতে হল।

এরকম সময়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায়—ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানোই নিয়ম। কিন্তু নীচে নামার উপায় নেই। লিফ্‌ট্ কখন বিকল হয়ে গেছে। সিঁড়ি একটা আছে বটে, কিন্তু কখনও ব্যবহার করা হয় না। তা ছাড়া লিফ্‌ট্ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোও সব নিবে গেছে। এখন নীচে নামা অসম্ভব। যেমন টলতে টলতে বেরিয়েছিলাম তেমনি টলতে টলতেই দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

রাত্রি বারোটা বাজে। এখনই গীর্জায় গীর্জায় ঢুংঢুং বাজনা শুরু হবার কথা। বিগ্‌ল্ বাজবে, তোপ পড়বে, আরও কত কি! শুধু তো বর্ষ বিদায় নয়, এ যে শতাব্দীর বিদায়। কিন্তু কোথায় কি! মুহূর্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এমনি অবস্থা চলতে লাগল সারারাত।

আমি কফির পেয়ালাটা তুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে··· । [পৃঃ ২৮৩]

ভোরবেলাই আমাদের হেলিকপ্‌টার রওনা হবার কথা ছিল, সে সব চুলোয় গেল। যাঁরা এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হবেন তাঁরা শেষ রাত্রে এসে একত্র হবেন এই রকম ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলেম না।

এই ভাবেই, অস্বাভাবিক এক অবস্থার মধ্যে রাত্রি প্রভাত হল। তারপর এক সময়ে নতুন শতাব্দীর সূর্য দেখা দিল আকাশে।

ঝড় থেমেছে, কিন্তু তার তাণ্ডব লীলা শহরের বুকে বেশ কিছু ছাপ রেখে গেছে। একটু বেলা হলে সহ্যাদ্রিকে নিয়ে তাই দেখতে বেরুলাম।

কাছাকাছি সমুদ্রের ভিতর খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে আসার জন্য এখানে একটা ছোট জাহাজঘাটা ছিল। জাহাজ নয়, উঁচু লঞ্চ যাতায়াত করত ওখান থেকে। জাহাজঘাটার কাছে গিয়ে দেখি দুটো লঞ্চ কাত হয়ে পড়ে আছে, বেশ জখমও হয়েছে। জেটিরও খানিকটা ভেঙ্গে গেছে। রাস্তায় গাছও পড়েছে অনেক। লা ভেলোদা পার্ক এখানকার বিখ্যাত পার্ক। সেখানে একটা বহু প্রাচীন ওক্ গাছ ছিল—ইয়োরোপ থেকে এনে লাগানো। সেটাও উপড়ে ফেলে দিয়েছে ঝড়।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুরেই ফিরে এলাম, নইলে সহ্যাদ্রি গিন্নী দুশ্চিন্তায় পড়বেন।

দুপুরটা একরকম কেটে গেল। কিন্তু বেলা একটু গড়াতেই আবার শুরু হল একটা অস্বাভাবিক শব্দ। ঠিক যেন উঁচু জলপ্রপাত থেকে ভীষণ তোড়ে জল নেমে আসছে। আবার কি হল!

দেখতে দেখতে জলস্রোতের শব্দ ক্রমাগতই বেড়ে চলল। যেন একসঙ্গে দশটা বারোটা—না, আরও অনেক বেশি জলপ্রপাত নেমে আসছে তুমুল শব্দ করতে করতে শহরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সেই ভীষণ গর্জন ছাপিয়েও ভেসে আসছে ভয়ার্ত জনকোলাহল।

ছুটে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি সমুদ্রে সত্যিই বান ডেকেছে। উত্তাল বান। প্রচণ্ড জলস্রোত কলকল করে ঢুকে পড়ছে শহরে। বাঁধ যে কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে!

দেখতে দেখতে রাস্তাঘাটও জলের নীচে তলিয়ে গেল। জল তখনও বাড়ছে। একতলার জানালা-দরজা ছাপিয়ে উঠেছে। আরো—আরো—আরো। একি, জল যে শেষে একতলা ছাপিয়ে দোতলা পর্যন্ত উঠে এল! সমস্ত শহরটাই এবার জলের নীচে ডুবে যাবে নাকি?

হঠাৎ হাতে কে সজোরে আকর্ষণ করল। ফিরে দেখি সহ্যাদ্রি। স্বভাবসিদ্ধ অস্থিরভাবে বলল, "কি দেখছিস হাঁ করে? খুঁজে খুঁজে হয়রান! শীগ্‌গির ছাদে চল্। বাড়ির সবাই ছাদে উঠে গেছে। এক্ষুনি পালাতে হবে।"

অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় পেলাম না, কেমন সম্মোহিতের মতই ছাদে চলে এলাম। হেলিকপ্‌টার তো কাল রাত থেকেই সাজানো ছিল, আর সময় নষ্ট না করে সবাই উঠে পড়লাম তাতে। দেখলাম, সহ্যাদ্রির স্ত্রী এরই মধ্যে টুকটাক্ কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধাছাঁদা করে নিয়ে এসেছেন। ধন্যি গৃহিণী বলতে হবে!

হেলিকপ্‌টার একবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্যে উঠে এল তারপর উড়ে চলল তীব্র বেগে—সোজা উত্তর দিকে।

কিন্তু এ কি, পায়ের তলায় কোথাও তো ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে না! যেদিকে তাকাই কেবল জল—জল আর জল! ভালো করে দেখবার জন্য হেলিকপ্‌টারটা যতটা সম্ভব নীচে নামিয়ে আনা হল। না, দিক্ ভুল হয়নি। হেলিকপ্‌টারের দিক্‌দর্শন যন্ত্রে দেখা গেল আমরা চলেছি সোজা উত্তর দিকেই। এদিকটায় আর তো সমুদ্র থাকবার কথা নয়, তার বদলে থাকবার কথা পাটাগোনিয়ার বিশাল অরণ্য। এতক্ষণে তো তাও ডিঙ্গিয়ে আসার কথা। কিন্তু না, বনজঙ্গল তো দূরের কথা, কোথাও কোন মাটিরও চিহ্ন নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সমুদ্র—কানায় কানায় ভরা সমুদ্র! আমরা যেন বাইবেলের সেই নোয়ার আর্কে চড়ে জলের ওপর ভাসছি। তফাৎ শুধু এই,—আমাদের আর্কটা ঠিক জলের ওপর নেই, রয়েছে ঠিক তার ওপরকার আকাশে।

তবে কি আবার এল সেই মহাপ্লাবন? আমাদের পুরানেও তো আছে পৃথিবী পাপে ভরে গেলে ভগবান্ সমস্ত পৃথিবী মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে দেবেন—যেমন একবার দিয়েছিলেন সৃষ্টির আদিতে। সেবারে শেষ রক্ষা করেছিলেন ব্রহ্মা। বিরাট একটা শিংওয়ালা মাছের রূপ ধরে সেই শিংএর সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটা নৌকোয় তুলে নিয়েছিলেন মনু সমেত কয়েকজন পুণ্যবানকে, মহাপ্লাবনে নোয়ার মতই তাদেরকেও ডুবতে দেন নি। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন সৃষ্টি, কিন্তু আমাদের কে বাঁচাবে? আমরা তো নোয়া বা মনুর মত অত পুণ্যাত্মা নই!

সহ্যাদ্রি আবার অস্থির হয়ে পড়েছে। পেট্রোল যা আছে তা তো আর চিরস্থায়ী নয়! এখনও যদি ডাঙ্গা না পাওয়া যায় তা হলে কি হেলিকপ্‌টার নিয়ে এই সমুদ্রেই শেষ শয্যা পাততে হবে আমাদের? তার স্ত্রী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন—যদি তাই হয় তা হলেই বা উপায় কি? পৃথিবী শুদ্ধু লোকের অদৃষ্টের সঙ্গে আমাদের অদৃষ্টও যে একই সূত্রে বাঁধা।

হেলিকপ্‌টার একবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্যে উঠে এল। [পৃঃ ২৮৫

এইভাবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে রাত ভোর হ'ল। সূর্য উঠেছে কিন্তু ডাঙ্গা ওঠে নি। পেট্রোল যা আছে তাতে হয়তো বড় জোর আর ঘণ্টা খানেক যাওয়া যাবে। তার পর?

ঘড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেল। নীচে সেই একই দৃশ্য—জল আর জল।

আরও পাঁচ মিনিট। সহ্যাদ্রি আরও অস্থির হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তার স্ত্রী আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মনে হল তাঁর চোখে মুখে একটা আশার আলো ফুটে উঠেছে। আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "দেখুন দেখুন, ওটা কি বলুন তো? সী-গল মনে হচ্ছে না?"

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাথার ওপর, মনে হচ্ছে একটা পাখি,—সী-গলই হবে হয়তো, উড়ে যাচ্ছে। তার পাশে আর একটা, তাদের পেছনে আরও কয়েকটা।

তাহলে কাছাকাছি ডাঙ্গা আছে নিশ্চয়ই। নইলে, সী-গলই হোক বা অন্য পাখিই হোক, ওরা আসবে কোথা থেকে? হাজার হাজার কিলোমিটার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিশ্চয়ই নয়!

একটু পরেই মনে হ'ল জল যেন কমে এসেছে, জলের ভিতর দিয়ে দু'একটা গাছের মাথাও মনে হল উঁকি মারছে। সমুদ্রের ঢেউও যেন শান্ত হয়ে এসেছে। ভাবটা—অনেকটা তো এগিয়েছি, এবার থাক।

সত্যি সত্যিই অবশেষে ফুরিয়ে এল জল, সামনে দেখা গেল ডাঙ্গা। পেট্রোল প্রায়

নিঃশেষ। তবুও আর একটু চালিয়ে নিয়ে একটা সুবিধেমত সমতল ঘাস জমির ওপর নামানো হল হেলিকপ্টার। আমরা অক্ষত দেহেই নেমে এলাম মাটিতে।

কিন্তু এ কোথায় এসেছি আমরা? হেলিকপ্টারের দূরত্ব নির্দেশক কাঁটা পরীক্ষা করে দেখা গেল প্রায় দু হাজার কিলোমিটার চলে এসেছি আমরা পসিডনেরিও থেকে। সামনে একটা নদী দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, নদীই বটে, কিন্তু অসম্ভব উঁচু এর পাড়। পাড় থেকে নদী এত নীচুতে যে ওর দিকে তাকাতে ভয় করে। একেই তো বলে ক্যানিয়ন। তবে কি আমরা কোলারেডোর ধারে এসে পড়লাম? ওর ক্যানিয়ন বিখ্যাত, আর পসিডনেরিও থেকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটারই হবে ওর দূরত্ব।

না, আর নদীর দিকে নয়, আর জল চাই না। চাই মাটি। মনে মনে আওড়াতে লাগলাম, "হে মাটি, হে স্নেহময়ী, ঐ মৌন মূক! ঐ স্থির, ঐ ধ্রুব, ঐ পুরাতন, সর্ব উপদ্রব সদা আনন্দভবন—শ্যামলা কোমলা···।"

কত দিনের কথা? তা দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। ঐতিহাসিক যুগে এ রকম কাণ্ড আর কখনও ঘটে নি। কুমেরু থেকে শুরু করে ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং অস্ট্রেলিয়ার বেশ খানিকটা অংশ, আর এর ভিতরকার বিস্তৃত অঞ্চলে যত দ্বীপটিপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সব এখন জলের তলায় তলিয়ে গেছে। আগে যেখানে ছিল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এখন তারই আকার বহু পরিমাণ বেড়ে গিয়ে জন্ম নিয়েছে এক নতুন মহাসাগর, আমরা আর তাকে এখন প্রশান্ত বলি না, বলি অশান্ত মহাসাগর। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে যাঁরা এ অঞ্চলে ঘুরে গেছেন তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারবেন না—একটা বিশাল জনপদ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এভাবে সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। পুরো মহাপ্লাবন না হলেও এটা যে খণ্ড মহাপ্লাবনের ফল তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু কারণটা কি? এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হল?

গত দু'বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষে কারণটা বার করে ফেলেছেন। সেটাই এবার সংক্ষেপে বলি।

এখন থেকে ২০।২৫ বছর আগে বিজ্ঞানীরা কুমেরু অর্থাৎ অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ নিয়ে জোর গবেষণা শুরু করেছিলেন। এমন কি ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও দক্ষিণগঙ্গোত্রী নাম দিয়ে একটা গবেষণাকেন্দ্র বসিয়ে এসেছিলেন সেখানে। বিজ্ঞানীরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাতে বলা যেতে পারে যে গোটা কুমেরু অঞ্চলটা হচ্ছে একটা বরফ ঢাকা মহাদেশ—যার আয়তন গোটা ইয়োরোপ আর আমেরিকা একত্র করলে যত বড় হয় প্রায় তত বড়। কিন্তু মহাদেশ হলেও এর মাটি বা পাথর দেখার উপায় নেই—কারণ গোটা মহাদেশটাই একটা পুরু বরফের চাদরে ঢাকা। কতটা পুরু? বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, তা কম করে এক মাইল বা ১'৬০ কিলোমিটার পুরু তো হবেই। সমস্ত পৃথিবীতে যতটা বরফ জমে আছে তার শতকরা নব্বই ভাগই আছে এখানে।

এখন, উত্তাপ পেলে বরফও গলে যায়। কুমেরুর ঐ বিশাল এক মাইল পুরু বরফ যদি সত্যি কোনদিন গরমে গলে জল হয়ে যায় তা হলে কি হবে? সেই জল আর তখন কুমেরুর বুকে ধরে রাখা যাবে না—প্রবল স্রোতে তা গড়িয়ে চলবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দিকে। যদি সবটা বরফ গলে যায় তা হলে, হিসেব করে দেখা গেছে, সমস্ত পৃথিবীর ডাঙ্গা ২০০ ফুট জলের নীচে তলিয়ে যাবে, যাকে সত্যিই বলা যায় মহাপ্লাবন।

কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়!

কিন্তু একেবারেই যে নয় তাই বা বলা যায় কি করে? বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাতাসের উষ্ণতাও বেড়ে যায়। আর, সত্যিই পৃথিবীর বাতাসে, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, যার ফলে একদিন হয়তো সত্যিই এখানকার সমস্ত বরফ গলে জল হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তবে এ ব্যাপার ঘটতে এখনও কত হাজার বছর যে লাগবে তার ঠিক নেই। ততদিনে, কে জানে, মানুষই হয়তো পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

কিন্তু—

কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে কুমেরুর ওপরকার বাতাস ভীষণ রকম গরম হয়ে ওঠে তা হলে ঐ ভয়ানক ব্যাপারটা এখনই হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়, আর তাই হয়েছিল ১৯৯৯ সালের শেষ দিনটাতে।

পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলি নিজেরা পরমাণু বোমা তৈরী করে যাচ্ছিল আর ছোট ছোট দেশগুলিকে বোঝাচ্ছিল, খবরদার, কেউ পরমাণু বোমা বানাবার চেষ্টা কর না, তা হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা শুনবে কেন? তাই প্রকাশ্যে ভালো মানুষ সেজে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেকেই পরমাণু বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা চালাতে শুরু করেছিল এবং পাছে ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে সে-সব পরীক্ষার জন্য এমন সব দুর্গম জায়গা বেছে নিয়েছিল যার কথা কেউ জানতে পারবে না। এদেরই কোন একটা ছোটখাট দেশের পরমাণু বিজ্ঞানীরা গোপনে কুমেরুর ওপর উঠে সেখানে একটা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন।

আর, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে কি হয় তা তো সবাই জানে। মুহূর্তে আবহাওয়ার উষ্ণতা কোটি ডিগ্রী বেড়ে যেতে পারে। আর তাই হয়েছিল কুমেরুর কোন একটা জায়গায়। ফলে সেখান থেকে বিস্তৃত পরিমাণ জমাট বরফ (কত কোটি টন কে জানে!) গরমে গলে জল হয়ে তীব্র স্রোতে বেরিয়ে এসেছিল এবং অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ছুটে চলেছিল উত্তর দিকে। সেই বরফ-গলা বিরাট জলরাশি কুমেরুর কাছাকাছি দেশগুলি,—যেমন দক্ষিণ আমেরিকার তলা থেকে শুরু করে প্রায় অর্দ্ধেকটা এবং অস্ট্রেলিয়ারও খানিকটা তলিয়ে দিয়েছে জলের তলায়, আশপাশের কোন দ্বীপকেও রেহাই দেয় নি। ভাগ্যিস, গোটা কুমেরুর বরফ গলাতে পারেনি সেই পরমাণু-বোমা, তা হলে আর এ ঘটনার কথা জানাবার জন্য পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকত না।

———
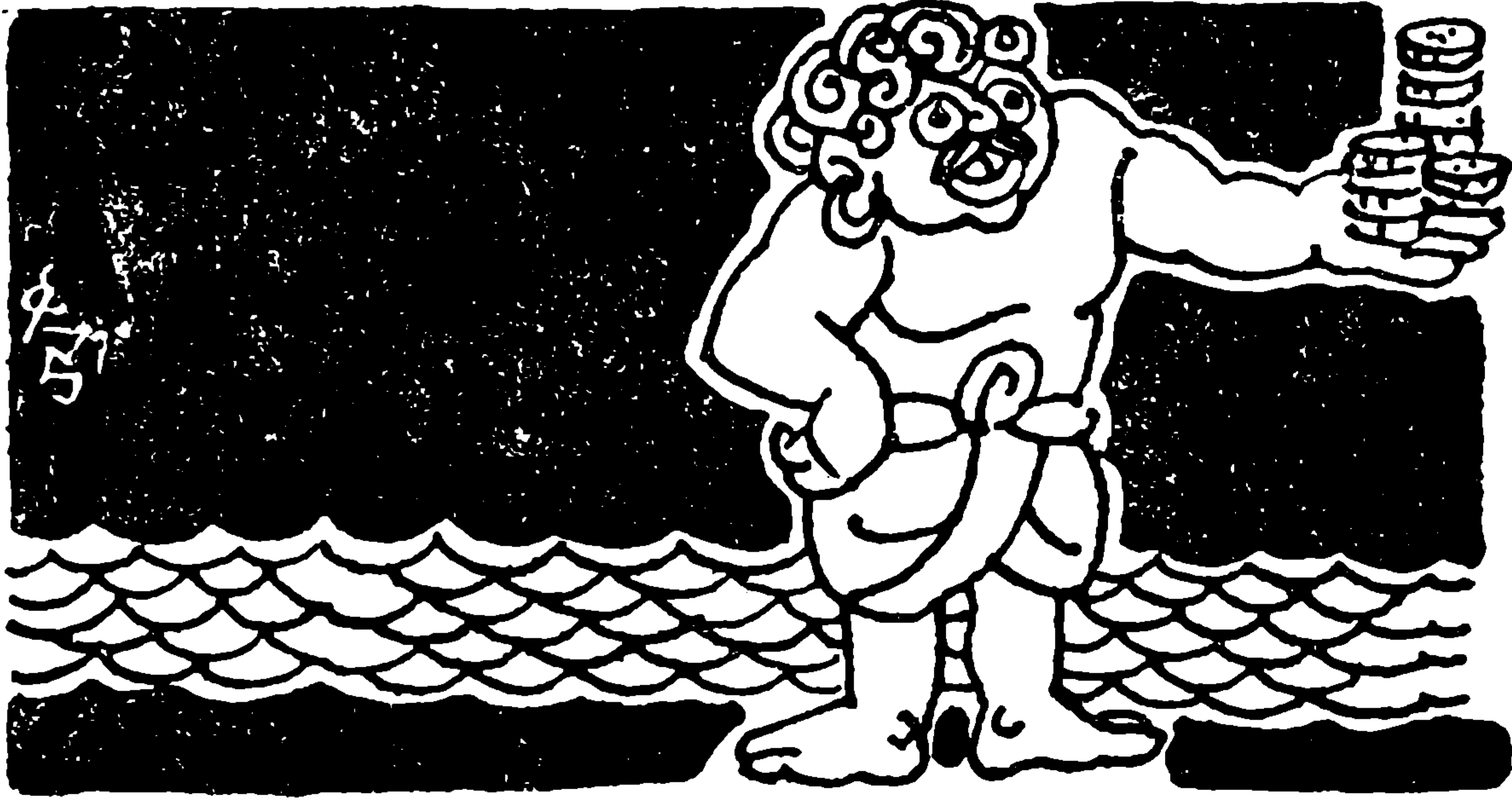
ভদ্রলোকের চুক্তি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঝাঁকড়াচুলো, রক্তচক্ষু,
দুই কানে তার মাকড়ি,
দেখেই রাজা বলেন, "কে তুই,
দস্যুদলের সর্দার?"
লোকটা বলে, "ছিলুম তো তাই,
কিন্তু এখন চাকরি
চাইছি, হব রাজার পাইক,
কিংবা হুঁকোবর্দার।"

রাজা বলেন, "রাজ্যে যে আর
নতুন কর্মী চাইনে
এমন কথা যায় কি বলা
বাজিয়ে শিঙে-ডঙ্কা?
কিন্তু এটাই সত্যি, দেব
কোত্থেকে আর মাইনে,
চাকরি আছে, কিন্তু বাপু
রাজকোষে নেই টঙ্কা।"

লোকটা শুনে হাস্য করে,
কয় সে, "মালিক, সরকার,
মাইনে আমি চাইনে, আমি
চাইছি শুধুই কাজ যে,
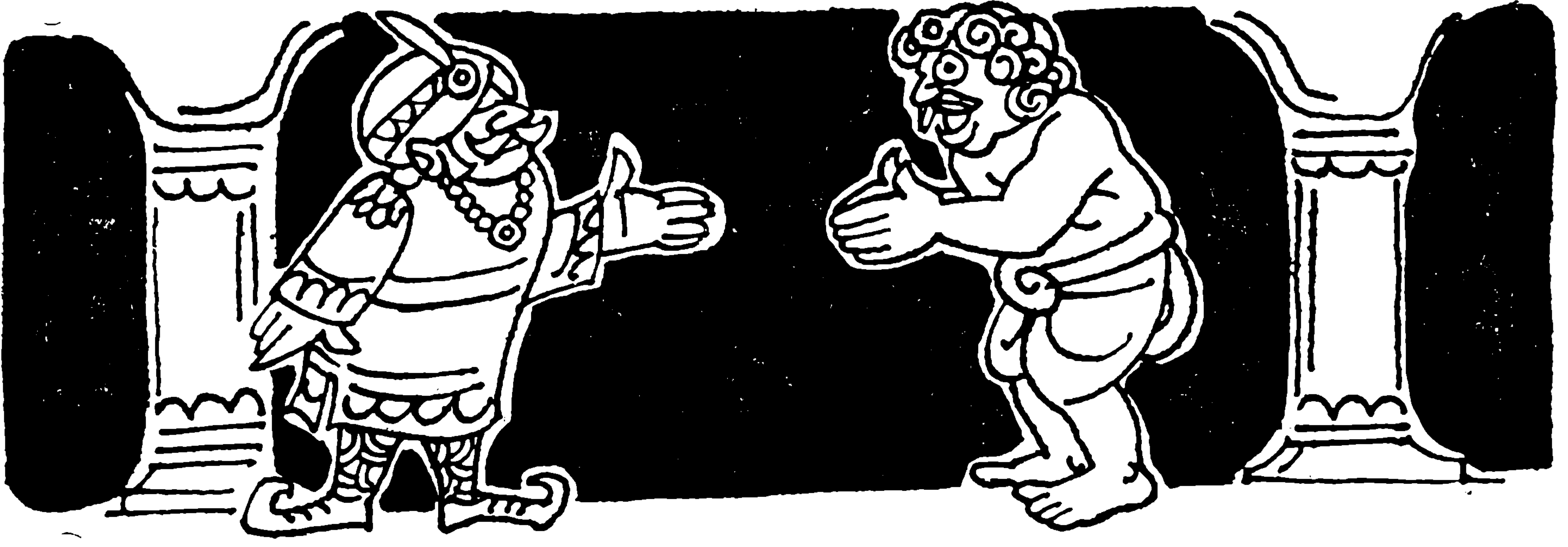
হোক্‌গে বেতনবিহীন, তবু
চাকরি আমার দরকার,
সেইটে পেলেই থাকতে পারি
চমৎকার এই রাজ্যে।"

রাজা বলেন, "মাইনে যখন
চাসনে তখন শঙ্কার
কারণ কিছু রইল না তো,
ছ্যাখ্‌গে তবে দিচ্ছে
কার গোয়ালে ধূপ্‌ধুনো কে,
কিংবা গিয়ে গঙ্গার
ঢেউগুলি গোন্‌, মোটকথা তুই
কর্‌গে যা তোর ইচ্ছে।"

চাকরি পেয়েই লোকটা গেল
গঙ্গাতে ঢেউ গুনতে।
এবং গিয়েই মুচকি হেসে
মারল সে ঘা ডঙ্কায়!
বলল, "রাজার ভৃত্য আমি,
যা কই হবে শুনতে,
আজ থেকে স্নান, নৌকো চলা
বন্ধ হল গঙ্গায়।"

শুনেই সবাই চমকে ওঠে,

"কন্ কী, মশাই, কন্ কী?

এ কোন্‌দিকে ঝুঁকল হঠাৎ

ধর্মরাজের পাল্লা?

জঙ্গুলে এই আইন কেন,

এটা সোঁদরবন কি?"

প্রশ্ন করে স্নানার্থীরা,

এবং মাঝিমাল্লা।

লোকটা বলে, "কাজ নিয়েছি

গঙ্গাতে ঢেউ গুনবার,

সাঁতরালে, কি ডুব দিলে, কি

নৌকো-টৌকো চললে

ঢেউ ভেঙে যায়, ধৈর্য কি নেই

এই কথাটা শুনবার?

চটেন কেন আপনারা ভাই

কাজের কথা বললে?

ঢেউ আমাকে গুনতে হবে,

সেটাই আমার কার্য।

আপনারা ঢেউ ভাঙেন যদি,

পারব কি কাজ করতে?

তার ফলে কী হবে ভাবুন,
দণ্ড হলে ধার্য
কয়জনে ভাই আছেন রাজী
শূলের ডগায় চড়তে?"

সবাই বলে, "তাও তো বটে,
অকাট্য এই যুক্তি।"
লোকটা বলে, "বন্ধ আমি
করতে চাই না স্নান তো।
করুন তবে আমার সঙ্গে
ভদ্রলোকের চুক্তি,
নৌকোটাকেও চলতে দেব
তেমন ক্ষেত্রে, চান তো।"

চুক্তিটা কী? শুনুন তবে,
চুক্তি লবডঙ্কা।
ঝাঁকড়াচুলো লোকটা বলে,
দুলিয়ে কানের মাকড়ি,
"সবাই মিলে নিত্য আমায়
একশোটা দিন টঙ্কা,
তারপরে যা ইচ্ছে করুন,
আমিও করি চাকরি।"

———

পলি

—নিমাই ভট্টাচার্য

মেয়ের কাছে মাস তিনেক কাটিয়ে বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বাড়িতে ফিরে এসে কুকুর দেখেই রেগে লাল। পুত্রবধূকে বললেন, বাড়ির মধ্যে কুকুর ঘুরে বেড়ালে আমি সন্ধে আহ্নিক করব কি করে? এটা বামুনের বাড়ি নাকি ম্লেচ্ছোর বাড়ি?

পুত্রবধূ ভয়ে ভয়ে বললেন, কি করব বলুন? আপনার নাতি-নাতনীকে বার বার বারণ করলাম কিন্তু ওরা কিছুতেই শুনল না।

নাতি-নাতনীর কুকুর শুনেই সুরেন্দ্রনাথ আর কথা বাড়ালেন না। মনে মনে খুশি না হলেও মুখে কিছু বললেন না।

বিকেলবেলায় নাতি-নাতনী স্কুল থেকে ফিরতেই কুকুরের কথা ভুলে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ওদের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন কিন্তু পলি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ছুটে আসতেই উনি চিৎকার করে উঠলেন, ভাই, রাঙ্গাদি, একে সামলাও। আমাকে ছুঁয়ে দিলেই কাপড় ছাড়তে হবে।

নবীন শিষ্যের প্রভুভক্তি পরীক্ষা করার জন্য রাজা একটু দূরে সরে গিয়েই ডাকল, পলি, কাম হিয়ার!

পলি সঙ্গে সঙ্গে ওর কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"দেখলে দাদু, পলি কত ভদ্র।"

নাতনীর কথায় দাদুর মুখে হাসি ফুটলেও ঠাট্টা করে বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দু' ভাইবোনের চাইতে অনেক ভদ্র।

নাতনী দাদুর থুঁতনি ধরে বলল, ভুল বললে কেন? বলো, পলি তোমার চাইতে অনেক বেশি ভদ্র।

দাদুর মুখে তখনও হাসি। বললেন, তাইতো বললাম, কুকুরটা তোমার আর ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভদ্র।

"পলি, কাম হিয়ার।"

নাতনী পলিকে তলব করতেই দাদু ভয়ে আর ঘেন্নায় কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, না, না, ভুল বলেছি। পলি আমার চাইতে অনেক অনেক বেশি ভদ্র।

দাদুর পরাজয়ে নাতি-নাতনীর সে কি খুশি! হাততালি দিয়ে নেচে উঠল ভাইবোন দুজনেই। ওদের দেখে পলিও লাফিয়ে বেড়ায় সারা ঘর-বাড়ি।

নাতি-নাতনীর কাছে হেরে গেলেও গোঁড়া বামুন সুরেন্দ্রনাথ কুকুরটাকে সহ্য করতে পারেন না। পলি ওর কাছে এলেই উনি তেড়ে মারতে যান। আর নাতি-নাতনী স্কুলে গেলেই রোজ পুত্রবধূর কাছে গজ গজ করবেন, আজ ভাই আর রাঙ্গাদি স্কুল থেকে এলেই বলো তো এই হতচ্ছাড়াকে দূর করে দিতে। এই বয়সে কি আমাকে সন্ধে আহ্নিকও ছাড়তে হবে?

আগে পুত্রবধূ এসব কথার জবাব দিতেন কিন্তু এখন আর কিছু বলেন না। বরং মনে মনে হাসেন।

পলি খুব অভিজাত বংশের সন্তান না হলেও বেশ ভদ্র পরিবারে জন্মেছে। ওর মাকে দেখেই রাজার খুব ভাল লেগেছিল। তাইতো বন্ধু শঙ্করকে অনেকদিন বলছিল, এবার তোদের কুকুরের বাচ্চা হলে আমাকে একটা দিস। আমাদের দু' ভাইবোনের খুব শখ, একটা কুকুর পুষব।

অনেকেই ওদের কুকুরের বাচ্চা চেয়েছিল বলে প্রায় বছর দুয়েক পর শঙ্কর রাজাকে একটা বাচ্চা দিয়েছিল। সে কুকুরের বাচ্চা বাড়িতে এনেই নামকরণ হলো পলি। তারপর সেই পলিকে নিয়ে দু' ভাইবোনের সে কি আনন্দ আর উৎসাহ! ভোরবেলায় উঠেই দু' ভাইবোনে পলিকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। বাড়িতে ফিরেই দুধ দিয়ে পলির ব্রেকফাস্ট। তারপর ওরা স্কুলে যায় কিন্তু বার বার মাকে বলে যায়, ঠিক বারোটায় পলিকে খেতে দিও। দেরি করো না। স্কুলে গিয়েও কি মনে শান্তি পায়? বার বার পলির কথা মনে পড়ে। টিফিনের সময় দু' ভাইবোনে দেখা হলেই পলির কথা আলোচনা করবে। স্কুল থেকে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পলি ছুটে আসে ওদের কাছে। লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে। হাত পা চেটে দেয়। ঐ আনন্দ উত্তেজনার মধ্যেও ওরা চিৎকার করে ওঠে, মা, পলিকে ঠিক সময় খেতে দিয়েছিলে?

হোম-টাস্ক করতেই হয়। বাকি সময়টা ওরা দুজনেই পলিকে নিয়ে মেতে থাকে। ওদের মা ওদের বার বার বলেছিলেন, দাদু ফিরে এলে পলিকে নিয়ে কি করবে?

ঠোঁট উল্টে রাজা বলে, কি আবার করব? যেমন আছে, তেমনি থাকবে।

কুকুর সম্পর্কে শ্বশুরের মনোভাব খুব ভাল করেই জানেন বলে উনি আবার বলেন, পলি যদি দাদুর পূজার ঘরে যায়?

রাজা সে-কথা কানেই তোলে না। ওর দিদি বলে, সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না। দাদু ফিরে আসার আগেই পলিকে সে-সব আমরা শিখিয়ে দেব।

দু' ভাইবোনে ওকে আদর করে, কত বোঝায়। [পৃঃ ২৯৬

না, পলি কখনই রান্নাঘরে বা পূজার ঘরে যায় না কিন্তু বাড়ির মধ্যে কুকুর ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে তাতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তীব্র আপত্তি। জাত যায় আর কি! কিন্তু মনু-সংহিতার আইন-কানুনের চাইতে ঐ ছোট্ট দুটো নাতি-নাতনীর গুরুত্ব এমনই বেশি যে পলি এ বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও ওর জাত গেল না। নাতি-নাতনীকে কিছু বলার মত মনের জোর নেই ঠিকই কিন্তু ওরা স্কুলে গেলেই উনি পলিকে দু'এক ঘা ছড়ির বাড়ি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

এইভাবেই দিন চলছিল। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। পলি এখন সাবালক। দরজার বাইরে কেউ এসে দাঁড়ালেই সে গন্ধ পায়। বাড়ির লোকজন না হলেই সে এমন ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে যে অনেকেই ভয় পান। পরিচিত কেউ বাড়িতে এলেও পলি ঘেউ ঘেউ করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু' ভাইবোনের একজন বারণ করতেই ও থেমে যায়। পলি এত বাধ্য হয়েছে বলে ওদের কি গর্ব!

সেবার গরমের ছুটিতে স্কুল থেকে ওদের মুসৌরী নিয়ে যাবে। দু' ভাইবোনই খুব খুশি। মহা উৎসাহে উদ্যোগ-আয়োজন চলল। ওদের অনুপস্থিতিতে পলির যাতে অনাদর না হয় তার জন্য সবাইকে বার বার বলল।

"বাবা, তুমি রোজ ভোরবেলায় ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

"আচ্ছা।"

মাকে বলল, পলিকে কিন্তু ঠিক মত খেতে দিও।

মা হাসেন।

নাতনী গিয়ে দাদুকে বলল, দাদু, তুমি কিন্তু পলিকে বকবে না।

"না রাঙ্গাদি, বকব না।"

"ঠিক বলছ?"

দাদু হেসে বলেন, হ্যাঁ।

"আমাকে ছুঁয়ে বলো।"

দাদু ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

তারপর আস্তে আস্তে ওদের রওনা হবার দিন এগিয়ে এলো।

পলি জানে, ওদের স্কুল বন্ধ। কিন্তু ওরা সাজগোজ করে বাক্স-বিছানা ঠিক করছে দেখেই ও কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দু' ভাইবোন বলাবলি করে, দেখেছিস, ও কেমন বুঝতে পারছে আমরা কোথাও যাচ্ছি। ওদের মা কতবার পলিকে ভিতরে ডাকেন কিন্তু ও কানেই তোলে না সে কথা। জোর করে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন কিন্তু তবু সে নড়ে না।

ট্যাক্সির পিছনে বাক্স-বিছানা তুলতেই পলি পাগলের মত লাফালাফি শুরু করে। দু' ভাইবোনে ওকে আদর করে, কত বোঝায় কিন্তু ও কিছুতেই শান্ত হয় না। বরং ও আরো বেশি চিৎকার চেঁচামেচি লাফালাফি শুরু করে। দু' ভাইবোনের চোখ ছলছল করলেও আর দেরী করতে পারে না। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওঠে। ওদের মা পলিকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু তখন কার সাধ্য ওকে ধরে রাখে। ট্যাক্সি স্টার্ট দিতেই পলিও তার পিছন পিছন দৌড়তে শুরু করল। দু' ভাইবোন সে দৃশ্য দেখে চোখের জল আটকাতে পারে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পলি অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এলো। কারুর দিকে একবার মুখ তুলেও চাইল না। নিঃশব্দে মুখ নীচু করে এগিয়ে গেল রাজাদের পড়ার ঘরে। তারপর একবার ভাল করে চারদিক দেখে নিয়ে চুপ করে দুটি টেবিলের মাঝখানে শুয়ে রইল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরে ছুটে এলেন পুত্রবধূর কাছে। বললেন, মা, দেখে যাও পলি কি কাঁদছে!

হ্যাঁ, সত্যি পলি কাঁদছিল।

কত অপরিচিত মানুষ সেদিন এলেন, গেলেন কিন্তু পলি একটি বারের জন্যও চিৎকার করল না। রাত্তিরের খাবার সময় কত ডাকাডাকি টানাটানি করা হলো কিন্তু না, সে নড়ল না।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ সেদিন প্রথম পলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, দুঃখ করো না পলি; ওরা কদিন পরেই চলে আসবে।

পলি একবার এক মুহূর্তের জন্য ওঁর মুখের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মুখ গুঁজে নীরবে চোখের জল ফেলল।

হিঃ হিঃ! আমি ওকে ছালটা দিয়ে বোকা বানিয়েছি! এবার আমি এই ছোট্ট ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি!

তুমি বলছো যে পালিয়ে যাওয়া ভালুকটাকে তুমি ধরেছো?

হ্যাঁ! ওটা ঐ কাঠের ঘরটার ভেতরে আছে!

হিঃ হিঃ! এখন আমাকে ভাবতে হচ্ছে এই পুরস্কারের টাকায় কি কি জিনিস কিনবো!

হুপ্পি! আমার পুরস্কারের টাকা দিয়ে এই বড় দোকান থেকে পছন্দমতো জিনিস কিনতে পারি।

আহ্! এই তো খেলাধুলার ঘর।

খেলাধুলা বিভাগ

ইয়াপ্পি! টেনিস র‍্যাকেট! এটা দিয়ে একটা বল মারার চেষ্টা করি!

আঁউক!

বাঁচাও!

খেলনা

পেয়েছি তোকে

অলপ্পেয়ে ম্যানেজারটা বেচারা ছেলেটাকে ধরে ঠ্যাঙাতে চাইছে!

!

বাঁচাও!

আমি এই দোকানে আর আসবো না!

না, মহোদয়া! খুব ঝানু ছেলে হিসেবে ওকে একটু চাপড়ে দিচ্ছি!

আমি আর দোকানে ঢুকবো না এই কথা দেওয়ায় উনি আমাকে কত্তো দারুণ দারুণ খেলনা দিয়েছেন। দেখো। আমার পুরস্কারের টাকা খরচ করতে হয় নি!

পাগলামী

—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গুলির শব্দ ভেসে আসছে।

এক আধবার নয়। তিন তিনবার। তবে পর পর নয়। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেমে।

ওদিকে গুলির শব্দে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে মস্ত সেই বাড়িটায়। বিরাট বাড়ি। অগুন্তি ফ্ল্যাট। তারই একটা থেকে আসছে গুলির শব্দ। সেই ফ্ল্যাটটা চিনে নিতে বেশি সময় লাগলো না। ফ্ল্যাটের সামনে ভিড়। সকলের চোখে মুখে উদ্বেগ। না জানি কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। একদল ছুটলেন পুলিসে খবর দিতে।

একটু পরেই পুলিস এসে হাজির। হন্তদন্ত হয়ে অফিসাররা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। কলিংবেল বাজাতে লাগলেন। কিন্তু দরজা আর খোলে না। ওদিকে উত্তেজনাও বাড়ছে।

একটু পরে দরজা খুললো। বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। পুলিস দেখেই চমকে উঠলেন!

ব্যাপার কি?

পুলিস অফিসার এগিয়ে গেলেন। বললেন,

আপনার ঘর থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে। আমরাও জানতে চাই ব্যাপারটা কি?

পুলিসের কথা শুনে ভদ্রলোক থমকে গেলেন। মুখটা শুকিয়ে গেছে তাঁর। একটু ভয় ভয় ভাব। বললেন,

আমিই ফায়ার করেছি। তাতে কি হয়েছে?

কি হয়েছে? কাকে মেরেছেন?

তেড়ে গিয়ে ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরলেন পুলিস অফিসার।

কাউকে মারি নি তো?

কি করছিলেন তাহলে? গুলি চালানোর খেলা? চলুন ঘরের মধ্যে। আপনার ঘর সার্চ করবো।
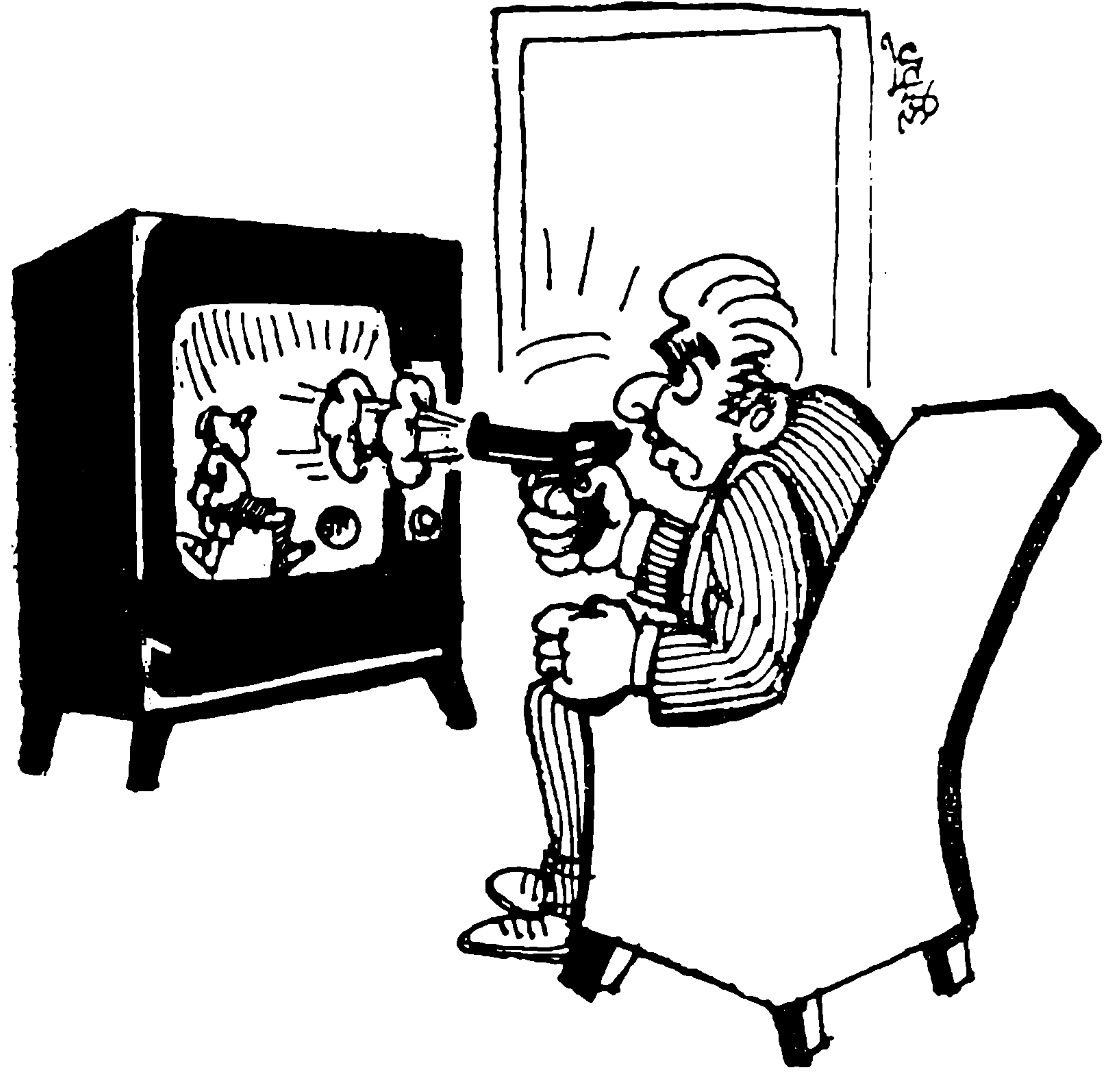
পুলিসের সঙ্গে ক'জন উৎসাহীও ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাঁদের আশা ছিলো ঘরের মধ্যে একটা ডেডবডি-টডি পাওয়া যাবে। তাঁরা নিরাশ হলেন। কোথাও কিছু নেই।

ভদ্রলোক ততক্ষণে একটা সোফায় বসে পড়েছেন। সারা ঘর তন্নতন্ন করে দেখার পর পুলিস অফিসার এসে বসলেন তাঁর সামনে।

…যতবার গোল করেছে আমিও ততবার ফায়ার করেছি।

ব্যাপারটা কি বলুন তো? গুলি চালাচ্ছিলেন কেন?

তখনো সামনের ছোট টেবিলটার ওপর পড়ে আছে গুলিভরা পিস্তলটা। তিনটে গুলি খরচ হয়েছে। সামনের টিভিটা চলছে। একটু আগে বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা সরাসরি দেখাচ্ছিলো। এখন অন্য অনুষ্ঠান হচ্ছে। পুলিস অফিসারের কথা শুনে ভদ্রলোক নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন,

আমি আর্জেন্টিনার মানুষ। আজ ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা ৩—১ গোলে হল্যাণ্ডকে হারালো। দেশ থেকে এতো দূরে সিডনি শহরের এই ফ্ল্যাটে বসে টিভিতে খেলা দেখতে দেখতে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি নি। হাতের কাছে ছিল পিস্তলটা। তাই উত্তেজনার বশে আর্জেন্টিনা যতবার গোল করেছে আমিও ততবার ফায়ার করেছি।

সিডনির আইন অনুসারে আলফ্রেডা পারসিয়াকে সেদিন পুলিস গ্রেফতার করেছিল। ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েও ছিল। তবে পারসিয়া আর যাই করুন কারো প্রাণহানির কারণ হন নি। কিন্তু ব্রাজিলের এক বাসচালক সাংঘাতিক এক কাণ্ড করে বসেছিলেন।

রিও ডি জেনেরোর পথে দিব্যি বাস চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেদিন আবার বিশ্ব কাপে ব্রাজিল খেলছে পেরুর সঙ্গে। ব্রাজিলের আর পাঁচজনের মতো বাসচালকও ফুটবল খেলায় দারুণ উৎসাহী। তাঁর মন পড়েছিলো আর্জেন্টিনায়। হঠাৎ খবর এলো, ব্রাজিল পেরুকে হারিয়েছে।

ব্যাস আর যাবে কোথায়। আনন্দের চোটে ভদ্রলোক বাসের স্টিয়ারিং ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন পথে। চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে তিনি নিজে গুরুতর আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু চালকহীন ঐ বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিলেন একজন পথচারী। আর আহত হয়েছিলেন তিরিশজনের ওপর।

সেইদিনই আর এক কাণ্ড ঘটে গিয়েছিলো ব্রাজিলের এক রেল স্টেশনে। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন ট্রেন ধরবেন বলে। ট্রেনটা প্লাটফর্মে ঢুকছে। সেই সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে ব্রাজিল পেরুকে গোল দিয়েছে। ভদ্রলোক আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন চলন্ত ট্রেনের সামনে।

বাসের স্টিয়ারিং ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন পথে।

ফুটবল নিয়ে ব্রাজিলের মানুষ পাগল। তাঁদের পাগলামীর যেন আর সীমা পরিসীমা নেই। এবার স্পেনে ব্রাজিল থেকে এসেছিলো দারুণ একটা জাহাজ। ন'শ লোক সেই জাহাজে চেপে এসেছিলেন স্পেনে। স্পেনের বন্দরে বন্দরে জাহাজটা ঘুরছিলো। জাহাজে ছিলো খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, আনন্দ স্ফূর্তির ঢালাও ব্যবস্থা। যাকে পাচ্ছিলো তাকেই ওরা সেই জাহাজে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছিলো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জাহাজটা দেখাচ্ছিলো। বলছিলো, ঐ জাহাজে করে ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ দেশে নিয়ে যাবে। জিকো, সক্রেটিশ, জুনিয়ারদের কথা ওদের মুখে মুখে।

ওরা ধরেই নিয়েছিলো, এবারের বিশ্ব কাপে ব্রাজিলই জিতবে। খেলার মাঠে ওরা গিয়েছিলো নাচতে নাচতে। রং চংয়ে পোশাক পরে। হাতে ছিলো পতাকা। কিন্তু ইতালি ওদের বিশ্রীভাবে হারিয়ে দিলো। ইতালির পাওলো রোসি একাই তিনটি গোল করে হ্যাট্‌ট্রিক করলেন। সক্রেটিশ আর ফালকাও একটা করে গোল শোধ করে দিলেন।

অপ্রত্যাশিত সেই পরাজয়ের পর ব্রাজিলবাসীদের মুখ চুন হয়ে গিয়েছিলো। চোখের জল বুকে চেপে যাঁরা হোটেলে ছিলেন তাঁরা ঘরে ফিরেছিলেন। আর মস্ত সেই জাহাজটা ন'শ লোক নিয়ে নিষ্প্রদীপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলো। কেউ সেদিন খান নি।

আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন চলন্ত ট্রেনের সামনে। [পৃঃ ২৯৯

কেউ ঘুমোন নি। যেন বিশ্বাসই হচ্ছিলো না সেই অপ্রত্যাশিত ফল। ব্রাজিল হেরে গেছে। ব্রাজিল সেমিফাইনালে উঠতে পারে নি। এর চেয়ে বড় অঘটন স্পেনে আর কি ঘটেছে? যতই আলজেরিয়া হারাক পশ্চিম জার্মানিকে, যতই বেলজিয়াম হারাক আর্জেন্টিনাকে—ব্রাজিলের হারই ছিল সব থেকে অপ্রত্যাশিত।

আর ব্রাজিলকে হারিয়েছিলো যে ইতালি সেই পাওলো রোসির দলই শেষ পর্যন্ত বিশ্ব কাপ ঘরে তুললো। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে ৩—১ গোলে হারিয়ে।

এবারের বিশ্ব কাপের জন্যে স্পেনের চিড়িয়াখানা একটা উট পেয়ে গেছে। উট কোয়ায়েতের সৌভাগ্যের প্রতীক। তাই কোয়ায়েত দলের সঙ্গে একটা উট এনেছিলো। খেলার দিন ওরা সেই উটটাকে মাঠে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু রক্ষীরা উট নিয়ে তাদের মাঠে ঢুকতে দেয় নি। তারপর বিশ্ব কাপে হেরে দেশে ফেরার সময় কোয়ায়েতের রাজকুমার সেই উটটিকে উপহার দিয়ে গেলেন। কোয়ায়েতের সৌভাগ্যের জীবন্ত প্রতীক এখন আছে মাদ্রিদের চিড়িয়াখানায়। বহাল তবিয়তেই আছে।

মণি ও মুক্তা

পিপীলিকা-ভুক আর্মাডিল্লো শুধুমাত্র পিঁপড়ে এবং কিছু ময়লা খেয়ে জীবন ধারণ করে, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জঙ্গলি। কিন্তু তাকে যদি ধরে এনে গৃহপালিত করা হয় তো সে সানন্দে কমলালেবু, আঙুরের রস, দুধ, জল, মাংস এবং চাল, গমজাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে।

পাতালপুরীর রাজকন্যা

—অমিতাভ চৌধুরী

[কিছু গান, ছড়ার আকারে কিছু সংলাপ আর সূত্রধারের ভাষ্য নিয়েই এই নাটিকা। বিষয়, রূপকথা। রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প। ছোটবেলায় মা-ঠাকুরমার মুখে শোনা, ঠাকুরমার ঝুলিতে বা ফোক্ টেল্স্ অব্ বেঙ্গলে পড়া চেনা গল্প। অনেক গল্প আবার মিলেমিশে একাকার। নাম দিয়েছি পাতালপুরীর রাজকন্যা। অন্য নাম দিলেও ক্ষতি ছিল না। একটু হেরফেরে রূপকথা তো শুধু রূপকথাই। সংলাপের ছড়াগুলো একটু টেনে টেনে পড়লে ভালো লাগবে। গানের সুর কথার ছন্দ মিলিয়ে করলেই চলবে।]

সূত্রধার ঃ ভোরের আলো ফুটি ফুটি। সাদা কালো দু'টি ঘোড়া ছুটছে। লাল সবুজ দুটি পাপড়িতে সূর্যের আভা। দুই ঘোড়ার পিঠে দুই বন্ধু। রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র। ভোরের আলোয় ঝলমল রাজপুত্র আর মন্ত্রিপুত্রের রঙিন পোশাক, জরির নাগরা, কোমরবন্ধের বাঁকা তলোয়ারও।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে। সাদা আর কালো ঘোড়া কেবল ছুটছে। ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে গেল ছোট্ট নদী, কালো পাথরের কোলে ঝর্না। তারপর সামনে তেপান্তরের মাঠ। মাঠ ফুরোয় না, ঘোড়াও থামে না। রাতের শেষে আবার ভোর হয়, সূর্য ওঠে। রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র—দুই বন্ধু ক্লান্ত। ক্লান্ত ঘোড়া দুটিও। মাঠের ওপারে সবুজ বনের রেখা। নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। আবার সন্ধ্যা ঘাসের উপর ছুটছে রামধনু রঙের খরগোস, চিত্রল হরিণ। ঘোড়া দুটি এসে থামল ক্ষীর-নদীর কূলে। তার জলে সূর্যাস্তের শেষ আলো আবির ছড়ায়। দুই বন্ধু ঘোড়া থেকে নামেন, ঘোড়া দুটিকে বেঁধে রাখেন মায়াতরুর ডালে। তার এক ডালে হীরামন, অন্য ডালে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি।

রাজপুত্র ঃ এ কোথায় এলাম,
এ যে রূপের হাট।
মন্ত্রিপুত্র ঃ এ তো সেই তেপান্তরের মাঠ।
রাজপুত্র ঃ এ কি সেই ক্ষীরসাগর,
মন্ত্রিপুত্র ঃ হীরামন দিচ্ছে শিস্
গাছের উপর।
রাজপুত্র ঃ আলোয় আলো আকাশখানা,
মন্ত্রিপুত্র ঃ রাত, না দিন যায় না জানা।

গান ॥ দ্বৈত ॥ রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র

মন বলছে দিন-দুপুর, বন বলছে রাত,
জমকালো লালকালো, রংমশালে মাত্॥
এই তো এলাম তেপান্তর
দুধসাগর ক্ষীরসাগর
দিনে রাতে মিলিয়ে গেল সবুজ বনের গান ;
সোনার গাছে হীরের দুল
হাওয়ায় ঝরে তারার ফুল
নিরুদ্দেশের ঠিকানাটার পেয়েছি সন্ধান।
ছুটল ঘোড়া উড়ল ঘোড়া
গভীর গোপন স্বপ্নে মোড়া
আকাশ এল বুকের কাছে, এল অকস্মাৎ॥

রাজপুত্র ঃ চুপ চুপ চুপ—
গাছের থেকে ওই কী পড়ল, টুপ।
মন্ত্রিপুত্র ঃ চুপ চুপ চুপ—
ফুল নয় তো, ফল যে অপরূপ।
রাজপুত্র ঃ একটি তো নয়, দুটি।
মন্ত্রিপুত্র ঃ গায়ে চুনির বুটি।
রাজপুত্র ঃ রসে ভেসে যায়।
মন্ত্রিপুত্র ঃ আয় খেয়ে নিই আয়।
সূত্রধার ঃ দুই বন্ধু মায়াতরুর উপহার দুটি অমৃত ফল খেয়ে গায়ে পেলেন নতুন বল। তারপর হাজির হলেন বিরাট এক পদ্মদীঘির ধারে। দুই বন্ধু আসতে না আসতেই দীঘির জল তোলপাড়। জল পাড় ভেঙে ছুটছে। রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র দৌড়ে গিয়ে উঠলেন মায়াতরুর ডালে। দেখতে পেলেন জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল এক বিরাট অজগর। তার মাথায় উজ্জ্বল এক মণি। মণির আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। অজগর ধীরে ধীরে এগোয় আর তারই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারা যেন দিগন্ত থেকে হঠাৎ গেয়ে উঠল সমবেত সংগীত।

গান ॥ সমবেত

দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি হাঁকলো,
হুম্ হুম্ হুংকার লাগলো॥
চিড় বিড় চিড়
দাঁত কিড়্মিড়্
জিব লক্লক্
চোখ চক্চক্
মহাভীম মহাকায় জাগলো॥
মড় মড় মড়
রাগ গরগর
জল তোলপাড়
সব চুরমার
বাসুকী ঘুম যেন ভাঙলো॥

সূত্রধার ঃ সাপ দীঘি ছেড়ে এগোয় মায়াতরুর দিকে। ঘোড়া দুটি কাঁপে ভয়ে। রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র যেই তরোয়াল বের করতে গেছেন, তখনই অজগর হঠাৎ অন্য দিকে সরে গিয়ে মাথার মণিটাকে ঘাসের উপর রেখে তাকালো গাছের ডালে। এমন সময় শোনা গেল ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির গলা—
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি ঃ
শোন শোন মন দিয়া প্রিন্স মহাশয়,
ঝোপ থেকে কোপ মার এই তো সময়।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথা শুনেই রাজপুত্র তরোয়াল হাতে নিচে নেমে গেলেন।

লাফ মারো ঝাঁপ দাও তরোয়ালে কচ্,
ঝটপট লটপট সব তচনচ।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথা শুনেই রাজপুত্র তরোয়াল হাতে নিচে নেমে গেলেন। অজগর পেঁচিয়ে পিষে মেরে ফেলতে চায় রাজপুত্রকে। রাজপুত্র তরোয়ালের ফলায় আটকান ছোবলকে। তুমুল লড়াই চলছে। এমন সময় আবার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গলা—

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি ঃ দিয়ে দুই থাপা
মণি ধর বাপা
দাও নাদি চাপা।

মন্ত্রিপুত্র তক্ষুণি গাছ থেকে নেমে ঘোড়ার নাদি চাপা দিলেন সাপের মণিকে। চাপা দেওয়া মাত্র অজগর কাত। রাজপুত্র তরোয়ালের কোপে তার মাথা কেটে দিলেন। মন্ত্রিপুত্র নাদিচাপা মণি হাতে এলেন রাজপুত্রের কাছে।

মন্ত্রিপুত্র ঃ সাবাস বন্ধু, সাবাস
তুমিই মারলে ফণী,

রাজপুত্র ঃ আসল জিনিস তুমিই পেলে
হাতে আনলে মণি।

সূত্রধার ঃ দুই বন্ধু মণি হাতে গেলেন দীঘির পাড়ে। তারপর মণির গায়ে লাগা নাদি যে-ই না জলে ধুতে গেলেন, হঠাৎ অবাক কাণ্ড! দীঘির জল যেন কাচ। সেই কাচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল নিচে, অনেক নিচে এক রাজ-প্রাসাদ।

মন্ত্রিপুত্র ঃ দেখো দেখো চেয়ে দেখো মিটে যাক সাধ,

রাজপুত্র ঃ এ যে পাতাল পুরীর রাজার প্রাসাদ।

মন্ত্রিপুত্র ঃ মণি হাতে ডুব দিই, চল দেখে আসি,

রাজপুত্র ঃ ভয় কি তোমার নেই, আছে সর্বনাশী।

মন্ত্রিপুত্র ঃ সর্বনাশী নয়, আছে রাজকন্যে,

রাজপুত্র ঃ আমারই জন্যে ?

সূত্রধার ঃ মণি হাতে দুই বন্ধু দীঘির অতলে নেমে দেখেন পাতালপুরীর অপরূপ এক রাজপ্রাসাদ। লোক নেই জন নেই, নির্জন পুরী। খিলানওলা সিংহদুয়ার খোলা। বড় বড় স্ফটিক স্তম্ভ। লাল নীল পাথর। চারদিকে খেলে বেড়াচ্ছে রঙিন মাছ। দুই বন্ধু এ ঘর থেকে ও ঘর যান, অবাক বিস্ময়ে তাকান। হলুদ সবুজ লতার ফাঁকে জ্বলছে মণি-মুক্তোর আলো। জ্বলছে নিভছে। নিভছে জ্বলছে। হঠাৎ জলতরঙ্গের মৃদু আওয়াজ। দুই বন্ধু সুরের ঝঙ্কারে থমকে দাঁড়ান, তারপর ছুটে যান ঘরের পর ঘর পেরিয়ে এক

মনোরম সরোবরে। নিজেদের আড়াল করে রাখেন বিরাট এক থামের পিছনে। দেখেন সরোবরের কোলে কখনও ঘুরে ঘুরে, কখনও গোল হয়ে নাচছে জল-পরীরা। তারা নাচতে নাচতে মিলিয়ে যায়। আবার আসে। সঙ্গে নারীকণ্ঠের গান।

গান ॥ সমবেত ॥ জলপরী

আমরা জলপরী
আমরা অপ্সরী।
রাজকন্যা মণিমালার
আমরা সহচরী ॥
আমরা জলপরী
গলায় সাতনরী।
পাতালপুরীর ভেঙেছে ঘুম
বেড়াই সঞ্চরি ॥
আমরা জলপরী
ফুলের মঞ্জরী।
সুরের ছন্দে দূরের গন্ধ
উঠল মর্মরি ॥

সূত্রধার ঃ নাচ-গান থামতেই দুই বন্ধু এগিয়ে এলেন ওদের ধরতে। কিন্তু ওরা নেই। আছে শুধু ওদের হাসি। শব্দ। সেই হাসি প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরে বেড়ায় খিলানে খিলানে মর্মর স্তম্ভে। আবার জলপরীদের দেখা যায় অন্য প্রান্তে। আবার নাচ। আবার গান—আমরা জলপরী। দুই বন্ধু ওদিকে যেতে না যেতেই ওরা হারিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় গান, ফুরিয়ে যায় নাচ। থাকে শুধু সেই হাসির আওয়াজ।

রাজপুত্র ঃ হঠাৎ আসে হঠাৎ মিলায় রূপবতীরা কারা?

মন্ত্রিপুত্র ঃ নাচের তালে গানের সুরে এমন মাতোয়ারা?

রাজপুত্র ঃ আপন রসে মগ্ন এরা আপন রূপে ধন্যা

মন্ত্রিপুত্র ঃ হয়ত এরাই অতল পাতালপুরীর মৎস্যকন্যা।

রাজপুত্র ঃ কিন্তু রাজকন্যে ভাই কই?

মন্ত্রিপুত্র ঃ তার আগে তো রাক্ষসকে মারবই।

রাজপুত্র ঃ রাক্ষসটা তো ছদ্মবেশী ছিল অজগরই

মন্ত্রিপুত্র ঃ ঠিক বলেছ, তাকে মেরেই এলাম পাতালপুরী।

সূত্রধার ঃ দুই বন্ধু ঘরের পর ঘর পেরিয়ে সন্তর্পণে এলেন ছোট্ট একটা ঘরে। ঘরের ভিতর সুরের গুনগুন, ধূপের ধোঁয়া, চন্দনের গন্ধ। মাঝখানে একটি সোনার পালঙ্ক। পালঙ্কের পায়া বেয়ে বেয়ে চলেছে রঙিন জল। পালঙ্কের কোল ঘেঁষে পড়েছে মেঘবরণ চুল। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন এই রাজকন্যাকেই পাতাল-পুরীতে এনে বন্দী করে রাখে তো অজগররূপী রাক্ষস। রাজপুত্র এলেন ঘরের মধ্যে। পেছনে মন্ত্রিপুত্র। ঢুকতেই যেন সেতার-সরোদ একসঙ্গে বেজে উঠল। ঝালার ঝনৎকার স্ফটিক স্তম্ভে আঘাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিল কাচের গুঁড়োর মতো। অনিমেষ রাজপুত্র, মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্র চুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শঙ্খবরণ রাজকন্যার তুলতুলে কপালে দিলেন নরম আঙুলের ছোঁয়া। আবার যন্ত্রের সুরঝঙ্কার। ঘুমন্ত রাজকন্যা চোখ মেলে দেখেন সামনে দূরদেশী এক রাজপুত্র। রাজপুত্রেরও দৃষ্টি রাজকন্যার পদ্মকলি চোখে। দু'জনেই নির্বাক। দুজনেই অপলক। আবার বেজে

ঘুমন্ত রাজকন্যা চোখ মেলে দেখেন সামনে দূরদেশী এক রাজপুত্র। [পৃঃ ৩০৪

উঠল সেতার-সরোদের মিঠে সুর। মৃদু আলাপ। রাজকন্যা মুক্তার ঝালর দেওয়া রূপার কুচিতে তৈরি নরম বালিশ থেকে মাথা তুলে বসলেন পালঙ্কে। যেন পটে আঁকা ছবি। কিন্তু তাঁর চোখে ভয়, চোখ থেকে বেরিয়ে পড়ল এক ফোঁটা জল—যেন মুক্তো।

রাজপুত্র ঃ হীরামোতি হেলে না
মাটিতে পা ফেলে না।
পাতালপুরীর বন্দিনী
কে তুমি, কার নন্দিনী ?

গান ॥ একক ॥ রাজপুত্র

কে গো তুমি জলকুমারী,
কোথায় তোমার কূল,
শঙ্খবরণ অঙ্গ তোমার মেঘবরণ চুল ॥
মণি দিয়া পেলাম মণি
মণিমালা সুনয়নী
সত্য করি কওগো কন্যা
নওগো চোখের ভুল ॥

গান ॥ একক ॥ রাজকন্যা

পালাও পালাও রাজার কুমার
নাই কি তোমার ডর,
তোমারে দংশিবে নিষ্ঠুর
দৈত্য অজগর ॥
আমার লাগি প্রাণ দিও না
ওগো প্রাণেশ্বর ॥

গান ॥ একক ॥ রাজপুত্র

ঝক ঝক তরোয়াল
শন শন বাণ,
শত্তুর ছারখার
খান খান খান ॥
গর গর অজগর
নিঃশেষ প্রাণ ॥

রাজপুত্র ঃ রাজকন্যা, তুমি আমার
আমার সঙ্গে চলো,
রাজকন্যা ঃ কেমন করে হেথায় এলে
সেই কথাটা বলো।
রাজপুত্র ঃ অজগরের মণির আলোয়
জলে দিলাম ডুব,
রাজকন্যা ঃ কেমন করে পেলে মণি
সাহস তোমার খুব।
রাজপুত্র ঃ মন্ত্রিপুত্র বন্ধু আমার,
পেলাম তার কৌশলে,
অজগরকে মেরে তোমার
কাছে এলাম চলে,
রাজকন্যা ঃ বিপদতারণ বন্ধু আমার
তুমিই আমার সব,
তোমার গলায় দেব মালা
করব তোমার স্তব।

রাজপুত্র ঃ তাই হোক সই, তাই হোক,
পালা বদল মালা বদল
যাক মিলে দুই চোখ।

সূত্রধার ঃ রাজকন্যা তাঁর গলার হীরার হার পরিয়ে দিলেন রাজপুত্রের গলায়, রাজপুত্র রাজকন্যার গলায় পরালেন তাঁর গলার মুক্তোমালা। বাজল সানাই, বাজল শঙ্খ। আবার এল জলপরীরা। রাজপুত্র ও রাজকন্যা বসলেন এক স্ফটিক মঞ্চে। একটু নিচে বসলেন মন্ত্রিপুত্র। জলপরীরা নাচল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল গান।

গান ॥ দ্বৈত ॥ রাজপুত্র ও রাজকন্যা

কিবা ঝনঝন কিবা ঝনঝন।
চরণে নূপুর বাজে নাচে খঞ্জন॥
(ঝন্ ঝন্ ঝন্)
কিনিকিনি কঙ্কণ
তুলিকায় অঙ্কন
কাজলে ও কুঙ্কুমে মায়া অঙ্কন॥
(ঝন্ ঝন্ ঝন্)
সেই গান এই গান
দুই প্রাণ এক তান
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ঝন্ ঝন্ ঝন্॥
(ঝন্ ঝন্ ঝন্)

সূত্রধার ঃ পাতালপুরীর উপরে মাটির পৃথিবীতে তখন অন্য চেহারা। দীঘির কাছেই আর এক রাজার রাজ্য। সেখানেও লোকলস্কর মন্ত্রী-সেপাই। রাজপ্রাসাদের অদূরে এক কুঁড়েঘর। সেখানে থাকে এক বুড়ি। তার একমাত্র ছেলে ফকিরচাঁদ। পাগলাটে বাউণ্ডুলে। প্রায়ই বাড়ি থেকে পালায়। নানা রকম ছদ্মবেশ পরে হঠাৎ হঠাৎ আসে, আবার চলে যায়। বুড়ি ছেলেকে সারাদিন খুঁজে বেড়ায়। পথচারী কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করে ফকির-চাঁদকে কেউ দেখেছে কি না।

গান ॥ একক ॥ বুড়ি

বয়স হল চার কুড়ি
চুল তো নয়, শনের নুড়ি।
থুত্থুড়ি থুত্থুড়ি॥
হাঁটি হাঁটি পা পা
আয়রে ফকির দেখে যা।
আমি ফকিরচাঁদের মা
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি॥

সূত্রধার ঃ ওদিকে পাতালপুরীতে রাজপুত্র ও রাজকন্যা নিচ্ছেন বিশ্রাম। কিন্তু মন্ত্রিপুত্রের আর ভাল লাগে না। তিনি বাড়ি ফিরতে চান। একদিন রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র মণি হাতে এলেন উপরে। মন্ত্রিপুত্র নিজেদের রাজ্যে ফিরে গেলেন পাতালপুরীর বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজপুত্রের বিয়ের কথা বলতে। আর মণি হাতে রাজপুত্র ফিরে গেলেন পাতালপুরীতে। বিদায় নেবার আগে স্থির হল, আগামী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মন্ত্রিপুত্র ঘোড়া দুটি নিয়ে হাজির হবেন, আর রাজপুত্র ও রাজকন্যা মণি হাতে তখনই উপরে উঠে আসবেন। দিন যায়। রাজপুত্র ও রাজকন্যা সুখে দিন কাটান। একদিন রাজকন্যা ফন্দি আঁটলেন, গোপনে একদিন ওই মণি হাতে উপরে উঠে মাটির পৃথিবী কেমন দেখে যাবেন। রাজপুত্র নিদ্রামগ্ন। তিনি সত্যি সত্যি চলে এলেন উপরে, বসলেন দীঘির ঘাটের শেষ ধাপে, তার চোখে মুখে বিস্ময়। মাটির পৃথিবী এত সুন্দর! ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিণ ময়ূর।

রাজকন্যা বসলেন দীঘির ঘাটের শেষ ধাপে, তার চোখে মুখে বিস্ময়। [পৃঃ ৩০৬

ডেকে যাচ্ছে পাখি। ফুল ফুটেছে চারধারে। রাজকন্যা এসব দেখেন নি।

গান ॥ একক ॥ রাজকন্যা

ও আকাশ, ও বাতাস, বনের বিছানা।
আমি আজ খুঁজে পেলাম আমার ঠিকানা॥
ওরে ময়ূর ওরে হরিণ
তোদের রঙে আমি রঙিন
চোখের দুয়ার খুলে দিল নতুন নিশানা॥
সুরের পাখি দূরের পাখি
কেন করিস ডাকাডাকি
বর্ষা শরৎ বসন্তময় জগৎ অজানা॥

সূত্রধার ঃ রাজকন্যা যখন পৃথিবীর রূপসুধা পানে মগ্ন, তখন দীঘির গায়ে লাগা রাজ্যের রাজকুমার চলেছেন মৃগয়ায়। সঙ্গে তীর ধনুক বল্লম হাতে শিকারীর দল। মাঝখানে হাতির পিঠে রাজকুমার। হাতির সামনে পতাকা হাতে লোকটি বাজনার তালে তালে গান ধরেছে।

গান ॥ একক ॥ রাজ-অনুচর

সাধু যায় যায় যায়।
যায় রে মৃগয়ায়॥
ধনুক থেকে মারল তীর
তার পরে তার চক্ষুস্থির
তীর ফিরে বুক বিঁধে দিল
কিসের ইশারায়॥

সূত্রধার ঃ দীঘির ধারে শিকারীর দল আসতেই ফকিরচাঁদের মা সেই বুড়িও দাঁড়ালো পথের ধারে। দীঘির ঘাটে জলে পা ডোবানো এক অপরূপ সুন্দরীকে দেখে রাজকুমারের চোখ স্তব্ধ। এ কে? কে এই রমণী, যেন শ্বেতপদ্ম ফুটেছে ঘাটের কিনারে? হঠাৎ শব্দ শুনে ভীতা রাজকন্যা ডুব দিয়ে আবার চলে গেলেন পাতালপুরী। আর এদিকে রাজকুমার হাতির পিঠ থেকে নেমে ছুটে যান দীঘির ঘাটে। কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত।

রাজকুমার ঃ এই দেখি এই নেই
কোথা গেল পরী সেই?
চাঁপার বরণ গা
সোনার বরণ পা
হারালো সে নিমেষেই?

সূত্রধার ঃ রাজকুমার মৃগয়া বন্ধ রেখে ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। আর কেবল বলতে লাগলেন, 'এই দেখি এই নেই।' তার এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার কারণ যে সেই জলে ডুব দেওয়া রাজকন্যা, এ কথা বুঝতে পারে কেবল সেই বুড়ি। রাজবৈদ্য রাজকুমারকে পরীক্ষা করে গেলেন। কিন্তু কিছুই ধরতে পারেন না। রাজ-

কুমারের মুখে সেই এক কথা—'এই দেখি এই নেই।' মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যে ঢোল শহরত দেওয়া হল। রাজকুমারকে যে সারাতে পারবে, তাকে দেওয়া হবে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকুমারী। ঘোষণা শুনতে পায় সেই বুড়িও।

ঘোষক ঃ রাজকুমারের অসুখ সারায় যে
রাজত্ব আর রাজকন্যা পায় সে।

বুড়ি ঃ কী বললেন, ফের কন্ না?
পুরা রাজত্ব, পুরা কন্যা?

ঘোষক ঃ একটি পুরা একটি আধা
না সারালে অর্ধচাঁদা।

সূত্রধার ঃ বুড়ি তখনই হাজির রাজপ্রাসাদে, বললে, আমি রাজকুমারের রোগ সারিয়ে দেব। কিন্তু কথা দিতে হবে, সারালে তার ছেলে ফকিরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে রাজকুমারীর। মন্ত্রী রাজী, রাজা রাজী। রাজকুমারের জীবন সবার আগে। বুড়ি বললে—

বুড়ি ঃ খড়ের চাল বাঁশের খুঁটির
চাই ছোট্ট একটি কুটির।
দীঘির ধারে দিলেই তবে
তোমার ছেলে ভাল হবে।

সূত্রধার ঃ মন্ত্রী বললেন, তথাস্তু। বুড়ি কিছু সিপাই নিয়ে থাকে নতুন তৈরি কুঁড়েঘরে। দিন যায়। আবার আর একদিন মাটির পৃথিবী দেখার লোভে, আকাশের রঙ দেখতে, বাতাসে বুক ভরতে, হরিণ ময়ূরের সঙ্গে মিতালি পাতাতে পাতাল-পুরীর রাজকন্যা রাজপুত্রকে লুকিয়ে মণি হাতে ভেসে উঠলেন ঘাটে। কাছে-পিঠে লোকজন নেই। রাজকন্যা যেই জলে-আঙুলে লেখা করতে করতে একটু অন্যমনস্ক, ঠিক তখনই চুপিসাড়ে বুড়ি এসে খপ করে ধরে ফেলল তাঁর হাত। রাজকন্যা তখন নিজেই ভয়ার্ত হরিণী।

বুড়ি ঃ কে তুমি গো লাল টুকটুক
কী সুন্দর এত্তোটুক্।
এসো তোমায় বুকে নিই
রাঙা চরণ ধুইয়ে দিই।

সূত্রধার ঃ বুড়িকে নিরাপদ ভেবে সরলমতি রাজকন্যা ডুবে পালানো থেকে নিরস্ত হলেন। বুড়ি তাঁর গা মেজে দেয়, চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। রাজকন্যা এই আদরে খুশি, তবে মণিটা লুকোতে চান শাড়ির আঁচলে। তখন বুড়ি বলে—

বুড়ি ঃ সাত রাজার ধন এক মাণিক
নয়ন জুড়াক দেখে খানিক।
পাথরটা মা ঘাটে রাখো
কেউ কিন্তু নেবে নাকো।

সূত্রধার ঃ রাজকন্যার মনে আর সন্দেহ নেই সংশয় নেই। মণিটা ঘাটে রাখলেন। কিন্তু কী কাণ্ড, বুড়ি তা কোঁচড়ে লুকিয়ে নেয়, আর রাজকন্যা কিছু বলার আগেই তাঁর দুটি হাত চেপে ধরে চিৎকার পাড়ে—'সিপাই সিপাই।' পাশের ঝোপে লুকিয়ে থাকা সিপাইরা ছুটে এসে রাজকন্যার মুখ বেঁধে পাঁজা-কোলা করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলে যায়। তাঁকে হাজির করে রাজকুমারের কাছে। রাজকুমার বলেন,—'এই তো সেই এই তো সেই।' তার উন্মাদ ভাব কেটে যায়। রাজা খুশি, মন্ত্রী খুশি। রাজকন্যাকে বন্দী করা হল একটি ঘরে। উদ্যোগ আয়োজন চলল বিয়ের। রাজ-কন্যা তখন অধীর রাজকুমারকে বললেন, একটি মাস সময় চাই, আমার ব্রত আছে। ব্রতের সময় পুরুষের সঙ্গ মানা।

মন্ত্রিপুত্র ফকিরচাঁদের নকল দাড়িগোঁফ লাগান মুখে, মাথায় বাঁধেন পাগড়ি।

রাজকুমার রাজী হলেন। প্রথম বিপদ কাটল। তবু অসহায় রাজকন্যা একা ঘরে কাঁদেন আর ভাবেন কী করে পালানো যায়। ওদিকে পাতালপুরীতে রাজকন্যাকে না দেখতে পেয়ে রাজপুত্র উন্মাদের প্রায়। মণি নিয়ে কোথায় পালালেন মণিমালা? তবে কি তিনি লুকিয়ে জলের উপরে গেছেন এবং পড়েছেন কোন বিপদে? কিন্তু হায়, মণিও নেই যে উপরে গিয়ে তাঁকে আবার উদ্ধার করবেন। বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এসে পাতালপুরীতে রাজপুত্র নিজেই যে বন্দী। আর মন্ত্রিপুত্র? তিনি শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ঠিক সময়ে ঘাটে এসে দেখেন কেউ নেই, না রাজপুত্র, না রাজকন্যা। উথাল-পাতাল চিন্তা তাঁর মাথায়। হঠাৎ দেখেন দুটি পথচারী কথা বলতে বলতে চলেছে শহরের দিকে।

প্রথম লোক ঃ রাজকুমারের বিয়ে হবে,
দু' দিন বাকি

দ্বিতীয় লোক ঃ তাই নাকি তাই নাকি?

প্রথম লোক ঃ দীঘির ঘাটে দেখা মেয়েই
পাকাপাকি

দ্বিতীয় লোক ঃ তাই নাকি তাই নাকি?

প্রথম লোক ঃ রাজবাড়িতে না আনলে
দিত ফাঁকি

দ্বিতীয় লোক ঃ তাই নাকি তাই নাকি?

সূত্রধার ঃ মন্ত্রিপুত্র অনুমান করেন কোনো কারণে রাজকন্যা উপরে আসায় তিনি বিপন্ন—এখানকার রাজবাড়িতে বন্দী এবং রাজপুত্র বন্দী পাতালপুরীতে। তাহলে কি এখানকার রাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে? কিন্তু সে অসম্ভব, এ হতে দেওয়া চলবে না। মন্ত্রিপুত্র এগিয়ে চলেন চিন্তিত মনে। আর এক দল পথচারীর সঙ্গে দেখা।

প্রথম লোক ঃ বাউণ্ডুলে সেই ফকিরচাঁদ
পুরল তারও মনের সাধ।

দ্বিতীয় লোক ঃ কিন্তু তো তার নেইকো দেখা
ছেলে কোথায়, বুড়ি একা।

তৃতীয় লোক ঃ সাজবে ফকির যে কোন লোক
চাপল যখন বুড়ির রোখ।

সূত্রধার ঃ মন্ত্রিপুত্রের মাথায় অন্য বুদ্ধি আসে। তিনি পথচারীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন ফকিরচাঁদ দেখতে কেমন, কী পোশাক, পরে সব জেনে নিয়ে তিনি নকল দাড়িগোঁফ লাগান মুখে, মাথায় বাঁধেন পাগড়ি, আর বাড়ি থাকার কথা বুড়ি বললে নাচতে নাচতে গেয়ে ওঠেন—তা হবে না, তা হবে না। ওটাই ফকিরচাঁদের মুদ্রাদোষ। তারপর হাজির বুড়ির বাড়ি।

বুড়িঃ কে দাঁড়িয়ে, ফকির নাকি?
মন্ত্রিপুত্রঃ চিনতে তোমার নেইকো বাকি।
বুড়িঃ ওরে আমার মাণিক রে, এবার কি তুই থাকবি বাড়ি?
মন্ত্রিপুত্রঃ তা হবে না তা হবে না, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।
বুড়িঃ রাজকন্যা ঠিক করেছি, করতে হবে তোকে বিয়ে।
মন্ত্রিপুত্রঃ তা হবে না তা হবে না, পালিয়ে যাব খেয়ে নিয়ে।
বুড়িঃ কী পেলে তুই থাকবি বল্?
মন্ত্রিপুত্রঃ হবে না মা কিচ্ছুতে ফল।
বুড়িঃ আচ্ছা যদি মণি দিই?
মন্ত্রিপুত্রঃ তবে সেটা সঙ্গে নিই।
বুড়িঃ করবি বিয়ে তাহলে তুই?
মন্ত্রিপুত্রঃ মণি পেলেই রাজী মুই।
বুড়িঃ এই নে মণি আপত্তি নাই,
মন্ত্রিপুত্রঃ চলো চলো রাজবাড়ি যাই।
সূত্রধারঃ ফকিরচাঁদের বেশে মন্ত্রিপুত্র রাজবাড়িতে হাজির। সঙ্গে বুড়ি। ফকিরের চেহারা দেখে মন্ত্রী বিরক্ত, রাজা বিরক্ত। কিন্তু কী আর করা, প্রতিশ্রুতি তো রাখতেই হবে। বুড়ি ছেলেকে রেখে চলে যায়। মন্ত্রীর হুকুমে একজন অনুচর মন্ত্রিপুত্রকে নিয়ে যায় অন্দরমহলে। ভাবী জামাইয়ের স্থান অন্তঃপুরে। সেখানে স্নান-টান করিয়ে পরানো হবে নতুন পোশাক। মন্ত্রিপুত্র অন্তঃপুরের অন্ধি-সন্ধি সব জেনে নিলেন ইতিমধ্যে। তারপর সেদিনই মাঝরাতে হাজির হলেন পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘরের জানালায়। রাজকন্যা ভয়ে আঁতকে ওঠেন। মন্ত্রিপুত্র গোঁফদাড়ি পাগড়ি খুলে ফেলেন। রাজকন্যা চিনতে পারেন মন্ত্রিপুত্রকে।
মন্ত্রিপুত্রঃ খিড়কি দুয়ার খোলা আছে, পালাই চলো
রাজকন্যাঃ রাজপ্রাসাদে কেমন করে এলে বলো?
মন্ত্রিপুত্রঃ এ সব কথা পরে হবে, দরজা খোলো
রাজকন্যাঃ রাজপুত্রের কাছে আমায় নিয়ে তোলো।
সূত্রধারঃ খিড়কি দুয়ারের সিপাইকে দশ মোহর ঘুষ দিয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে মন্ত্রিপুত্র চুপিচুপি পালালেন রাতের অন্ধকারে। তারপর মণির দৌলতে দু'জন নামলেন পাতালপুরীর অতলে। রাজপুত্র রাজকন্যাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। রাজপুত্র বুঝতে পারেন, তিনি সব ফিরে পেলেন বন্ধু মন্ত্রিপুত্রের কল্যাণে। মন্ত্রিপুত্র বলেন, এ সব কথা পরে, চল, এখনই উপরে উঠি। রাতের অন্ধকারে এই রাজ্য ছেড়ে না পালালে ধরা পড়ে যাবো। দুয়ারের দরজায় স্ফটিক স্তম্ভের পর স্ফটিক স্তম্ভ ফোয়ারার পর ফোয়ারা পেরিয়ে পাতালপুরীর কাছে বিদায় নিলেন তিনজন। চলে এলেন উপরে। ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল সেই দুটো ঘোড়া। একটিতে উঠলেন মন্ত্রিপুত্র। অন্যটিতে রাজপুত্র ও রাজকন্যা, ঘোড়া চলল দেশের দিকে। আবার সেই তেপান্তরের মাঠ। দুধসাগর ক্ষীরসাগর। মাঠ পেরিয়ে ঘোড়া দুটি ছুটল তীরের বেগে। সামনে ঘন বন। সেই বনের মাঝখানে বিরাট বটগাছ। গাছের নিচে ঝুরি ঝুলছে। আর চলছে কুদর্শন কিছু লোকের হল্লা। ওরা কারা? ডাকাতের দল নাকি? ঠিক তাই। আবার বিপদ।

গান ॥ সমবেত ॥ ডাকাত দল

সকলে : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ
খুব সুরৎ হীরে জহরৎ লুঠতে
চলেছি।

সর্দার : আরে চুপ চুপ চুপ চোপ,
খড়্গ মারি কোপ

সকলে : কাটি কচকচ করি তচনচ, ঝোলায়
পুরেছি॥
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ

সর্দার : থোড়াই করি ভয়, কালী মাঈকী জয়

সকলে : বম বম বম বম, ভোলানাথ বলতে
লেগেছি॥
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ

সূত্রধার : সামনে আসতেই ডাকাতরা পথ রুখে দাঁড়ালো। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র ও রাজকন্যার হীরে মুক্তো লাগানো পোশাক আর গায়ের দামী অলঙ্কার দেখে ডাকাতদের চোখ লোভে চকচক করে। ঘোড়া দুটো ডাকাতদের দেখে চিৎকার পাড়ে—চিঁ-হি চিঁ-হি চিঁ-হি।

মন্ত্রিপুত্র : মারতে হবে ভাই মারতে হবে

রাজপুত্র : কেন এই তরোয়াল আছে তবে ?

মন্ত্রিপুত্র : রাজ্যে ফেরার পথে ফ্যাসাদ
আবার

রাজপুত্র : কুছ পরোয়া নেই, করব সাবাড়।

সূত্রধার : রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেই একাই আক্রমণ করলেন ডাকাতদের। সর্দার এগিয়ে এল খড়্গ হাতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওরা পালাল। রাজপুত্র, রাজকন্যা ও মন্ত্রিপুত্র আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে ছুটলেন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রাজবাড়ির চূড়ো। উড়ছে পতাকা, বাজছে সানাই, বাজছে শঙ্খ। শহরের ভিতরে আনন্দোল্লাস। রাজপুত্র ফিরছেন বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। জয় রাজপুত্রের। এই তো সামনে সিংহদ্বার। ওরা প্রবেশ করলেন রাজবাড়ির ভিতরে। রাজা এগিয়ে এলেন। রাণী বরণ করে নিলেন রাজকন্যাকে। রাজপুত্র প্রণাম করলেন মা ও বাবাকে। রাজকন্যা মণিমালা আনন্দে বিহ্বল। রাজ্য জুড়ে শুরু হল উৎসব। গান ধরেছে সবাই আনন্দে।

গান ॥ সমবেত

এক দুই তিন—
তা ধিন ধিন ধিন॥
এক দুই তিন চার,—
জলকুমারী নিয়ে এল রাজার কুমার॥
এক দুই তিন চার পাঁচ—
আজকে বড় সুখের দিন, আনন্দে আয়
নাচ॥
এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়—
পাতাল পুরীর জলকুমারীর আর নেইকো
ভয়॥
এক দুই তিন চার, পাঁচ ছয় সাত—
রাজকুমারীর বিয়ে হবে রাজকন্যার সাথ॥
এক দুই তিন চার পাঁচ, ছয় সাত আট—
আয় নিয়ে আয় ফুলের মালা
আন্ পালঙ্ক খাট।
এক দুই তিন চার পাঁচ,
ছয় সাত আট নয়—
রাজ্যি জুড়ে বাদ্যি বাজে বড়ই সুসময়॥
এক দুই তিন চার পাঁচ,
ছয় সাত আট নয় দশ—
রাজপুত্তুর সোনার পুত্তুর
রাজকন্যার বশ।

গরাদহীন জানালায় রাক্ষস

—সমরেশ বসু

গোগোল একটা অদ্ভুত গল্প শুনেছিল ওর মায়ের কাছে। অদ্ভুত বলতে ঠিক অদ্ভুত নয়, বেশ ভয় ধরানো গা ছমছমে, আর কেমন একটা কষ্টও হয়েছিল। গোগোল মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা সেই ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছিলেন কি না। মা হেসে বলেছিলেন, "না, আমি নিজের চোখে তো দেখি নি বটেই। আমিও আমার ছেলেবেলায় গল্পটা শুনেছিলাম আমার দিদিমার কাছে। তোমার মত আমিও দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি ঘটনাটা দেখেছিলেন কি না। দিদিমা বলেছিলেন, তিনি দেখেন নি। তবে ঘটনাটা নাকি সত্যি ঘটেছিল দিদিমার ছেলেবেলায়। দিদিমা তো গ্রামে ছিলেন। ঘটনাটি নাকি ঘটেছিল দিদিমাদের পাশের একটা গ্রামেই। দিদিমা বিশ্বাস করতেন, ওরকম ঘটনা সত্যি ঘটতে পারে।"

গল্পটা যা যা বলেছিলেন, তা ছিল এই রকম। তাঁর দিদিমাদের পাশের গ্রামে ছিল এক নিকিরি পরিবার। নিকিরি হল এক শ্রেণীর মৎসজীবী সম্প্রদায়। তারা ছিল অবশ্য মুসলমান। পাশের গ্রামে, নিকিরিপাড়া বলে, একটা পাড়াও ছিল। কয়েক ঘর নিকিরি সেই পাড়ায় বাস করত। সেই পাড়ায় এক নিকিরি পরিবারে ছিল কেবল দুজন। স্বামী আর স্ত্রী। স্বামীর নাম ছিল সোলেমান। আর তার বিবির নাম ছিল হাসিনা।

সোলেমানের কোন জমি-জিরেত ছিল না। খালে বিলে মাছ ধরে বেড়াত। রাত্রের দিকেই একটা ছোট লণ্ঠন হাতে নিয়ে সে খ্যাপলা জালে মাছ ধরত। সকালবেলা বাজারে গিয়ে মাছ বিক্রি করত। তার নিজের কোন পুকুর ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই সে মাছের চারা পুকুরে ছেড়ে বড় করত। আর বড় মাছ বিক্রি করে বেশি টাকাপয়সাও রোজগার করতে পারত। কিন্তু তা না থাকায় যে সব খালে বিলে মাছ ধরলে কোনরকম কর বা ট্যাক্স দিতে হত না, সোলেমান সেই সব খালে বিলে জাল ফেলে মাছ ধরত। সে সব খালে বিলে সকলেরই মাছ ধরার অধিকার ছিল। জালে তেমন কিছুই উঠত না। ছোট ছোট ল্যাটা, মাগুর, কই, ট্যাংরা, পুঁটি। গ্রামের বাজারে তার তেমন দামও পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে ঘন বুনটের আঁটোল জাল ছেঁচে কুচো চিংড়িও ধরত।

সোলেমান ছিল এইরকম একজন গরিব নিকিরি। গরিব হলেও সে আর হাসিনা মোটামুটি সুখেই ছিল। সামান্য মাছ বিক্রি করে যা পাওয়া যেত, দু'জন মানুষের কোন রকমে চলে যেত। তা ছাড়া সোলেমান ছিল একজন গুণিন। তাকে লোকে ধার্মিক মনে করত। গরিব মানুষদের অসুখ-বিসুখে সে জলপড়া দিত। নানা রকম ঘাস লতাপাতার রস দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দিত। তাতে লোকের অসুখও সারত। এমন কি, সে মাদুলিও দিত। লোকে তাকে বিশ্বাস করত। সে এ সবের জন্য কারোর কাছ থেকে একটি পয়সাও নিত না। সেজন্য লোকে তাকে ভালবাসত। হিন্দু-মুসলমান, সকলেই তার খাছে আসত। সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ছিল খুব ভাল।

একদিন সে ঠাট্টা করে তার বিবিকে বলেছিল, "আমি ইচ্ছে করলে পুকুর খাল বিলের সব মাছ খেয়ে ফেলতে পারি।"

বিবি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "খেয়ে ফেলতে পার মানে কি? জালে ধরে এনে রেঁধে খাবার কথা বলছ?"

সোলেমান বলেছিল, "জালে কি আর সব মাছ ধরা যায়? আর সব মাছ ধরে রান্না করে একজন মানুষ কখনো খেতে পারে? আমি জলে ডুবে ডুবে মস্ত হাঁ করে সব মাছ খেয়ে ফেলতে পারি।"

হাসিনা খুব অবাক হয়ে বলেছিল, "সে আবার কেমন ব্যাপার? তা আবার কখনো হয় নাকি?"

সোলেমান বলেছিল, "কেন হবে না? ধর, আমি যদি কুমীর হয়ে যাই, তা হলেই জলে ডুবে সব মাছ খেয়ে ফেলতে পারি। খালি মাছ কেন, তখন আমি জলের ধারে মানুষ জানোয়ার যা পাব, সবই খেয়ে ফেলতে পারি।"

হাসিনা ভেবেছিল, সোলেমান ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে। তাই সে বলেছিল, "তা বলে তুমি তো আর সত্যি সত্যি কুমীর হতে পারবে না। হলে না হয় খেতে পারতে। কিন্তু মানুষ কখনো কুমীর হতে পারে না।"

সোলেমান বলেছিল, "আমি কিন্তু কুমীর হতে পারি।"

হাসিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী করে?"

সোলেমান বলেছিল, "আমি একটা মন্ত্র জানি। সেই মন্ত্রপড়া জল আমার গায়ে ছিটিয়ে

দিলেই, আমি কুমীর হয়ে যাব। আবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেই জল গায়ে ছিটিয়ে দিলেই আমি মানুষ হয়ে যাব। তবে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে হবে।"

সোলেমানের কথা শুনে হাসিনার তেমন বিশ্বাস হয় নি। ভেবেছিল তাকে বোকা বোঝাচ্ছে। তবু মানুষের মন। হাসিনার খুব কৌতূহল হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "আর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি সেই মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে না দেওয়া হয়?"

সোলেমান হেসে বলেছিল, "তা হলে আর আমি মানুষ হতে পারব না।"

হাসিনার তখন অবিশ্বাসের থেকে কৌতূহলই বেশি হয়েছিল। অবিশ্বাস করার কোন কারণও ছিল না। সোলেমান কখনও মিথ্যা কথা বলত না। আর সে ছিল সত্যিকারের একজন গুণিন। হাসিনা বলেছিল, "বেশ, তুমি আমাকে সেই মন্ত্র পড়া জল দাও। আমি তোমার গায়ে ছিটিয়ে দেব। দেখব তুমি কেমন কুমির হও?"

সোলেমান চুপচাপ একটু ভেবেছিল। তারপরে বলেছিল, "শোন হাসিনা বিবি, এসব করতে নেই। এ হল জীবন নিয়ে খেলা। তুমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমার গায়ে জল না দাও, তা হলে কিন্তু আমাকে আর ফিরে পাবে না।"

হাসিনা বলেছিল, "এক ঘণ্টা কেন? আমি তোমার কুমির হওয়া দেখে একশো পর্যন্ত গুনব, তারপরেই জল ছিটিয়ে দেব। কিন্তু বলেছ যখন, তোমাকে দেখাতে হবে।"

সোলেমান জানত, হাসিনাকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কথাটা সে যেদিন তার বিবিকে বলেছিল, সেদিনটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। তার পরের দিন অমাবস্যা। সে বলেছিল, "ঠিক আছে। তোমার যখন এতই দেখতে ইচ্ছে করছে, কাল রাত পোহালেই দেখাব। আজ মাঝ রাত্তিরে অমাবস্যা পড়বে। তখন আমি সেই মন্ত্রপড়া জল বানাব। তুমি সকালবেলা উঠোনে আমার গায়ে সেই জল ছিটিয়ে দেবে। তবে একটা কথা। তুমিই শুধু দেখবে, আর কারুকে বলবে না। এসব জিনিস লোকজনকে বেশি দেখতে নেই। খোদাতালার রাগ হয়।"

হাসিনা বলেছিল, "সে কারোকেই বলবে না। বলেও নি। পরের দিন ভোরবেলা সোলেমান হাত-মুখ ধুয়ে অজু করে নামাজ পড়েছিল। হাসিনার যেন তর সইছিল না। ছেলেমানুষের মত ছটফট করছিল। সোলেমান ঘরের ভিতর থেকে ছোট একটা কাঁসার বাটি নিয়ে উঠোনে এসেছিল। নিকিরি পাড়ায় ওদের বাড়িটা ছিল হিজলি খালের ধারে, এক টেরেতে। উঠোনের চারপাশে ঘেরা ছিল প্যাকাটি কাঠির গায়ে গোবর মাটি জড়ানো বেড়া। আর একপাশে ছিল বাইরে যাতায়াত করার ইঞ্চি বাঁশের ঝাঁপ দরজা। সোলেমান হাসিনাকে কঞ্চি বাঁশের ঝাপটা বন্ধ করে দিতে বলেছিল, যেন কেউ এসে পড়তে না পারে। তারপরে কাঁসার বাটিটা হাসিনার হাতে দিয়ে, উঠোনের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বলেছিল, "খোদার নাম নিয়ে এবার আমার গায়ে বাটির অর্ধেক জল ছিটিয়ে দাও। বাকি অর্ধেক জল পরে ছিটিয়ে দেবার জন্য রেখে দাও।"

হাসিনা খোদার নাম করে, সোলেমানের খালি গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঘরের চালায় একটা দাঁড়কাক কা-কা করে ডেকে উঠেছিল। জল ছিটিয়ে দেবার পর সোলেমান কয়েক মুহূর্ত যেন মড়ার মত পড়েছিল। তারপরেই হাসিনা দেখেছিল, সোলেমান নেই। উঠোনের ওপর বিশাল এক কুমির হাসিনার দিকে ফিরেছিল। সেই ভয়ঙ্কর কুমীর দেখে হাসিনা ভয়ে আঁতকে

উঠেছিল। কুমীরটা যে আসলে তার স্বামী সোলেমান, সেই কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল। হাতের কাঁসার বাটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে, দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে উঠেছিল, "ওগো, কে কোথায় আছো, শীগগির এস। আমার উঠোনে কুমীর।"

আর কুমীররূপী সোলেমান দেখছিল, সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। যে বাকি অর্ধেক জলে তার মানুষের শরীর ফিরে পাবার কথা, হাসিনা ভয় পেয়ে সে জলই বাটিসুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল। সোলেমান কুমীর হলেও তার ভিতরে মানুষের মনটা ছিল। ভেবেছিল, কী ভুলই না সে করেছে। হাসিনা যে ভয় পেতে পারে, এটা সে একবারও ভাবে নি। ভাবলে আগেই সাবধান করে দিত। অথচ তখন আর তার মানুষের মত কথা বলার উপায় ছিল না। সে কেবল হাঁ করেছিল।

বিরাট কুমীরের হাঁ দেখে হাসিনা আরও ভয় পেয়েছিল। তার চিৎকারে নিকিরি পাড়ার লোকজন ছুটে এসেছিল। তারাও উঠোনের মাঝখানে সেই ভয়ংকর বিরাট কুমীর দেখে বাড়িতে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না। কুমীররূপী সোলেমান তখন উঠোনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাড়ার লোকেরা ভাবছিল, এত বড় কুমীর কোথা থেকে সোলেমানের উঠোনে এসে উঠেছে! ওদিকে হাসিনা ভয় পেয়ে, প্রথমে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেও, পরে তার মনে হয়েছিল, কী সর্বনাশ সে করেছে! সে ঘরের বাইরে এসে কুমীররূপী সোলেমানকে দেখেছিল। আর কুমীর তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়েছিল।

হাসিনা তখন কপাল চাপড়ে কেঁদে কূল পায় নি। বাটির অর্ধেক জল তখন উঠোনের মাটি শুষে নিয়েছিল। সে পাড়ার লোকজনকে সব কথা ভেঙে বলেছিল। শুনে তো সকলের মাথায় হাত! খোদার এই মর্জির ওপরে তো আর কারোর খোদ্‌গিরি চলবে না। এখন উপায়? আশেপাশের গ্রামে যত গুণিন ওঝা ছিল, সবাইকে ডাকা হল। তারা কেউ কিছু করতে পারল না। পাড়ার সব থেকে বুড়ো নিকিরি দূর থেকে কুমীররূপী সোলেমানকে বার বার বলতে লাগল, "সোলেমান, তুমি ছাড়া আর কেউ এর বিধেন করতে পারবে না। যদি কিছু করার থাকে, তুমিই কর।"

সোলেমানের তখন আর কিছুই করার ছিল না। সে উঠোন থেকে কাঁসার বাটিটা মুখে নিয়ে গিলে ফেলেছিল। তাতেও কিছু হয় নি। সবাই দেখেছিল, কুমীরের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। হাসিনা কপাল চাপড়ে কেঁদে বলেছিল, "ওগো মিঞাজান, আমি কী সর্বনাশ করলাম! এখন আমার কী হবে?"

সোলেমানের আর সে জবাব দেবার উপায় ছিল না। সারাটা দিন সে উঠোনে রইল। তারপরে বিকালের দিকে কঞ্চি বাঁশের খোলা ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাসিনা পিছনে পিছনে গেল। কুমীররূপী সোলেমান হিজলি খালের জলে নেমে ডুব দিল। হাসিনা চিৎকার করে অনেক কাঁদল। কুমীর তখন আর উঠল না।

সেই থেকে সোলেমান চিরকালের জন্য কুমীর হয়ে গিয়েছিল। হাসিনা মাঝে মাঝেই খালের ঘাটে এসে বসে থাকত। আর কুমীর জলের ওপর ভেসে উঠত। হাসিনা কেঁদে কেঁদে অনেক কথা বলত। কুমীর শুনত। তারপরে আবার ডুব দিয়ে চলে যেত। এমনি

করে হাসিনা যতদিন বেঁচেছিল, সেই কুমীরকে সবাই হিজলি খালের জলে দেখতে পেত। হাসিনা মরে যাবার পরে সেই কুমীরকে কেউ আর কোনদিন খালে দেখতে পায় নি।

গোগোল গল্পটা শুনে আর কোনদিন ভুলতে পারে নি। অনেক সময় ওর মনে হয়েছে, গল্পটা নেহাতই আজগুবি। মানুষ কি কখনও কুমীর হতে পারে? যুক্তি দিয়ে এরকম একটা ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। তবু গল্পটা যেন ওর মাথায় বিঁধেছিল। সোলেমানের জন্য ওর মনে কষ্ট হত। হাসিনার জন্যও কষ্ট হত।

একবার শীতের ছুটিতে গোগোলরা বেড়াতে গেল জরাইকেলা। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, প্রগ্রেস-রিপোর্টও বেরিয়ে গিয়েছে। গোগোল ভালভাবেই পাস করেছে। কিন্তু বেড়াতে যাবার কোন কথাই ছিল না। সেই সময়েই বাবার এক কবি বন্ধু একদিন বেড়াতে এলেন। বাবার কবি বন্ধুর বেশ নামডাক আছে। নাম তাঁর গিরীন্দ্রশেখর মুস্তাফি। কবি হলেও তিনি একটা বড় চাকরি করেন। কিন্তু সবাই তাঁকে কাজী নজরুলের মত বিপ্লবী কবি বলে। গোগোল নজরুলের কবিতা অনেক পড়েছে। বুঝতেও অসুবিধা হয় না। গিরীন্দ্রশেখরের কবিতা এত কঠিন, গোগোল পড়েও কিছুই বুঝতে পারে না। বাবাকে সে কথা বললে, বাবা বলেন, "গিরীনের কবিতা তুমি এখন বুঝতে পারবে না। আরও বড় হও, তখন বুঝতে পারবে।"

গোগোলের অবশ্য গিরীন কাকার কবিতা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। মানুষটিকে ওর খুব ভাল লাগে। চেহারাটা তাঁর তেমন লম্বা-চওড়া নয়। মাথার চুলও ছোট করে কাটা। কবি বললেই যেমন রবীন্দ্রনাথ নজরুলের চেহারা মনে পড়ে, তাঁর চেহারা মোটেই সেরকম নয়। কবি সুকান্তর মতও তিনি দেখতে নন। সুকান্তর ছবি দেখলে তাঁকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। আর এ কথাও সত্যি, তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন।

গিরীন কাকাকে দেখতে আর দশটা সাধারণ লোকের মতই। তবে তাঁর চোখ দুটো বেশ বড়। হাসিটা খুব সুন্দর। তবে তাঁর কথাবার্তা বেশ তেজী ভাবের। তিনি ভগবানে বিশ্বাসী নন, এ কথাটা প্রায়ই বলেন। মানুষের কুসংস্কার সম্পর্কে তিনি খুব বিদ্রূপ করেন। সাধারণ মানুষ যা সব বলে আর বিশ্বাস করে, তিনি তা মোটেই করেন না।

গোগোল আগেও শুনেছে, গিরীন কাকার বাবা থাকেন জরাইকেলায়। তাঁর বাবা সেখানে জঙ্গলের ঠিকাদার। তাঁদের একটা বড় বাড়ি আছে সেখানে। জায়গাটা নাকি খুবই সুন্দর। আসলে জরাইকেলা হল একটা জঙ্গলের জায়গা। সারেণ্ডা নামে বিরাট জঙ্গলের ধারেই জরাইকেলা বলতে গেলে একটা ছোট গ্রাম। ঐ নামে একটা স্টেশনও আছে। আর জরাইকেলার ধার দিয়ে বয়ে গিয়েছে কোয়েল নামে পাহাড়ী নদী। আসলে সারেণ্ডা জঙ্গলটাই পাহাড়ী।

সেবারে গোগোলের পরীক্ষার শেষে একদিন গিরীন কাকা এসে বাবাকে বললেন, "তোমাকে অনেকবার বলেছি, চল একবার জরাইকেলা বেড়িয়ে আসি। এখন তো গোগোলের ছুটি। সামনেই বড়দিন। বড়দিনে তো কলকাতায় থাকোই। চল এবার জরাইকেলায় আমাদের বাড়ি যাই।"

বসবার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। বাবা মা দুজনেই ছিলেন। গোগোলও ছিল। বাবা

বললেন, "গোগোলের ছুটি আছে। আমার তো নেই। টানা অন্তত এক সপ্তাহের ছুটি না পেলে যাব কেমন করে?"

বাবা কথাটা বলে মার দিকে তাকালেন। গিরীন কাকাও মার দিকে তাকিয়েছিলেন। মাকে তিনি 'তুমি' করে নাম ধরেই বলেন। বললেন, "কী, তুমি কী বল? খুচরো ছুটিটাকে টানা করে নিলেই যাওয়া যায়। তবে এটা বলতে পারি, গেলে তোমাদের জায়গাটা ভাল লাগবে। চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। কোয়েল নদীর তো তুলনা নেই। জরাইকেলায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন, আর সারেণ্ডা ফরেস্টে বেড়িয়ে বইও লিখেছিলেন।"

মা বললেন, "আপনার কবিতা পড়েই আমার জরাইকেলা দেখা হয়ে গেছে। অন্তত যা পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, খুবই সুন্দর জায়গা।"

বাবা বললেন, "তা সত্যি।"

গিরীন কাকা হেসে বললেন, "এতে আমার কবিতার প্রশংসা করা হল বটে, তবে আমি তা শুনতে চাই নি। কবিতা পড়ে কি আর আসল বোঝা যায়? চল ঘুরে আসি। থাকবার কোন কষ্ট নেই। অনেকগুলো ঘর আছে, বাগান আছে। পাহাড় জঙ্গল দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠলে, কয়েকটা স্টেশন পরেই রয়েছে রাউরকেলা স্টিলপ্ল্যাণ্টের শহর। তাও বেড়িয়ে আসা যাবে।"

গোগোল বাবা মার মুখের দিকে দেখছিল। বেড়াতে যাবার ভাগ্যটা তাঁদের ওপরেই নির্ভর করছে। গিরীন কাকার কবিতা পড়ে ও কখনও জরাইকেলার ছবি দেখতে পায় নি। তবে জায়গাটার কথা শুনে ওরও খুব ইচ্ছে, সেখানে একবার বেড়াতে যাবে। ও জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "সেখানে জঙ্গলে কি অনেক জানোয়ার আছে?"

গিরীন কাকা হেসে বললেন, "শহরে গ্রামে মানুষ থাকে, আর জঙ্গলে জানোয়ার থাকবে না? সারেণ্ডায় বাঘ কেমন আছে জানি নে। তবে হাতি আছে ভালই। ভল্লুকও কম নেই। আর আছে অজগর। বিরাট অজগরের দেশ হল সারেণ্ডা। আমি চোখে দেখি নি, শুনেছি, এক সময়ে রেল লাইনের ধারে, বিরাট গাছের গুঁড়ি আর মোটা ডাল দেখে লোকে বুঝতেই পারত না, ওটা অজগর, রেলগাড়ির কামরার ভেতর তাগ্ করে আছে। স্টেশনও তো জঙ্গলের মধ্যে। ভালুলতা বলে একটা স্টেশনে অনেক বছর আগে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। রেলের জানালায় একজন মুখ বাড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল, একটা গাছের মোটা ন্যাড়া ডাল, একটা মানুষের মুণ্ডু মুখে পুরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই বোঝা গেল, ওটা আসলে একটা অজগর।"

গোগোলের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

গিরীনকাকা বললেন, "তারপরে আর কী? লোকজন নাকি ভয়ে কেউ এগোতেই চায় নি। অজগরের মুখে মুণ্ডু ঢোকানো লোকটা তখন হাত-পা ছুড়ছে। অজগরটা মাটিতে নেমে পড়েছিল। মানুষের যে কত রকম কুসংস্কার আছে! অনেকে নাকি বলেছিল, ওরকম মুখের খাবার ছিনিয়ে নিতে নেই। অজগরের তো বিষ নেই। আস্তে আস্তে গিলে খায়, তারপরে মোটা পেট নিয়ে পড়ে থাকে। হজম হতে সময় লাগে। সেইজন্য বলে অজগর

নাকি বছরে একবারই খায়। সব বাজে কথা। একটা গোটা হরিণ বা সম্বর গরু খেলে হয়তো হতে পারে। তা কি আর সব সময় কপালে জোটে? খরগোশ বুনো ইঁদুর বেড়াল, এসব হয় তো পায়। তবে যাই হোক, লোকজনের কাছে খবর পেয়ে সাহেব ফরেস্ট অফিসার বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছিল। অজগরটাকে গুলি করে মেরেছিল। কিন্তু লোকটাকে বাঁচানো যায় নি। অজগরের গ্রাসে অনেকক্ষণ মুণ্ডুটা ছিল বলে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছল। তখন তো আর রাউরকেলা স্টীলপ্ল্যাণ্ট হয় নি। মনোহরপুরে একটা ছোট হাসপাতাল ছিল। সেখানে লোকটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সে মরে গেছল। তবে আজকাল আর সেরকম নেই। জঙ্গলের খুব ভেতরে অজগর আছে। সে সব হল আলাদা ব্যাপার। আসলে জঙ্গলের একটা সৌন্দর্য আছে।”

মা বললেন, “ওসব অজগর-টজগর শুনলেই ভয় লাগে।”

“আমার কিন্তু একদম লাগে না।” গোগোল বলে উঠল, “আমি একটা গল্প পড়েছি, অজগর আসলে খুব ভীতু।”

মা ধমকে বললেন, “তোমাকে বলেছে, অজগর ভীতু।”

গোগোল কিছু বলবার আগেই গিরীন কাকা বললেন, “আহা ওকে কেন ধমকাচ্ছ? অজগরকে গর্ত থেকে টেনে বের করতে আমি দেখেছি। অবশ্য মুখ ধরে নয়, ল্যাজ ধরে। আর সত্যি বলতে কি, অজগর খিদে না পেলে একেবারেই নিরীহ জীব। তা সে সব ভেবে কী লাভ? আমরা তো আর অজগরের আস্তানায় যাচ্ছি নে। জরাইকেলা এখন আধা শহর আধা গ্রাম। আর জঙ্গলে যদি আমরা বেড়াতে যাই, তা হলে তো যাব জীপে চেপে। ভাগ্যে থাকলে হাতি চোখে পড়তে পারে। ভল্লুক এখন বিশেষ দেখা যায় না। ওরা আসে বসন্তকালে, যখন মহুয়ার ফুল হয়। গাছতলায় পড়ে থাকা মহুয়ার ফুল খেতে ওরা খুব ভালবাসে। সেও জঙ্গলের মধ্যে।”

সব শুনে বাবা বললেন, “গিরীন যখন এত করে বলছে, তা হলে ছুটি নিতেই হয়।”

বিশেষ করে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় জঙ্গল সারেণ্ডা, সেটা একটু দেখা হবে।”

মাও রাজী হয়ে গেলেন। তখনই যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। গিরীন কাকা নিজেই স্টীল এক্সপ্রেসের টিকিট কাটার ভার নিয়ে নিলেন। মাকে বললেন, শীতের জামা-কাপড় যেন ঠিকমত নেওয়া হয়। যাবার আগে গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, “মাস্টার গোগোল, তুমি খুশি তো?”

গোগোলের চোখ মুখ এমনিতেই খুশিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। ও কিছু বলবার আগে মা বললেন, “কাকে জিজ্ঞেস করছেন? গোগোলকে? এ তো সেই কথার মত হল, সাধু খাবে, না হাত ধোব কোথায়? গোগোল বোধহয় মনে মনে এখনই জরাইকেলায় চলে গেছে।”

মার কথা শুনে গোগোল মজা পেয়ে গেল। গিরীন কাকা আর বাবা হো-হো হেসে উঠলেন। গোগোল তার মধ্যেই বলে উঠল, “অজগর দেখবার ইচ্ছে তেমন নেই, তবে হাতি কি দেখতে পাব?”

গোগোলের সঙ্গে তখনও সেই পাগলা হাতির সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘটনাটা ঘটে নি।

গিরীন কাকা বললেন, "সেটা তোমার ভাগ্য। গণেশ ঠাকুরের দয়া হলে তারা দেখা দিতে পারে, দয়া না হলে দেখা পাবে না।"

গোগোল বলল, "আপনি তো ঠাকুর-দেবতা ভাগ্য-কপাল মানেন না।"

"আহা, ওটা এমনি কথার কথা বলছি।" গিরীন কাকা হেসে বললেন, "সত্যি, আমি ওসব মানি নে। হয় তো এমনও হতে পারে, হাতির দেখা পেলে, আর সে এমন তাড়া করল, কোথায় পালাবে ঠিক করতে পারবে না। হাতি এরকম বেশ কিছু লোককে মেরেও ফেলেছে। অবশ্য হাতি এমনিতে খুবই শান্ত জীব। তবে ক্ষেপে গেলে কী করবে, কিছুই বলা যায় না। যাই হোক, আগে চলতো জরাইকেলা যাই। তারপরে বাকি সব দেখা যাবে।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, আগে থেকে ওসব বলে ভয় পাইয়ে দেবেন না।"

গোগোল তখন সত্যিই মনে মনে জরাইকেলায় চলে গিয়েছে।

গিরীন কাকা স্টীল একস্‌প্রেসের চেয়ার কার রিজার্ভ করেছিলেন। চেয়ার কারে বসতে আরাম। ঘুমোনো যায় না। কিন্তু সময়টা শীতের বড়দিনের ছুটির অবকাশ। চেয়ার কারের টিকেট আর রিজারভেশন পাওয়াই শক্ত। তবু গিরীন কাকা টিকেটের ব্যবস্থা করেছিলেন। ট্রেনে উঠে, জায়গা নিয়ে বসে বললেন, "একটা তো রাত, কেটে যাবে। তাও পুরো রাত নয়। এক্সপ্রেস লেট না করলে আমরা শেষ রাত্রেই পৌঁছে যাব।"

বাবা বললেন, "আমি এই চেয়ার-কারেই ঘুমিয়ে নেব।"

গোগোল জানালার ধারে সীট পেয়েছিল। শীতের বিকেল পাঁচটাতেই প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। তবু ভাবল, অন্ধকারে কাচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকেই ওর রাত কেটে যাবে। রাত্রে খাবার জন্য মা কিছু খাবার, কমলালেবু আর মিষ্টি এনেছিলেন। মুখোমুখি চারজনের চেয়ার-কারের মাঝখানে টেবিল। গোগোলরাও চারজন। কোন অসুবিধা ছিল না। গাড়ি ছাড়বার কথা পাঁচটায়। কিন্তু ছাড়ল দশ মিনিট দেরিতে। রিজার্ভ কামরা হলেও বেশ কিছু যাত্রী দাঁড়িয়েছিল। গিরীন কাকার কথা থেকে বোঝা গেল, দাঁড়ানো যাত্রীরা সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জার। খড়্গপুরের আগেই সবাই নেমে যাবে। তা ছাড়া গিরীনকাকা তৈরি হয়েই এসেছিলেন। গাড়ি ছাড়বার পরে ফ্লাস্ক্‌ থেকে একপ্রস্ত চা পান করে তাস বের করেছিলেন। মা বাবা আর তিনি, তিনজনে মিলে তাস খেলা শুরু করলেন। গোগোল তাস খেলা বোঝে না। ও জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল।

অন্ধকার নেমে এল বেশ তাড়াতাড়ি। দূরের কিছুই দেখা যায় না। তবে স্টেশন-গুলোতে আলো জ্বলছিল। সব স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াচ্ছিল না। খড়্গপুরে পৌঁছে গিরীন কাকা ডাইনিং কারের বেয়ারাকে মাখন টোস্ট, ওমলেট আর কফি দিতে বললেন। মা বললেন, "এখন এসব খেয়ে, তারপরে খাবার খাবেন কখন?"

"রাত্রের খাবার খাব টাটায় পৌঁছে।" গিরীন কাকা বললেন, "তার মধ্যে টোস্ট আর ওম্‌লেট হজম হয়ে যাবে। গোগোলের খিদে পেয়ে গেলে আলাদা কথা। ট্রেন ঠিকমত

গেলে টাটায় পৌঁছুবে ন'টায়। এখন বাজে সাতটা। গোগোল যদি আগেই খেয়ে নিতে চায়, খেয়ে নেবে।"

গোগোল বলল, "আমি রাত্রি ন'টাতেই তো রোজ খাই।"

"তা হলে তো কোন কথাই নেই।"

খড়্গপুর স্টেশন ছাড়িয়ে যেতেই টোস্ট আর ওমলেট এসে গেল। তার সঙ্গে গরম কফি। শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা নেমে যাবার পরে কামরাটাও ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বাবা খেতে খেতে গিরীন কাকাকে ঠাট্টা করে বললেন, "গিরীন কবি হলেও খেতে ভালবাসে। কবিরা তো শুনি, কবিতায় এমন ডুবে থাকেন, তাঁদের খিদে তেষ্টার কথা মনেই থাকে না।"

"ওসব বাজে লোকের বাজে কথা শুনেছ।" গিরীনকাকা মাখন টোস্ট চিবোতে চিবোতে বললেন, "ওরকম আত্মভোলা কবি আজকাল আর নেই। আগের কোনকালে ছিল বলে আমি শুনি নি। তবে হ্যাঁ, একজন কবি আছে, যারা আসলে কবি নয়, তারা কবি কবি ভাব দেখাবার জন্য ওরকম করতে পারে। আর যাদের স্বাস্থ্য খারাপ, তারা খাবে কেমন করে? আমি অন্য ধাতুতে গড়া। আমি কবিতায় স্বপ্ন দেখি না, বাস্তব জীবনকে দেখি। দরিদ্র দুঃখী মানুষের সংগ্রামের কথা আমি লিখি।"

বাবা হেসে বললেন, "গরিবের সংগ্রামী কবি তুমি। তোমার কোন স্বপ্ন নেই?"

গিরীন কাকা ডিমের ওমলেট কাঁটা চাম্‌চেয় তুলে মুখে পুরে বললেন, "স্বপ্ন দেখব কেন? আমি সংগ্রাম করি।"

বাবা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা বললেন, "আহা, কেন তুমি গিরীন ঠাকুরপোর পেছনে লাগছ?"

গিরীন কাকা খাবার খেতে খেতে বললেন, "আরে ছেড়ে দাও ওর কথা। ওর কাছে কবিতা হল প্যানপ্যানানি। আমি ওসব লিখি নে।"

গিরীন কাকার কথা শেষ হতে না হতেই ট্রেন গেল থেমে। কোন স্টেশন নেই। মাঝ-পথেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোধহয় সিগনাল পায় নি কোন কারণে। গোগোল ওর কফিতে বেশ খানিকটা দুধ আর চিনি মিশিয়ে নিল। সকলেরই খাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু গাড়ি আর চলতে চায় না। অন্যান্য যাত্রীরাও উস্‌খুস্‌ করতে আরম্ভ করেছে। সকলেই খবর নেবার চেষ্টা করছে, কী কারণে গাড়ি চলছে না। কেউই কোন খবর দিতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত গিরীন কাকা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দেখি একবার কী ঘটল?"

এমন সময়ে একজন টিকেট চেকার এলেন করিডোর দিয়ে। তিনি জানালেন, "একটা গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে গাড়ি বেঁচে গেছে। ইঞ্জিনের ড্রাইভার দেখতে পায়, কয়েকটি লোক লাইনে কিছু করছিল। দেখতে পেয়েই ড্রাইভারের সন্দেহ হয়। সে গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিতেই লোকগুলো অন্ধকারে পালিয়ে যায়। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেয়। তারপরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তারা একটা ফিসপ্লেট খুলে ফেলেছে! খড়গপুরে খবর চলে গেছে। মেকানিকরা এখনই এসে যাবে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সকেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।"

গিরীন কাকার দু' চোখে ভয় ফুটে উঠল। শুধু গিরীন কাকার নয়, অনেকেরই চোখে মুখে ভয়ের ছাপ। গিরীন কাকা বসে পড়লেন নিজের সীটে। বসেই বলে উঠলেন, "এ গভর্নমেণ্টকে দিয়ে কিছু হবে না। আর একটু হলেই প্রাণটা যাচ্ছিল আর কি!"

বাবা বললেন, "যা বলেছ। তবে রাখেন কেষ্ট মারে কে?"

গিরীন কাকার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। বললেন, "কেষ্ট আবার কে? তিনি রাখবারই বা কে? ওসব বুজরুকি আমি মানিটানি নে।"

"তা হলে নিশ্চয়ই ভাগ্য মানো?" বাবা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

গিরীন কাকা রেগে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা বলে উঠলেন, "আপনি আবার ওর কথার জবাব দিতে যাচ্ছেন? ও তো ইচ্ছে করে আপনাকে চটাচ্ছে।"

গিরীন কাকা হেসে উঠলেন। বললেন, "আমি মোটেই চটি নি। তবে আমি ভাগ্য টাগ্য মানি নে। আমি বলব, ড্রাইভারের কৃতিত্বের জন্যই আমরা বেঁচে গেছি। সে যদি দূর থেকে লোকগুলোকে না দেখতো, তা হলে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেণ্ট হত। আমি ঠিক করেছি জরাইকেলা গিয়েই খবরের কাগজে একটা চিঠি পাঠাব, যেন এই গাড়ির ড্রাইভারকে পুরস্কার দেওয়া হয়।"

বাবা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি আর কিছু বলবে না। এই শীতের রাত্রে মাঠের মাঝখানে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তার ঠিক নেই। তার মধ্যে তোমাদের যত বাজে তর্ক।"

বাবা হেসে চুপ করলেন। গিরীন কাকা বসে থাকতে পারলেন না। সীট ছেড়ে উঠে বললেন, "তুমিই ঠিক বলেছ। এসব আজেবাজে কথার থেকে একটু দেখা যাক, লাইন সারাতে কতক্ষণ লাগবে।"

গিরীন কাকা সামনের করিডোরের দিকে এগিয়ে গেলেন। গোগোলও বুঝতে পারছিল, বাবা হেসে কথা বলে গিরীন কাকাকে রাগাবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের দুই বন্ধুতে দেখা হলেই এরকম হয়। গিরীন কাকা কবি বটেন। তবে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তিনি জেদ করে ওঠে মেতে ওঠেন। তাঁকে যে চটানো হচ্ছে, সেটা যেন বুঝতে পারেন না। গিরীন কাকা ছাড়া গোগোল কোন কবিকে দেখে নি। তবে অনেক কবির কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাসও পড়েছে। তাঁরাও গিরীন কাকার মত কিনা, ওর জানা নেই। তবে তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয় না তাঁরা কেউ গিরীন কাকার মত রাগী আর তার্কিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, আরও অনেকের ছড়া আর কবিতা গোগোল পড়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁদের ছড়াও পড়েছে। তাঁদের ছড়া আর লেখা পড়লে মনে হয়, তাঁরা যেন সব সময়ই হাসছেন। গিরীন কাকাও ছড়া লেখেন, সে সব ছড়া পড়লেই বোঝা যায়, তিনি যেন রেগে ঝেঁজে উঠছেন। কিন্তু তাঁকেও ভাল লাগে। সবাই তো আর এক রকম হন না। তিনি যে ড্রাইভারকে পুরস্কার দেবার কথা বললেন, গোগোলের সে কথাটা মনে ধরেছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট করে গাড়ি ছাড়ল। টাটা পৌছুবার আগেই গোগোলের খিদে আর ঘুম, দুই-ই পেয়ে গেল। ও খেয়ে নিয়ে সীটের বোতাম টিপে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। ঘুম ভাঙল মায়ের ডাক শুনে, "গোগোল, শীগ্‌গির উঠে পড়। আমাদের এবার নামতে হবে।"

গোগোল পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অজগরকে স্বপ্ন দেখছিল। মায়ের ডাক শুনে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাইরে ভোর হয়েছে। গাড়ি চলেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। ওর গায়ে ছিল হাতকাটা সোয়েটার আর পুরো হাতা শার্ট। শীতটা এখন বেশি লাগছে। কিন্তু জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে শীতটা যেন গায়েই লাগছে না। গাড়ির গতি কমে এসেছে। বাবা আর গিরীন কাকা ওপরে রাখা স্যুটকেস নামাতে ব্যস্ত। গোগোলের চোখে পড়ল, জঙ্গলের ফাঁকে অনেকটা দূরে, রুপোর পাতের মত, এক পলকের জন্য একটা নদীর বাঁকা রেখা দেখা গেল। ও বলে উঠল, "এখানে কি নদী আছে?"

গিরীন কাকা বললেন, "সে কি, ভুলে গেলে? তোমাকে তো আগেই বলেছি, এখানে কোয়েল নামে একটা নদী আছে। এখানে যে ক'দিন থাকব, রোজই দু'বেলা আমরা কোয়েল নদীর ধারে বেড়াতে যাব। ইচ্ছে করলে চানও করতে পারি।"

মণীন্দ্র গোগোলকে টেনে নিয়ে বললেন, তুমিই গোগোল!

ট্রেন দাঁড়াল একটা স্টেশনে। কুলি উঠে এল কামরার মধ্যে। জরাইকেলায় নামবার যাত্রী আর কেউ ছিল না। গিরীন কাকা তাড়া দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি নামতে হবে। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না।"

সকলের সঙ্গে গোগোল প্ল্যাটফরমে নেমে এল। ট্রেনও হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিল। যেন গোগোলদের নামবার জন্যই ট্রেনটা থেমেছিল। কুলি মাল নামালেও দেখা গেল, দুজন লোক ওদের সব স্যুটকেস ব্যাগ ইত্যাদি নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। আর গিরীন কাকার থেকে ছোটই হবেন, গায়ে গলাবন্ধ সোয়েটার আর ট্রাউজার পরা এক ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে কুলিকে একটা টাকা দিলেন। কুলি খুশি হয়ে সেলাম ঠুকে চলে গেল। তা হলে এই লোক দুটি কারা? গিরীন কাকা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বাবা-মাকে বললেন, "এই আমার ছোট ভাই মণি অর্থাৎ মণীন্দ্র।"

মণীন্দ্র দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বাবা মা'কে নমস্কার জানালেন। গিরীন কাকা বললেন, "মণি, তুই তো আমার বন্ধু সমীরেশের কথা অনেকবার শুনেছিস। এই হলো ওর স্ত্রী আর ছেলে গোগোল।"

মণীন্দ্র গোগোলকে হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তুমিই গোগোল! এ বয়সেই তো তুমি একজন নামী লোক হয়ে গেছ।"

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসল। গিরীন কাকা বললেন, "এ জঙ্গলে অবশ্য গোয়েন্দাগিরি করার মতো কিছু ঘটনা ঘটে না। আমার টেলিগ্রাম তা হলে ঠিক সময়মতই পেয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।" মণীন্দ্র বললেন।

গোগোল জিজ্ঞেস করলো, "ওরা কারা, যারা আমাদের লাগেজ নিয়ে চলে যাচ্ছে?"

মণীন্দ্র বললেন, "ওরা হল মুণ্ডা। একজনের নাম চেকো, আর একজনের নাম বুধুয়া। ওরা আমাদের ঠিকেদারিতে কাজ করে।"

গিরীন কাকা বললেন, "গোগোল, তোমাকে আর একটা মজার খবর দিই। এই যে দেখছ জরাইকেলা ইস্টিশন, এর প্ল্যাটফরমের একটা অংশ পড়েছে ছোটনাগপুর—মানে বিহারের মধ্যে। আর একটা অংশ উড়িষ্যার মধ্যে।"

গোগোল এরকম ইস্টিশন কোনদিন দেখে নি। বাবা বলে উঠলেন, "তাই নাকি? তা হলে এই ইস্টিশনের প্ল্যাটফরমটাই বিহার উড়িষ্যার সীমানা বল?"

গিরীন কাকা বললেন, "ঠিক তাই। প্ল্যাটফরমের পেছন দিকটা—মানে, আমরা যেদিক থেকে এলাম, সেদিকটা পড়েছে বিহারের মধ্যে। বাকিটা উড়িষ্যার মধ্যে। কিন্তু বোঝবার কোন উপায় নেই। রাস্তায় গেলে একটা পোস্ট দেখতে পাবে। সেটাই সীমানা। তবে কিছু লেখাটেখা নেই। কোন চেকপোস্টও নেই। যেটা আছে, সেটা হল পুলিশের একটা আস্তানা, সে অনেক দূরে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের বাড়িটা বিহারে, না উড়িষ্যায়?"

"উড়িষ্যায়।" গিরীন কাকা বললেন, "চল এবার আমরা যাই। আর আমি তোমার গিরীন কাকা। আমার ভাই হল এখন তোমার মণি কাকা।"

মণি কাকা গোগোলের হাত ধরে পা বাড়িয়ে বললেন, "চল যাই। ছোট জায়গা, এখানে সাইকেল রিকশা কয়েকটা আছে। কিন্তু আমরা চাপি না। বাড়িতে হেঁটে যেতে সাত আট মিনিট লাগবে।"

গোগোল উল্টো দিকের প্ল্যাটফরমের ইস্টিশনের লাল ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের টিকেট নিতে কেউ আসছেন না?"

মণি কাকা হেসে বললেন, "ছোট ইস্টিশন। সবাই আমাদের চেনেন। দেখেও নিয়েছেন। জানেন, আমরা কখনো বিনা টিকেটে চলাফেরা করি নে। তুমি খেয়াল কর নি, টিকেট কলেকটর আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়েছিলেন। গাড়ি আসবার কথা আরও অনেক আগে, শেষ রাত্রের অন্ধকারে। চেকো আর বুধুয়া সেই সময় থেকেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি দেরি করল কেন তুমি জান?"

গোগোল ফিসপ্লেট সরানোর ঘটনা বলল। মণি কাকা প্ল্যাটফরমের ঢালুতে নেমে রাস্তায় এসে পড়লেন। অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি? তা হলে তো তোমাদের খুব ফাঁড়া গেছে। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

মণি কাকার কথা শুনে গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভগবান মানেন?"

"তা মানি।" মণি কাকা হেসে বললেন, "কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলে, তাও জানি। নিশ্চয়ই আমার দাদা বলেছেন, তিনি ওসব কিছুই মানেন না?"

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, “হ্যাঁ।”

“দাদা অনেক কিছুই মানেন না। তা বলে আমি মানব না কেন?” মণি কাকা লাল কাঁকরের শক্ত রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন। তারপর একটা পোস্টের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললেন, “এটাই হচ্ছে বিহার আর উড়িষ্যার সীমানা। আমরা এখন উড়িষ্যার মধ্যে।”

গোগোল পোস্টের দিকে তাকাল। সামান্য একটা লোহার পোস্ট। দেখে কিছুই বোঝা যায় না। রাস্তার বাঁ ধারে দেখা গেল, বড় বড় শালবল্লা ডাঁই করা রয়েছে। ভিতরে কোথায় একটা শব্দ হচ্ছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল, “কিসের শব্দ হচ্ছে?”

“করাত কলের।” মণি কাকা বললেন, “এখানে কিছুই নেই, কেবল কাঠ ছাড়া। আশেপাশে তুমি এরকম অনেক কাঠের গুদাম আর গোটা তিনেক কাঠ চেরাইয়ের স-মিল দেখতে পাবে। কাঠের ব্যবসা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। আর তার জন্যই যা কিছু দোকানপত্র। বাজার বলতে যা বোঝায়, তা এখানে নেই। তবে সব রকমের দোকানই এখানে আছে। মুদিখানা থেকে কাপড়ের দোকান। মুদিখানাতেই বলতে গেলে সব কিছু পাওয়া যায়। আলু পেঁয়াজও। তরিতরকারি আর সামান্য মাছ সকালে বিকালে মুণ্ডা ওরাঁওরা নিয়ে আসে। সে সব পাওয়া যায় রেললাইনের ওপারে। আর সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন দূরের জঙ্গল পাহাড় থেকে অনেক মানুষ সওদা করতে আসে। জঙ্গলের ভেতরে একবার ঢুকে গেলে তুমি দোকানপাট কিছুই পাবে না।”

গোগোল জিজ্ঞেস করল, “তা হলে জঙ্গলের ভেতরের লোকেরা কী খায়?”

“তারা অনেক কিছু খায়, যা আমরা খাই নে।” মণি কাকা বললেন, তবে তারা ভুট্টা আর মকাইয়ের চাষ করে। ধানও করে। নানা রকনের বুনো শাকপাতা আছে, আর সাঁকালুর মত কয়েক রকমের তরকারি মাটির নীচে এমনি জন্মায়। ওরা সেগুলো মাটি থেকে তুলে শুকিয়ে তরকারি বানিয়ে খায়। ওদের সব থেকে অভাব নুনের। আলু বা আমরা যে সব তরকারি খাই, তারা সে সব খায় না। খায় না মানে, সে সব কেনবার মত পয়সা তাদের নেই। এরা গরিব, কিন্তু খুব সৎ আর হাসিখুশি। দু’ একদিন থাকলেই বুঝতে পারবে।”

বাবা-মা গিরীন কাকার সঙ্গে পিছনে কথা বলতে বলতে আসছেন। মণি কাকা বাঁ দিকে মোড় নিলেন। গোগোলের চোখের সামনে রেললাইনের দু’ পাশে জঙ্গল। বাঁ দিকে কিছুটা দূর থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। আরও দূরে পাহাড় আর জঙ্গল আকাশে ঠেকেছে। লাল মাটির কাঁকর ছড়ানো শক্ত রাস্তার এপাশে ওপাশে দু’ একটা ছোট মাটির বাড়ি। দু’ চারটে গরু ছাগল চরছে। এই শীতে ঘরগুলোর কাছে সামান্য জামা গায়ে কয়েকটি শিশু আর বড়দের দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় এরা মুণ্ডা বা ওরাঁও।

মণি কাকা বললেন, “এই রেললাইন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাউরকেলা। জরাইকেলার ভালুলতা, তারপরে বিস্‌রা। বিস্‌রার চুন খুব প্রসিদ্ধ। তারপরে বাণ্ডামুণ্ডা ইস্টিশন। বাণ্ডামুণ্ডার পরে রাউরকেলা। সেখানে স্টীল প্ল্যান্ট।”

গোগোল মন দিয়ে মণি কাকার কথাগুলো শুনছিল। এমন সময়ে ওদের সামনে এসে পড়ল এক বুড়ো, যার গায়ে একটা মোটা ময়লা চাদর জড়ানো। আর সামান্য একটা নেংটি

পরা। সে মণি কাকাকে হাত তুলে নমস্কার করল, আর গোগোলের দিকে তাকিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করল। মণি কাকা হেসে বুড়োকে কিছু বলল। বুড়ো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, গোগোলের দিকে তাকিয়ে ফোকলা মুখে হেসে চলে গেল। মণি কাকা বললেন, "বুড়ো মুণ্ডারি ভাষায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, তুমি বেড়াতে এসেছ। বুড়ো এখন যাচ্ছে কোয়েল নদীর ধারে। সেখানে নদীর বালির মধ্যে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সোনা খুঁজবে।"

"সোনা? কিসের সোনা?" গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মণি কাকা বললেন, "সোনা মানে সোনা, অর্থাৎ গোল্ড। অনেক কাল আগে কোয়েলের ধারে জলের সঙ্গে সোনা ভেসে আসতো। এখনো আসে, বালির সঙ্গে মিশে থাকে। এরা সেই সব বালি চিনতে পারে, যার মধ্যে সোনা মিশে থাকে। সারাদিনে দু' তিন কে. জি. বালি সংগ্রহ করে, যার মধ্যে হয়তো এক আনা সোনা পাওয়া যাবে। সেই বালি এখানকার মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীরা এদের কাছ থেকে এক টাকায় কিনে নেয়। বালি ঝেড়ে সোনা বের করতে পারে, এরকম লোক মারোয়াড়িদের আছে। যারা এরকম নদীর বালিতে সোনা খুঁচিয়ে বেড়ায়, তাদের সোনাখোঁচা বলে।"

গোগোল যতই শুনছিল, ততই অবাক হচ্ছিল। নদীর জলের বালিতে সোনা পাওয়া যায়! ও জানে, এক ভরি সোনার দাম অনেক। এক আনা সোনার দাম সেই তুলনায় কিছু কম নয়। বললো, "এক আনা সোনার জন্য মাত্র দু' এক টাকা পায়?"

"হ্যাঁ, সকাল থেকে বিকেল অবধি বালি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যখন মাড়োয়ারির কাছে বিক্রি করতে যায়, তখন এই বুড়োকে ওরা বলে, এ তো কেবল বালি। এর মধ্যে সোনাই নেই। কিন্তু ওদের এমন লোক আছে, যারা বালি দেখলেই বুঝতে পারে, তার মধ্যে সোনা আছে। বুড়োকে যেন দয়া করে দুটো টাকা দেয়।" মণি কাকা বললেন, "এইভাবে গরিবদের ঠকানো হয়।" কথা শেষ হতে না হতেই ওরা চারদিকে বেড়া ঘেরা একটা বাংলোর মত বাড়ির সামনে এসে পড়ল। সামনে অনেক বড় বাগান, নানা রকম গাছপালা। বেড়ার গায়ে একটা বাঁশের ঝাঁপ দরজা দড়ির ফাঁসে আটকানো। সামনেই একটা গাছের নীচে তিন চার বছরের ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ট্রাউজারের ওপর গলাবন্ধ, মোটা সোয়েটার গায়ে। পাশে একজন মহিলা। দেখলে মনে হয় মায়ের থেকে ছোট। তাঁর গায়ে একটা উলের শাল জড়ানো। মণি কাকা বললেন, "এটা আমাদের বাড়ির পেছন দিক।"

বাবা-মা আর গিরীন কাকাও এসে পড়লেন। যে মহিলা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি মণি কাকার স্ত্রী। তিনি এগিয়ে এসে বাবা-মাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গোগোলের হাত ধরেছিলেন আগেই। গোগোলকে দেখে বললেন, "ভারি মিষ্টি ছেলে।"

গিরীন কাকা বললেন, "দেখতে মিষ্টি বটে, গোগোল কিন্তু একজন নামকরা খুদে গোয়েন্দা। খবরের কাগজে এর নাম বেরিয়েছে কয়েক বার।"

কাকিমা বললেন, "জানি।"

পিছনের উঠোনে অনেকগুলো মুরগী চরছিল। বাগানের বাইরেও অনেকখানি খোলা জায়গা। সেখানে খুঁটিতে বাঁধা দুটো গরু। বাছুরটা ছাড়া রয়েছে। বাংলোবাড়িটা বেশ নিরিবিলি। পিছনের বাঁধানো বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন একজন প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর মাথায় উলের টুপি।

গায়ে জড়ানো শাল। তিনি গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। গোগোলদের দেখে মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে বললেন, "গিরীন, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন? ট্রেন কি লেট ছিল?"

"হ্যাঁ বাবা, গতকাল রাত্রে ড্রাইভারের কল্যাণে আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি।" গিরীন কাকা বললেন, "ড্রাইভার দেখতে পেয়েছিল, কয়েকটা লোক লাইন থেকে ফিসপ্লেট সরিয়ে নিচ্ছে।"

গোগোল বুঝতে পারল, ভদ্রলোক গিরীন কাকার বাবা। গিরীন কাকা সবাইকে নিয়ে বারান্দার ওপরে উঠলেন। বাবা-মাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। তারপরে গোগোলের সঙ্গে। বাবা-মা গিরীন কাকার বাবাকে প্রণাম করলেন। গোগোলও করল। গিরীন কাকার বাবা সবাইকেই আশীর্বাদ করে বললেন, "আহা, থাক থাক। তোমরা এসেছ দেখে খুবই ভাল লাগছে! আমরা ঠিকাদার মানুষ, একরকম জঙলীই বলতে পার। নিজেদের বাড়ির মত করে থাকবে।"

কাকিমা তখন পিছনের উঠোনে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মণি কাকার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কাছেই দাঁড়িয়েছিল কাকিমার বয়সী একটি মেয়ে। কালো রঙ কিন্তু কাকিমার মতই শাড়ি পরা। তবে তার গায়ে কোন গরম চাদর নেই। গোগোল বারান্দার ডান দিকে গেল। বাঁ দিকেও বারান্দা। মাথার ওপর টালি। ভিতরে ঘর। চারদিকেই বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে টালির চাল ঢাকা বারান্দা। দেওয়াল ইটের। গোগোল বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেকটা জায়গা জুড়ে সবুজ লন। বারান্দার ওপরে কতগুলো বেতের চেয়ার আর টেবিল রয়েছে। সেখান থেকে সারেণ্ডা ফরেস্টের পাহাড় আর জঙ্গল দেখা যায়। বেড়া ঘেরা লনের পাশ দিয়ে একটা কাঠ বোঝাই লরি চলে যাচ্ছে। ডান দিকে বাড়ির সীমানার বাইরেই বড় বড় শাল গাছের জঙ্গল। বলতে গেলে, চারদিকেই জঙ্গল। তার মাঝখানে জরাইকেলা একটি ছোট জায়গা।

"এই যে গোগোল, তুমি এখানে রয়েছ?" মণি কাকা এগিয়ে এলেন, বললেন, "চল, গরম জলে মুখ ধুয়ে আগে একটু কিছু খেয়ে নাও। তারপরে জামাকাপড় বদলে বেড়াতে যাওয়া যাবে।"

গোগোলকে নিয়ে মণি কাকা সামনেই একটি ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। গোগোল দেখল, ঘরে একটা বড় খাট রয়েছে। বিছানা আর এলোমেলো লেপ কম্বল দেখলেই বোঝা যায়, এ খাটে কেউ শুয়েছিল। ঘরের বাঁ দিকে, ডান দিকে দুটো দরজা। আবার উলটো দিকেও একটা দরজা রয়েছে। দুটো জানালা সামনের লনের দিকে। ডান পাশের ঘর থেকে বাবা আর গিরীন কাকার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। মণি কাকা গোগোলকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন।

গোগোল দেখল, এ ঘরটাও বেশ বড়। কিন্তু বাইরে লনের সামনে বারান্দায় যাবার কোন দরজা নেই। দুটো জানালা আছে। এ ঘরেও বড় খাট আছে। বিছানা তেমন নেই। ডান দিকের একপাশে একটা ছোট দরজা। মা আর কাকিমা এসে ঢুকলেন। স্যুটকেস্ আর ব্যাগগুলো এ ঘরেই তোলা হয়েছে। গোগোল নিজেই ব্যাগ থেকে ওর দাঁত মাজার ব্রাস বের করতে যাচ্ছিল। মা বললেন, "তোমাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না। সব অগোছাল করে দেবে।"

কাকিমার সঙ্গে যে মেয়েটি উঠোনের ঘরের কাছে কথা বলছিল, সে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি নিয়ে ঢুকল। কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা হাঁড়ি জড়িয়ে ধরা দেখেই বোঝা যায়, গরম জল এনেছে। সে ঘরের আর একটি দরজার পাল্লা পা দিয়ে ঠেলে খুলে ফেললো। হাঁড়ি নিয়ে ঢুকে গেল সেই ঘরে। কাকিমা বললেন, "মাংরি, বড় বালতি দুটোতে এমনি জল ভরে রেখেছিস তো?"

দরজার ভিতর থেকে জবাব এল, "হ্যাঁ, সব ভরে রেখেছি।"

মাংরি নাম কখনও বাঙালী মেয়ের বোধহয় হয় না। অথচ কথার জবাব সে পরিষ্কার বাঙলাতেই দিল। জবাব দিয়েই বেরিয়ে এল। সকলের দিকে একবার দেখে ঘরের বাইরে চলে যাবার আগে কাকিমা বললেন, "মাংরি, সবই হয়ে গেছে। আমি চায়ের জল উনোনে চাপিয়ে এসেছি। তুই একটু দেখ, আমি এখুনি যাচ্ছি।"

মাংরি ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে গেল। মা গোগোলের হাতে তুলে দিলেন দাঁত মাজার পেস্ট আর ওর ব্রাস। সাবান তোয়ালেও দিতে যাচ্ছিলেন। কাকিমা বললেন, "সাবান তোয়ালে সব বাথরুমের ভেতরে আছে। ওসব দিতে হবে না। বাথরুমের মধ্যে একটা খালি বালতি আছে, তার মধ্যে ঠাণ্ডা আর গরম জল মিশিয়ে নিলেই হবে।"

গোগোল ব্রাস পেস্ট নিয়ে বাথরুমে গেল। দরজা বন্ধ করার আগেই শুনতে পেল, গিরীন কাকা বলছেন, "অমিতা, আমি মুখ ধোবার আগেই চা চাই। মুখ ধুয়ে তারপর আবার।"

কাকিমাকেই নিশ্চয় বললেন।

গোগোল বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, মা ওর জন্য আলাদা জামাপ্যাণ্ট বের করে রেখেছেন। মা বললেন, "পাশের ঘরে গিয়ে এগুলো পরে এস। ট্রেনে সারারাত্রি পরা জামা-টামা সব কেচে দিতে হবে।"

গিরীন কাকা আর বাবা তখন চা খাচ্ছেন, আর জরাইকেলার কাঠের ব্যবসার বিষয়ে আলোচনা করছেন। গোগোল পাশের ঘরে গিয়ে মায়ের দেওয়া জামাপ্যাণ্ট বদলে এল। কাকিমা ভিতরের বারান্দার দরজার সামনে এসে ডাকলেন, "গোগোল, তুমি এস, একটু কিছু খেয়ে নেবে। তোমার মণি কাকা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"কেন, মণি গোগোলের জন্য অপেক্ষা করছে কেন?" গিরীন কাকা জিজ্ঞেস করলেন।

কাকিমা বললেন, "গোগোলকে নিয়ে কোয়েলের ধারে বেড়াতে যাবে। আপনারা কি যাবেন?"

"মাথা খারাপ?" গিরীন কাকা বললেন, "দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরোব। গোগোল যেতে চায় যাক। আর গোগোলের মা যদি যেতে চায় যেতে পারে।"

মা মাথা নেড়ে বললেন, "সবে এসে পৌঁছেছি, এখনই বেড়াতে বেরোব নাকি? গোগোলের কথা আলাদা।"

গোগোল ওসবের মধ্যে নেই। ও ঘরের বাইরে গেল। চওড়া বারান্দার একপাশে, বারান্দাকেই বাড়িয়ে একটা ঘর করা হয়েছে। খাবার ঘর। কাকিমার সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকে গোগোল দেখল, মণি কাকা আর সেই চার বছরের ছেলেটি বসে আছে। মণি কাকা ডাকলেন, "এস গোগোল। এই হল তোমার একটি ভাই, নাম খোকন।"

গোগোল দেখল, খোকন ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। মণি কাকা খোকনকে বললেন, "খোকন, এ হল তোমার গোগোলদাদা।"

কাকিমা গোগোলকে বসতে বলে টেবিলের ওপরে রাখা পাত্রের ঢাকনা খুললেন। সদ্য ভাজা লুচি থেকে ভয়সা ঘিয়ের গন্ধ বেরোচ্ছে। আর একটা পাত্রে রয়েছে আলু পেঁয়াজের চচ্চড়ি।

কাকিমা মণি কাকা আর গোগোলের সামনে প্লেট দিয়ে লুচি আর চচ্চড়ি দিলেন। মণি কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি দোকান বাজারের দিকে যাবে?"

"যাব।" মণি কাকা বললেন, "গোগোলকে নিয়ে কাশীকাকার বাড়ি যাব। সেখানে বিলু তোতনের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেব। সবাইকে নিয়ে কোয়েলের ধারে যাব। তারপরে গোগোলকে বিলুদের কাছে রেখে আমি ওদিকে যাব। বিলুরাই গোগোলকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।"

কাকিমা বললেন, "তা হলে তোমাকে যা যা বলে দিয়েছি, সে সব নিয়ে এস।"

মণি কাকা খেতে খেতে ঘাড় বাঁকালেন। কাকিমা বেরিয়ে গেলেন। খোকন মণি কাকার প্লেট থেকে একটা লুচি নিয়ে চিবোচ্ছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে গোগোলের দিকেই। কাকিমা ঢুকলেন বড় বড় দুটো দুধ ভরতি কাচের গেলাস নিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, "গোগোল, তুমি কি চা খাবে?

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "না।"

কাকিমা আর একটা ঢাকনা দেওয়া পাত্র থেকে গোগোল আর মণি কাকাকে প্যাঁড়া বের করে দিয়ে বললেন, "তাহলে দুধের পর মিষ্টি খেয়ে নিও।"

খাওয়া শেষ হতে দেরি হল না। খোকনের খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, মণি কাকা বললেন, "খোকন, তুমি আস্তে আস্তে খাও। আমি গোগোল দাদাকে নিয়ে বেরোচ্ছি, কেমন?"

খোকন ঘাড় কাত করে সরু গলায় বলল, "আচ্ছা।"

"গোগোল, চল বাইরে হাত ধুয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

গোগোল এক পায়ে খাড়া। বাইরেই বারান্দায় ছিল জলের বালতি আর মগ। সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে গোগোল ঘরে গিয়ে মাকে বলল, "মা, আমি মণি কাকার সঙ্গে যাচ্ছি।"

"ঘুরে এস।" মা বললেন, "দুষ্টুমি করো না যেন।"

গিরীন কাকা বললেন, "ঐ তোমাদের এক দোষ। দুষ্টুমি আবার কী করবে? একটু বেড়াতে যাবে, বড় জোর দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করবে। ও কি আমাদের মত বসে থাকবে নাকি?"

গোগোল হেসে বাবার দিকে একবার তাকিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। মণি কাকা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ও মণি কাকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যে রাস্তা দিয়ে ইস্টিশন থেকে বাড়ি এসেছিল, সেই পথেই এগিয়ে গেল। কিছুটা গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে, আবার ডান দিকে ফিরে রেল লাইন পার হল। এদিকে দোকানপাট কিছুই নেই। দশ বার ফুট উঁচু শালবন। মণি কাকা বললেন, "এখানে আগে অনেক বড় বড় শাল গাছ ছিল। সে সব কেটে ফেলার পরে নতুন চারা লাগানো হয়েছিল। এ সব গাছের বয়স এখন সাত আট বছর।"

জঙ্গলের ভিতরে গরুর গাড়ি চলার দাগ রয়েছে। চারদিকে নানা রকম পাখি ডাকছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদ। জঙ্গলের মধ্যে সোজা খানিকটা গিয়ে মণিকাকা বাঁ দিকের একটা পায়ে হাঁটা পথে চললেন। সামনেই দেখা যাচ্ছিল একটা পাহাড়ের টিলা। তার আশে-পাশে বড় বড় কয়েকটা পাথর দাঁড় করানো। মণি কাকা সেই পাথরগুলো দেখিয়ে বললেন, "এখানে মুণ্ডারা মৃতদের কবর দেয়। পাথরগুলো এক একটা সমাধি।"

জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। খাড়া করা পাথরগুলো এবড়ো-খেবড়ো করে কাটা। দাঁড়িয়ে

"এ বাঁশের ডগায় কাপড়গুলো কিসের ?"

আছে যেন দৈত্যাকার মানুষের মত। পাথরগুলো ঘিরে বাঁশের ডগায় কয়েকটা নিশান দাঁড় করানো রয়েছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "এ বাঁশের ডগায় কাপড়গুলো কিসের ?"

"ওগুলো হল এদের অপদেবতার হাত থেকে বাঁচানোর ধ্বজা।" মণি কাকা বললেন, "সমাধির মধ্যে যারা আছে, তাদের আত্মারা যাতে ভূত হয়ে কারোর ক্ষতি না করতে পারে, সেই বিশ্বাসেই এগুলো রাখা হয়েছে।"

গোগোলরা চলে এল টিলাটার ধারে। চওড়া লাল মাটি আর কাঁকরের রাস্তার ওপর দিয়ে কলকল শব্দে জলের ধারা বয়ে চলেছে। তার ওপরে কাঠ পাতা। সেটা পার হতে হতে মণি কাকা বললেন, "এ জল কোয়েল থেকেই আসছে।"

টিলাটাকে ডান দিকে রেখে মণি কাকা চললেন সোজা। কয়েকটা মুণ্ডা ওঁরাওদের ঘর দেখা গেল। লোক নেই একটাও। তার পরেই টিনের চালের ঘর আর মাটির দাওয়া, সামনে মস্ত উঠোন একটা বাড়িতে ঢুকলেন। গোগোলের বয়সী একটি ছেলে আর মেয়ে উঠোনের রোদে ক্যাম্বিসের বল আর হাতে তৈরি কাঠের ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। গোগোলদের দেখেই ওদের খেলা থেমে গেল। মাটির উঁচু দাওয়াতে রোদে চাদর জড়িয়ে বসেছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। হাতে তাঁর চায়ের গেলাস। বলে উঠলেন, "এই যে মণি, এস এস।"

মণি কাকা গোগোলকে বললেন, "এই ভদ্রলোকের নাম কাশীনাথ গাঙ্গুলী। এঁর বাড়িতেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এসে কয়েকদিন ছিলেন।"

বলতে বলতে মণি কাকা দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। কাশীনাথবাবু গোগোলের দিকে তাকিয়েছিলেন। মণি কাকা বললেন, "দাদার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল, তাঁরা এসেছেন। দাদার বন্ধুর ছেলে, এর নাম গোগোল।"

গোগোল কাশীনাথবাবুকে প্রণাম করল। তিনি দাওয়ায় বসেই গোগোলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "থাক, থাক দাদু। কলকাতার ছেলেরা আজকাল আবার বুড়োদের পেন্নাম করে নাকি? বেশ ছেলেটি। এস, ওপরে উঠে বস।"

"এখন আর বসব না কাকাবাবু।" মণি কাকা বললেন, "বিলু আর তোতনের সঙ্গে গোগোলের পরিচয় করিয়ে দিতে এনেছি। আমাদের বাড়িতে তো গোগোলের সমবয়সী বন্ধু নেই।"

মণি কাকা বিলু আর তোতনকে ডেকে গোগোলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বিলু বড় ভাই, তোতন ছোট বোন। দুজনেই পিঠোপিঠি। ওদের মা বেরিয়ে এসে বললেন, "মণি ঠাকুরপো, গোগোল নতুন এসেছে, ওকে আগে একটু মিষ্টি খাওয়াই।"

মণি কাকা তাকালেন গোগোলের দিকে। গোগোল বলল, "আমি তো এখুনি লুচি তরকারি দুধ মিষ্টি খেয়ে এসেছি।"

"সত্যি বউদি, আমরা এই মাত্র খেয়ে এসেছি।" মণি কাকা বললেন, "গোগোলকে খাওয়াবার অনেক সময় পাবেন। এখন আমরা একটু কোয়েলের ধারে যাব। বিলু তোতনও যাবে।"

কাশীনাথবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা হলে তাই যাও। খাওয়াটা পরেও হতে পারবে।"

গোগোল বিলু তোতন তিনজনেই হেসে উঠল। ওরাও গোগোলের সঙ্গে কোয়েলের ধারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। সবাই একসঙ্গে বেরোবার সময় এক ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ধবধবে কোঁচানো ধুতির ওপরে সাদা সার্জের পাঞ্জাবি আর সাদা আলোয়ান। পায়ে চকচকে কালো পাম্‌শু্য। হাতে একটি ছড়ি। বয়স হবে বাবা গিরীন কাকাদের মত। মাথার চুলে টেরিকাটা। এক জোড়া কালো গোঁফ। চোখা নাক, বড় বড় চোখ, ফরসা রঙ। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে বললেন, "চল, তোমাদের সঙ্গে আমিও ঘুরে আসি।"

গোগোল বিলুর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বিলু বলল, "ইনি আমাদের মামা গদাধর চ্যাটার্জী। তিন দিন আগে কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। খুব মজার লোক। ম্যাজিক জানেন, গল্প বলতে পারেন, আর খুব সাহসী। এমন কি, উনি ফ্রেডরিক সাহেবের ভূত-বাংলোতেও ঘুরে এসেছেন, যেখানে কোনো লোক ভয়ে ঢুকতে পারে না।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ফ্রেডরিক সাহেবের ভূত-বাংলোটা কোথায়?"

"তুমি আসবার সময় একটা টিলা দেখতে পাও নি?" বিলু জিজ্ঞেস করল।

গোগোল বলল, "দেখেছি।"

"ফ্রেডরিকের ভূত-বাংলোটা ঐ টিলার গায়েই।" বিলু বলল, "বাংলোটা কোয়েলের দিকে মুখ করা। যাবার সময় তোমাকে দেখাব।"

গোগোলের সঙ্গে গদাধর চাটুয্যে মামারও আলাপ হয়ে গেল। তারপর সবাই মিলে বেরিয়ে পড়া গেল।

পাহাড়ী টিলাটার চারপাশেই বড় বড় গাছ। টিলার ওপরেও কয়েকটি গাছ, কিন্তু বলতে গেলে একরকম ন্যাড়া পাথরের টিলা। যেখান থেকে কোয়েল নদী দেখা যায়, সেদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো দোতলা বাংলো বাড়ি। বাড়িটার সামনে এক সময়ে বাগান ছিল, দেখলেই বোঝা যায়। বাগানের মাঝখানে গোল করে বাঁধানো একটা চত্তর। চত্তরের মাঝখানে একটা লোহার মোটা দু'ফুট উঁচু পাইপ। আর চত্তরটা ঘিরে বসবার জন্য লোহার ঢালাই করা সেকালের তিনটি বেঞ্চি।

বাংলোটার একতলা বড়। মাথার ওপর টালিগুলোতে শ্যাওলা ধরেছে। অনেক জায়গায় টালি খসে পড়েছে। তার ওপরে লম্বা, চারকোণা টালির ছাদের আর একটা ঘর। দেওয়াল ইটের, সেগুলো যেন এখন কঙ্কালের মত দাঁত বের করে আছে। ওপরের ঘরের সামনের জানালাটা খোলা। জানালায় কোন গরাদ নেই। পাল্লা দুটো ঝরঝর করছে। নীচের তলার অবস্থাও সেইরকম। দু' একটা জানালা খোলা। দরজাগুলো সবই বন্ধ। বাগানে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। কেবল কয়েকটা ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। টিলার নীচে বাড়িটা একেবারে নিঝুম। দেখলেই কেমন গা ছমছম করে।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "এটাকে ভূত-বাংলো বলা হয় কেন ?"

জবাব দিলেন মণি কাকা, "অনেককাল আগে ফ্রেডরিক সাহেব ছিলেন সারেণ্ডা ফরেস্টের সব থেকে বড় অফিসার। খাঁটি বিলিতি সাহেব, ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। আমি খুব ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছি। তিনি তখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছলেন। তাঁর মেম বউ আর ছেলেমেয়েরা বিলেতে চলে গেলেও তিনি যান নি। এই বাংলোটা তৈরি করে এখানেই থাকতেন। শুনেছি, তিনি নাকি মুণ্ডা ওরাঁওদের সঙ্গে মিশে, ওদের বোঙ্গা—মানে, অপদেবতাদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেজন্য অনেকে তাঁকে পাগলও বলত। তিনি নাকি বলতেন, অপদেবতাদের কাছ থেকে এমন সব জিনিস শিখেছেন, যা থেকে তিনি বনের যে কোন জানোয়ারের বেশ ধরতে পারতেন। খবরটা শুনে ওঁর কাছে ওরাঁও মুণ্ডারাও যেতে ভয় পেত। তাঁকে নাকি অনেকে সন্ধ্যার সময় হাতি বা বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে এই বাগানের চারপাশেই। ভয়ে কেউ ওঁর বাড়িতে কাজ করতে চাইত না। কেবল সুরস্মুতিয়া নামে একটি মুণ্ডা মেয়ে তাঁর কাজ করত। সেজন্য সুরস্মুতিয়ার সঙ্গেও কেউ মিশত না। অনেকে তাকে ডাইনী ভাবত। সেই সুরস্মুতিয়া এখনো বেঁচে আছে, বুড়ি হয়ে গেছে। সে থাকে বাংলোর পিছনে একটা ঘরের মধ্যে। তাকে দেখলে সত্যি ভয় লাগে। শননুড়ি চুল, হিজিবিজি কাটা মুখ। চোখগুলো বড় আর সাপের মত অপলক। অনেকে বলে, সাহেবের গচ্ছিত টাকা সুরস্মুতিয়াকে দিয়ে গেছেন। কিছু তো নিশ্চয়ই দিয়ে গেছেন, নইলে সুরস্মুতিয়া খাবার কিনে খায় কেমন করে ? তাকে কোন কাজ করতে দেখা যায় না। অথচ পয়সা দিয়ে সে বাজার থেকে চাল ডাল কিনে আনে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "সুরস্মুতিয়ার জন্যই ভূত-বাংলো বলা হয় ?"

"না না।" মণি কাকা বললেন, "ফ্রেডরিক সাহেবের জন্যই ভূত-বাংলো বলা হয়। উনি শুতেন ওপরের ঐ ঘরটায়। একবার গ্রীষ্মকালে তিনি খেয়ে নিয়ে ওপরে শুতে যান। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। সেই একবার গ্রীষ্মকালে রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে তিনি আর বেরোন

নি। সুরসুতিয়া নাকি অনেকবার ডাকাডাকি করেছে, কিন্তু তিনি তিন-চার দিন দরজা খোলেন নি। বাধ্য হয়েই দরজা ভাঙতে হয়েছিল। দরজা ভেঙে দেখা গেল ফ্রেডরিক সাহেব ঘরে নেই, তিনি কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। সাহেব বলে কথা! তখন রাউরকেলা স্টীল-প্ল্যাণ্ট দূরের কথা, জরাইকেলায় বাইরের লোক খুব কমই ছিল। জঙ্গলও ছিল অনেক ঘন। বিহার আর উড়িষ্যার বড় বড় সাহেব, পুলিসের লোক ফ্রেডরিককে তন্নতন্ন করেও খুঁজে পান নি। সাহেবরা মোটেই বিশ্বাস করে নি, ফ্রেডরিক ইচ্ছামত যে কোন পশু হয়ে যেতে পারতেন, আবার মানুষের রূপ ধারণও করতে পারতেন। তাঁরা দেখেছিলেন, ফ্রেডরিকের খাটের বিছানাটা তছনছ করা। যেন কেউ খুব দাপাদাপি করেছিল। এমন কি ওপরের ঘরের কাঠের মেঝের ওপর পাতা গালিচাও এলোমেলো ছিল। কিন্তু কোথাও একফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া যায় নি। কেবল ফ্রেডরিকের আঙুলের একটা হীরা বসানো সোনার আংটি বিছানায় পাওয়া গেছল। ফ্রেডরিক যে কোথায় গেলেন, তাঁর কী হতে পারে, এটা কোনদিনই কেউ জানতে পারে নি। সুরসুতিয়াকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছল রাঁচীতে। কয়েক মাস বাদে ছেড়েও দিয়েছিল। কারণ ফ্রেডরিকের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। সুরসুতিয়া নিশ্চয় ফ্রেডরিককে খুন করে নি। তেমন সাহসও তার ছিল না। আর খুন করলে রক্ত তো থাকতো? গলা টিপে মারলে অনেক সময় রক্ত থাকে না। কিন্তু ডেডবডি কোথায় যাবে? সাহেবরা জঙ্গলে নদীর জলে সবখানে তোলপাড় করে খুঁজেছে। ফ্রেডরিককে আর পাওয়া যায় নি। সেই থেকেই এই অভিশপ্ত বাংলোকে ভূত-বাংলো বলা হয়।"

"আমি ওসব আজগুবি কথায় একদম বিশ্বাস করি না। গদাধর মামা হেসে বললেন। মোটাসোটা ফরসা মানুষ, হাসলেই মুখ লাল হয়ে যায়। "আমি ইতিমধ্যে একদিন এদের সকলের সামনেই বাংলোর ভেতরটা ঘুরে দেখে এসেছি। ওপরের ঘরেও গেছলাম। হ্যাঁ, বিছানা-টিছানা ইঁদুর আরসোলায় নষ্ট করেছে। অনেক শুকনো পাতা ছড়িয়ে রয়েছে ঘরের ভেতরে। গোটা বাংলোটার ভেতরে বাদুড় আর চামচিকে বাসা বেঁধেছে। এ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই নি। সুরসুতিয়ার সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। সে সাহেবের টাকার হদিশ হয় তো জানত, কিন্তু তাঁর উধাও হবার ব্যাপারটা সে সত্যি জানে না।"

বাংলোর সামনে থেকে কোয়েলের ধারে যেতে যেতে মণি কাকা জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে ফ্রেডরিক সাহেবের কী হল, আপনি বলতে পারেন?"

"অন্তত বনের জানোয়ার হয়ে বনে বনে ঘুরছেন না, এটা বলতে পারি।" গদাধর মামা বললেন, "মানুষ কখনো মন্ত্রবলে জানোয়ার হতে পারে না। ওসব আজগুবি কথা। আমার মনে হয়, ফ্রেডরিক গরাদহীন জানালা দিয়ে নিজেই কোথাও উধাও হয়ে গেছেন। মাথায় একবার পাগলামি চাপলে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। হয় তো সাহেব শেষ পর্যন্ত জঙ্গলে বেরিয়ে বাঘের পেটেই গেছেন।"

মণি কাকা বললেন, "গদাধরবাবু, আপনার এ কথাটা মানতে পারলাম না। আজ পর্যন্ত এ জঙ্গলে যত মানুষকে বাঘে খেয়েছে, তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে। বাঘ তো আর গোটা কঙ্কালটা সুদ্ধ খেতে পারে না?"

“সেটা অবশ্য ভাববার কথা।” গদাধর মামা ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে বললেন, “তবে হাওয়া হয়ে যাবার মত ভূতুড়ে ব্যাপার কিছু ঘটে নি। সেটা এখনো অনুসন্ধান করলে জানা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। এখনো হয় তো কোন ক্লু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।”

গদাধর মামার কথায় কেউই বিশ্বাস করে না, মুখ দেখেই বোঝা গেল। গোগোলের মনে পড়ছিল, মায়ের সেই মানুষের মন্ত্রপড়া জলে কুমীর হয়ে যাবার কথা। বাস্তবে সে রকম ঘটনা ঘটতে পারে কি না, গোগোল জানে না। সেরকম যদি ঘটে থাকে, তা হলে হয় তো ফ্রেডরিক মন্ত্রবলে কোন জানোয়ার হয়ে গেছেন। পরে আর মানুষ হবার মন্ত্র মনে করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বিছানা তছনছ হয়েছিল কেন? মেঝের গালিচাই বা কেন এলোমেলো হয়েছিল? সুরসুতিয়া চার দিনের মধ্যে কোন খবরও কেন লোকজনকে জানায় নি?

গোগোলের মাথায় ফ্রেডরিকের ভূত চেপে গেল।

কোয়েলের ধারে বেড়িয়ে গোগোলের খুবই ভালো লেগেছে। নদীটা আঁকাবাঁকা, সুন্দর। নদীর মাঝে মাঝে কালো পাথরের চাংড়া যেন কালো মহিষের মত মাথা উঁচু করে আছে। বালির রঙ সোনালী।

গোগোল দুপুরে খেয়ে-দেয়ে, একটু শুয়েছিল। তিনটের মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেল। বাবা মা গিরীন কাকা, সকলের চা পর্বও শেষ। মণি কাকা কাজে গিয়েছেন। বিলু তোতন এ বাড়িতে চলে এসেছে। বাবা-মা কোয়েলের ধারেই বেড়াতে যেতে চাইলেন। পরের দিন সারেণ্ডা ফরেস্টে বেড়াতে যাবার জন্য থলকোবাদ বলে একটা জায়গায় ফরেস্ট বাংলো বুক করা হয়েছে। জীপের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

রেল লাইন পেরিয়ে সেই ভূত-বাংলোর সামনে এসে দেখা গেল, গদাধর মামা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গিরীন কাকা আগেই সব জানতেন। গদাধর মামার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। বাবা-মাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গদাধর মামা যে ভূতে বিশ্বাস করেন না, গিরীন কাকা তাও জানতেন। বললেন, “শুনলাম এবার আপনি একদিন ফ্রেডরিকের বাংলোয় ঢুকেছিলেন?”

“হ্যাঁ, ঢুকেছিলাম। কিন্তু ভূত-টূত কিছুই দেখতে পাই নি।” গদাধর মামা বললেন, “আর মন্ত্রবলে মানুষ বনের জানোয়ার হয়ে যায়, ওসব আজগুবি কথায়ও আমি বিশ্বাস করি নে।”

গিরীন কাকা বললেন, “যা বলেছেন মশাই। আমিও ওসবে একদম বিশ্বাস করি নে। আমার সন্দেহ, ঐ সুরসুতিয়াই কোনভাবে সাহেবকে মেরেছে। এখন সাহেবের যখ দেওয়া টাকা ভাঙিয়ে মনের সুখে খাচ্ছে।

“আপনার অনুমান একেবারে মিথ্যে নাও হতে পারে।” গদাধর মামা হাতের পাঁচ ব্যাটারির বড় টর্চ লাইটটা নাচিয়ে বললেন, “আমি আজ আবার এই বাংলোতে ঢুকছি। শীতের দিন, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে, সেইজন্য টর্চ লাইটটা সঙ্গে নিয়েছি। ফ্রেডরিকের হাওয়া হয়ে যাওয়ার একটা ক্লু আমি খুঁজে বের করতে চাই।”

গিরীন কাকা বললেন, “বলেন তো আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারি।”

“না না, আমার সঙ্গে কারোর যেতে হবে না।” গদাধর মামা ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, “আপনি বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, বেড়িয়ে আসুন। এখন শুক্লপক্ষ, আকাশে উঠবে দ্বাদশীর চাঁদ। কোয়েলের ধারে বেড়াতে খুবই ভালো লাগবে। ঘণ্টাখানেক যদি থাকেন, তাহলে আমিও এখান থেকে কোয়েলের ধারে যাব।”

গিরীন কাকা বললেন, “তাই আসুন। আমরা ঘণ্টাখানেকের বেশিই থাকব। এখানে আর কী করার আছে! জ্যোৎস্না রাত্রে কোয়েলের ধারে বেড়াতে আমার বরাবর ভালো লাগে।”

গোগোল গদাধর মামার দিকে তাকিয়েছিল। ওর খুবই ইচ্ছা করছিল, তাঁর সঙ্গে ও বাংলোতে ঢুকবে। কিন্তু জানে, মা-বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। ও বিলু তোতনের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিয়ে কোয়েলের ধারে ছুটল।

ঘণ্টাখানেক পরেই কোয়েলের সোনালী বালুচরে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। ঘণ্টা-খানেক হাঁটাহাঁটি করে বাবা মা গিরীন কাকা এক জায়গায় বসে গল্প করছিলেন। গোগোলরাও দৌড়ঝাঁপ করে হাঁপিয়ে পড়েছিল। গোগোল বসে বিলু আর তোতনকে সেই মন্ত্রপড়া জলে মানুষের কুমীর হয়ে যাবার গল্পটা বলল।

প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে গিরীন কাকা সবাইকে উঠতে বললেন। গোগোল বলল, “গদাধর মামা তো এখনো এলেন না?”

“বোধহয় এখনো বাংলোর মধ্যে ক্লু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।” গিরীন কাকা বললেন, “চল, যাবার সময় হাঁক দিয়ে যাব। বিলু তোতনকেও পৌঁছুতে হবে।” বলে তিনি টর্চ জ্বাললেন গাছের ছায়ায় অন্ধকারে।

চারদিক নিঝুম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে চারদিকে। গোগোলরা ভূত-বাংলোর সামনে এসে পড়ল। আগাছা ভরা বাগানে চাঁদের আলোর ঢেউ খেলছে। তার মাঝখানে বাংলোটা যেন ভূতের মতই দাঁড়িয়ে আছে। গিরীন কাকা গদাধর মামার নাম করে হাঁক দিতে যাচ্ছিলেন।

বিলু বলল, “ঐ তো মামা চাতালের ওপর বেঞ্চিতে বসে আছেন।”

চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, গদাধর মামা শাল চাপিয়ে বসে আছেন। তাঁর কোঁচা লুটোচ্ছে। এমন কি বেঞ্চিতে রাখা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইটটাও দেখা যাচ্ছে। গিরীন কাকা ডাকলেন, “গদাধরবাবু, ওখানে বসে কী করছেন? আমরা এসে পড়েছি, চলুন এবার ফেরা যাক।”

গদাধর মামা কোন জবাব দিলেন না। এমন কি নড়েচড়ে বসলেন না। ছোটবড় সকলেই অবাক! কী ব্যাপার? গদাধর মামা কোন সাড়া দিচ্ছেন না কেন? গিরীন কাকা আবার গলা তুলে ডাকলেন, “ও গদাধরবাবু, চুপচাপ বসে কী ভাবছেন? এখন চলুন, ফেরা যাক?”

গদাধর মামা কোন জবাবই দিলেন না। গিরীন কাকা অবাক হয়ে বললেন, “ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো? ভদ্রলোক কি ঘুমিয়ে পড়লেন? না ভূতের খোঁজের চিন্তায় একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন? একটু দেখে আসি।”

গিরীন কাকা বাগানের ভিতর ঢুকলেন। গোগোলের ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারল না।

গিরীন কাকাকে চত্বরের ওপর উঠে গদাধর মামাকে ডাকতে শোনা গেল। তারপরে গদাধর মামার ওপর টর্চ ফেললেন। ঝুঁকে দেখলেন, দেখেই ফিরে এলেন তাড়াতাড়ি। গিরীন কাকার মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁর গলায় ভীষণ উদ্বেগ। বললেন, "ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এখনই কাশীনাথ কাকাকে খবর দেওয়া দরকার।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে গদাধর-বাবুর?"

"মনে হল, উনি আর বেঁচে নেই।" গিরীন কাকা গম্ভীর স্বরে বললেন।

গাছপালার জঙ্গলের মধ্যে সকলেরই গা ছমছম করে উঠল। সর্বনাশ! গদাধর মামা বেঁচে নেই? প্রথমেই যাওয়া হল কাশীনাথ-বাবুর বাড়ি। তাঁকে খবর দেওয়া হল। তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে বেশ কিছু লোকজন সংগ্রহ করে ভূত-বাংলোয় গেলেন। কিন্তু গোগোলদের বাড়ি ফিরে যেতে হল।

"গদাধরবাবু, ওখানে বসে কী করছেন? [পৃঃ ৩৩৪

সারারাত গোগোল ভালো করে ঘুমোতে পারে নি। কেবলই গদাধর মামার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনল, জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া হবে না। গদাধর মামা মারা গেছেন। কিন্তু কী করে মারা গেছেন, সেটা এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাঁর মৃতদেহ রাউরকেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিস ভোরবেলাই ফ্রেডরিকের ভূত-বাংলোয় পৌঁছে গেছে।

গোগোল তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কোনরকমে একটু জলখাবার খেয়ে নিল। মণি কাকাই বললেন, "চল গোগোল, দেখা যাক, পুলিস কিছু হদিশ করতে পারল কি না।"

গিরীন কাকা মুখ চূণ করে বসেছিলেন। তাঁর সেই রকম হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে না। গদাধর মামার মৃত্যু দেখে তিনি যে বেশ ঘাবড়ে গেছেন, কোন সন্দেহ নেই। গোগোল বেরোবার আগে মা ওকে সাবধান করে দিলেন, "তুমি যেন আবার কিছু ওস্তাদি করতে যেও না।"

গোগোল মণি কাকার সঙ্গে ভূত-বাংলোর কাছে গিয়ে দেখল, পুলিশের ভ্যান গাড়ি আর জীপ দাঁড়িয়ে আছে। একদল পুলিস আর অফিসার বেরিয়ে আসছেন ভূত-বাংলো থেকে। তাঁদের সঙ্গে একটি ছোটখাটো বুড়ি স্ত্রীলোক। গোগোলরা ছাড়াও আরও অনেক লোক বাংলোর বাইরে ভিড় করেছিল। বিলু তোতনও ছিল। বুড়ি স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে মণি কাকা বললেন, "ঐ হল সুরসুতিয়া।"

গোগোলের মনে হল, শনমুড়ি চুলওয়ালা একটা ছোটখাটো পুতুল। বাচ্চা ছেলের মত খাটো। পুলিসের কাছ থেকে জানা গেল, ভিতরে কিছুই পাওয়া যায় নি। গদাধর মামাকে কেউ খুন করেছে কি না, তাও বোঝা যায় নি। তাঁর শরীরের কোথাও কোন দাগ ছিল না। সুরসুতিয়া কাঁদছিল, আর কী সব বলছিল। থেকে থেকে কপাল চাপড়াচ্ছিল।

গোগোল ভেবেছিল, সুরসুতিয়াকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিজেদের গাড়িতে চেপে চলে গেল। সুরসুতিয়া আগাছার ওপর বসে পড়ল। মণি কাকা বললেন, "এ বুড়ির কিছুই করবার নেই। গদাধরবাবুর মত লোককে ও কিছুই করতে পারে না। রাউরকেলা থেকে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলেই সব জানা যাবে।"

বিলু বলল, "তা হলে আমরা বাড়ি গিয়ে ক্রিকেট খেলি।"

মণি কাকা বললেন, "সেই ভালো। তোমরা সময়মত গোগোলকে পৌঁছে দিও।"

পরের দিনই জরাইকেলায় খবর এল, গদাধর মামাকে কেউ মারে নি। তিনি কোন ব্যাপার এমনই শকড্ হয়েছিলেন, তাতেই হার্টফেল করে মারা যান। বোধহয় বাংলোর ভিতরে তিনি এমন কিছু দেখেছিলেন, যা দেখে ভয়ে বাইরে চলে আসেন। চত্বরে উঠে বেঞ্চিতে বসে বোধহয় একটু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। সেখানেই হার্টফেল করে বসে থেকেই মারা যান।

গোগোলের কৌতূহল এতে আরও বেড়ে গেল। গদাধর মামা বাংলোর ভিতরে কী দেখতে পারেন? তিনি কি ফ্রেডরিক সাহেবকে কোন জানোয়ারের বেশে দেখেছেন? অথবা ফ্রেডরিক নিজেই দেখা দিয়েছিলেন?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গোগোল এক সময়ে একলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সকলেই গদাধর মামার কথা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ খেয়াল করেন নি, গোগোল বেরিয়ে যাচ্ছে।

বেলা তখন তিনটে। গোগোল বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে সোজা চলে গেল ভূত-বাংলোর দিকে। বাংলোর সামনে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এই সময় পিছন থেকে বিলুর চিৎকার শোনা গেল, "গোগোল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

গোগোল বিলুকে দেখে ওকে হাত তুলে ডাকল। বিলু বলল, "আমি যাব না, তুমিও যেও না।"

গোগোল সে কথায় কান না দিয়ে বাংলোর একটা খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেখল না, বিলু রেল লাইন পেরিয়ে গিরীন কাকাদের বাড়ির দিকে ছুটেছে। গোগোল অন্ধকারে ঘরের ভিতর প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। একটা বিশ্রী গন্ধ ওর নাকে এল। কয়েকটা চামচিকে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারটা সয়ে এল। গোগোল দেখল, এ ঘরটা হলঘরের মত বড়। মাঝখানে টেবিল, চারপাশে চেয়ার। শীতের সময় আগুন জ্বালাবার জন্য একটা আগুনের চুল্লিও আছে। ডান দিকে আর সামনের দিকে দুটো ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মেঝেয় পায়ের পাতা ডুবে যাবার মত ধূলা জমেছে। টেবিল চেয়ারের অবস্থাও সেইরকম।
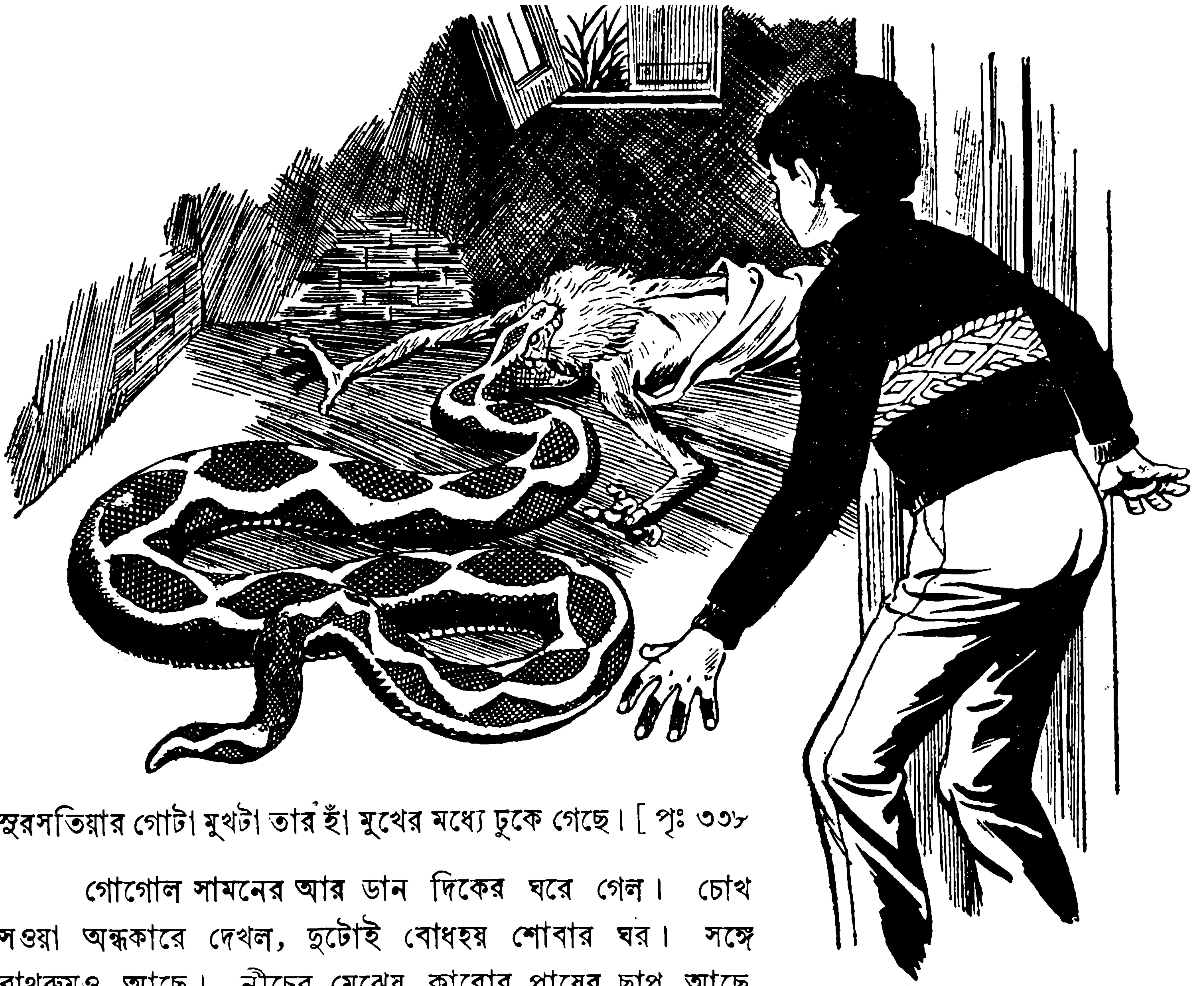
সুরসতিয়ার গোটা মুখটা তার হাঁ মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। [পৃঃ ৩৩৮

গোগোল সামনের আর ডান দিকের ঘরে গেল। চোখ সওয়া অন্ধকারে দেখল, দুটোই বোধহয় শোবার ঘর। সঙ্গে বাথরুমও আছে। নীচের মেঝেয় কারোর পায়ের ছাপ আছে কি না, চোখে পড়ছে না। ডান দিকের ঘরের একটা জানালা খোলা। কিন্তু গাছের ছায়ায় অন্ধকার করে রেখেছে। ভিতরে যাবার আর একটা দরজা। সেদিকে গিয়ে ইট বাঁধানো উঁচু উনোন দেখে বুঝল, এটা রান্নাঘর।

গোগোল বেরিয়ে এসে হলের বাঁ দিকে তাকাল। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে পা দিতেই মচ্‌মচ্‌ শব্দ হল। তবু আস্তে আস্তে ওপরে উঠল। দোতলার ঘরের সামনে কাঠের মেঝের ওপর ধুলার আস্তানা। ওপরে বেশ আলো আছে। গোগোল দেখল, কাঠের মেঝেয় ধুলায় অনেক জুতোর দাগ। এগুলো বোধহয় পুলিসের বুটের পায়ের দাগ। কিন্তু একটা দাগ অদ্ভুত। যেন মোটা কোন গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে গেছে, এ রকম দাগ।

গোগোল ফ্রেডরিকের দোতলার একমাত্র ঘরের খোলা দরজায় উঁকি দিল। ঘরের মধ্যেও পুরনো কার্পেটের ধুলা আর শুকনো পাতার ওপরে অনেক জুতোর দাগ। দুদিকে তিনটি গরাদহীন জানালা খোলা। গোগোল আবার দেখল, মোটা গোল কাঠের গুঁড়ির মত দাগ রয়েছে বিছানার ওপরেও। এ দাগ যে পুরনো নয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। এটা কিসের দাগ?

গোগোল খাটের পাশে জানালার কাছেই গিয়ে থমকে দাঁড়াল। জানালার মোটা কাঠের চৌকাঠের ধুলার ওপরেও সেই রকম দাগ। আর দাগটা বেশ মসৃণ। কিসের দাগ হতে পারে?

হঠাৎ ঝটাপট শব্দ হতেই গোগোল ওপরের দিকে তাকাল। দেখল, দুটো বাদুড় ঝুলছে, কাঠের ভাঙা সিলিংয়ের ওপরে। সন্ধ্যা হলে গরাদহীন জানালা দিয়েই ওরা বেরোয়।

গোগোল আর কিছু দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে এল। গদাধর মামা তাহলে কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন? বাংলোর বাইরে এসে পিছনে সুরসুতিয়ার ঘরের দিকে গেল। বুড়ির সঙ্গে একটু কথা বললে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে। পিছনে টালির চালের আর মাটির দেওয়ালের দুটো ঘর। এর কোন একটা ঘরেই বোধহয় সুরসুতিয়া থাকে।

গোগোল দেখল, দুটো ঘরের দরজাই খোলা। একটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, নেভানো উনোন, কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি। হঠাৎ ওর কানে একটা দাপানো শব্দ এল। ও সরে এসে কান পাতল। শব্দটা পাশের ঘর থেকে আসছে। গোগোল সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়েই ভয়ে হিম হয়ে গেল! পিছন গিয়ে দৌড় দেবে, তাও যেন পারছে না। একেবারে পাথর হয়ে গেছে।

গোগোল দেখল, গোটা ঘর জুড়ে গাছের গুঁড়ির মত মোটা বিশাল এক অজগরের শরীর ছড়ানো। সুরসুতিয়ার গোটা মাথাটা তার হাঁ মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। সুরসুতিয়া তখনও মরে নি। হাত-পা ছুঁড়ছে আর দাপাচ্ছে।

ফ্রেডরিককে কি তবে এরকম কোন অজগরই গিলে খেয়েছে? গরাদহীন জানালা দিয়ে হয় তো এই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা অজগরটাই ফ্রেডরিকের ঘরে ঢুকেছিল। ঘুমন্ত ফ্রেডরিকের মাথাটা অজগর হয় তো এমনি করেই গ্রাস করেছিল, আর চার দিন ধরে গিয়ে খেয়েছিল। দরজা ভাঙবার আগেই অজগরটা গরাদহীন জানালা দিয়ে টালির ছাদ দিয়ে চলে গিয়েছিল।

গোগোল শুনতে পেল, অনেকে ওর নাম ধরে ডাকছে। ও ছুটে গিয়ে দেখল, বাংলোর সামনে বাবা, মা, গিরীন কাকা, তাঁর বাবা, কাশীনাথবাবু, কাকিমা, বিলু, তোতন সব দাঁড়িয়ে। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেক লোক। গোগোল সেদিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "সুরসুতিয়াকে একটা প্রকাণ্ড ময়াল গিলে খাচ্ছে।"

মা ছুটে এসে আগে গোগোলকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন, আর গালে একটি থাপ্পড় মেরে বললেন, "কেন তুমি ও বাংলোর ভেতরে গেছলে?"

গোগোলের গালে মোটেই লাগল না। ও উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মণি কাকা, ফ্রেডরিক সাহেব দেখতে কেমন ছিলেন?"

"খুব ছোটখাটো রোগা মানুষ।" মণি কাকা বললেন, "কেন বল তো?"

গোগোল বলল, আমার মনে হচ্ছে, ফ্রেডরিক সাহেবকে গরাদ ছাড়া জানালা দিয়ে ঢুকে, ঐরকম বিশাল পাইথন গিলে খেয়েছিল। চারদিন ধরে গিলেছে, তারপরে পালিয়েছে। আর গদাধর মামা বোধহয় গতকাল এই পাইথনটাকে দোতলায় দেখে ভয় পেয়েছিলেন তিনিও বোধহয় বুঝেছিলেন, ফ্রেডরিক সাহেব কী করে উধাও হয়েছে। তবে ভয় পেয়ে মরে গেলেন কেন জানি না। এখন সুরসুতিয়াকে বাঁচানো যায় কি না, আপনারা দেখুন।"

গোগোলের কথা শুনে গিরীন কাকার বাবা আর কাশীনাথবাবু অনেক লোকজন নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। এবার বাবা-মাও সকলের সঙ্গে ঢুকলেন। কিন্তু মা গোগোলের হাত ছাড়লেন না।

সেই ঘরটার কাছে গিয়ে কয়েকজন চিৎকার করতে লাগল। ভয়ে সবাই দূরে সরে

এসেছে। অনেকে নানা দিকে ছুটে গেল। কাশীনাথবাবু সবাইকে সরিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন, "এখন সুরসুতিয়াকে আর বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। আর সুরসুতিয়াকে অজগরটার মুখ থেকে টেনে বের করতে গেলে ও আমাদের দিকে তেড়ে আসবে।"

গিরীন কাকার বাবা বললেন, এভাবে হবে না। অজগরটার ল্যাজ ধরে ওকে পেছন থেকে টেনে বের করতে হবে। কিন্তু ল্যাজ তো রয়েছে ঘরের ভেতর। সাহস করে ঢুকবে কে? শিকার মুখে নিয়ে ও এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।"

ইতিমধ্যে কয়েকজন বড় বড় পাথরের টুকরো অজগরের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অজগরটার যেন তাতে কিছুই লাগছে না। কয়েকজন মুণ্ডা ওরাঁও তীর-ধনুক এনে অজগরের মাথা আর চোখে টিপ করে ধারালো লোহার তীর ছুড়তে লাগল। এবার আর অজগরটা স্থির থাকতে পারল না। সুরসুতিয়ার মাথা গ্রাস বের করে দিয়ে সে ঘরের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল। আর তার রাগী ফোঁস ফোঁস শব্দে যেন বাগান কাঁপতে লাগল। কিন্তু তীর বিঁধে আর পাথরের ঘায়ে কাবু হয়ে মরীয়া হয়ে অজগরটা বাইরে বেরিয়ে এল। তখন সবাই চারদিকে ছুটতে লাগল।

কিন্তু অজগর মোটেই জোরে ছুটতে পারে না। দেখা গেল, সে বাংলোর খোলা দরজার দিকে এসেছে।

এর মধ্যেই কয়েকজন বড় বড় কাঠে আগুন লাগিয়ে অজগরটাকে পেটাতে আরম্ভ করেছে। পাথর ছুড়ছে। ধনুক থেকে তীরও সমানে ছোড়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অজগরটা আস্তে আস্তে নিথর হয়ে গেল। একজন এসে বলল, "সুরসুতিয়া মারা গেছে।"

গোগোলদের সেবার আর সারেণ্ডার জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া হয় নি। অজগরের ভয়ে সবাই এমন কাবু হয়ে পড়েছিলেন, কেউ বেড়াতে যেতে রাজী হন নি। এমন কি, সাহসী গিরীন কাকাও না। তবে রাউরকেলা থেকে গোগোলের নামে একটা চিঠি এসেছিল। লিখেছিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ। তিনি লিখেছিলেন, "মাঃ গোগোল, তুমি যা অনুমান করেছিলে, তা ঠিক। সেই অজগরটির পেট থেকে ফ্রেডরিকের গলার সোনার ক্রস্, বাঁধানো দাঁত এবং আর একটি আংটি পাওয়া গেছে। একস্‌পার্টদের অভিমত, পাইথনটার বয়স প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল। গদাধর চ্যাটার্জীও সেই ভয়ঙ্কর পাইথনটিকে অন্ধকারে দেখেই ভয় পেয়েছিলেন, এবং এখন অনুমান করা হচ্ছে, উনি সেই ভয়েই মারা যান। এমনও হতে পারে, পাইথনটা তাঁকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল।

"তোমার এই আশ্চর্য ও বাস্তব অনুমানের জন্য আমিও সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। তোমার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবে। ইতি—

শ্রীদিবাকর মহাপাত্র
এস. পি., রাউরকেলা

সংবাদটা দেশের সব খবরের কাগজেই বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত গোগোলের আর সারেণ্ডা ফরেস্ট বেড়াবার সুযোগ হয় নি।

———

রঘুনাথ চকের টুকরো

—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বেলা দেড়টা হবে। বাড়ির বাবু অফিস যায় তিনটে নাগাদ। বড় ডাকঘরে বিকেলে ডিউটি। অঞ্জলি রান্নাঘর মুছে খেতে বসবে। এমন সময় বাবু ডাকলো। ও অঞ্জলি—এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিবি?

—ছ্যান। টাকা ছ্যান।

—কি সিগারেট আনবি বল তো?

—হেসে ফেললো অঞ্জলি। মনে থাকে আমাদের!

—নে। এই খালি প্যাকেটটা দেখাবি দোকানে। এই দু' টাকার নোট নে। দু' টাকাই দাম এক প্যাকেটের।

বাবু অনিলকুমার রায় খাবার টেবিলে বসে ডাকঘরের রেজিস্ট্রির কাগজ মেলাচ্ছিল। বাবুর বউ রান্নাঘরের ভার পুরোপুরি অঞ্জলির ওপর ভরসা করে দিতে পারে না। অঞ্জলি ভাত বসায়—নামায় বাবুর বউ। মাছে হলুদ দেবার সময় বাবুর বউ অঞ্জলিকে বলে—এই অ্যাতোটুকু হলুদ দিবি। কাঁচা তেলের গন্ধটা মেরে নিবি। বউকে বাবু 'ওগো' ডাকে। আর ডাকে রেবা বলে।

অঞ্জলি টাকা আর খালি প্যাকেটটা নিয়ে বেরোলো। বাবুর বউ এখন চান করতে ঢকেছে। বউদিদি মানুষটা খারাপ না। খাবার জল আনতে হয় রাস্তার টিউকল থেকে। বউদি তখন বলে, লক্ষ্মীটি—অঞ্জলি—টিউকল থেকে খাবার জলটা ধরে নিয়ে আয় মা। ঢাকনা দিয়ে আনিস।

রাস্তায় পড়ে অঞ্জলি দেখলো, একটুও ছায়া নেই। শুকনো পীচ রাস্তা রোদ মেখে সাদা, ফরসা হয়ে আছে। রাস্তার ওপর বাড়ি। সামনেই ক'বাড়ির আদাড়। তরকারির

খোসা, ছাই। ডান দিকের তিন দোকানেই সিগারেট আছে দেখতে পেল—কিন্তু দোকানী বাড়িতে খেতে গেছে বলে সিগারেট কিনতে পারলো না অঞ্জলি। তখন সে বাজারের দিকে গেল। পাছে খালি প্যাকেটটা পড়ে যায়—তাই ফ্রকের হাতার নিচে ডান বগলে চেপে নিল।

খালি পায়ে বেশ সেঁক লাগছিল অঞ্জলির। পীচ রাস্তাটা বোধহয় ভোরের দিকে বৃষ্টি ভিজেছে। জোছন রাতে আমাদের হলদি নদী এমন সাদা পাত হয়ে পড়ে থাকে। আকাশের নিচে। নদীর পাড়ের গাছগুলোর ধুমসো সব ছায়া গায়ে মেখে। আমি এর আগে তিন বাড়ি কাজ করেছি। বালিগঞ্জে ধীরু বোসের বাড়ি। ওই যে তেকোণা পার্ক। ওর গায়ের দোতলা বাড়ি ছিলাম তিন মাস। ওরা আমায় মাস-মাইনে দিত তিরিশ টাকা। তিরিশ টাকায় কাপড় কাচা, ঘরঝাঁট, রান্নাবান্না—সবই করেছি। বাবুদের মাছ রান্না শিখি ওখানে। তখন চুয়ান্ন নম্বর বস্তিতে দিদির সঙ্গে থাকতাম। দিদি মাড়োয়ারি বাড়ির আয়া। সোমবার পুরো ছুটি পায়। আমি যখন শাড়ি ধরবো—তখনই আমার মাইনে বাড়বে।

তা দোতলা বাড়িতে সব কাজ করে খাওয়া-দাওয়ার পর গিন্নিমা, কর্তাবাবু, দিদিদের শাড়ি-কাপড় নিয়ে তেকোণা পার্কে যেতে হত। গিন্নিমা দোতলার জানলা দিয়ে সব নজর রাখতো। পার্কের রেলিংয়ে শাড়ির খুঁট বেঁধে আর এক খুঁট হাতে ধরে টান টান দাঁড়াতে হত। খোলা বাতাস খোলা রোদে বিকেল পাঁচটার ভেতর সব শুকিয়ে যেত। দোতলায় তো রোদ ঢুকতো না। আবার সন্ধ্যে সন্ধ্যে চুলো ধরানো।

সামান্য রাস্তা। তবু শেষ হয় না যেন অঞ্জলির। রেশন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। পাড়ায় একটা ইস্কুল হয়েছে। আমার বয়সী, আমার চেয়ে ডাগর মেয়েরা সুন্দর সুন্দর জামা গায়ে টিফিন খাচ্ছে। আজ দু'মাস হল অনিলবাবুর বাড়িতে কাজ করছি। মাইনে পঞ্চাশ। হালকা কাজ। বাবু আমায় খুব ভালবাসেন। মা বলে ডাকেন। দিদিদের পুরনো ফ্রক পেয়েছি তিনটে। আর নতুন একটা বউদিমণি কিনে দিল। শুধু রাতে শুয়ে শীত শীত করে।

হলদি নদীর ধারে রঘুনাথ চক আমাদের গাঁ। ইলিশের ঝাঁক এই বর্ষাকালে ধরা পড়লে গাঁয়েও ছটকে আসে দু'চারটে। সব তো আর চালান যায় না। দু'চারটে খুঁতো ইলিশ বেরোবেই। সেগুলো আমার বাবা রণজিৎ মণ্ডল, পড়শী শরৎ নস্কর—ওরা সবাই ভাগা করে কেনে। সেদিন মা কচুশাকের সঙ্গে ইলিশের মুণ্ডু দিয়ে মুড়ি রাঁধে। ভাতে মেখে দেখি কী ভাল।

অঞ্জলি হাঁটছিল আর হাতের কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে এগোচ্ছিল। এখন সে হলদি নদীর গায়ে রঘুনাথ চকে চলে গেছে।

আমরা পাঁচ বোন আর এক ভাই। ভাই সবার চেয়ে ছোট। দিদির নাম অর্চনা। ঠাকুরদা নাম রেখেছিল। তিনি বেঁচে নেই। আমি মেজো—অঞ্জলি। তারপর রোহিণী, গীতা আর বুলু। শেষের তিনজন ছোট। ওরা রণজিৎ মণ্ডলের কাছে

হাতের কাগজ টুকরো টুকরো করে··· [পৃঃ ৩৪১

থাকে। বাবার নামটা কী সুন্দর। আমাদের নিয়ে বাবা ছোটবেলায় পুকুরে নামতো। আমি আর কিছুদিন পরেই বেলাউজ পরবো। দিদি বলেছে। এখন দিদির ঘরভাড়ার অর্ধেক আমি দিই।

হাতের কাগজ ফুরিয়ে এলো। আর সামান্যই আছে। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে রাস্তায় ফেলতে ফেলতে এগোতে বড় ভাল লাগে। যেন ফেলে আসা রঘুনাথ চকের গাছতলা, পুকুর পাড়, উলুর মাঠ, ঝিঙের ক্ষেত—এক এক জায়গা টুকরো টুকরো দশায় রাস্তায় ফেলে এগোচ্ছি। আমার পরের বোন রোহিণী ডাগর হলে কলকাতায় কাজ করতে আসবে। আমি এখন পাই পঞ্চাশ, দিদি পায় আশি। দু'জনেই দোবেলা বাবুদের বাড়ি মাছ খাই, ডাল খাই, ডিম খাই, মাংস্ খাই, ভাত খাই। বাবুদের মত এমন বাজার রণজিৎ মণ্ডল করতে পারে না। কোত্থেকে করবে?

আমাদের বাবার জমি মোটে পনের কাঠা। রোয়া করা হয়ে গেলে শুকনোর সময় রণজিৎ মণ্ডল অন্যের পুকুর কাটে, ঘর বানায়। জলের সময় মাছ ধরে হলদিতে, খালে। পয়সা জমিয়ে বাবাকে আমি একখানা তিরিশ কাঠির জাল কিনে দেব।

বাবা বড্ড ভাল মানুষ। নিজের ঘরের খোলা পাল্টায় বাবা। হাতে পয়সা হলি। তা পয়সা বড় একটা হয় না। বাবার সুসার করতিই আমাদের রোজগারে নামা। একখানা বড় ঘর আমাদের। খোলার ছাদ। ঘর ঘিরে বারন্দা। সবটাই মাটির। গাঁথার সময় আমাদের ছোট ভাই পবিত্র জন্মায়। এখন সে পাঁচ বছর। বাবা-মা আমাদের সবার চোখের মণি সে।

—এই খুকি? খুকি?

—অঞ্জলি দাঁড়িয়ে পড়লো। কি?

—নোট ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাঁটা দিস।

—ওই যাঃ। সত্যি তো। দু'টাকার নোটখানা বাজে কাগজ ভেবে ছিঁড়তি ছিঁড়তি হাঁটছি! ওমা! কি হবে এখন? টাকা পাবো কোথায়? ছোট্—ছোট্।

চুয়ান্ন নম্বর বস্তিতে অর্চনার ঘরে গিয়ে হাজির হল। দিদি বেলায় ফিরে তোলা উনুনে আলুর দম বানাচ্ছে। ওমা! অত হাঁফাচ্ছিস কেন?

—আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। বাঁচা দিদি।

—হলটা কি? বল আগে।

—বাবুর সিগারেট আনার দু'টাকার নোট আমি ভুলো মনে কুচিকুচি করে ছিঁড়িছি।

—নোট! ছিঁড়লি কি করে?

আমাদের হলদি নদীর কথা মনে এলো।

—বাঃ। গুণবতী আমার। হাতে তো পয়সা নেই একটা।

—তাহলি আমার যে দশ টাকা তোমার কাছে ছিল—তা থেকে দাও।

—ছ্যাখ ওই বাঁশের খুটিতে লুকোনো আছে।

ধড়াস ধড়াস বুক নিয়ে অঞ্জলি বাঁশের গাঁটে এক খোপে দু'আঙুল গুঁজে ভাঁজ করা দশ টাকার নোটটা পেল।

বাইরে বেরিয়েই সিগারেট কিনে আট টাকা ফেরত পেল।

বাড়ি ফিরতেই বাবু জানতে চাইলো, এত দেরি করলি কেন?

—এখানকার দোকান বন্ধ ছিল—তাই বাজারে গেলাম।

—বাজারে গিয়ে ফিরতে এত সময় লাগে?

অঞ্জলি কোন জবাব দিল না। বাবুর বউয়ের পায়ে একখানা হাড়ে ঘুণ ধরেছে। এক্সরের ছবি আর ডাক্তার তাই বলে। এ বয়সে অপারেশনের ঝুট ঝামেলায় অনিলকুমার রায় যেতে চায় না। এখন অঞ্জলিকে দাবড়ালে সে যদি কাজ ছেড়ে চলে যায়? তাহলে? রেবাকেই তো সব কাজ করতে হবে। করলে আবার পায়ের হাড়ে ব্যথা। ওষুধ, ইঞ্জেকশন, সিরাপ, সেঁক। তার চেয়ে অঞ্জলির কাছে কৈফিয়ৎ না চাওয়াই ভাল।

খানিক বাদে অনিলবাবু অফিসের জামা কাপড় পরছিল। রেবা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললো, মেয়েটা কি করেছে জানো!

অবাক অনিলের মুখে তাকিয়ে রেবা বললো, সিগারেট কিনতে গিয়ে ভুলো মনে হাতের নোটখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে। তাই দিদির কাছে গিয়ে টাকা নিয়ে তবে সিগারেট কিনে ফিরেছে। দেরি এজন্যেই—। সব বললো আমায় এইমাত্র।

কথা বলতে বলতে রেবা একবার হাসতে শুরু করলে থামতে পারে না। একবার এমন হাসির সময় ডান গালের চোয়াল ওপরে উঠে গিয়ে লক-জ দশা। তখন ছোটো হাসপাতালে।

এবার তা হোল না। তবে চোখ বুজে হাসতে হাসতে রেবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।

বাবুর মুখে হাসি দেখে প্রথম অঞ্জলির ভয় কাটলো। কলকাতায় রোজগারে নেমে এটা তার তেসরা বাড়ি। যখন অনেক বাড়ি ঘোরা হয়ে যাবে—তখন আমার ভয়, দুঃখু, মজা, ঘুম—সব কেটে যাবে। আমি রণজিৎ মণ্ডল—মোকাম রঘুনাথ চক—তার মেজো মেয়ে। অঞ্জলি মণ্ডল—রেশন কার্ডে আমার নাম অঞ্জলি দাসী।

বাবু হেসে বললো, ভয়ের কি। এই দু'টাকা রাখো। আমিও কলকাতায় পড়তে এসে হস্টেলে উঠে সব সময় বাড়ির কথা ভাবতাম।

———

মেগিডোর অভিজ্ঞতা

—শান্তনু ভট্টাচার্য

বরাবর শুনে এসেছি দেশভ্রমণে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সিলভাঁ লেভি থেকে আরম্ভ করে 'ডিসকভারী অফ লিম্পোর' রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী প্রোবেয়ার, তাঁদের জীবনী ও তাঁদের লেখা ভ্রমণ-কাহিনী আমাকে দেশভ্রমণে উৎসাহ দিয়েছে। জ্ঞান বেড়েছে কিনা জানি না, তবে দেশভ্রমণের বাতিকটা নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে। তাই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি। নানা জায়গায় ঘুরেছি বলেই বহু ভাষা আর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় হয়েছে।

যা হোক, এ বছর পাড়ি জমালাম সুদূর প্যালেস্টাইনের মেগিড্ডোতে। বেশ প্রাচীন শহর, চারদিক বেশ ফাঁকা, যে হোটেলে উঠলাম, সেটা অনেকটা বাংলো টাইপের, ছিমছাম, তবে বেশ পুরনো। ঘরগুলো মধ্য-কলকাতার পুরনো বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। হোটেলের ম্যানেজার ভদ্রলোক খুব আলাপী, স্থানীয় লোক। সকাল হতেই আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মনে করিয়ে দিলেন এখানকার বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান সদ্য আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বছর আগেকার কান্‌স যুগের সভ্যতার নিদর্শন সলোমনের অশ্বশালার কথা। যা দেখতে

গেলে খুব সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। এত সকালে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে বিরক্ত হলেও ভদ্রলোকের কর্তব্যবোধ দেখে মুগ্ধ হলাম।

ব্রেকফাস্টের পর উনি একজন গাইডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। লোকটি হ্যাণ্ডশেক্ করে হঠাৎ পরিষ্কার ইংরিজিতে বলে উঠলো, "ইলেকট্রিক শক যদি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়, তবে তোমার ভয়ের কিছু নেই। এর থেকে তুমি উপকৃত হবে।"

আমার হতভম্ব ভাব দেখে হোটেল ম্যানেজার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, "স্যার, এ লোকটির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, অনেক সময় এ ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে।"

আমার মনে পড়লো, গতকাল রাত্রে হোটেলে আমার ঘরে ঢুকেই দেখেছিলাম, লাইটের স্যুইচ বোর্ডে কিছু ইলেকট্রিক তার খোলা অবস্থায় রয়েছে। খেয়াল না করে স্যুইচে হাত দিলেই প্রচণ্ড শক্ লাগতে পারে। যে লোকটা আমার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল, তাকে ব্যাপারটা দেখাতে সে হোটেল ম্যানেজারকে জানাবে বলেছিল। এখন এই সকালবেলাই গাইডের ভবিষ্যৎ বাণীর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি পেয়ে গেল। ম্যানেজারকে বললাম, "গতকাল যে হোটেল বয় আমার জিনিসপত্র ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেই ভবিষ্যৎ বক্তা করলে পারতেন।"

মুখ দেখে বুঝলাম, আমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ম্যানেজার ভদ্রলোকের মাথায় ঢোকে নি।

এরপর রওনা হলাম পাঁচ হাজার বছর আগেকার সলোমনের অশ্বশালার দিকে। সব কিছু দেখে হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। হোটেল ম্যানেজারটি এতই ভদ্রলোক যে, আমাদের দুপুরের খাবার আর বিকেলের টিফিন সব কিছু প্যাক করে গাইড লোকটির সঙ্গে দিয়েছিলেন। কাজেই বেড়াতে বেড়াতেই আমরা সময়মত পেট ভরিয়ে নিয়েছিলাম। অভ্যেস অনুযায়ী অনেক কিছু কেনাকাটাও করলাম। তবে সবই প্রায় ছোটখাট জিনিস। কেবল একটা প্রাচীন জিনিসের দোকানে ঢুকে একটা বড় তামার মূর্তি খুব পছন্দ হয়ে যেতে, অনেক দাম লাগলেও কিনে নিলাম। মূর্তিটা বেশ পুরনো। অনেক পুরনো বলেই তামার মূর্তিটা একেবারে ম্যাড়ম্যাড়ে কালো হয়ে আছে। দোকানদার মূর্তিটার ইতিহাস লেখা একটা বইও দিল।

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মূর্তিটাও টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মূর্তিটা সম্বন্ধে লেখা বইটা পড়তে শুরু করলাম। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। মূর্তিটা যার কাছেই ছিল, তিনিই কোন-না-কোন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছেন। প্রায় তিনশো বছর আগে এক ফরাসী মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর বাড়ির অনেক কিছু জিনিসের সঙ্গে এটাকেও বিক্রী করে দেন। অনেক বছর বাদে এক ইংরেজ পুলিস অফিসার এটা কিনে নেন, কিন্তু কোন এক রাত্রে ট্রেনে কাটা পড়ে ভদ্রলোক মারা যান। তারপর বহুদিন মূর্তিটার হদিশ পাওয়া যায় নি। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে তিব্বতের কাছে পাহাড় রাস্তায় একজন চীনা ব্যবসায়ীর মৃতদেহের কাছে মূর্তিটাকে

পাওয়া যায়। চীনা লোকটি অবশ্য পাথরের ওপর স্লিপ করে করে গিয়েছিল। যার ফলে মাথার খুলি ভেঙে সে মারা যায়। এভাবে আরও অনেক হাত বদল হয়ে মূর্তিটা এসে পৌঁছয় প্যালেস্টাইনে আর শেষ পর্যন্ত স্থান পায় এক ধনী লোকের ড্রয়িংরুমে। কিন্তু সেখানেও একরাত্রে ঘরের দেওয়াল থেকে একটা বড় ভারী ছবি ছিঁড়ে মাথায় পড়তে ভদ্রলোক মারা যান।

সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছিল, তাই বইটা বন্ধ করে রাখলাম। এসব কুসংস্কার আমি কোনদিন মানি না, তাছাড়া ঘটনাগুলো সবই অ্যাকসিডেণ্ট। মনে হয় পুরো ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে তুলতে লেখক ঘটনাগুলোর সঙ্গে মূর্তিটাকে জড়িয়ে দিয়েছেন। মূর্তিটাকে ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। কেনবার সময় লক্ষ্য করি নি, এখন দেখলাম ওটার ডান পায়ের গোড়ালির নীচে ছোট্ট ছবির মত কি একটা রয়েছে, ভালভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। প্রাচীন মূর্তির মধ্যে অনেক সময় গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয় আর এমন গোপন চাবির ব্যবস্থাও থাকে। বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। চাবিটা টেনে বা টিপে দেখলাম, কিন্তু কিছুই হলো না। এবার ডান দিকে ঘোরাতেই সামান্য একটু ঘুরলো কিন্তু কোন গুপ্ত দরজা বা অন্য কিছুই পাওয়া গেল না। মূর্তিটা রেখে দিয়ে আবার বইটায় মন দিলাম, যদি চাবিটার ব্যাপারে কিছু সংকেত লেখা থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মনে হয় লেখকও কিছু জানেন না। দেওয়াল ঘড়িতে খুব মিষ্টি শব্দে অনেকটা গ্রাম-বাংলার মেঠো পথে দোয়েল পাখির ডাকের মত 'টুই, টুই' শব্দে রাত দুটো বাজলো। বইটা বন্ধ করে শোবার আগে লাইট নেভানোর জন্যে সুইচ বোর্ডের খোলা তারগুলো এড়িয়ে সাবধানে হাত বাড়ালাম। ঠিক তখনই মূর্তিটার দিকে চোখ পড়লো। চমকে উঠলাম, ওটার চোখের মণি দুটো নড়ছে। এও কী সম্ভব! ওটাকে নিয়ে এতক্ষণ চিন্তার ফলে কোনো দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি তো?

এর পর দেখলাম মূর্তির মাথাটাও বেশ নড়ছে। আর বিস্ময় নয়, একটা বিশ্রী রকমের ভয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিরসিরিয়ে উঠলো। রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই, চেয়ারটা ধাক্কা খেয়ে সশব্দে উল্টে পড়লো। এর পর মূর্তিটার ডান হাতটা নড়ে উঠলো, তারপর পরিষ্কার গ্রীক ভাষায় বলে উঠলো, "অনেক ধন্যবাদ, বহুদিন পরে চাবি ঘুরিয়ে আবার আমাকে চালু করেছো। আর যত মানুষকে আমি শেষ করেছি, সেই তালিকায় তুমিও পড়ছো।" মূর্তিটার কথায় আমি প্রায় স্তব্ধ। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ওটার পায়ের চাবিটা তাড়াতাড়ি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। এবার মূর্তিটা হেসে উঠলো, তারপর বাঁ হাতটাও নাড়তে নাড়তে বলে উঠলো, "এর আগে যত মানুষকে মেরেছি, সবাই প্রায় তোমার মত চাবিটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে আমাকে থামাতে চেয়েছে। কিন্তু কেউই জানে না চাবি দেওয়া মাত্র আমার ভেতরের সার্কিটগুলো চার্জ পেয়ে কাজ আরম্ভ করে। তবে সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার আগেই চাবি বন্ধ করে দেওয়াতে আমার আয়ু ঘণ্টা দুয়েকের বেশি থাকে না। অবশ্য তার আগেই আমার কাজ শেষ করতে পারবো।"

এত ভয় পেয়ে গেলাম যে গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বার হলো না। মূর্তিটা এবার একলাফে টেবিল থেকে মাটিতে নেমে এলো। তারপর বললো, "মৃত্যুর আগে তোমার জানা উচিত যে, আমি কে? আমি একটা রোবট বা যন্ত্রমানব। যদিও প্রথম রোবট মানুষই সৃষ্টি করেছিল, তা বলে তোমাদের গর্ব করার কিছু নেই। আমাকে কোন একটা রোবটই তৈরি করেছে।"

প্রচণ্ড ভয় পেলেও খুব আশ্চর্য হচ্ছিলাম। জিগ্যেস করলাম, "কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তো সবে মাত্র রোবট নিয়ে গবেষণা করছে। শুনেছি জাপানী বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সব থেকে এগিয়ে। তবে কি প্যালেস্টাইন বিজ্ঞানে এতই উন্নতি করেছে যে তোমার মত এরকম উন্নত যন্ত্রমানব তৈরি করেছে?"

আমার কথায় মূর্তিটা হেসে উঠে বললো, "এ যুগের বিজ্ঞান আমাকে সৃষ্টি করে নি। আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে গ্রীস দেশে 'আইজিয়ান' ও 'মেডিটেররানিয়ান'—এই দুই সাগরের মধ্যে অবস্থিত 'মাইনোয়ান' দ্বীপের একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে আমার জন্ম হয়। এখন সামোস, খিওস, ফউরনোই, ভেলিসস, নাখোস প্রভৃতি দ্বীপগুলোর কাছে সাইক্লোডেস নামে যে দ্বীপটি আছে, সেটাকেই সব থেকে পুরনো দ্বীপ বলা হয়, সে সময় ঐ দ্বীপটির নাম ছিল 'সাইক্লাডিক'। প্রায় আট হাজার বছর আগে তোমরা যাকে আরলি ব্রোঞ্জ এজ বল, সে সময় যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হতো 'হেলাডিক' সভ্যতা। তখনই সর্বপ্রথম তিনটি দ্বীপের নামকরণ হয়,—'ক্রেটে, মাইনোয়ান এবং সাইক্লাডিক'। সে সময়ে ঐ সভ্যতা, তাদের বিজ্ঞান কি প্রচণ্ড উন্নতি করেছিল তা এখনকার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।"

এ পর্যন্ত একটানা কথা বলে মূর্তিটা একটু থামতেই আমি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলাম, "না না, এ ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। যদিও ইতিহাস স্বীকার করেছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগের 'নিয়েলিথিক পিরিয়ডের' পরে আরলি ব্রোঞ্জ এজ-এ হেলাডিক সভ্যতা প্রচণ্ড উন্নতি করেছিল। কিন্তু ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না, তখনকার বিজ্ঞান এ যুগের থেকেও উন্নত ছিলো।"

মূর্তিটা মাথা নেড়ে বললো, "ইতিহাসটা ভালই জানা আছে দেখছি, তবে সেটা তো মানুষেরই লেখা যা সব সময় বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৭০-এ অর্থাৎ লেট ব্রোঞ্জ এজ-এ একটা বিরাট আগ্নেয়গিরি ক্ষেপে গিয়ে উত্তপ্ত লাভায় মাইনোয়ানকে গ্রীসের বুক থেকে মুছে দেয়। যার ফলে সমস্ত কিছুর সঙ্গে ঐ উন্নত সভ্যতারও বিলুপ্তি ঘটে। এর পর আগ্নেয়গিরির হাত থেকে বেঁচে যাওয়া সামান্য কিছু সোনার অলঙ্কার আর হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র আবিষ্কার করেই তোমরা হেলাডিক সভ্যতার ইতিহাস লিখে ফেললে। তাছাড়া আমাকে দেখেই তো তোমাদের বোঝা উচিত। এ যুগে যেখানে সবে মাত্র তোমরা রোবট তৈরি করছো, যদিও তাদের কম্পিউটার ব্রেন আমার মত এত উন্নত নয়। যেটুকু তোমরা কম্পিউটার ডিস্কে টেপ করে দাও, রোবটও সেটুকুই অনুকরণ করতে পারে। সে জায়গায় আমার ব্রেন কম্পিউটার এত উন্নত যে আমি কোন

কিছু দেখে তার ডায়াগ্রাম বা মেকানিজম তখুনি আমার ব্রেনের স্ক্রীনে ফোটোটাইপ করে নিয়ে সেটাকে নিজেই আবার নতুন করে তৈরি করতে পারি।”

এতক্ষণে ভয় ভাবটা কাটিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। রোবটটা চুপ করতে প্রশ্ন করলাম, “কিন্তু তুমি মানুষ মারছো কেন? তোমার এ আশ্চর্য ক্ষমতা একদিন তো মানুষের জ্ঞানের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। তোমার সৃষ্টিকর্তা সেই মানুষ জাতের ওপর এত নৃশংস হয়ে উঠলে কেন?”

রোবটটা এবার জোরে শব্দ করে হেসে উঠে বললো, “প্রতিহিংসা বলতে পারো। আমার পূর্বপুরুষ কোন এক রোবটকে মাইনোয়ানের কোন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করেছিল ঠিকই। কিন্তু তারপর বছরের পর বছর সেই মানুষের দল আমাদের অর্থাৎ যন্ত্রমানবদের শুধুমাত্র চাকরের মত খাটিয়েছে। তারা এতই অলস ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছিল যে, তাদের সামান্যতম কাজ থেকে প্রচণ্ড শক্ত কাজ সমস্তই আমাদের মুখ বুজে করতে হয়েছে। পুরনো নষ্ট জিনিস তোমরা যেমন ফেলে দাও, সে সময়ে মানুষের ছোট বাচ্চারাও খেলাচ্ছলে আমাদের কম্পিউটার ভাল্‌ব্‌ বা সার্কিটগুলো নষ্ট করে আবর্জনায় ফেলে দিয়েছে। সারিয়ে তোলার কোন ব্যবস্থাই করে নি। এভাবে প্রচুর অত্যাচার সহ্য করতে করতে যন্ত্রমানবদের কম্পিউটার ব্রেনেও কিছুটা অত্যাচারের অনুভূতির কম্পন হয়। এর পর তারা যখন পরবর্তী রোবট অর্থাৎ আমাদের তৈরি করে তখন মানুষের অজান্তে আমাদের ব্রেনে এমন একটা সেন্স চেম্বার বসিয়ে দেয়, যেটার দ্বারা সর্বদা মানুষের ওপর একটা প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।”

হঠাৎ যেন মূর্তিটার চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। একটা হাত উপরে তুলে কি যেন বলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তার চোখ দুটো আবার দপ করে জ্বলে উঠলো। আমি সম্বিত ফিরে পেতেই সে বলে উঠলো, “আমরাও তাই মানুষের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু এরপরই একটা মহাপ্রলয় ঘটে গেল। আগ্নেয়গিরি ক্ষেপে গিয়ে মাইনোয়ানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল।

সেখানকার মানুষ অবশ্য জেট প্লেনে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ওদের সব যানবাহনই নষ্ট করে দিয়েছিলাম। কাজেই সেখানকার সমস্ত মানুষই ধ্বংস হয়ে যায়। দুঃখের ব্যাপার যন্ত্রমানবরাও এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে রেহাই পায় নি। এরই ভেতর আমি আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে যাই। তবে আমার এমন একটা সার্কিট গলে যায় যাতে আমি আমার নিয়ন্ত্রণ সুইচটা নিজেই আর চালনা করতে পারি না। এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কেন আমি মানুষ ধ্বংস করে চলেছি। আমার কম্পিউটার ব্রেনে, ঐ সেন্স চেম্বারের ভাল্‌ব্‌গুলো যতক্ষণ কাজ করবে, আমিও ততক্ষণ মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেব।”

রোবটটা তার কাহিনী শেষ করলো। যদিও পুরো ব্যাপারটা মনে হচ্ছিল আমি যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি, তবু যে ভয়টা কাটিয়ে উঠেছিলাম, সেটা আবার সিরসির করে চারদিক থেকে আমাকে যেন জড়িয়ে ধরতে লাগলো। রোবটটা আমার অবস্থা

দু'হাতে আমার গলাটাকে টিপে ধরে বলে উঠলো, "তবে মৃত্যুই তোমার প্রাপ্য।"

বুঝতে পেরেই এবার বলে উঠলো, "তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে বেশ ভাল লাগলো। অন্য মানুষগুলো আমাকে শুধুমাত্র তামার মূর্তি মনে করে আঘাত করতে যায়, কাজেই খুব তাড়াতাড়ি তাদের মেরে ফেলতে হয়। বোকারা জানে না, আমাকে কোনরকম অস্ত্রই আঘাত করতে পারবে না। যেহেতু তুমি আমাকে কোন আঘাত করতে আস নি, তাই তোমাকে আমি এক শর্তে ছেড়ে দিতে পারি।"

আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে রোবটটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, "যে কোন শর্ত বল—"

রোবট এবার আস্তে আস্তে বললো, "যদি তুমি আমার নিয়ন্ত্রণ সুইচটা আবার ডান দিকে ঘুরিয়ে চালু করে দাও—"

এবার আমি হেসে উঠে বললাম, "তুমি প্রায় মানুষের মতই বুদ্ধিমান বটে কিন্তু মানুষের সাধারণ জ্ঞানটা তোমার নেই। নিয়ন্ত্রণ সুইচটা চালু করা মাত্রই তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। তখন সুইচ বন্ধ করার কেউ থাকবে না, আর তোমার ভেতরকার ভাল্‌ব্‌গুলোও পুরোপুরি চার্জ পেয়ে যাবে। তখন তুমি আবার হাজার হাজার রোবট সৃষ্টি করবে আর মানুষদের পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার চেস্টা চালাবে। কারণ তোমার ব্রেনে সেরকমই সেন্স-চেম্বার জুড়ে দেওয়া হয়েছে।"

আমি চুপ করা মাত্রই রোবটের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। এক লাফে সামনে এসে দু'হাতে আমার গলাটাকে টিপে ধরে বলে উঠলো, "তবে মৃত্যুই তোমার প্রাপ্য।"

চিৎকার করতে গেলাম, পারলাম না। প্রচণ্ড জোরে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে দম আটকিয়ে এলো। মাথা ঘুরে উঠে চারদিক কালো হয়ে আসতে লাগলো। মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে গেল, কিন্তু ব্যথার কোন অনুভূতি নেই। গলার ওপর অসম্ভব জোরে চাপ পড়ছে। এবার শেষ চেষ্টায় প্রাণপণে রোবটটার ভারী হাত দুটো ছাড়াতে গেলাম, গলায় আর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি টের পেলাম। রোবটটা আমার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। হাতটা গিয়ে পড়লো সুইচ-বোর্ডের খোলা তারের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড শব্দ আর চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ঙ্করভাবে শক্ খেয়ে ছিটকে পড়লাম। কিছুক্ষণ বোধহয় জ্ঞানই ছিল না, তারপর বুঝতে পারলাম এখনো বেঁচে আছি। শুধু তাই নয়, গলার ওপর থেকে ভারটা চলে গেছে। যদিও খুব ব্যথা লাগছে, তবু আবার স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। অন্ধকারের মধ্যে কোনরকমে টেবিল থেকে টর্চ নিয়ে জ্বালালাম। দেখলাম, ঘরের মেঝেতে কিছুদূরে তামার মূর্তিটা ছিটকে পড়ে আছে, তবে সেটাকে আর মূর্তি বলা চলে না। পুরো জিনিসটা কেমন যেন গলে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে, আর একটু একটু করে ভেঙে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। টর্চ জ্বেলে ঘরের ফিউজটা সারালাম। আবার আলো জ্বলে উঠলো। ততক্ষণে মূর্তিটা সম্পূর্ণ গুঁড়ো ধুলো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরো ব্যাপারটা এবার আস্তে আস্তে আমার মাথায় ঢুকলো। আমার হাতটা সুইচবোর্ডের খোলা তারগুলোতে লাগা মাত্রই আমার ভেতর দিয়ে কারেণ্ট রোবটটাকে ছুঁয়েছে আর ওর ভেতরের সমস্ত ভাল্‌ব্‌গুলো শর্ট-সার্কিটে গলে নষ্ট হয়ে গেছে। সকালবেলা গাইডের ভবিষ্যৎ বাণীটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ই আমার জীবনকে ফিরিয়ে দিল।

মণি ও মুক্তা

পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবি হল ঈগল পাখি। লাওসের জুলজিকাল সোসাইটির মতে তাঁদের একটি ঈগল ৫৫ বছর বেঁচেছিল। পক্ষীবিদদের মতে অনুকুল অবস্থায় ঈগল পাখি ১০০ বছর পর্যন্তও বাঁচে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তন

[অলৌকিক কাহিনী]

—স্বপনবুড়ো

মৃত্যুঞ্জয় যে কত কম বয়েসে এই বাড়িতে কাজে লেগেছে তা সে নিজেই ভুলে গেছে।

এখন যিনি বাড়ির কর্তা—শম্ভুবাবু—তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় কোলে করে মানুষ করেছে। আজ তিনি জমিদার।

শম্ভুকে ও ভালো করে কোলে তুলে নিতে পারতো না। তবু পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াতো, আর আপন মনে দেশোয়ালী গান গুনগুন করে গাইত।

বাড়িতে মাসি-পিসির দল আশঙ্কায় হা-হা করে উঠত।

চিৎকার করে বলত, ওরে মিতু, ওকে ফেলে দিবি, সব্বোনাশ হয়ে যাবে,—নামিয়ে দে।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মনে এতটুকু ভয়-ডর ছিল না। আপন মনে হাসতো, গুনগুন করে গান গাইত আর পিঠে করে শম্ভুকে নিয়ে বাগানে বেড়াতো।

সবাই মৃত্যুঞ্জয়কে মিতু বলেই ডাকত। অত বড় দাঁত ভাঙা নাম ধরে কে ডাকবে?

তাই 'মিতু' নাম সবার মুখে মুখে ফিরত! সেই মিতু ধীরে ধীরে বড় হল, বুড়ো হল আর শম্ভু ইস্কুল কলেজের পড়া শেষ করে বাড়ির কর্তা হয়ে বসল। বাড়ির বুড়ো কর্তারা—বাপ-খুড়ো-জেঠা সবাই এপারের মামলা চুকিয়ে ওপারে চলে গেছে।

সেই মৃত্যুঞ্জয় আজো মিতু হয়ে সবার ফরমাশ খেটে আর গালমন্দ খেয়ে দিব্যি কাজকর্ম করে চলেছে। মিতু কিন্তু সবার কাজ ফেলে শম্ভুর হুকুম সবার আগে মেনে চলে। বলে, ওরে বাবা, ও যে বাড়ির কর্তা, ওর হুকুম না মেনে উপায় আছে? ভাত-জল দিয়ে কর্ত্তা যে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

মিতু রোজ একটা পাকা বাঁশের লাঠি তেল দিয়ে মালিশ করে। দেখতে লাঠিটা একেবারে হলুদ বরণ হয়েছে।

শম্ভু কখনো রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলে মিতু জবাব দেয়, কর্তা, লাঠিটা তৈরী করে রাখি। দিনকাল তো ভালো নয়। কখন ডাকাত পড়ে বাড়িতে, তখন লাঠি চালাতে হবে না?

শুনে বাড়ির কর্তা শম্ভু হাসে আর বলে, এই শরীর নিয়ে মিতু তুই লাঠি চালাবি?

মিতু মিটিমিটি হাসে, আর রসিকতা করে জবাব দেয়, তখন দেখে নিও কর্তা, এই বুড়ো হাড়েও মিতু লাঠি চালাতে পারে কিনা!

বাড়ির কর্তা আর বাড়ির পুরনো চাকরের সঙ্গে এই রকম রসিকতার আলাপ প্রায়ই চলে। বাড়ির কর্তা শম্ভুর সব ভালো।

দয়া মায়ায় ভরা মন। সকলের প্রতি কর্তব্য ঠিক ঠিক বজায় রাখে। কিন্তু রাগলে আর রক্ষা নেই! তখন বাড়ির কর্তা শম্ভুর অন্য রকম চেহারা।

শম্ভুর একমাত্র কন্যা কণা।

দেখতে একেবারে যেন চাঁদের কণা।

দিব্যি ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়ে এই চাঁদের কণা।

যে দেখে, সে-ই আদর করে কোলে নিতে চায়। বাপ তো হাজার কাজের মাঝে কখনো চোখের আড়াল করে না। আর মিতু ওকে সব সময় আগলে আগলে রাখে।

বাড়ির সবাই মনে করে, এই কণাকে মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে, আর তাকে তুলে রাখলে পাখিতে ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এত আদরের কণা সবার চোখের মণি হয়ে বাড়িতে ফুলের মতো ফুটে রয়েছে।

এই কণার আবার নানা রকম আবদার আছে। সেই আবদার মতো জিনিস না এনে দিলে কণা একেবারে কেঁদেকেটে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে অস্থির করে তোলে। কণা আবদার যখন করেছে—পৃথিবী উলটে গেলেও সে আবদার মানতে হবে, নইলে কারো রক্ষা নেই।

সে কথা বাড়ির কর্তা থেকে শুরু করে পিসিমা-মাসিমা, ঝি-চাকর থেকে মিতু পর্যন্ত সবাই জানে। তাই কণার আবদার রাখতে তটস্থ হয়ে থাকে সবাই।

সেদিন সকাল থেকেই কণা আবদার ধরলে, তাকে শাপলা ফুলের মালা এনে দিতে হবে। সে গলায় পরবে সেই শাপলা ফুলের মালা।

প্রথমে বাবার কাছে সেই বায়না নিয়ে হাজির হল কণা।

বাবা বললে, আমি তা পুকুর থেকে শাপলা ফুল তুলতে পারি নে, আমি মিতুকে বলে যাচ্ছি, সে ঠিক স্নান করার সময় শাপলা ফুল তুলে, মালা গেঁথে তোমায় দিয়ে যাবে।

কণা বললে, আজ খেলাঘরে আমার মেয়ের বিয়ে। শাপলা ফুলের মালা আমার অবশ্য চাই। সেই মালা নিয়ে আমার মেয়ে বরের সঙ্গে মালা বদল করবে।

বাবা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুই যে বললি নিজে শাপলা ফুলের মালা গলায় পরবি?

কণা চোখ মিটমিট করে জবাব দিলে, সে কথা না বললে, তুমি আমায় তাড়াতাড়ি শাপলা ফুলের মালা এনে দেবে কেন? আমার আজই চাই সেই শাপলা ফুলের তাজা মালা! মেয়ের বিয়ে হেন কথা।

বাবা হাসতে হাসতে বললে, একেবারে পাকা বুড়ী হয়েছিস। আমার মেয়েরই বর জুটল না, তা ও এরই মধ্যে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে।

কণা গিন্নীবান্নির মতো উত্তর দিল, মেয়ের বিয়ে তো ফেলে রাখতে পারি না। আজ সন্ধ্যায় শুভলগ্ন পড়েছে। পুরোহিত ঠাকুর পাঁজি দেখে বলে দিয়েছেন। আজকের শুভলগ্ন আবার পেরিয়ে না যায়—

বাবা তখন জরুরী কাজে বাইরে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি বললে, না—না, লগ্ন পেরিয়ে যাবে না। আমি মিতুকে বলে যাচ্ছি। সে ঠিক সময়মত শাপলার মালা গেঁথে এনে দেবে।

বাড়ির কর্তা শম্ভু কণার আবদারের কথা মিতুকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আজ তার একটা জরুরী মামলা আছে। কোর্ট থেকে বেরিয়ে আর এক কাজে ছুটতে হবে। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জরুরী আলোচনা আছে। আজ বাড়ির কর্তা শম্ভুর মরবারও একটু ফুরসত নেই! কারো সঙ্গে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে একটুখানি কথা বলবার সময়ও তার নেই।

তবু বাড়ির কর্তা যখন দুর্গা-দুর্গা বলে ছাতা নিয়ে গনগনে রদ্দুরে বেরিয়ে গেল, তখন আদরের মেয়ে কণা পেছু ডেকে বললে, আজ তাড়াতাড়ি কিন্তু বাড়ি ফিরে এসো বাবা। গোধূলি লগ্নে আমার মেয়ের বিয়ে। তারপর বরযাত্রী আর নিমন্ত্রিত অতিথিদের খাওয়া দাওয়া। তুমি বাড়ির কর্তা। তোমার এই বিয়ের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ সমাধা না করলে চলে?

বাড়ির কর্তা শম্ভু পান চিবুতে চিবুতে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

এদিকে সারাদিন ধরে এই শান্ত বাড়িতে অনেক কোলাহল, আর কাজে-কর্মে অনেক ওলট-পালট।

হলই বা ছোট্ট কণার পুতুল-মেয়ের বিয়ে। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো বটে!

কণার ছোট ছোট বন্ধুরা পাড়া ঝেঁটিয়ে এসেছে। তারা সবাই মিলে কণার খেলাঘর নতুন করে সাজিয়ে ফেলল। কোথায় যজ্ঞিবাড়ি রান্না হবে—হেঁসেলে গনগন করে আগুন জ্বলছে। এয়োর দল বঁটি পেতে কুটনো কুটছে। বরযাত্রী দল কোথায় এসে বসবে, তার আয়োজন। ছোট্ট রঙ্-বেরঙের চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। কলাপাতা কেটে এনেছে ঝি-চাকরের দল।

ছোট্ট রং করা পালকি সাজানো রয়েছে গাছের তলায়, এই পালকিতে চেপে বর আসবে। পাড়ার খুদে ছেলেরা আসাসোটা আর মশাল সাজিয়ে বসে আছে। ওরা মিছিল করে বরের পালকি আর বরযাত্রীদের নিয়ে আসবে। মেয়েদের দল মহা উৎসাহে নানা বাগান খুঁজে নানা রঙের ফুল যোগাড় করে এনেছে।

কিন্তু কোথায় সেই শাপলা ফুলের ফরমাশি মালা? সারাদিন ধরে অন্য রকম মালা তৈরী হচ্ছে, ফুলের তোড়া সাজানো হচ্ছে। কিন্তু কোথায় গেল মিতুদা?

সারাদিন ধরে তার টিকিটি দেখবার জো নেই! বিকেলে ভাবলো, বুঝি পুকুরে গিয়ে শাপলা ফুল তুলে নিয়ে আসছে।

কণা কেবলি ঘরবার করতে লাগলো। ক্রমাগত লোক ছুটলো মিতুর সন্ধানে।

ছেলেমেয়ের দল খুঁজে খুঁজে হয়রান!

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। ছেলের দল মশাল জ্বালতে না পেরে মনমরা হয়ে বসে রইল। বাজনদারেরা তাদের ঢাক-ঢোল-বাঁশী নিয়ে তৈরী। তাদের মুখ আম্‌সির মতো শুকিয়ে গেছে!

পালকি-বেহারার দল, যারা বরকে মিছিল করে নিয়ে আসবে, বসে থাকতে থাকতে সবাইকার ঘুম পেয়ে গেল।

কিন্তু কণার সেই ধনুক-ভাঙা পণ!

শাপলার মালা না হলে কনে কি করে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেবে? বরই বা কিভাবে মালা-বদল করবে?

আঁধারে ঝিঁঝিঁ ডাকতে লাগ্‌লো।

দূর বনে শেয়াল দলের হুক্কা-হুয়া শোনা যেতে লাগলো। একটা কাল প্যাঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দ করে বাড়ির ওপর দিয়ে তার অশুভ ছায়া ফেলে উড়ে চলে গেল!

যারা বিয়ে বাড়ির যজ্ঞি ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল, সবাই উনুন জ্বালবে কি জ্বালবে না, বুঝতে না পেরে বোকার মতো মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

ইতিমধ্যে পুরোহিত ঠাকুর এসে ব্যস্ত হয়ে বললেন, লগ্ন যে বয়ে যাচ্ছে! এর পর আর কি এই মেয়ের বিয়ে হবে?

বরের বাড়ি থেকে খবর এলো,—তারা সবাই সেজে গুজে বসে আছে। বরের সাজানো পালকি আর মশালচীরা না গেলে ওরা রওনা হতে পারছে না!

কিন্তু তখনো মিতুর দেখা নেই।

মিতু কোথায় উধাও হয়ে গেল?

রাত্রি গভীর হয়ে এলো।

এয়োর দল এতক্ষণও আশায় আশায় ছিল—

মিতু শাপলা ফুলের মালা নিয়ে ফিরে আসবে—আলো জ্বলবে—

মশালের আলোতে রোশনাই হবে—

বরের পালকি চেপে বর আসবে—

এয়োরা হুলুধ্বনি দেবে—

মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠবে—

অবশেষে কণার মেয়ের বিয়ে হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না—

মিতু শাপলা ফুলের মালা নিয়ে ফিরে এলো না—আলো জ্বললো না—

মশালের রঙীন আলোয় রোশনাই হল না—

বরের সাজানো পালকি ঠায় বসে রইল—

এয়োর দল মুখ ভার করে ফিরে গেল—

হুলুধ্বনি হল না—

মঙ্গল শঙ্খ বাজলো না—

কণা রাগ করে না খেয়ে-দেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সেদিন সে বাড়িতে আর উনুন জ্বলল না—সবাই অনাহারে অন্ধকারে পড়ে রইল।

একটু বেশি রাত্রে বাড়ির কর্ত্তা শম্ভু বাড়ি ফিরে দেখে—গোটা ভবন একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে।

আদরের মেয়ে কণা কাঁদতে কাঁদতে বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর চোখের জলে বাপের বুক ভিজিয়ে দিয়ে নিজের দুঃখ ও বেদনার কথা জানালো। কি করে মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল, সেই দুর্ভাগ্যের কথা জানাতেও ভুলল না।

মেয়ের বেদনার কাহিনী শুনে বাড়ির কর্তা শম্ভুর দেহের সব রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেল, সে উন্মাদের মতো মিতুর ঘরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে দেখল, মিতু চুপচাপ বসে হুঁকো টানছে।

মিতু বাড়ির কর্তার অগ্নিমূর্তি দেখে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল, গোয়ালের গরু ধবলীটা হারিয়ে গিয়েছিল। পথ ভুল করে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছিল। সারা বিকেল আর সন্ধ্যা সেই ধবলীকে পাগলের মতো খুঁজেছে মিতু। কিন্তু সে কথা বলবার সুযোগ পেলো না মিতু। রাগ চণ্ডাল।

শম্ভু তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

কোনো কথা শুনতে সে রাজী নয়।

হাতের কাছের সেই মিতুর পাকানো বাঁশের লাঠিটা তুলে ধরে একেবারে সোজা মিতুর মাথায় বসিয়ে দিল।

মিতু সারাদিনের অনাহারে একেবারে কাবু ছিল। এইবার মাথায় চোট পেয়ে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না।

বাড়ির আর একটি চাকর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে আর্তনাদ করে কইলে, কি করলে কর্তাবাবু ? মিতু যে মরে গেল।

বাড়ির কর্তা শম্ভুরও তখন জ্ঞান নেই। সেও অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর সেই জোয়ান চাকরটা কিভাবে অন্ধকারের ভেতর মিতুর লাশটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের পাশের খালের জলে ফেলে দিয়ে এলো—সে কথা কেউ জানে না।

খালটাতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে।

তাই মিতুর দেহটা সেই রাত্রের অন্ধকারে যে কোথায় ভেসে গেল, কেউ হদিশ দিতে পারে না।

পরদিন সবাই জানলো, কর্তার বকুনি খেয়ে মিতু কোথায় রাগ করে চলে গেছে। আর তার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।

লাঠিটা সোজা মিতুর মাথায় বসিয়ে দিল। [পৃঃ ৩৫৫

দিন যেমন চলছিল—তেমনি মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো।

এই জমিদার বাড়ির একটি গাছের পাতাও বোধ করি মিতুর অভাবে ঝরে পড়ল না।

কিন্তু বাড়ির আদরের মেয়ে কণা যেন দিন দিন মনোব্যথায় সূর্যের তাপ লাগা ফুলের মতো শুকিয়ে যেতে লাগলো।

কেউ ওকে কোনো কথা জানায় নি। তবু যেন কণা আপন মনে শুকিয়ে যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে এমন হল যে এই বিরাট বাড়িটাতে ফুল ফোটে না, পাখি ডাকে না, একটা জোরে কথা শোনা যায় না—একটি হাসির কথা কেউ বলে না।

ধীরে ধীরে কণা যেন কেমন হয়ে পড়ল। সেই হাসি-খুশি উজ্জ্বল মেয়েটি যেন হলুদ-গোলা পুতুল হয়ে গেল ! চোখে সেই দীপ্তি নেই, ঠোঁটে সেই ভুবন ভোলানো হাসি নেই,

মেঘের মতো সেই কোঁকড়া চুলে আর বেণী বাঁধা হয় না। সখির দল আসে, কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে মুখ নীচু করে নীরব চরণে ফিরে চলে যায়।

অবশেষে কণা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে সেই ফুলের মতো মেয়ে কণা শয্যা গ্রহণ করল।

কেউ জানে না—কেন এই অসুখ?

গাইয়ের দুধ শুকিয়ে গেল—
পাখির ডাক থেমে গেল—
কুয়োর জল শুকিয়ে গেল—
বাগানের ফুল কুঁকড়ে গেল—
চন্দনা খাঁচা খুলে উড়ে গেল—

মন্দিরে আর সকাল-সন্ধ্যা কাঁসর-ঘণ্টা বাজে না। গাঁয়ের কবিরাজ দু'বেলা এসে ওষুধ দিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু মেয়ে চোখ বুজে থাকে, কথা কয় না!

তারপর একদিন হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ। মেয়ের যেন কোনো আর সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না।

সারাটা বাড়িও একেবারে নিঝুম হয়ে গেল। কেউ আর মুখ তুলে কথা কয় না—পা টিপে টিপে হাঁটে সবাই।

দেয়ালের গায় টিকটিকিটাও নড়ে বসতে চায় না। কণার বেড়ালটা ঝিম মেরে গাছতলায় বসে আছে। কেউ ওকে ডেকে দুধ খেতে দেয় না।

সন্ধ্যের দিকে আরো যেন বাড়াবাড়ি হল কণার। গাঁয়ের কোবরেজ তো মুখ বাঁকিয়ে চলে গেছে।

বাড়ির কর্তা শম্ভু বললে, এদিকে তো আর ভালো চিকিৎসক নেই। আমাকে বড় ডাক্তার আনতে শহরেই যেতে হবে।

কর্তার কথাটা সবাই কান পেতে শুনল।

কেউ আপত্তিও করল না, কেউ সম্মতিও দিল না। কর্তা শম্ভু সন্ধ্যার ট্রেনে শহরে রওনা হয়ে গেল।

বাড়ির মাসি-পিসি-মায়েরা কণাকে ঘিরে বসে রইল।

ওদিকে গাঁয়ের পাশেই বাগদী আর ডোমপাড়া। ওরা সারাদিন বাঁশের আর বেতের ঝুড়ি, ধামা, কুলো তৈরী করে। তাই দল বেঁধে হাটে-বাজারে বিক্রি করে।

কিন্তু লোকে বলে, ওরা রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করে। বাগদীদের মোড়ল ডাকাতের সর্দার।

শুধু ডালা-কুলো-ঝুড়ি বিক্রি করে এত বাড়বাড়ন্ত হয় না। ওদের নিকোনো উঠোন আর ধানের গোলাগুলো দেখে বেশ বোঝা যায়, আরো গোপন আয়ের পথ ওদের খোলা আছে।

ওই বাগদীদলের মোড়ল ষণ্ডা যে ডাকাত দলের সর্দার এ কথা সবাই জানে। কিন্তু প্রাণের ভয়ে সে কথা কেউ মুখ খুলে বলে না।

সেই ষণ্ডার আবার অনেক দিনের নজর রয়েছে এই শম্ভু কর্তার বাড়ির ওপর।

প্রচুর সোনাদানা গয়নাগাঁটি সঞ্চিত আছে পুরুষানুক্রমে এই জমিদার বাড়িতে।

ষণ্ডা লোভে আর লালসায় উদ্দীপ্ত হয়ে আছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু সুযোগ পায় নি একদিনের জন্যও। শম্ভু কর্তা রাত্তিরে কখনো বাড়ি ছেড়ে থাকে না। তা ছাড়া শম্ভু কর্তা আবার জাঁদরেল লাঠিয়াল। ও অঞ্চলের সেরা লাঠিয়াল শঙ্করের মন্ত্রশিষ্য। তাকে হটিয়ে বাড়ির গয়নাগাঁটি হাত করা বড় সোজা কথা নয়। তাই বাগদী সর্দার ষণ্ডা মনের বাসনা মনেই চেপে রেখে এতদিন গুমরে গুমরে কাল কাটিয়েছে।

ডাকাতদেরও তো গুপ্তচর থাকে। সন্ধ্যের মুখে সে জানিয়ে গেল শম্ভু কর্তা এই-মাত্র শহরে চলে গেল ডাক্তার ডেকে আনতে। হয়ত রাত্তির বেলা ফিরতেই পারবে না।

এই সুবর্ণ সুযোগ।

বাগদী সর্দার ষণ্ডার শয়তানী চোখ দুটো আঁধারে লাখো জোনাকির মতো জ্বলতে থাকে।

মেয়েটা দারুণ ব্যামোতে পড়েছে।

বাড়ির কর্তা শম্ভু শহরে চলে গেছে ডাক্তার ডাকতে। শহর থেকে ফিরতি গাড়ি রাতে আর মিলবে না।

ওদের পুরনো চাকর মিতুও কিছুদিন হল উধাও হয়ে গেছে।

তারও ফিরে আসবার আর সম্ভাবনা নেই। এ রকম সুযোগ আর কোনো দিনই মিলবে না বাগদী সর্দারের।

বাছাই করা দশজন শাকরেদ ঠিক করে ফেলল—বাগদী সর্দার ষণ্ডা।

মা কালী জুটিয়ে দিয়েছেন এমন সুযোগ। রাতের অন্ধকারে তাদের উপাস্য কালীকে পূজায় সন্তুষ্ট করে ডাকাতের দল কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে নিল।

জমিদার বাড়ির গয়নাগাঁটি দিব্যি লুটে নিয়ে একেবারে গ্রামের বাইরে শাকরেদ রহমতুল্লার ডেরায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

রণপা চড়ে যাবে।

আবার রাতের অন্ধকারেই ফিরে আসবে।

কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না।

ডাকাতদলের বাগদী সর্দার লোভ আর লালসায় ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

খুব গোপনে সে নৈশ-অভিযানের জন্য তৈরী হতে লাগল।

কত কাল ধরে ওই জমিদার বাড়ির টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি, পুরনো আমলের সোনা-রুপোর বাসন-কোসনের ওপর তার দৃষ্টি।

বাড়ির কাছে ষণ্ডা কতদিন ধরে সুযোগের প্রতীক্ষা করছে—কিন্তু ওই মিতুর লাঠির ভয়ে এতদিন সে মনে-মনেও সঙ্কল্পকে জোরদার করতে পারে নি।

তাছাড়া বাড়ির কর্তা শম্ভুও এ অঞ্চলের দারুণ লাঠিয়াল, সে কথা সবাই জানে।

শঙ্করের শিষ্য শম্ভু।

এ কথা কারো আর জানতে বাকি নেই!

ডাকাত দলের বাগ্দী সর্দার প্রচণ্ড লোভ থাকা সত্ত্বেও তাই এদিকে এগুতে সাহস করে নি!

এখন তো বিপদের বেড়াজাল আপনা থেকেই ছিঁড়ে গেছে।

বিশ্বাসী লাঠিয়াল মিতু আজ কয়েকদিন থেকেই নিরুদ্দেশ।

তারপর বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা দারুণ অসুখে পড়েছে। এখন তখন অবস্থা!

তাই নিরুপায় হয়েই বাড়ির কর্তা শহরে ছুটেছে ডাক্তার ডেকে আনতে।

আজ আবার সে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে কিছুতেই ফিরতে পারবে না। রাত্তিরে আর ট্রেন নেই।

ডাকাত দলের গুপ্তচর সর্দারের কানে কানে এসে জানিয়ে গেছে, বাড়িতে আজ বেটাছেলে কেউ রইল না। দু'চারজন যারা ছিল—আগের দিন কোন্ এক বিয়ে উপলক্ষে অন্য শহরে চলে গেছে।

আজকে আবার অমাবস্যা পড়েছে। অমাবস্যা রাত্রেই ডাকাত দলের পুণ্য লগ্ন পড়ে।

ষণ্ডা সর্দার খুব গোপনে মা কালীর পুজোর আয়োজন করল। শাকরেদদের সাবধান করে দিল, মা কালীর পুজোতে আজ অমাবস্যা রাত্রে ঢাক যেন না বাজে!

তাহলে আশেপাশের মানুষ সন্দেহ করতে পারে, বাগদীদের বাড়ি এত রাত্তিরে ঢাক কেন বাজে? নিশ্চয়ই ওরা ডাকাতি করবার কোনো ফন্দী এঁটেছে।

গোপনে ডাকাতদের পুরোহিতকে ডেকে আনা হল।

সর্দারের সাবধানতা—খুব আস্তে আস্তে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। শঙ্খ বাজবে না, ঘণ্টা বাজবে না—ঢাকের শব্দ একেবারে শোনা যাবে না। সর্দার কিন্তু বলির আদেশ দিয়েছে।

তাই অনেকগুলি ছাগশিশুর বলিদান নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হল।

বাগদী ডাকাতের দল প্রসাদী মাংস-ভাত খেয়ে অনেকখানি করে কারণবারি পান করল।

এখন তাদের শরীরে অসুরের অসীম শক্তি। এখন তারা বড় বড় গাছ উল্টে ফেলে দিতে পারে।

ষণ্ডা সর্দার সবাইকার কপালে মা কালীর সিঁদুর ফোঁটা করে পরিয়ে দিলে। গলায় দুলিয়ে দিলে আশীর্বাদী জবা ফুলের মালা।

ষণ্ডা সর্দার আবার সকলকে সাবধান করে দিলে, সবাইকার মশাল জ্বালাতে হবে না।

একজন মশালচী থাকবে।

সে সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

কাছেই বাড়ি—তাই বেশি আলো জ্বালানো নয়। গাঁয়ের আর আশেপাশের মানুষ সন্দেহ করতে পারে।

লাঠি বাগিয়ে নিয়ে মিতুকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল। [পৃঃ ৩৬১

আরো রাত গভীর হল।

অমাবস্যার সেই আঁধারী রাতে মাত্র একটি মশালচী সঙ্গে করে বাগদী সর্দার ষণ্ডা তার শাকরেদদের নিয়ে পা টিপে টিপে সেই নির্জন জমিদার বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো—

চুপচাপ কাজ হাঁসিল করতে হবে।

কোনো মানুষ খুন করা হবে না।

অথচ জমিদার বাড়ির সব ধনরত্ন হাত করতে হবে। এগিয়ে চলেছে ষণ্ডা সর্দার তার শাকরেদদের নিয়ে।

খানিকটা পথ পল্লী-অঞ্চলের জঙ্গলে ভরা। সেই ঝোপজঙ্গলে জোনাকির দল ক্রমাগত যেন আগুনের হরির লুট ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আরো কিছুদূর চলবার পর সেই জমিদার বাড়ির নিঝুম ফটক যেন ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ ষণ্ডা নিশ্চিন্ত।

সামনে তাকে পথ আটকাবার আজ কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

নীরবে ঢুকবে আর লুটপাট করে বস্তাবন্দী টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি নিয়ে তক্ষুণি ফিরে আসবে।

আরো কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেল দলটা। কিন্তু হঠাৎ চোখের সামনে এ কি দৃশ্য!

সেই নিরুদ্দেশ মিতু !!

তার সেই অনেক দিনকার পাকা বাঁশের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে !!!

এত আঁধার—তবু তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

অমাবস্যার অন্ধকারে মিতুর চোখ দুটি যেন সুন্দরবনের বাঘের মতো জ্বলছে।

এটা কি করে সম্ভব হল ?

কিন্তু ষণ্ডা সর্দার এতটুকু দমবে না। সে হুঙ্কার দিয়ে বললে, আমরা সবাই মিলে ওই মিতুকে ঠাণ্ডা করবো। ও একা রয়েছে, আমাদের ভয়টা কিসের ?

ডাকাতের দল সর্দারের কথায় উৎসাহিত হয়ে লাঠি বাগিয়ে নিয়ে মিতুকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল।

কিন্তু এ কী আজব কাণ্ড ?

সবাই দেখলে—তাদের দু'পাশে দুটি করে মিতু লাঠি বাগিয়ে ধরে তাদের মাথায় মারবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

তারা কি আগাগোড়া বিভীষিকা দেখছে ! একজন করে ডাকাত, দুটি করে মিতুকে রুখবে কি করে ?

ডাইনে তাকায়,—বাঁয়ে তাকায় আর চোখ কচলে সেই আতঙ্কের দৃশ্য দেখে !

মিতু কিন্তু বিপুল বিক্রমে ডাকাত দলের লোকেদের সেই লাঠি নিয়ে আক্রমণ করল।

দু'দিক থেকে একই সঙ্গে যদি প্রত্যেককে দুটি মিতু আক্রমণ করে, তবে ডাকাতরা রুখবে কি করে ?

তারা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারই মধ্যে ওরা ক্রমাগত লাঠি চালাতে লাগলো।

কিন্তু মিতুর হাতের অব্যর্থ পাকা বাঁশের লাঠি ডাকাতদের মাথায় গিয়ে আঘাত করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে ওদের মাথা থেকে রক্ত ছুটতে লাগলো।

কিন্তু ওদের লাঠি মিতুকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারল না !

ডাকাতদের লাঠি মিতুর দেহের ভেতর দিয়ে যেন জল কেটে বেরিয়ে গেল। তাতে কিন্তু মিতু এতটুকু কাবু হল না কিংবা হটে গেল না !

ডাকাত দল সবাই একযোগে আক্রমণ করে মিতুকে ঘিরে ফেলল।

ফলে, চারদিকে মিতুর লাঠির ঘায়ে একেবারে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল।

কিন্তু মিতুকে কেউ স্পর্শও করতে পারল না। একবার সর্দার ভাবল, বেশি মদ খেয়ে কি ওদের চোখে ঘোর লেগেছে ? তাই ওরা দুটি করে মিতু দেখতে পাচ্ছে ? কিন্তু তার মাথা ফাটাতে পারছে না ?

একে একে ডাকাত দলের মাথা ফেটে গেল। তারা সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখন একটা অশরীরী বীভৎস হাসি শোনা গেল—আকাশে—বাতাসে চারদিকে ? কিন্তু সবাইকার চোখের আড়ালে মিতু আবার ফিরে এলো কখন ?

———

অর্জুনের হেয়ারড্রেসার

—বিমল কর

আমাদের নেবুমামাকে তোমরা নিশ্চয় চেনো না। বিখ্যাত লোক হলে মানুষ তাকে চেনে ; হয় নামডাকে, না হয় খবরের কাগজে ছবি দেখে চিনে ফেলে। নেবুমামা কোনো কালেই বিখ্যাত ছিলেন না। তিনি কখনও কোনো ফুটবল টিমে খেলেন নি, কোনো দিন হেদুয়ায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতার কাটেন নি, কেউ তাঁকে কুস্তি বা বক্সিং করতে দেখে নি, এমন কি তিনি সাইকেলে শেওড়াফুলি ভ্রমণ নাম দিয়ে একটা এলেবেলে লেখাও কোনো দিন লেখেন নি।

নেবুমামা এক সময় চাকরি করতেন মিণ্টে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর বাড়িতে বসে বসে কাগজপত্র বই পাঁজি ডিকশেনারি যা হাতের কাছে জোটে তাই পড়েন, আর গড়গড়া টানেন। থাকেন নেবুবাগানে। দোতলা বাড়ির ওপর তলায়। নিচে একঘর ভাড়াটে থাকে।

মামার নিজের বলতে এক মামি ছাড়া কেউ নেই। নয় নয় করেও মামার বয়েস সত্তরের কাছাকাছি হতে চলল। আমরা তাঁর দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। এমন ভাগ্নে জনা তিনেক থাকলেও মামার সঙ্গে আমার খাতিরটাই বেশি। প্রতি হপ্তায় না পারলেও মাসে বার দুই তিন আমি মামার কাছে যাই। যখন হাতে কাজ থাকে না কোনো, মন-টন ভাল থাকে না—মামার কাছে চলে যাই। অবশ্য সেটা সন্ধ্যের দিকে।

নেবুমামার আহ্নিক বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটা অবশ্য পূজো আর্চা নয়। মামা সন্ধ্যের মুখেমুখে বেশ বড় মাপের এক ডেলা আফিং গলায় ফেলে আহ্নিক সারেন। আর সন্ধ্যের শেষ দিকে তাঁর মৌতাত জমে ওঠে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মামা তখন ঘুমঘুম চোখে ত্রিভুবন বিচরণ করে বেড়ান। তাঁর যত্রতত্র অবাধ গতি হয়। এই সময় মামার কাছে গেলে এমন এমন গল্প শোনা যায়, যার কোনো তুলনা আমি দেখি না।

নেবুমামার মুখে এই সব গল্প শুনতে আমার খুব মজা লাগে। সত্যি বলতে কি, গল্প যদি গল্পই না হল, তবে ছাই শোনাই বা কেন, আর পড়াই বা কেন? মামার সঙ্গে কত রকম লোকের দেখা হয়, যারা ইহলোকেই নেই, কোনো দিন ছিলেন কি না, তাও বলা মুশকিল।

সেদিন কলকাতা শহর জলে ভিজে একেবারে চুপসে রয়েছে, হাতে কাজকর্ম নেই, বাড়িতে বসে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না, বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে মাথায় ছাতা ধরে বেরিয়ে পড়লাম মাতুল দর্শনে। আমাদের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি হাঁটাপথে মিনিট দশেকের রাস্তা। হাজার বর্ষাতেও এই রাস্তায় তেমন একটা জল জমে না। হাঁটুতক জল আর এমন কী!

নেবুমামা যথারীতি আহ্নিক সেরে বসেছিলেন। মামি নিজের ঘরে বসে নিচের তলার ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করছেন।

আমাকে দেখেই মামা বললেন, কে রে, জিতে নাকি?

বললাম, হ্যাঁ, জিতেন।...ভাল লাগছিল না, আপনার কাছে চলে এলাম।

বেশ করেছিস। আমারও মনমেজাজ ভাল নেই।

যা বর্ষা সারাদিন—একেবারে ছিঁচকাদুনে বাদলা।

মামা বললেন, বর্ষায় আমার কিছু হয় না। আদার রসে আধখানা পাতিলেবু আর এক কোয়া রসুন ফেলে একটু গরম করে খেয়ে নিবি, ব্যস—স্যাঁতস্যাঁতানি ভাব চলে যাবে।

মামা কিছু বললে 'না' বলতে নেই। বললাম, আজই খাব শোবার আগে। তা আপনার মনমেজাজটা খারাপ কেন?

ঢুলুঢুলু চোখে মামা আমার দিকে তাকালেন। ক' মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, জিতে, তুই মহাভারত পড়েছিস?

মাথা চুলকে বললাম, আজ্ঞে, চেষ্টা করেছি পড়বার। কেন?

তুই অর্জুনের যে চুল ছাঁটতো, তার নাম জানিস?

অর্জুনের চুল কে ছাঁটতো, তার নাম মহাভারতের কোথাও যদি থেকেও থাকে, আমি জানতাম না। আর অর্জুন-টর্জুনরা যে চুল ছাঁটতো, তাও তো কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ল না।

মামার কাছে অকপটে স্বীকার করলাম—'নামটা আমি জানি না।'

নেবুমামা খুশি হলেই তুড়ি মারতেন। এটা তাঁর অভ্যেস। তুড়ি মেরে মামা বললেন, কোথা থেকে জানবি? রাজারাজড়া, বীর, বড় বড় মুনি-ঋষি—এইসব বৃহৎদের নাম জানবার পর কি গরিবগুর্বোর কথা মনে পড়ে? দেখ জিতে, সেকালই বল আর একালই বল—সব কালেই গরিবগুর্বোর কোন পজিশন নেই।

আমি বললাম, 'হঠাৎ অর্জুনের হেয়ার-কাটারের ওপর আপনার ঝোঁক পড়ল কেন?'

'কাল তাকে মিট করলাম', মামা বললেন, 'দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। একেবারে আচমকা। আলাপ হল। তারপর শুনলাম, লোকটা অর্জুনের চুল ছাঁটতো।'

মামার সামনে হাসতে নেই। হাসলে আর ও-বাড়িতে ঢোকার উপায় থাকবে না।

বললাম, 'এ তো দারুণ ব্যাপার। কেমন করে দেখাটা হল, মামা?'

'শুনবি?'

'বা রে, শুনবো না কেন?'

তা হলে শোন—ব্যাপারটা বলি, মামা তাকিয়ায় ভাল করে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে আধশোয়া হয়ে বসলেন।

নেবুমামার পরনে গেরুয়া রঙের লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। মানুষটি কোনো কালেই নধর ছিলেন না, এখন যেন আরও রোগা হয়েছেন। মাথায় পনেরো আনা টাক, এক আনা মাত্র চুল, সাদা ধবধবে।

মামার হাতের কাছে একটা টিনের কৌটোয় কতকগুলো কান চুলকোবার পালক থাকে। মাঝে মাঝেই তিনি পালক তুলে নিয়ে কান চুলকোন।

মামা বললেন, গোড়া থেকেই ব্যাপারটা বলি তোকে। কাল দিনটা ভালই ছিল একরকম। বৃষ্টি-টৃষ্টির বালাই ছিল না। এই সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ কেমন খেয়াল হল, অনেক দিন ভাল রাবড়ি খাওয়া হয় নি। তোর মামি এককালে রাবড়িটা শিখেছিল—ভালই করত, আজকাল দায়সারা গোছের একটু ঘন দুধ দেয় রাত্তিরের পাতে। রাবড়ির কথা শুনলেই তেড়ে ওঠে। তোর মামির আর দোষ কি বল? বয়েস হয়েছে, বাতে বাতাক্কার, রাত্তিরে চোখে দেখতে পায় না, রাবড়ি আর করে কেমন করে! এদিকে আমার আবার ওই বদ অভ্যেস, মন চাইলে থাকতে পারি না। ভাবলাম যাই, টুকটুক করে মিশিরের দোকানে যাই, শ' দুই গ্রাম রাবড়ি কিনে আনি। মিশির হল গিয়ে কিশোরীচাঁদের ছেলে। বেনারসের কিশোরী। রাবড়িতে তার জুড়ি নেই। বেনারস থেকে এসে নতুন বাজারের কাছে দোকান দিয়েছিল নাইটিন টুয়েন্টি এইটে। কলকাতায় তাদের দোকানের মতন রাবড়ি আর কোথাও পাবি না। লোকে জানে না কিন্তু বনেদী রাবড়িখোররা জানে।

মামা একটা পালক তুলে নিয়ে কানে ঢোকালেন। চোখ দুটো আরও ঢুলুঢুলু হল। বললেন, "রাবড়ি কিনতে বেরুবার সময় তোর মামি খ্যাচখ্যাচ করতে লাগল। হাঁচল বার পাঁচেক। আমি বাপু হাঁচি টিকটিকির পরোয়া করি না। বেরিয়ে পড়লাম
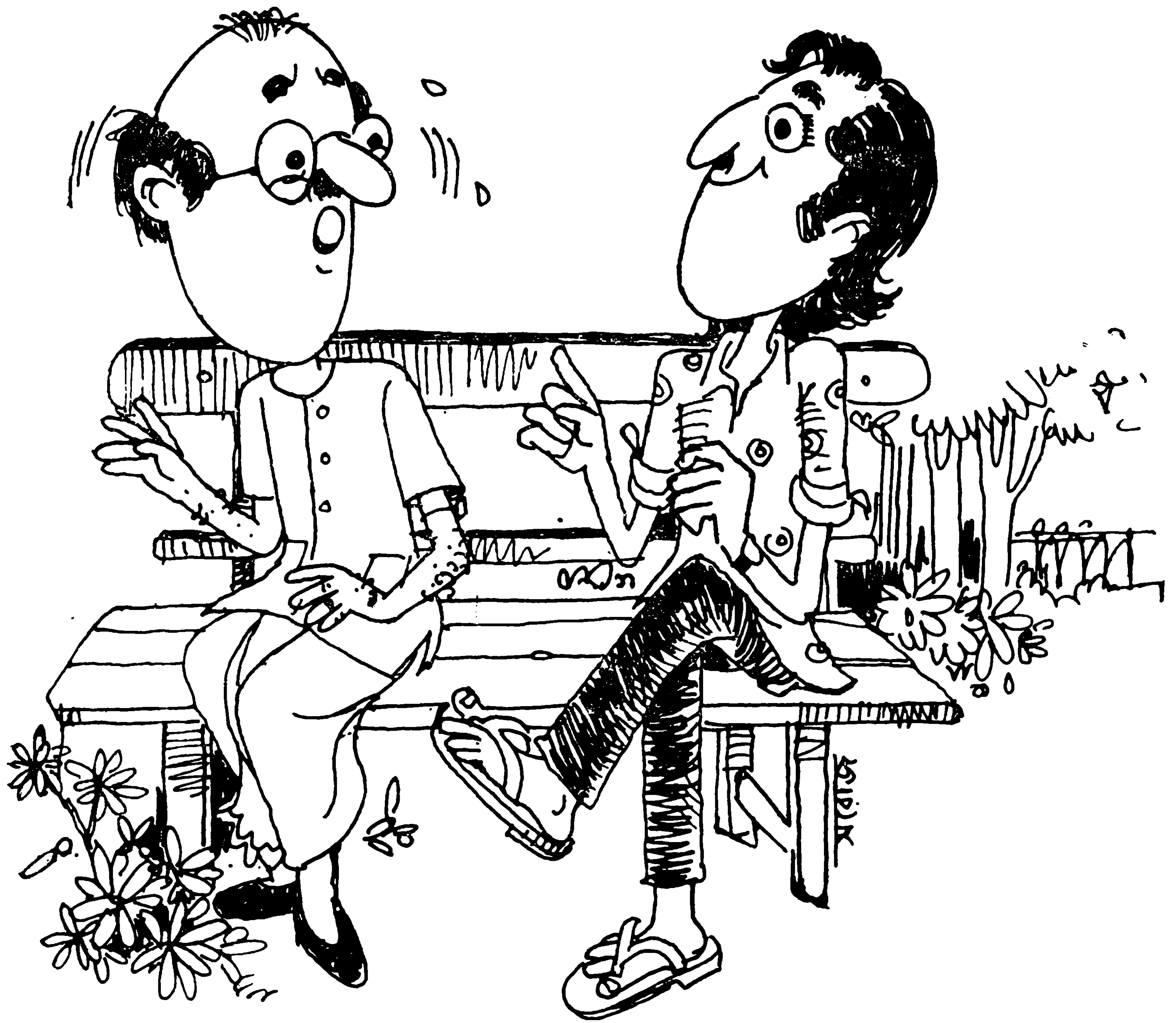
রাবড়ি কিনতে বেরুবার সময় তোর মামি খ্যাচখ্যাচ করতে লাগল। [পৃঃ ৩৬৪

রাস্তায়। কলকাতার রাস্তাঘাট আজকাল যা হয়েছে জিতে, দু' পা শান্তিতে হাঁটা যায় না। গাড়িঘোড়ার শব্দ, চেঁচামেচি, হল্লা, বকাটে ছোঁড়াদের হিন্দি গান। মাঝামাঝি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দেখি, চশমাটা পকেটে করে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছি। একটু ভয় হল। আবার ভাবলুম, দূর ছাই, মাঝপথ থেকে যদি বাড়ি ফিরি—আর আমার আসা হবে না। তা বাড়ি আর ফিরলুম না। কাছের জিনিস দেখতেই অসুবিধে বেশি। চশমা না থাকলেও চলে যাবে। একটু না হয় সাবধানে হাঁটব।"

মামা পালকটা ডান কান থেকে বাঁ কানে নিলেন। বললেন, মিশিরের দোকানে পৌঁছেও গেলাম কোনো রকমে। আমায় দেখে কত আহ্লাদ করল মিশির। পুরনো খদ্দের। তার বাবার আমলের। রাবড়ি দিয়ে বলল, 'বড়বাবু', দোকানেই খেয়ে নিন, খুরি হাতে কেন ঘুরবেন! কথাটা মন্দ বলে নি সে। রাবড়ি খেয়ে দাম মিটিয়ে ফিরছি, কোথ থেকে এক টেম্পো এসে মারল ধাক্কা। কলকাতায় তোরা এ সব কী জিনিস যে আমদানি করেছিস? মিনিবাস, টেম্পো, স্কুটার। গবরমেণ্টকে বলিহারি! মানুষ মারার যত কল সব এনে কলকাতায় জড় করেছে। ঘেন্না ধরিয়ে দিল।

মামার দুই কান চুলকোনো হয়ে গিয়েছে। পালকটা রেখে দিলেন কৌটায়। মামাদের কাজের লোক বুড়ো মদন এসে এক কাপ চা দিয়ে গেল আমায়।

মামা বললেন, টেম্পোর ধাক্কা খেয়ে আমি মাটিতে ছিটকে পড়লাম ট্রাম রাস্তায়। গেল গেল রব তুলল লোকে। আমি ভাবলাম, যাক্—অক্কাই পেলাম। কিন্তু রাখে হরি মারে কে? অক্কার কোনো চিহ্ন নেই। বেঁচে গিয়েছি। দুটো লোক আমায় ধরাধরি করে রিক্শায় তুলে দিল। বলল, দাদু—জোর বরাত, বেঁচে গিয়েছেন। যান, একটু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বাড়ি যান, শক্‌টা সামলে নিন।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম লম্বা করে। এ বাড়ির চায়ের কোয়ালিটিই আলাদা। পেটে গেলে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে।

মামা হাই তুললেন। বললেন, 'তারপর কী হলো শোন। রিকশাওলা আমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল। নগদ দু টাকা গচ্চা। ভাবলাম, এলামই যখন, একটু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে যাই। খুঁজে খুঁজে নিরিবিলি একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি—কোথা থেকে একটা লোক এসে পাশে বসল। বসেই দেশলাই চাইল। লোকটাকে ভাল ঠাওর করতে পারছিলাম না। দিলাম দেশলাই।...লোকটা বিড়ি ধরাল। আজকাল বিড়ি বড় একটা কেউ খায় না। বিরক্তই হচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই লোকটা আলাপ জুড়ে দিল।'

কথায় কথা বাড়ে। আমি বললুম, 'মশাইয়ের পরিচয়?'

লোকটা বলল, 'আমার নাম বিচ্চু। বিচ্ছু নয়। বিচ্চু।'

'বিচ্চু? ওটা কি বিচ্ছু থেকে?'

'আজ্ঞে না। আসল নামটা বিবিৎসু।'

'ও! তা কী করা হয়?'

'বিশেষ কিছু নয়, অর্জুনের হেয়ার ড্রেসার।'

লোকটার কথা শুনে আমি থ। অর্জুনের হেয়ার ড্রেসার মানে? লোকটা পাগল নাকি? ভাল করে লোকটাকে দেখলাম। একেবারে মড়াখেকো চেহারা। মাথার চুলটা কিন্তু বাবরি টাইপের। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। বয়েসই বা কী এমন! বড়জোর ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। চল্লিশের বেশি হতেই পারে না। আমার সঙ্গে রসিকতা করছে, নাকি গাঁজা টেনেছে?

আমারও কেমন রসিকতার সাধ জাগল। বললাম, 'অর্জুনের চুল ছাঁটা তো একটা মস্ত বড় কাজ। অত বড় বীর। তা মশাই কি শুধুই অর্জুনের চুল ছাঁটেন? যুধিষ্ঠির, ভীম—মানে পাঁচ ভাইয়ের নয়?'

বিচ্চু আমার কথা শেষ হতে না হতেই বলল, 'চুল ছাঁটা বলবেন না, বলুন হেয়ার ড্রেসার। আমি কি সেলুনে নাপিতগিরি করি?'

বুঝলাম বিচ্চুর মানে লেগেছে। বললাম, 'সরি। তা মশাই, অর্জুন-টর্জুনের কাল তো কবেই কেটে গিয়েছে। আপনি এখনও টিঁকে আছেন?'

বিচ্চু আমার দেশলাইটা ফেরত দেয় নি। তার হাতেই ছিল। নিভে যাওয়া বিড়িটা আবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'কেন থাকব না? আপনি নেই?'

'আমি?'

'ওই তো মজা, দাদু। আগে ভাবুন আপনি কোথায় আছেন, তা হলেই ধরতে পারবেন আমি কোথায় রয়েছি।'

বিচ্চুর কথাটা আমার মাথায় ঢুকল না। বললাম, 'কেন, আমি তো গঙ্গার ঘাটে বসে আছি। কাছেই নিমতলা।'

বিচ্চু ফিকফিক করে হাসল। বলল, 'জমিয়েছেন ভাল। তা খানিকটা আগে টেম্পোর তলায় পড়েছিলেন না? মাথার ঘিলু রাস্তায় গড়াচ্ছিল, মনে আছে?'

'হাঁ, কিন্তু বরাত জোরে বেঁচে গেলাম যে!'

'বেঁচে গেলেন? না, মরে গেলেন?'

'ধ্যাত, মরব কেন! মরলে কি কতকগুলো রাস্তার ছেলে এসে আমায় রিক্‌শায় তুলে দেয়!'

বিচ্চুর সেই একই রকম হাসি। বলল, 'দাদু, ওই আনন্দেই থাকুন। আপনার কী হয়েছে আপনি জানেন না। আপনি মারা গেছেন। রাস্তায় পড়েছেন আর দুধের বোতল হাত থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙে যেমন দুই দিকে ছিটকে যায়—আপনার ঘিলুও ছিটকে গেছে।'

বলে কি লোকটা? বেটা নিশ্চয় গাঁজাখোর। জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলছে। চটে গিয়ে বললাম, 'ঘিলুর ব্যাপারটা পরে হবে। আগে রিক্‌শার ব্যাপারটা হোক। মরা মানুষকে কেউ রিক্‌শায় তুলে দেয়?'

বিচ্চু বলল, 'আগে দিত না, এখন দেয়। আমাদের স্বর্গে অ্যাম্বুলেন্স আর কুলোতে পারছে না। এত মরছে—এত মরছে রোজ, এক কলকাতাতেই গণ্ডায় গণ্ডায়। তার ওপর অ্যাম্বুলেন্স বিগড়ে বসে আছে অনেকগুলো। আমরা আজকাল রিক্‌শার ঠিকে নিয়েছি। গাড়ির কলকব্জার দাম অনেক। জাল স্পেয়ার পার্টস। যমরাজ রেগে গিয়ে রিক্সার হুকুম করলেন। আজকাল আমরা রিক্সা দিয়েই কাজ সারছি।'

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিল। কী সর্বনাশ, আমি মরে গিয়েছি। লোকটা বলছে কি? তামাশা করছে? হায় হায়, তোর মামি যে হাঁ করে বসে থাকবে! আমি, বললুম, 'আমি তাহলে এখন কোথায়?'

'স্বর্গে।'

'তুমি?' লোকটার ওপর চটে যাওয়ায় মুখ দিয়ে তুমি বেরিয়ে গেল।

'আমিও স্বর্গে।'

'ফাজলামি হচ্ছে! সামনে গঙ্গা—স্বর্গে গঙ্গা আছে?'

'দাদু, আপনার এখনও মর্ত্য-মর্ত্য ভাবটা যায় নি। সামনে গঙ্গা নয়, ওটা বৈতরণী।'

বড্ড রাগ হল। বললাম, 'দেখো হে ছোকরা, আমার সঙ্গে ফাজলামি মারতে এসো না। স্বর্গ একেবারে হাতের মোয়া! তুমি আমায় গবেট পেয়েছ?'

বিচ্চু হাত জোড় করে বলল, 'ছি ছি দাদু, আপনার সঙ্গে আমি ফাজলামি করব কেন? যা সত্যি, তাই বলছি। আপনি এখন স্বর্গে। এতে আপনার আফশোসের কী আছে? আমিও তো রয়েছি। খারাপ আর কি আছি বলুন!'

লোকটার কথা শুনে কেমন সন্দেহ হল। বললাম, 'তুমি এখানে কী করো?

'কী আর করব! যা কাজ তাই করি।'

'অর্জুনের চুল ছাঁটো?'

'আবার সেই এক কথা। হেয়ার ড্রেসার বললাম না!'

'একটু বুঝিয়ে বলো।'

'বুঝিয়ে বলবো? আচ্ছা ধরুন, অর্জুন বৃহন্নলার বেশ ধরে রয়েছে, তার হেয়ার ড্রেসটা কে করবে, আমাকে করতে হয়। ধরুন, অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লড়ছে, লড়ার সময়ের হেয়ার ড্রেস, সেটাও আমাকে করতে হয়। কর্ণর সঙ্গে অর্জুনের যখন যুদ্ধ হয় তখন অর্জুনের চুলগুলোকে একটা স্পেশ্যাল কায়দায় ফাঁপিয়ে রাখি। দেখলেই মনে হবে, রেগে টং। তারপর ধরুন মহাপ্রস্থান। অর্জুনকে একেবারে সাধুসন্ন্যাসীর মতন করে দিই।'

কিন্তু বিচ্চুবাবা, এ সব তো অতীত। এখন তোমার অর্জুন তো খায়-দায় ঘুমোয়। তাই না?

বিচ্চু হেসে বলল, 'কী যে বলেন দাদু, অতীত আর কোথায়! এখনও ওই একই চলছে। আজ পানাগড়, কাল ডোমজুড়, পরশু বালুরঘাট, তরশু মাথাভাঙা···। ফেড্ আপ্, মাসে মাত্র সাতাত্তর টাকা মাইনে, রোজ পঞ্চাশ পয়সা জলপানি। খাওয়া-দাওয়াটা অবশ্য ফ্রি। সিজন্ যে ক'মাস কাজ আছে—সেই সময়টা। অন্য সময় নিজের ভাত নিজে রাঁধো।'

কেমন যেন ধাঁধা লাগল। বললাম, 'তুমি কি···মানে···'

কী সর্বনাশ, আমি মরে গিয়েছি। [পৃঃ ৩৬৭

'মানে-টানে সহজ, দাদু। আমি যাত্রাদলে আছি। এই কাছেই তো চিৎপুর। আমাদের দলের নাম হল 'ঈশ্বরী অপেরা'। ধর্মের বই ছাড়া আমরা করি না। আমাদের মালিক বলেন, দেশে আবার ধর্মভাব আনতে হবে। ধর্মই সব। আমাদের পাঁচটা পালা শুধু অর্জুনকে নিয়ে।'

ওর কথাবার্তা শুনে ধড়ে প্রাণ এল। যাক বাবা, সত্যি সত্যি স্বর্গে আসি নি। বললাম, 'তা হ্যাঁ হে বিচ্চু, তোমার এমন একটা উদ্ভট নাম হল কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিচ্চু বলল, 'দাদু, দুঃখের কথা আর বলবেন না। ছোকরা বয়েসে যখন এই লাইনে আসি, আমাকে বিবিৎসু বলে একটা পার্ট দেওয়া হয়েছিল। তখন ভীমের পার্ট করতেন হাতিবাবু। হাতির মতনই চেহারা। রোজই সেই হাতিবাবু যাত্রার যুদ্ধে আমায় মাটিতে ফেলে বুকের ওপর পা রেখে হা-হা করে হাসতেন। আমার বার দুই বুকের হাড় ভেঙে গেল। বিবিৎসুর পার্ট আর করতাম না। ওই থেকে মুখে মুখে বিচ্চু হয়ে গিয়েছি।'

বড় মায়া হল বিচ্চুর জন্যে। আহা রে, কী কষ্টের জীবন!

বিচ্চুই বলল, 'উঠুন দাদু, রাত হচ্ছে। এই জায়গাটা আর ভাল নয়। চলুন আপনাকে রিক্শায় তুলে দিই।'

'আবার কোন রিক্শায় তুলবে?'

'না না, ভাববেন না, বাড়ি যাবার রিক্শায় তুলে দেব। যাবেন কোথায়?'

'লেবুবাগান।'

'যাব একদিন।'

'এসো।'

দু'জনে উঠে হাঁটতে হাঁটতে ক'পা এগিয়েছি, বিচ্চু বলল, 'দাদু, আপনার কোন্টা? মানে গাঁজা চরস, না···'

'আমার আফিং। তোমার?'

নিজের কান মললো বিচ্চু। বলল, 'আমি একটু—ওই—মানে কলকে···।'

'বুঝেছি।'

বিচ্চু একটা রিক্শা ধরে আমায় তুলে দিল। বলল, 'সাবধানে যাবেন দাদু।'

গল্পটা শেষ করে নেবুমামা বললেন, 'বিচ্চুর জন্যে মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে রে জিতে। বেচারীর কী কষ্ট বল তো! অর্জুনের হেয়ার ড্রেস করেই জীবন কাটাতে হবে। নিকুচি করেছে তোর অর্জুনের।'

———

জুতোপরা বিড়াল

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

কোন এক কালে শহরের অদূরে এক যন্ত্রচালকের বাস ছিল। তার থাকার মধ্যে ছিল তিনটি ছেলে আর একটি শস্যপেষণ যন্ত্র, একটি গাধা এবং একটি বিড়াল। সে মাঝে মাঝে শহরে আসতো, রাজবাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াতো এবং ভাবতো, রাজার আর কি চিন্তা—তাঁর এতো ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলত, যা নিজের ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেও ছেলেদের প্রত্যেকেই অনেক সম্পদের অধিকারী হবে। কিন্তু সে নিজে কি যে দেবে তার ছেলে তিনটিকে, তা নিয়ে তার ভাবনার অন্ত ছিল না। আর ক্রমশই বয়সের ভারে অচল হয়ে পড়ায় সেটাই ছিল তার একমাত্র চিন্তা।

এর মধ্যে হঠাৎ ঐ শস্যপেষণ যন্ত্রচালক মারা গেল। তিন ছেলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে নিলো যে তাদের বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী বড়ো ভাই নেবে বাপের শস্যপেষণ যন্ত্রটি, মেজো ভাই পাবে বাড়ির পালিত গাধাটি এবং ছোট ভাই মালিক হবে পোষা বিড়ালটির।

এই ভাগ-বাটোয়ারার পর ছোট ভাই ভাবতে লাগলো, বাবার ব্যবস্থা তো মানতেই হবে, তবে যন্ত্র দিয়ে এবং গাধা দিয়ে তার দুই দাদা ব্যবসা করতে পারবে কিন্তু বিড়ালটা

দিয়ে সে কি করবে? বিড়ালটার চামড়া বাজারে নিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে তার কয়েকদিনের খরচ চালাতে পারবে এইমাত্র। তা ছাড়া বিড়ালটাকে দিয়ে তার আর কোনো উপকারই হবে না।

যন্ত্রচালকের ছোট ছেলের পায়ের কাছে অনেকক্ষণ ধরেই বসেছিল বিড়ালটা। তার প্রভুর মনের ভাব বুঝতে পেরে সে বলে উঠলো ঃ

আমার চামড়া বিক্রি করে
কি আর মূল্য পাবে,
আমার কথা শুনলে তুমি
রাজাই বনে যাবে।

বিড়ালের এই অদ্ভুত কথায় সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেলো ছোট ভাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে সব সময় তার বিড়ালের কথামতো চলতে সে এক কথায় রাজীও হয়ে গেলো। কারুর কথামতো চললেই যদি রাজা হওয়া যায় তা হলে তা মেনে না নিলে সেটা তো বোকামিই হবে। সেভাবে চিন্তা করেই ছোট ভাই বিড়ালকে তার কথা দিয়ে দিলো, তার নির্দেশমতোই চলবে বলে। সঙ্গে সঙ্গেই বিড়ালের আদেশ হলো, 'আমাকে যদি এক্ষুণি এক জোড়া খুব মজবুত জুতো এবং একটি খুব ভালো ব্যাগ এনে দাও, তা হলে তোমার কপাল খুলে যাবে।'

এই কথা কয়টি বিড়ালটা বললে ভারি সুন্দর একটি ছড়ায় এবং তাও অতি মিষ্টি সুরে ঃ

এক্ষুণি নিয়ে এসো
এক জোড়া মজবুত জুতো,
আর এক ভালো ব্যাগ
থাকে যেন সাথে ফিতে-সূতো।
তাতেই তোমার খুলবে কপাল,
দেখো শুধু চালছি কি চাল।

আদেশের পর একটুও সময় নষ্ট না করে ছোট ভাই দৌড়ে গিয়ে পছন্দসই জুতো আর ব্যাগ নিয়ে এলো। বিড়াল জুতো জোড়া পরলো এবং ঠিক ফিট করলো কি না তা ভালো করে দেখেও নিলো। তারপর কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে ঐ পাড়ারই খরগোশদের বাসার দিকে রওনা হয়ে গেল। সে বাসায় গিয়েই ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রেখে বিড়ালটা এমনভাবে ঘাড় কাত করে বসে রইলো, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে মরেই গেছে।

তা ভেবেই কিছুক্ষণ পর একটা খরগোশ গুটিগুটি এগিয়ে এলো এবং বিড়ালটা বেঁচে নেই ধরে নিয়েই পাশের ব্যাগটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিড়ালেরই রাখা ভূষি এবং বাঁধাকপির পাতা খেতে শুরু করে দিলো।

এই না লক্ষ্য করে বিড়ালটাও সুযোগ বুঝে ব্যাগের মুখটা চটপট ফিতে দিয়ে বেঁধে ফেললো। খরগোশটা অতি সহজেই ধরা পড়ে গেলো।

সেদিনই বিড়াল মশাই এক কাণ্ড করে বসলো। সে সন্ধ্যেবেলায় শহরে চলে গেলো। শহরে পৌঁছেই সরাসরি একেবারে রাজপ্রাসাদে যেয়ে হাজির হলো তার ঐ বিচিত্র সাজে। প্রাসাদের গেটে এসেই সে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো।

বিচিত্র পোশাকের বিড়ালটার সাহস দেখে তলোয়ারধারী দারোয়ান তো একেবারে অবাক। প্রাসাদে ঢুকতে চাওয়া মাত্রই বিড়াল মশাইকে বাধা দিয়ে দারোয়ান বলে ঃ

বলতে হবে আগে কারণ,
নইলে রাজার কাছে যাওয়া বারণ।

বিড়ালটা রেগে যায় দারোয়ানের কথা শুনে। সে চড়া স্বরে কড়া কথায় তাকে জানিয়ে দেয় ঃ

রাজারই আছে দরকার,
তাইতো হেথায় আসা আমার ;
না যেতে দাও যাচ্ছি চলে,
নমস্কার, নমস্কার !

এই বলে পিছন ফিরে চলা শুরু করার আগেই অনেক সাধ্যসাধনা করে বিড়াল মশাইকে দারোয়ান রাজার কাছে নিয়ে হাজির করলো।

রাজদরবার চলছিল তখন। বিড়ালটা রাজার পায়ের কাছে পৌঁছেই কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামালো। তারপর ব্যাগটার মুখ খুলে খরগোশটাকে বার করে রাজার সামনে রেখে বললে ঃ

শুনুন মহারাজ,
কেরাবাসের মার্কুইস
আপনাকেই এ উপহার
পাঠিয়ে দিলেন আজ।

রাজা খুবই খুশি হয়ে সুন্দর খরগোশটিকে গ্রহণ করলেন এবং সানন্দে এই আদেশ ঘোষণা করলেন, এই বিড়ালকে যেন সব সময়েই প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। তার কাছে কোন কারণ জানতে চাওয়া বা কৈফিয়ত চাওয়া চলবে না।

এই রাজকীয় আদেশ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরবারে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো কিছুক্ষণের জন্যে। কারুরই বুঝতে বাকি রইলো না যে বিড়াল হলেও এ নিশ্চয়ই মস্ত এক কেউকেটা।

বিড়ালটা বেশিক্ষণ রাজদরবারে না থেকে রাজার কাছ থেকে সবিনয়ে বিদায় নিয়ে গেলো। গেট পেরিয়ে যাবার সময় এমন কটমট করে সে তাকালো দারোয়ানের দিকে যে সে বেচারা ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেলাম জানিয়ে বললে ঃ

আসুন বিড়াল মশাই !
ঘনঘনই আপনার যেন দেখা পাই।

এর উত্তরে বিড়ালটা গুরুগম্ভীর ভাবে বলে যায়ঃ

ঘনঘন নয় ভাই,
বলো রোজই আসা চাই;
নয়কো তোমার, নয়কো আমার
এ যে রাজারই দরকার!

এ জবাবের পর আর কি কোনো কথা চলে? বিড়ালও এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তার কাজ হাসিল করার দিকে এগিয়ে চলতে থাকে।

রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দির বাইরে অর্থাৎ চারদিকে ঘেরা রাজ-উদ্যানের বাইরে রয়েছে এক বিশাল অরণ্য। রাজা তাঁর খেয়াল খুশিমতো সে বনে মৃগয়ায় যান। শিকার মিলুক কি না মিলুক, দলবল নিয়ে বছরে দু'চার বার অরণ্য ভ্রমণে বেরিয়ে হইচই করে আসেন।

সেই অরণ্যেই রোজ শিকারে বেরুতে লাগল বিড়াল মশাই। আর রোজই কিছু না কিছু শিকার করে সন্ধ্যা নাগাদ রাজার কাছে যেয়ে গড় হয়ে বলেঃ

মার্কুইস কেরাবাস
আমি তার খোদ দাস,
রাজাকে এ উপহার
তিনি পাঠালেন,
হবে খুবই উপকার
যদি গ্রহণ করেন।

সত্যি সত্যি এভাবেই এক ঢিলে দু'পাখি মারার ব্যবস্থাটি করে নিলো বিড়াল মশাই। রোজই এভাবে তার শিকার রাজাকে উপহার দিয়ে তাঁকে যেমন সে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসছে, তেমনি নিজেও সে কোনো দিন রাজবাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে যেতো না, রাজার দান হিসাবে কিছু না কিছু উপহার হাতে নিয়েই বেরুতো এবং সেগুলি তার প্রভুকে অর্থাৎ পরলোকগত সেই শস্যপেষণ যন্ত্রের মালিকের ছোট ছেলের হাতে তুলে দিয়ে খুশী করতো।

একদিন বিড়াল মশাই কেন যেন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে হঠাৎ বেশ গুরুগম্ভীর-ভাবে এবং কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠেই তার প্রভুর ওপর এক মজার হুকুম জারী করে বসলোঃ

শুনুন প্রভু শুনুন,
যা বলবো তাই করুন।
ভাগ্য আপনার খুলছে,
এখন ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে।

এতো ভণিতা না করে বলো না কি আমাকে করতে হবে—ছোট ভাই একটু বিরক্ত হয়েই বিড়ালটাকে বলতে গিয়ে উত্তর পেলো ঃ

কিছুই নয় কিছুই নয়,
কোনো তাতেই নেইকো ভয়।
রাজকন্যাকে নিয়ে রাজা
কাল দুপুরে নদীর দিকে যাবেন,
তার আগেই আপনি গিয়ে
স্নানটা সেরে নেবেন।
থাকতে হবে নদীর জলেই,
কাজ সারবো মন্ত্র বলেই।
আপনি চুপটি রবেন,
একটিও না কথা যেন কবেন।
ঘটনা সব ঘটে যাবে,
বিস্মিত না হবেন।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরেই বিড়ালের নির্দেশমতো তার প্রভু নদীর ঘাটে চলে গেলো এবং স্নান সেরে নদীতেই বুক-জলে দাঁড়িয়ে থাকলো। কোথা থেকে বিড়ালটা হঠাৎ সেখানে এসে তার প্রভুর পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যত্র সরিয়ে রেখে নিজে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকলো।

খানিক বাদেই দূর থেকে দেখা গেলো রাজা ও রাজকন্যাকে নিয়ে রাজবাড়ির গাড়ি নদীর ঘাটের দিকেই আসছে। বিড়ালটা তখন করলো কি, ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে গিয়ে একেবারে কাঁদতে শুরু করে দিলো ঃ

বাঁচান রাজা বাঁচান,
আমার প্রভু মার্কুইস
প্রাণটা না হারান,
এমনি জোর চলছে ইস
নদীর স্রোতের টান,
বাঁচান রাজা বাঁচান!

বিড়ালটার কথা শুনেই রাজা বুঝতে পারলেন, এই সেই জুতো পরা বিড়াল রোজ সন্ধ্যায় তাকে গিয়ে যে নতুন নতুন উপহার দিয়ে আসে, তার অনুরোধ কি কখনো উপেক্ষা করা যায়? কখ্খনো না।

রাজা তাই তক্ষুণি তাঁর লোকজনদের হুকুম দিলেন বিড়ালের প্রভুকে রক্ষা করার জন্যে, নদীর স্রোতে সে যেন ভেসে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। সঙ্গে সঙ্গেই রাজার একদল অনুচর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিড়ালের প্রভুকে তীরে তুলে আনতে।

ঠিক সে সময়েই বিড়ালটা কেঁদে কেঁদে রাজাকে বলছিল ঃ

বলবো কি আর রাজা মশাই,
বলার মতো আর কিছু নাই।
আমার প্রভু ঐ মার্কুইস,
কি শাস্তিই না পেলো ইস।
দস্যুর হাতে পড়ে,
প্রভুর আমার সব কিছুই
ওরা নিয়েছে লুঠ করে!
এমন কি ওর প্যান্ট-কোট,
তাও হয়ে গেছে লুঠ।
কি পরবে যে নদী থেকে উঠে
তারও কিছু ঠিক নেইকো মোটে।

সে কি কথা! রাজা অবাক হয়ে গেলেন শুনে। একজনকে রাজপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন নতুন এক সেট রাজ-পোশাক নিয়ে আসার জন্যে।

রাজার হুকুম তামিল হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গেই। দেখতে দেখতে এক সেট রাজপোশাক এসে গেলো রাজবাড়ি থেকে। ততক্ষণে রাজার লোকজনেরা তুলেও এনেছে নদী থেকে বিড়ালের প্রভুকে। নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে নিয়ে বিড়াল তার প্রভুকে 'মার্কুইস অব কেরাবাস' বলে রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

রাজপোশাক পরা মার্কুইসের সুন্দর চেহারাটি দেখে খুবই ভালো লাগলো রাজার। রাজকন্যাকে তিনি মার্কুইসের সঙ্গে নদীর তীরে বেড়াতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজেও দলবল নিয়ে তাদের পিছে পিছে বেড়াতে বেরুলেন নদীর তীর ধরে।

বিড়ালটা কিন্তু রাজকন্যা এবং মার্কুইসের আগে আগেই কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে জুতো পায়ে গটগট করে ছুটে চলে গেলো মস্ত বড়ো একটা খড়ের খামারে। সেখানে পৌঁছেই সেখানকার কর্মরত সব শ্রমিকদের ডেকে বললে ঃ

শোনো শোনো বন্ধুগণ,
রাজামশাই আসছেন ;
তোমরা জানো বিলক্ষণ
তিনি কত কি যে ভাবছেন।

জানতে চাইলে এ খামার কার,
বলবে সবাই সমস্বরে
এ সবই তো সেই একজনার
কেরাবাসের মার্কুইস—
এই পরিচয় যার।
এ যদি না বলতে পারো
মুণ্ডু রাখা হবে কিন্তু ভার।

এই বলেই বিড়াল মশাই এগিয়ে চললো খামারের মজুরদের ভয়ের মধ্যে ফেলে রেখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা তাঁর লোকজনদের নিয়ে ঐ খামারে এসে হাজির। ঐ বিরাট খামারটি দেখে রাজা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা সবাই খুব খুশি। কর্মীদের ডেকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এ খামার কার? বিড়ালের শেখানো বুলিতেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজ নিজ গর্দান রক্ষা করতে পারলো বলে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এর কিছু আগেই রাজা তাঁর কন্যা ও মার্কুইসকে তাঁর শকটে তুলে নিয়েছিলেন। পাশে বসা মার্কুইসকে তিনি বললেন, 'মার্কুইস, তোমার এই খড়ের খামারটি দেখে সত্যি আমার খুব ভালো লাগলো।' মার্কুইস সবিনয়ে একটু মাথা নীচু করে হাসলো।

ততক্ষণে বিড়াল মশাই সামনের এক শস্যক্ষেতে এসে হাজির হয়ে গেছে। প্রচুর ফসল হয়েছে সেই ক্ষেতটায়। অনেক মজুর সেখানে তখন কাজ করছিল। তাদের ডেকে ঠিক আগের বারের মতোই গর্দান যাবার ভয় দেখিয়ে বললে, এই ক্ষেতের মালিক কে, তা' রাজামশাই জানতে চাইলেই তারা যেন কেরাবাসের মার্কুইসের নাম বলে দেয়। তা না হলে তাদের কেটে টুকরো টুকরো করা হবে। কর্মীরা সব ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়লো বিড়ালের কথা শুনে।

এদিকে বিড়ালের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই রাজামশাই সেই শস্যক্ষেতে এসে হাজির সবাইকে নিয়ে। সবারই চোখ জুড়িয়ে গেলো মাঠের চমৎকার সবুজ ফসল দেখে। রাজামশাই ভারি খুশিও হলেন মাঠের মজুরদের কাছে জেনে যে এই সুন্দর ক্ষেতটিও মার্কুইসের।

রাজা মার্কুইসের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'মার্কুইস, ভারি চমৎকার লাগছে তোমার এই সবুজ ফসলের হাসিতে ভরা শস্যক্ষেতটি দেখতে। তুমি ভাগ্যবান।' মার্কুইস এবারও বিনীতভাবে মাথা নীচু করলো।

বিড়াল মশাই এদিকে হাঁটতে হাঁটতে এক দুর্গের কাছে এসে পড়লো। সেই দুর্গে এক দুষ্টু রাক্ষস বাস করতো। আশপাশের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রের মালিক ছিল এই ভীষণ রকমের দুষ্টু রাক্ষসটি। সে খুবই নিষ্ঠুর এবং লোভী ছিল বলে তার ভৃত্যের দল ও কর্মচারীরা তাকে অত্যন্ত ভয় পেতো। যে কোনো ছুতোনাতায় সে চাকর-বাকরদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলতো। অথচ রাক্ষসকে কেউ মারতে পারতো না, কারণ যে কোনো মুহূর্তে

রাক্ষস অন্য যে কোনো জন্তু হয়ে যেতে পারতো। অতি সাহসী লোকও মনে করতো, হিংস্র বাঘ, সিংহ বা হাতির সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না। তাই তারা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই চুপচাপ থাকতো।

বিড়ালটা তার অভিনব সাজে দুর্গের দরজার সামনে এসে রক্ষীদের খুবই ভয় দেখালো তার দু'পাটি দাঁত বের করে। তারপর পাশ কাটিয়ে সে সরাসরি চলে গেল সেই হলঘরটায়, যেখানে সেই নির্দয় রাক্ষসটা বসেছিল।

রাক্ষস বিড়ালটাকে দেখামাত্রই চোখ লাল করে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে হে, কোন্ সাহসে তুমি আমার এই দুর্গের ভেতরে ঢুকেছ?'

বিড়াল খুবই বিনয় সহকারে জবাবে বললেঃ

হে প্রভু মহাশয়,
আমি দীন অতিশয়;
এসেছি পৃথিবী ভ্রমণে,
ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে
আপনার নাম আছে গেঁথে মনে।
শুনেছি আপনি যে কোনো সময়
যা ইচ্ছে হন যেই মনে হয়
বাঘ সিংহ হাতি, সত্যি কি তাই?
আমার কিন্তু বিশ্বাস তাতে নাই।

কি বললে, 'আমার এ ক্ষমতায় তোমার বিশ্বাস নেই?' বলেই রাক্ষসটা তক্ষুণি একটা সিংহ হয়ে গিয়ে ভীষণ গর্জন শুরু করলো। বিড়ালটাও সেই মুহূর্তেই দুর্গের ওপরে বেয়ে উঠলো। কতক্ষণ বাদে সিংহটা যখন আবার রাক্ষস হয়ে গেলো, বিড়ালটা ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেমে এসে তাকে বললেঃ

ক্ষমা করুন হে মহারাজ,
আপনার অসীম ক্ষমতা;
তবে একটা কথা
আমার মনে হয়,
আপনি বড়ো জন্তুই হতে পারেন,
ছোট জন্তু নয়।

বিড়ালের এ কথায় আত্মসম্মানে খুবই আঘাত লাগলো। সে জোরের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আবার তুমি আমার ক্ষমতায় সন্দেহ করছো? দেখো তাহলে আমি ছোট্ট একটা ইঁদুর হতে পারি কি না।' বলেই রাক্ষসটা যেই একটা ইঁদুর হয়ে গেলো, অমনি বিড়ালটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খতম করে ফেললো।

এভাবে কাজ হাসিল করে নিয়ে বিড়াল রাক্ষসের সব লোকজনদের ডেকে জানিয়ে দিলেঃ

আর ভয় নেই আর ভয় নেই
রাক্ষস খতম
এতকাল যে তোমাদের ছিল
সাক্ষাৎ যম।
নতুন রাজা আসছে এবার
খুবই ভালো লোক,
এ দুর্গটি মার্কুইসের,
কেরাবাসের—এ বললেই
থাকবে না আর কোনো দুঃখশোক।

বিড়াল তাদের এই বলে আবার ভয়ও দেখালোঃ

কেরাবাসের মার্কুইসের
এই দুর্গ—যদি তা না বলো,
জেনে রেখো প্রত্যেকের
মুণ্ডু চলে গেলো!

উরে বাপস্, এ যে দেখা যাচ্ছে রাক্ষসের চেয়েও এ জীব আরো বেশি ভয়ঙ্কর! রাক্ষসের লোকজনরা সব ভয়ে কুঁকড়ে গেলো বিড়ালের কঠোর মন্তব্যে। ভয়ে ভয়ে তারা কথা দিলো, সে যা বলবে, তারা তাই শুনবে এবং তার কথামতোই চলবে।

সেদিনই গোধূলি লগ্নে রাজামশাই তাঁর শকটে চড়ে কন্যা ও মার্কুইসকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দুর্গের সামনে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান গেট খুলে গেলো। দুর্গের সব কর্মচারী সারি বেঁধে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো।

বিড়াল মশাই সসম্মানে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললেঃ

হে রাজন্, আসুন স্বাগতম্,
আমাদের সৌভাগ্য কি কম!
কেরাবাসের দুর্গে হলো
আপনার পদার্পণ,
স্বাগত হে রাজন্!

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'এই বিরাট দুর্গটিও তোমার মার্কুইস! সত্যি সত্যি তুমি রাজপরিবারের সদস্য হবারই যোগ্য!'

এর পরে ঐ দুর্গেই খুব ঘটা করে এক ভোজের ব্যবস্থা হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর রাজা মশাই দেখলেন, তাঁর কন্যা ও মার্কুইস হাত ধরাধরি করে একধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে এবং মাঝে মাঝে কথা বলছে।

এই দেখে রাজার মন খুশিতে ভরে গেল। তিনি প্রস্তাব করলেন, মাকু´ইসের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হোক। মাকু´ইসের চেয়ে যোগ্যতর জামাই আর হতে পারে না, এ তাঁর দৃঢ় ধারণা। তাই এই শুভ লগ্নেই মাকু´ইসের এ কেল্লায় শুভ কাজটা হয়ে যাক, এই তিনি চান।

রাজকন্যা তাঁর বাবার প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হলেন। বিয়ে হয়ে গেলো। এ ভাবেই দীন-দরিদ্র শস্যপেষণ যন্ত্রচালকের ছোট ছেলে রাজা বলে স্বীকৃতি পেলো। তারপর থেকে নতুন রাজারানী সুন্দরভাবে তাঁদের নতুন রাজ্য চালাতে লাগলেন।

নতুন রাজারানীর প্রথম কাজই হলো যে বিড়াল মশাইয়ের বুদ্ধিতে তাঁদের রাজত্ব লাভ, তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা। তাকে রাজার প্রধান আমাত্য পদে নিযুক্ত করে বলে দেওয়া হলো যে তাকে ইঁদুর মেরে জীবন কাটাতে হবে না, সে রাজার হালেই খাবে-দাবে এবং আনন্দে দিন কাটাবে।

বিয়ে হয়ে গেলো।

এসব কথা শুনে বিড়াল মশাই একটু হেসে শুধু বললে ঃ

যা তোমাকে বলেছিলাম
তাই তো প্রভু হলো,
ইঁদুর মারার অভ্যাস মোর
কোথায় যাবে বলো!

সত্যি তাই। রাজার প্রধান আমাত্য হয়েও জুতো-পরা সেই বিড়ালটা আরো চটকদার পোশাক-পরিচ্ছদে সেজে থাকতে শুরু করলে বটে কিন্তু ইঁদুর মারার অভ্যাসটা তার থেকেই গেল। *

---

* একটি ফরাসী রূপকথা অবলম্বনে।

পাগলা মামার চার ছেলে
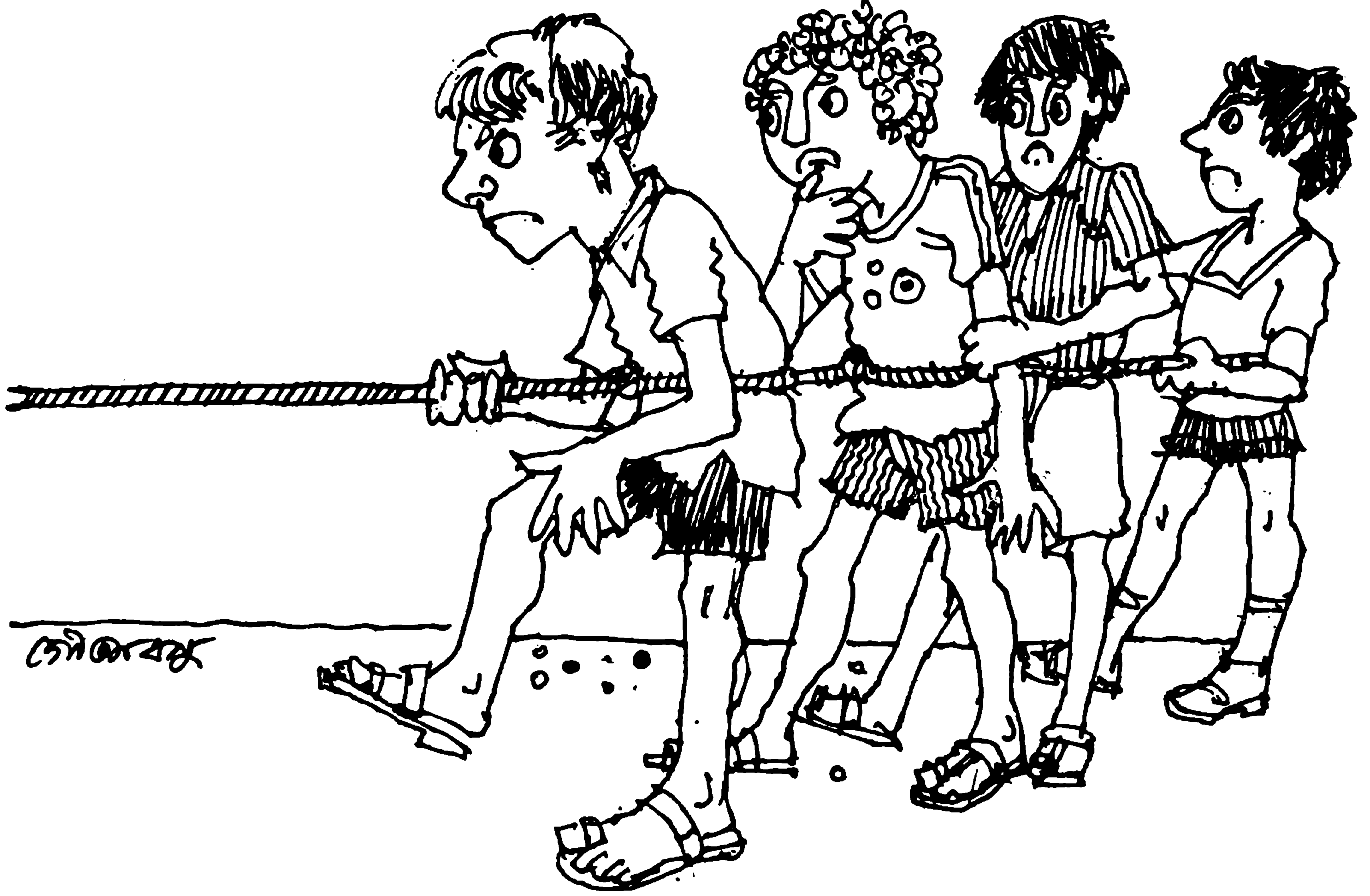
—প্রফুল্ল রায়

আমার সেজো মামার নাম পাগলচাঁদ সমাজপতি। এই একটা নামই তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। রাস্তায় বেরুলেই কেউ ডাকে, 'এই যে পাগলবাবু', কেউ ডাকে, 'এই যে পাগলচন্দ্র', কেউ বলে, 'পাগলাদা।'

একবার 'পাগল' শুনলে কার না মাথা খারাপ হয়ে যায়! উপায় থাকলে নামটা কবেই পাল্টে ফেলতেন সেজো মামা। কিন্তু ওটা তাঁর বাবা, মানে আমার দাদুর দেওয়া নাম। তা ছাড়া ম্যাট্রিক থেকে এম. এ. পর্যন্ত যত সার্টিফিকেট আর ডিগ্রি পেয়েছেন, সবগুলোতেই লেখা আছেঃ পাগলচাঁদ সমাজপতি। মনে অনেক দুঃখ থাকলেও তাই নামটা আর বদলানো যায় নি।

নিজের বেলা তো পারেন নি, তাই সাধ মিটিয়ে চার ছেলের নাম দিয়েছেন—প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতন, প্রলয়নাশন আর প্রলয়ঘাতন! অবশ্য ওদের একটা করে ডাকনামও আছে। আবু, টাবু, হাবু এবং পাবু।

সেজো মামা সগর্বে সেজো মামীকে বলেছেন, 'কেমন নাম দিয়েছি বল তো? ঐ নামের জোরে আমার ছেলেরা পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

সেজো মামী বলেছেন, 'তা হয়ত হবে। কিন্তু এতগুলো প্রলয় ঘরে এনে ঢোকালে! আমার তো ভয়ই করছে।'

মামীর ভয়টা যে মিথ্যে নয় তা পরে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিল। আমার চার মামাতো ভাইয়ের মতো এমন দুর্ধর্ষ বিচ্ছু ইরম্মদ ছেলে ভূভারতে খুব বেশি জন্মায় নি। নিজেদের নামের গুণেই কিনা কে জানে, বাড়িতে দিনরাত তারা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে যায়।

যদিও এই গল্পটা চারজন প্রলয়কে নিয়ে, তার আগে আমার সেজোমামা আর সেজোমামী সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

সেজো মামা টকটকে ফর্সা আর বেজায় মোটা। বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় মোটারা খুব ভাল মানুষ আর ঠাণ্ডা মানুষ হয়। আমার সেজো মামাও তাই। নাকের তলায় স্যার আশুতোষের মতো গোঁফ। সব সময় হাসিখুশি। সারাক্ষণ তাঁর পরনে থাকে পালিস-দেওয়া ঢলঢলে ফুলপ্যাণ্ট। শার্টের বোতাম লাগাতে, জুতোর ফিতে বাঁধতে আর দাড়ি কামাতে প্রায়ই ভুলে যান তিনি।

একটা ওষুধ কোম্পানিতে বড় চাকরি করেন সেজো মামা। সারা বছরই তাঁকে হিল্লি দিল্লী করে বেড়াতে হয়। এ মাসে যদি গৌহাটি যান, আসছে মাসে ভুবনেশ্বর, তার পরের মাসে জব্বলপুর বা এলাহাবাদ।

সে যাই হোক, ছেলেদের কীর্তিকলাপ দেখে সেজো মামার মতো ঠাণ্ডা মানুষেরও রক্ত একেক দিন মাথায় চড়ে যায়। হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'সব ক'টাকে বাড়ি থেকে বার করে দেব।'

সেজোমামী একেবারে সেজোমামার উল্টো। ভয়ানক রোগা। গায়ে মাংস টাংস নেই; শুধু হাড়। বারো মাস ভোগেন। মাপ নিলে মামার চারভাগের এক ভাগ হবেন। চার ছেলের জ্বালায় সারাক্ষণ পাগল হয়ে থাকেন। তার ওপর অসুখ বিসুখ তো আছেই। দুর্বল গলায় দিনরাত চেঁচিয়ে যান, 'এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে এমন কেউ কি নেই?'

সেজোমামী যতই চিৎকার করুন, প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতনরা গ্রাহ্যই করে না।

সেজোমামারা অনেকদিন শ্যামবাজারে ছিলেন। কিন্তু সেখানে বাড়িটা ছিল খুবই ছোট। মোটে আড়াইখানা ঘর; বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। পরশুদিন মামারা বাড়ি বদলে চেতলায় এসেছেন।

পুরনো আমলের এই একতলা বাড়িটা চমৎকার। পাঁচখানা বড় বড় ঘর। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পেছনে বাগান।

পরশু এসেই কাল অফিসের কাজে রাঁচী যেতে হয়েছে সেজোমামাকে। ফিরবেন সাতদিন বাদে। এ ক'দিন নতুন জায়গায় একা সেজো মামীকে ছেলেদের সামলে রাখতে হবে।

এখানে আসার পর পাশের বাড়ির বলাইবাবুদের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। আর সবাই অচেনা।

এবার আসল গল্পটা শুরু করা যেতে পারে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর মুখটুখ ধুয়ে আবু, টাবু, হাবু, পাবু, চার ভাই ডাইনিং রুমে গিয়ে খেতে বসেছে। সেজোমামী প্লেটে প্লেটে ডিম সেদ্ধ, কলা, রুটি মাখন আর এক গেলাস করে দুধ দিয়েছেন।

পাবু চামচ দিয়ে তার ডিমটা কাটতে যাচ্ছিল, হাবু চেঁচিয়ে উঠল, 'কাটবি না, কাটবি না, দাঁড়া—' ছোঁ মেরে পাবুর প্লেট থেকে ডিমটা তুলে নিজের ডিমের পাশে রেখে মেপে দেখল, তারটা একটু ছোট। অমনি হাত-পা ছুঁড়ে লাফালাফি শুরু করে দিল সে, 'আমাকে ছোট ডিম দিয়ে পাবুকে বড় ডিম দেওয়া চলবে না। ওকে আমি খুন করে ফেলব।' বলেই এক কামড়ে পাবুর ডিমের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল।

পাবুও হাত-পা গুটিয়ে থাকার ছেলে নয়। সে দুধের গেলাস ছুঁড়ে মারল হাবুর দিকে। পাবুর হাতের টিপ দারুণ। গেলাসটা হাবুর থুতনিতে গিয়ে লাগল।

এদিকে কলার মাপ নিয়ে আবু এবং টাবুর মধ্যে ধুন্ধুমার লেগে গেছে।

দেখতে দেখতে ডাইনিং রুমটা তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠল। হাতের কাছে যা পাচ্ছে, চার ভাই তাই তুলে ছুঁড়ছে। কামানের গোলার মত গেলাস, প্লেট, চামচ চারদিকে ছুটে যাচ্ছে।

সেজো মামী গালে হাত দিয়ে পাক্কা তিন মিনিট ছেলেদের কাণ্ড-কারখানা দেখলেন। তারপর চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'ওরে থাম লক্ষ্মীছাড়া হার্মাদেরা। থাম বলছি—'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কাচের গেলাস, কাপ প্লেট, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। মেঝেময় ডিম পাউরুটি মাখন আর দুধের স্রোত।

সেজো মামী দু হাত তুলে সেই পুরনো কথাটা করুণ মুখে আরো একবার বললেন, 'এই দস্যুদের হাত থেকে কেউ কি আমাকে বাঁচাতে পারে না?'

অদ্ভুত ব্যাপার। মামীর কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা কেউ যেন ধাঁই করে আবুর গালে বিরাশি সিক্কার একটা চড় কষাল আর সে ঠিকরে গিয়ে পড়ল ওধারের দেয়ালে। হাবু আর টাবুর মাথা দুটো আপনা আপনিই ঠুকে গেল; সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের কপালে মার্বেল গুলি গজিয়ে উঠল। তার পরেই দেখা গেল পাবুর কান দুটো অদৃশ্য হাতে কেউ মুচড়ে দিচ্ছে।

মুহূর্তে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ থেমে গেল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; অথচ তাদের মাথা গাল আর কানের দশা কে এমন করে ছাড়ল, বুঝতে না পেরে বেজায় ভয় পেয়ে গেল আবুরা। টুঁ শব্দটি না করে চার ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর স্কুলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত বাড়িটা শান্ত হয়ে রইল। চেতলায় আসার আগেই পাগলমামা চার ছেলেকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ থামায় সেজো মামী খুবই খুশী হয়েছেন। তবে ভয়ও পেয়েছেন যথেষ্ট। তাঁরা পাঁচজন ছাড়া অন্য কেউ ডাইনিং রুমে ছিল না। তা হলে কে ওভাবে চড় মারল, কান মুলল, মাথা ঠুকল? খুবই গোলমেলে ব্যাপার।

ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে সেজো মামী সোজা পাশের বলাইবাবুদের বাড়ি চলে গেলেন। ওরা কিছু জানলেও জানতে পারে। তেমন বুঝলে পাগলমামা ফিরে এলেই আবার বাড়ি বদলাতে হবে।

সকালবেলার ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেলেন সেজো মামী। সব শুনে বলাইবাবুর মা পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'এই কাণ্ড হয়েছে! কোন ভয় নেই!'

সেজো মামীর উদ্বেগ কাটে না। তিনি বললেন, 'বিপদ টিপদ হবে না তো?'

'আরে না না। বরং উল্টোটাই হবে।'

'কে আমার বাঁদর ছেলেগুলোকে টিট করল, বলতে পারেন?'

'দু-চার দিন থাকো, নিজেই বুঝতে পারবে। না পারলে বোলো; আমি বুঝিয়ে দেব।'

সেজো মামী বাড়ি ফিরে এলেন। বলাইবাবুর মা পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। ফলে মামীর দুশ্চিন্তাটা থেকেই গেল।

বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পর পাগলামামার চার ছেলে আবার স্বমূর্তি ধারণ করল। সকালের বেদম মারধোরের কথা তারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভুলে গেছে।

চার ভাই হাতাহাতি চালিয়েই যেতে লাগল।

চার ভাইয়ের শোবার জন্য চারখানা ছোট খাট রয়েছে। খাটগুলোর পায়ায় চাকা লাগানো। স্কুল থেকে ফিরেই জলখাবার খেয়েই খাট চারটে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে জোড়া লাগায় ওরা। তারপর ক্যারম বা লুডো খেলতে বসে।

আজ ওরা লুডো খেলছে। এক দলে আছে আজ পাবু আর আবু, অন্য দলে টাবু এবং হাবু।

খেলাটা ভালই চলছিল। হঠাৎ টাবু বাঁ হাতের কারসাজিতে একটা কাঁচা গুটি পাকিয়ে ফেলল। কিন্তু আবু পাবুর চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। তারা চিৎকার করে উঠল, 'চোট্টা চোট্টা—চোরামি করে খেলছে।'

টাবুরাও রুখে দাঁড়াল, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না। ওটা আমার পাকা গুটি।'

'মিথ্যুক চোর শয়তান—' বলেই লুডোটা উল্টে দিল পাবু।

তার পরেই চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মামী পাশের ঘরে ছিলেন; দৌড়ে এলেন এবং সরু গলায় চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'মরবি, এক এক করে তোরা একদিন নির্ঘাত শেষ হয়ে যাবি।'

মামীর কথা কারো কানেও ঢুকল না। চার ভাই হাতাহাতি চালিয়েই যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ চেঁচাবার পর ক্লান্ত হয়ে মামী তাঁর সেই পুরনো আর্জিটাই আরো একবার শোনালেন, 'কেউ কি এই হতচ্ছাড়াদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে না!'

কথা শেষ হবার আগেই তাজ্জব ব্যাপার। চারখানা খাট গড়গড়িয়ে চার দেয়ালে গিয়ে ঠেকল। কাজেই মারামারিটা তক্ষুনি বন্ধ হয়ে গেল।

সকালবেলার মতো চার ভাই ভয়ে সিঁটিয়ে রইল। ব্যাপারটা ক্রমশ খুব জটিল হয়ে উঠল।

মামীর কিন্তু ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, হাতের কাছে একটা দারুণ জিনিস পাওয়া গেছে। শুধু মুখ ফুটে একটু আর্জি জানালেই হল। মনে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে। দুরন্ত দুর্ধর্ষ ছেলেগুলোকে এতদিনে বশে আনতে পারবেন।

দুপুরের এই ঘটনার পর ঘণ্টা দুয়েক বেশ ভালভাবেই কাটল। তার পর যেই সন্ধে নামল, অমনি সেজোমামী চেঁচাতে শুরু করলেন, 'পড়তে বস রে, পড়তে বস রে—' কিন্তু প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতনদের দেখে মনে হল না, মায়ের কথা তাদের কানে ঢুকেছে।

অগত্যা সেজোমামী কড়িকাঠের দিকে মুখ করে করুণ গলায় বললেন, 'এমন কেউ কি নেই যে বজ্জাতগুলোকে কান ধরে পড়তে বসায়!'

ম্যাজিকের মত কাজ হয়ে গেল। কার যেন অদৃশ্য হাত কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে চার ভাইকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের তাকগুলোতে যেখানে ওদের বই থাকে, সেখান থেকে এর গ্রামার, ওর জ্যামিতি, তার ইতিহাস ধপাধপ এসে আবু টাবুদের সামনে পড়তে লাগল। তার মানে এক্ষুনি পড়া শুরু করতে হবে।

কিন্তু চার প্রলয় এমনই ঘাবড়ে গেছে যে কারো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কি যে করবে, কেউ ভেবে ঠিক করতে পারল না।

সেজো মামী ছাড়বার পাত্রী নন। হাতের কাছে দারুণ একটা অস্ত্র পেয়ে গেছেন; সেটা আবার কাজে লাগালেন। ওপর দিকে মুখ তুলে বললেন, 'দত্যিগুলো একদম পড়ে না; বছর বছর ফেল করে। কেউ কি এদের পড়িয়ে নিতে পারে না?'

বলা শেষ হল কি হল না, এক জোড়া বেত কোত্থেকে যেন ঘরের ভেতর এসে হাওয়ায় নাচতে লাগল। চার ভাই ভয়ে কাঠ হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে সপাং করে বেতদুটো টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল।

প্রলয়নাচন প্রলয়ঘাতনরা বুঝল, চুপ করে বসে থাকা চলবে না। চার ভাই ঘাড় গুঁজে গলা ছেড়ে পড়তে শুরু করল। আর বেতদুটো ঘরময় হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে তাদের পাহারা দিতে লাগল।

দশটা পর্যন্ত একটানা পড়াশোনা করে চারজন চুপচাপ খেয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন রাত্তিরে খাওয়া এবং শোওয়ার সময় ধুন্ধুমার বেধে যায়। আজ কিন্তু কিছুই হল না।

পরের দিন সকালে ডাইনিং রুমে খাবার দাবারের ভাগ নিয়ে আবার পঞ্চম পানিপথের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল। আজ লুচি হালুয়া দেওয়া হয়েছিল চার ভাইকে।

আবু টাবুর প্লেটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'টেবো আমার চেয়ে বেশী হালুয়া পেয়েছে।'

ওদিকে হাবু চেঁচিয়ে উঠেছে, 'আমি পানুর চেয়ে কম হালুয়া পেয়েছি।'

ছুঁড়বার জন্য চার ভাই যখন কাপ প্লেট তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সেই সময় সেজো মামী কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটা আবার বললেন, 'কেউ কি এই পাজীগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারে না ?'

তক্ষুনি কেউ যেন চার ভাইয়ের হাত থেকে কাপ প্লেট কেড়ে নিয়ে টেবলে সাজিয়ে রাখল এবং তাদের কান ধরে ফের চেয়ারে বসিয়ে দিল।

অগত্যা ট্যাঁ ফোঁ না করে প্রলয় নাচনেরা নিজের নিজের ভাগের লুচি-হালুয়া খেয়ে সোজা পড়ার ঘরে চলে গেল।

মামী ফের মুখ তুলে বললেন, 'আপনি কে জানি না। তবে আমার বড্ড উপকার করেছেন। এখন থেকে আমার চার ছেলের বাঁদরামো ঘুচিয়ে ওদের ভালো করে দিন।' বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পড়াশোনা করে চার ভাই স্নান করে খেয়ে বইয়ের ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

স্কুলে যাবার নাম করে বেরুলেও বেশির ভাগ দিন তারা স্কুলে যায় না। রাস্তায় ডাংগুলি খেলে কিংবা অ্যালজেব্রা কি বাংলা ব্যাকরণের বই বেচে সিনেমা দেখে।

আজ ওরা ঠিক করল চেতলা ব্রীজ পেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে ঘুরতে যাবে। কিন্তু ঠিক করলেই তো হয় না, চেতলা ব্রীজ আর পার হওয়া গেল না। তার আগেই কেউ যেন ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে স্কুলের ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

এর পর থেকে রোজ সকালে পাঁচটা বাজলেই কে যেন চার ভাইকে বিছানা থেকে তুলে বাথরুমে পাঠিয়ে দেয়। মুখটুখ ধোয়া হলে এক জোড়া বেত তাদের ডাইনিং রুমের দরজা দেখিয়ে দেয়। ওরা যতক্ষণ খায় বেত দুটো হাওয়ায় নাচতে থাকে। খাওয়া হলে পড়ার ঘরে যখন আসে জোড়া বেত তখনও ওদের পিছু ছাড়ে না। একটু ফাঁকি দিয়েছে কি, অমনি সপাং করে পিঠে বাড়ি পড়ে।

স্কুল কামাই করারও উপায় নেই! অমনি গলা ধাক্কা দিতে দিতে কেউ তাদের ক্লাসে নিয়ে যাবে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে টিফিন খাবার সময় থেকে রাত্তিরে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ জোড়া বেত ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে।

সেজো মামী বেজায় খুশী। ছেলেদের পেছনে চেঁচিয়ে তাঁর যে অসুখ করেছিল সেটা এখন সেরে যেতে শুরু করেছে। রাঁচীতে সেজো মামাকে চিঠি লিখে তিনি সব খবর জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতন, প্রলয়নাশন, প্রলয়ঘাতন, চার ভাইয়ের প্রলয় থেমে গেছে। পঞ্চম পাণিপথের যুদ্ধের এ বাড়িতে লড়াই আর হচ্ছে না। লড়াই তো দূরের কথা, জোরে কথা বলার পর্যন্ত উপায় নেই। তার ওপর রোজ নিয়ম করে স্কুলে যেতে হচ্ছে, বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে হচ্ছে। চার ভাইয়ের মনে আর সুখ নেই।

একদিন রাত্তিরে পরামর্শ করে তারা ঠিক করল, এখানে আর থাকবে না। রাত পোহাবার আগেই চেতলা ছেড়ে চলে যাবে। এখান থেকে ভোরের বাস ধরে যাবে হাওড়া ষ্টেশনে। সেখানে রাজধানী এক্সপ্রেস, বম্বে মেল—প্রথমে যে ট্রেন পাওয়া যায় তাতেই চড়ে বসবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। চার ভাই মাকে চিঠি লিখে অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে সেজ মামী দেখলেন, ছেলেদের ঘর ফাঁকা। টেবলের ওপর একটা ভাঁজ-করা কাগজ চাপা দেওয়া রয়েছে। সেটা খুলতেই দেখা গেল কয়েক লাইন লেখা রয়েছে।

শ্রীচরণেষু মা,

তুমি নিশ্চয়ই ভূত পুষেছ। তার এত বেতের বাড়ি, কানমলা, চড় আর সহ্য হয় না। মার খেতে খেতে আমাদের সারা গায়ে কালসিটে পড়ে গেছে। দিনের পর দিন মাথা গুঁজে এত পড়াশোনা ভাল লাগে না।

তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এ জীবনে আর দেখা হবে না। বাবা ও তুমি আমাদের প্রণাম নিও। ইতি—

হতভাগ্য

আবু, টাবু, হাবু, পাবু

অন্য সময় হলে সেজো মামী এ চিঠি পড়ার পর কেঁদে কেটে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলতেন। আজ কিন্তু কিছু করলেন না। নিজের মনে ঘরের কাজ করে যেতে লাগলেন। তিনি জানেন, যার ওপর দায়িত্ব দেওয়া আছে সেই ওদের ব্যবস্থা করবে।

আটটা তখনও বাজে নি, দেখা গেল, লম্বা মোটা একটা দড়ি দিয়ে চার ভাইকে বেঁধে অদৃশ্য কেউ টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে আসছে।

এরপর আবু টাবুরা একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বাঁদরামো করা চলবে না, ঘাড় গুঁজে দু বেলা পড়তে হবে, মারামারি বন্ধ করতে হবে এবং রোজ স্কুলেও যেতে হবে।

এই সব ঘটনা ঘটে যাবার পর সেজো মামী আবার একদিন পাশের বাড়ি গেলেন এবং যা যা হয়েছে সব বলে গেলেন।

সব শুনে বলাইবাবুর মা বললেন, 'তখনই বলেছিলাম, কোন ভয় নেই। আমার কথা মিলল তো?'

সেজো মামী বললেন, 'মিলেছে। আচ্ছা মাসিমা, একটা কথা বুঝতে পারছি না।'

'কি কথা?'

'যে আমার এত উপকার করছে সে কে?'

'একজন কড়া হেড মাস্টার। ও বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। মরার পরও বাড়িটা ছেড়ে যান নি। বড্ড ভাল মানুষ। কিন্তু ছোট ছেলেদের বেয়াদপি বজ্জাতি একদম সহ্য করতে পারেন না। পাজী ছেলেরা দু'দিন ওখানে থাকলেই ঢিট হয়ে যায়।'

এই সব ঘটনার বছরখানেক বাদে দেখা গেল, মামীর অসুখ বিসুখ একদম সেরে গেছে। আর অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আবু, টাবু, হাবু, পাবু, চার ভাই ফার্স্ট হয়েছে।

ঘনাদার শল্য সমাচার

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোন ভাগ্যে অমন একটা বেফাঁস বচন মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কে জানে !

কিন্তু তাইতেই অমন একেবারে কেল্লা ফতে !

গোলা-গুলি, রকেট, বোমা, টরপেডোতে যা হয় নি, এ যেন এ গুলতিতেই তা হাসিল।

এ ক'দিন কি আর করতে বাকি রেখেছি।

প্রথমে খানাদানার এলাহি কাণ্ডকারখানা। সে সব খানার খুশবেতে শুধু বাহাত্তর নম্বর কেন, সমস্ত বনমালী নস্কর লেন ছাড়িয়ে গোটা ভোটের তল্লাটটাই ম-ম করে উঠেছে।

আজ হিঙের কচুরী আর চিংড়ির কবরেজী কাটলেট ; পরের দিন চিকেন চাওমিন আর সুইট সাওয়ার মাছ।

দু'চার দিন এমন রসালো খানাপিনায় মুখ মেরে গিয়ে অরুচি ধরবে, তার উপায় নেই।

এ তো মন মাতানো 'মেনু' তৈরির মামুলি কেতাবী ছক নয়, একেবারে নতুন বৈজ্ঞানিক ফরমূলার ফিরিস্তি।

বেশ ক'দিন খানদানি চব্য-চোষ্যের পর হঠাৎ একদিন যখন যেমন মরসুম, তার মত ফলমুল সন্দেশ রসগোল্লা রাবড়ির সাত্বিক আহার।

পুরো সাত্ত্বিক আহারটা ঘনাদার কাছে অবশ্য ষোল আনা সই নয়। তাই একদিন মাত্র তা চালিয়েই সটান বিরিয়ানি পোলাও মোরগ মসল্লম আর শিক-কাবাবের প্লেট সাজাতে হয়েছে।

বিরিয়ানি পোলাও-এর জায়গায় মোগলাই পরোটা, মোরগ মসল্লম-এর বদলে রাম জোস আর শিক-কাবারের জায়গায় চিৎপুরী 'চাপ' বদল করেও ফল সেই একই।

প্লেটগুলো অবশ্য ঠিক সাফ হয়ে যাচ্ছে। শিশিরের সিগারেটের টিনগুলো যথারীতি শিস দিয়ে আবরণ মুক্ত হয়ে যথাসময়ে খালি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘনাদা যেন সেই এক ভিজে বারুদের সলতে, তুবড়িতে আগুন লাগানো দূরের কথা, তা থেকে ভালো করে ক'টা আগুনের ফুলকিও বার করা যাচ্ছে না।

ঘনাদা কি বিরক্ত? গরম মেজাজে আছেন? না, না মোটেই না। ওই চেলাকাঠ মার্কা মুখে যতটা খোশ ভাব ফোটা সম্ভব, তা ঠিকই ফুটেছে মনে হচ্ছে।

গলার বোল কিন্তু শুধু হুঁ আর হাঁ আর মুখে সেই ধাঁধাঁ-পেঁচানো মৃদু একটু হাসি, মিশরের কোনো স্ফিংক্স-এর মুখে যা হয়ত খোদাই করা আছে।

ধরাছোঁয়া যায়, প্রতিরক্ষার তেমন দুর্দান্ত 'ম্যাজিনো লাইন'ও ভেদ করা যায় অল্পে কিন্তু শুধু হেঁ, হাঁ আর ধাঁধাটে হাসির এই বেয়াড়া বেড়া পার হওয়া যায় কি করে?

চেষ্টার কিছু ত্রুটি অবশ্যই হয় নি। একেবারে মহাভারত ধরেই আরম্ভ করা হয়েছে।

আরম্ভ করেছে গৌর। শিশিরের সঙ্গে তার আগে থাকতেই যেমন মহলা দেওয়া, সেইমত দুজনে যেন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করতে করতে হঠাৎ গরম হয়ে গর্জে উঠেছে।

বাঁ হাতের ওপর ডান হাতের মুঠোর তুড়ি মেরে গৌর বলেছে,—হ্যাঁ, দুর্যোধন! আলবত দুর্যোধন!

আমরাও, মানে শিবু আর আমিও ঠিক সিনারিও অর্থাৎ চিত্রনাট্য মাফিক হঠাৎ যেন চমকে উঠে উদ্বেগটা জানিয়েছি,—আরে, আরে! হল কি! হঠাৎ দুর্যোধন নিয়ে এত রাগারাগি কিসের!

কিসের?—শিশির যেন অতি কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বলেছে,—গৌর কি বলে জানো! বলে, সারা মহাভারত হল দুর্যোধনকে ঠকিয়ে সব কিছু থেকে ফাঁকি দেওয়ার গল্প। আর এ ঠগবাজির প্যাঁচালো বুদ্ধি যুগিয়েছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। বলে, তিনি প্যাঁচ না খেলালে দ্রৌপদীর বিয়ে হত ওই দুর্যোধনেরই সঙ্গে।

কি!!—আমাদের গলাগুলো উদারা থেকে তারায় তুলে দিয়ে বলেছি,—ঠকিয়ে ফাঁকি না দিলে দুর্যোধন তাহলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করবার যা পণ, সেই লক্ষ্যভেদও করতে পারত!

সে পারুক না পারুক, তাতে কি আসে যায়!—গৌর নিজেই এবার আমাকে মোহড়া নিয়েছে—তার হয়ে লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তো স্বয়ং ভীষ্মই ছিলেন। তাঁকে কি ভাবে ঠুঁটো করা হয়েছিল তা নতুন করে শুনতে চাও? এই শোন তাহলে,—

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশ পতি
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি।

এক টানে ধনু তুলি গঙ্গার কুমার
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
তারপর হাঁকি ক'ন চির ব্রহ্মচারী,
নিজের নিমিত্ত আমি নহি ধনুর্ধারী।
লক্ষ্যভেদে কন্যা লভি দিব দুর্যোধনে
এত বলি ধনুর্বাণ ধরেন যতনে।
কিন্তু এ কি! অকস্মাৎ এ কেমন হইল
দু' চোখে দুটি ক্ষুদ্র অণু কি প্রবেশিল!
কিছু না দেখেন ভীষ্ম চক্ষু করে জ্বালা
ধনুর্বাণ ফেলে দেন হয়ে ঝালাপালা।
একটু কি হাসি ফোটে শ্রীকৃষ্ণের মুখে?
এ কাহার লীলা তবে বোঝো সকৌতুকে!

তৈরী হয়েই ছিলাম। গৌর থামতেই প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একেবারে সুপ্রিম কোর্টে আরজি জানিয়েছি—শুনলেন আপনি, শুনলেন? গৌরের মহাভারতটা শুনলেন?

কিন্তু কোথায় কাকে কি বলছি? কলকাতা মামলার আপীল যেন তুলেছি কামস্কাট্‌কার—হাইকোর্টের হাকিম আরজির মানেই যেন বোঝেন না!

ঘনাদা তাঁর কাটলেটের প্লেটের আসল মাল সাফ্ করে ফ্রায়েড পোট্যাটো ফিংগারগুলো টোম্যাটো সস মাখিয়ে তারিয়ে তারিয়ে শেষ করতে করতে আমাদের দিকে একটু মৃদু হাসি জড়ানো হুঁ শব্দ করেছেন। হাসিটি অবোধ্য আর হুঁ মানে যা বুঝতে চাও বোঝো।

ধাঁধার কপাটে মাথা ঠুকেও আমরা কিন্তু হাল ছাড়ি নি। আমিই খোদ ব্যাসদেব আর কাশীরাম দাসের তরফে লড়তে উঠেছি। বলেছি,—আস্পর্ধাটা একবার দেখলেন! একেবারে খোদার ওপরই খোদকারি! দ্রুপদ রাজার লক্ষ্যভেদের সভায় ভীষ্মের ওই যে চোখে অন্ কি পড়ার ও বর্ণনা ও কোথায় পেয়েছে, জিজ্ঞাসা করুন তো!

ঠিক! ঠিক—শিবু আমায় মদত দিয়েছে,—কোনো মহাভারতে ও কথা নেই। ব্যাসদেবের মূল মহাভারতেও না, কে না জানে ধনুকে বাণ লাগাতে গিয়ে সভায় হঠাৎ শিখণ্ডীকে দেখতে পেয়ে ভীষ্ম তীর ধনুক ছেড়ে চলে যান?

হ্যাঁ, চলে তো যানই, কিন্তু শিখণ্ডীকে দেখে, না চোখে অন্ কি উড়ে পড়ার দরুন, তা কে জানে? গৌর নিজের কোট ছাড়ে নি,—ভীষ্মের ধনুক ছেড়ে চলে যাওয়ার দুটোই কারণ হতে পারে। এক, যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্যাঁচ, তখন ভীষ্মকে তীর ছুঁড়তে না দেওয়ার জন্যে শিখণ্ডীকে সামনে আনার সঙ্গে চোখে অন্ কি ফেলে দিয়ে মতলব হাসিলটা একেবারে নিশ্চিত করে নিয়েছেন। চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক নয়? কি বলেন ঘনাদা?

ঘনাদা কিছুই বলেন নি। কাটলেটের প্লেট সাফ করে পাশে নামিয়ে রাখার পর হাতের সিগারেটে সুখটানের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় মৌজ হয়ে চুমুক দিতে দিতে একটু রহস্যময় হাসি হেসেছেন।

আমরা কিন্তু ওই 'যা বুঝতে চাও বোঝো' মার্ক হাসির ফুটকি দিয়ে প্রসঙ্গটা পেশ করতে দিই নি। গৌরের ওপরই আবার চড়াও হয়ে বলেছি,—থাক্, থাক্, ঘনাদাকে আর সাক্ষী মানতে হবে না। সবই তোমার চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্যাঁচ বলেই মেনে না হয় নিলাম, কিন্তু ভীষ্মদেবের চোখে অন্‌কি পড়ার ওই ছত্রগুলি কোথায় পেয়েছ শুনি? কাশীরাম দাস ওরকম কিছু লিখেছেন বলে তো কেউ কানে শুনি নি।

শোনো নি—গৌর তাচ্ছিল্যভরে বলেছে,—তা শুনবে কি করে? কাশীরাম দাস তো ওসব লেখেন নি।

তবে!—আমরা যেন শেয়ালের গন্ধ পেয়ে শিকারী কুকুর হয়ে উঠেছি।

তবে আর কিছু নয়,—গৌর বাহাদুরীর সঙ্গে বলেছে,—ও লাইন ক'টা আমারই লেখা—মুখে মুখে বানিয়ে তোমাদের শোনালাম।

মুখে মুখে বানিয়ে আমাদের শোনালে?—আমরা একেবারে স্তম্ভিত। গৌর যেন ধর্মস্থান অপবিত্র করে তারই বড়াই করছে, এমন আঁতকে ওঠা মুখের ভাব করে ঘনাদার কাছে কড়া গোছের একটা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত গোছের বিধান চেয়েছি—শুনুন আপনি, শুনুন! আজে-বাজে কিছু নয়—খোদ মহাভারতের ওপরেই ওর নোংরা হাত চালিয়েছে!

ঘনাদা একটু তেতেছেন কি?

না, মোটেই না। সেই রহস্যময় হাসির সঙ্গে এবার শুধু একটু কণ্ঠধ্বনি শোনা গেছে। আমাদের সকলকে বাদ দিয়ে ঘনাদা শুধু শিশিরকে সম্বোধন করে বলেছেন—তা ভালোই তো লাগল!

কি—ভালো লাগল কি? গৌরের মহাভারতের ওপর খোদকারি, না শিশিরের দেওয়া সিগরেটের ব্র্যাণ্ড, তা কিছুই বোঝা গেল না।

মহাভারত দিয়ে আর কিছু হবার নয় বুঝে শিবু এবার অন্য রাস্তা ধরে বিজ্ঞানের শরণ নিলে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত গোপন খবর ফাঁস করবার মত করে বললে,—নভেম্বরে আমরা আবার দক্ষিণ মেরুতে যাচ্ছি জানিস তো?

আমরা যাচ্ছি মানে!—শিশির যথাবিহিত বিস্ময় প্রকাশ করলে।

আহা, আমরা মানে আমাদের ভারতের একটা বৈজ্ঞানিক দল, তাও বুঝিস না!—শিবু শিশিরকে লজ্জা দিয়ে চট করে গলাটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কিন্তু এবার কেন যাচ্ছে তা জানিস?

এরপর একটা লাগসই রহস্যময় উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেবার কথা ছিল আমার। সেই সঙ্গে ঘনাদাকে উসকে দেবার মত ঝাঁঝালো কিছুর ফোড় দেওয়ার ভারও ছিল আমার ওপর।

কিন্তু বারবার ঘনাদাকে তাতাবার চেষ্টায় হার মেনে মেজাজ তখন আমার বিগড়ে গেছে। শিবুর গোপন খবরটার সব রহস্য আমি ঠাট্টার সুরে নস্যাৎ করে দিয়ে বললাম,—যাচ্ছে কেন আবার? যাচ্ছে স্কেটিং ক্লাব খুলতে?

'স্কেটিং ক্লাব!'—আমার আচমকা বেয়াড়াপনায় বেশ বিরক্ত হলেও শিবুর হতভম্ব গলা দিয়ে আপনা থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, স্কেটিং ক্লাব। আমি এবার বোঝালাম—হাজার হাজার মাইল জমা বরফের মাঠ পড়ে

আছে। যেখানে যতদূর খুশি স্কেটিং রিং বসাও। শুধু জাহাজ থেকে উঠে বা প্লেন থেকে নেমে পায়ে স্কেটের জুতো জোড়া পরার অপেক্ষা, আর—

থামো!—এক ধমকে আমায় চুপ করিয়ে দিয়ে শিশির রহস্যটাকে নিজের মত করে পাক দিতে চেয়ে বললে,—ও সব স্কেট-টেট্-এর বাজে ফক্কুড়ি নয়। আসলে আমাদের দ্বিতীয় অভিযান যাচ্ছে অ্যানটারটিকায় শেয়াল ছাড়তে!

শেয়াল ছাড়তে!—বলে যে বিস্ময়টা প্রকাশ না করতে যাচ্ছিলাম, তা শুরু করেই থামতে হল।

শিশির তখন সবিস্তারে নিজের বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। রহস্যটা সরল করে বললে,—হ্যাঁ, যাচ্ছে শেয়াল ছাড়তে। ছাড়তে যাচ্ছে, কোন্ শেয়াল? না আমাদের এই হুক্কা-হুয়া ডাকা শেয়াল নয়। উত্তর মেরুর সেই তুষারধবল রেশমী পশমের খেঁকশেয়াল যার 'ফার', মানে পশমী চামড়া হীরে মুক্তোর চেয়ে দামী। দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইন ছাড়া ডাঙায় চরবার কোনো প্রাণী তো নেই। উত্তর মেরুর এই শেয়াল সেখানে ছাড়লে তাই দেখতে দেখতে হাজারে হাজারে বেড়ে উঠে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ, মানে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ওই যাকে বলে গোপালের দধিভাণ্ড হয়ে উঠবে।

পেঙ্গুইন ছাড়া ডাঙায় চরবার কোনো প্রাণী নেই।

আমরা যে যাই বলি, আড়চোখে নজরটা ঘনাদার দিকে ঠিকই থাকে। শিশিরের আজগুবি শিয়াল-চাষের পরিকল্পনা শোনার মধ্যেও তাই ছিল। শিশির যা গুলবাজি শুরু করেছিল, ঘনাদা তা থেকে অবলীলাক্রমে একটা ফ্যাকড়া টেনে বার করে পেঁচিয়ে তুলতে পারতেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুতে ওই সাদা শেয়াল চালান থেকে সেখানে পেঙ্গুইনের পোলট্রি বানিয়ে দুনিয়ার খাদ্য সমস্যার সুরাহা করবার পরিকল্পনা কেন হালে পানি পেল না, তার একটা জমজমাট বিজ্ঞান-রহস্যের ফোড়ন দেওয়া গল্প ফাঁদবার এমন সুযোগ পেয়ে তার তো ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু সেরকম কোনো চিড়িবিড়িনির লক্ষণ না দেখে গৌর আরো কড়া পাঁচন গুলল।

কি যা তা বকছিস!—বলে শিশিরকে থামিয়ে দিয়ে একেবারে যেন ঘোড়ার মুখের খবর বার করে এনে বললে,—আমাদের দক্ষিণ মেরু অভিযানের লক্ষ্য কি তা জানিস?

আমাদের ঠিক মাত্রা মাফিক কয়েক সেকেণ্ড উৎকণ্ঠায় রেখে গৌর রহস্যটা প্রকাশ করে বললে,—লক্ষ্য হল ফাটল খোঁজা।

ফাটল খোঁজা?—আমাদের এবার আর হতভম্ব হবার ভান করতে হল না। কারণ গৌর এইমাত্র যা ছাড়লে তা আমাদের রিহার্সেল দেওয়া চিত্রনাট্যের বাইরে। 'স্ক্রিপ্‌ট' পাল্টালেও গৌর তার বেলাইনে যাওয়া সার্থক করে তুলে বললে,—হ্যাঁ, ফাটল! কেন ফাটল, কোন্ ফাটল, তাও বুঝতে পারছ না?

নীরবে মাথা নেড়ে আমাদের অজ্ঞতা স্বীকার করতে হল।

নারলিকার-এর নাম শুনেছিস?—গৌর যথোচিত মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে এবার জিজ্ঞাসা করলে,—নারলিকার আর হয়েলের নাম?

শোনা থাক আর না থাক, এখন বোকা সেজে মাথা নাড়তে হল।

যাক, শোনো নি যখন শুনে নাও—গৌর রীতিমত গুরুগিরির চালে বোঝালে,—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ওই দুজনের নাম একেবারে সবার ওপরের সারিতে। এই দুজনের নাম একেবারে সবার ওপরের সারিতে। এই দুজনের মধ্যে হয়েল হলেন ইংরেজ আর নারলিকার ভারতীয়। এই নারলিকার কি বলছেন শোনো। বলছেন যে আমাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণই কমে যাচ্ছে, সূর্য থেকে সরে আসতে আসতে তাই ফেঁপে-ফুলে আরো বড়ো হতে থাকার মধ্যে তার খোলসে প্রথম ফাটল ধরবে এখানে সেখানে আর তারপর সেই সব ফাটল থেকে ঠেলে বার হতে থাকবে নতুন মহাদেশ হয়ে ওঠবার মত পৃথিবীর ভেতরকার পাথুরে মালমসলা!

গৌরকে মনে মনে তারিফ করে ঘনাদার দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে আমরা হতভম্ব গলায় কোনোরকমে যেন বললাম—এমন ভয়ানক কাণ্ড!

হ্যাঁ,—গৌর গলায় প্রলয়ের হুমকির ভয়-বিহ্বলতা মাখিয়ে বললে—একেবারে সর্বনাশা ব্যাপার! পৃথিবীতে প্রাণের জগতের শেষ যবনিকা পতন না হোক, সম্পূর্ণ পালাবদল নিশ্চয়ই। এই সৃষ্টি ওল্টানো ব্যাপার এখনই শুরু হয়েছে কি না তা বোঝবার হদিশ ওই ফাটল। সে ফাটল প্রথম কোথায় ধরবে?

গৌর নাটকীয়ভাবে থামল। কিন্তু কোথায় কি? এমন একটা পাকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া খেই যাঁর লুফে নেওয়ার কথা, তিনি দেহটাই শুধু আমাদের আড্ডাঘরে রেখে আর কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

আশা ভরে পাঁচ সেকেণ্ড আন্দাজ অপেক্ষা করে গৌরকেই আবার শুরু করতে হল। বললে,—পাকা ফলের বেলা যেমন তেমনি পৃথিবীর প্রথম মাথা আর তলার দিকে, অর্থাৎ কিনা দুই মেরুর কোথাও! কিন্তু উত্তর মেরু তো ডাঙা নয়, জমা বরফের রাজ্য। সেখানে হরদম এখানে সেখানে ফাটল ধরছে আর জোড়া লাগছে। আসল ফাটলের আগে একটু আধটু চিড়ধরা সেখানে বোঝার কোনো উপায় নেই। মোক্ষম ফাটলের আগে তো একটু চিড়ধরা ধরতে পারাই সবচেয়ে বড় কথা, আর তা ধরতে যেতে হবে সেই দক্ষিণ মেরুতে। আর শুধু গেলেই তো হবে না। সেই সৃষ্টিনাশা চিড় চেনবার মত বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি বিচক্ষণতা তো চাই-ই সেই সঙ্গে চাই যমের দক্ষিণ দুয়ারের সমান সেই অ্যানটারটিকার চির-তুষারের বিপরীত মেরুতে টহল দিয়ে টিকে থাকবার ক্ষমতা।

এ মণিকাঞ্চন যোগ তো অসম্ভব বললেই হয়।—শিবু গৌরকে একটু দম নেবার ফুরসত দিয়ে সলতের আগুনটা উসকে দিলে।

ঠিক তাই!—আড়চোখে একবার যথাস্থানে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গৌর আবার সুরু করলে,—বিজ্ঞানের ধুরন্ধর যদি বা মেলে, মেরু-বিজয়ী বাহাদুর পাচ্ছে কোথায়? আমাদের দক্ষিণ মেরু অভিযানের কর্মকর্তারা তাই হন্যে হয়ে সারা দুনিয়ায় খোঁজ চালিয়ে হয়রান হচ্ছেন।

গৌর তাল বুঝে ঠিক শমের মাথায় থামল। ঘরের সবাইও উদ্‌গ্রীব আগ্রহে চুপ। এমন একটা মোক্ষম মুহূর্ত কি বিফলে যাবে?

শিশির আর ধৈর্য ধরতে না পেরে সলতেটা ধরিয়ে দিলে। যেন অবাক হয়ে বললে,—কেন? আসল লোকের নামই তাদের মনে পড়ল না? ঘনশ্যাম দাসটা তারা শোনে নি?

আমরা আবার সব চুপ। এবার আর বারুদের সলতে নেতিয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু কোথায় কি?

বারুদের সলতে নয়, আওয়াজ একটা যা পেলাম তা সিগারেট ধরাবার জন্যে ঘনাদার দেশলাই জ্বালবার।

এর পর আর নিজেকে সামলে রাখা যায়? মেজাজটা অনেকক্ষণ থেকেই খিঁচড়ে ছিল। এখন একেবারে চিড়বিড়িয়ে টিট্‌কিরি হয়ে বার হল—কি বললে? ওরা খোঁজ করবে ঘনশ্যাম দাসের? ভীষ্ম দ্রোণ গেল তল শল্য সেনাপতি?

হুঁঃ—হুঁঃ—হুঁ—হুঁ······

না, মেঘের গুড়গুড়ুনি নয়, গলা খাঁকারি এবং গলা খাঁকারি আর কারুর নয়, স্বয়ং তাঁর।

হ্যাঁ, ঘনাদাই গলা খাঁকারি দিয়ে এবার সরব হলেন। বেশ একটু ভারী গলাতেই শোনালেন,—

ভীষ্ম দ্রোণ গেল তল শল্য সেনাপতি?—কেমন?

ঘনাদার ভারী গলার আবৃত্তিতে কি একটু কান মলা গোছের মোচড়?

ঠিক বুঝতে না পেরে নীরব হয়েই রইলাম।

ঘনাদাই আবার বললেন,—অর্থাৎ হাতি-ঘোড়া হার মানল, রথ টানবে ছাগল!—বচনটা এ রকমও হতে পারে!

হাওয়াটা ঠিক কোন্ মুখো, তা বুঝতে না পারলেও শিবু আলাপটা নেহাৎ চালু রাখবার জন্যেই বললে, হ্যাঁ, তা তো পারেই। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন—তখন সব মহা মহাবীরই খতম হয়ে গেছে, তাই নেহাৎ নাচার হয়েই তিনি শল্যকে সেনাপতি করেছিলেন তো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল তখন তিনি ভালো করেই বুঝে ফেলেছেন। শল্যের মুরোদ জানতে তো তাঁর বাকি ছিল না।

হ্যাঁ,—ঘনাদা যেন সায়ই দিলেন শিবুর কথায়।—শল্যের মুরোদ আরেকজনও ভালো করেই বুঝেছিলেন, তাঁর ধারণাটাই শোনা যাক। তিনি বলেছিলেন—"ও-ই বীর বিপুল বলশালী মহাতেজস্বী বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার মনে হয়, উনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণ বিশারদ। উহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না।"

ঘনাদা গম্ভীর মুখে ইচ্ছে করেই কিছু যেন উহ্য রেখে থামলেন। নিজেদের মধ্যে বারকয়েক মুখ চাওয়া-চাওয়ির পর আমিই সকলের হয়ে মনের সংশয়টা প্রকাশ করলাম স্পষ্ট করেই। বললাম,—শল্য সম্বন্ধে এরকম ধারণা সত্যি কারুর ছিল না কি? তা ধারণাটা কার? আর পেলেন কোথায়?

কোথায় পেলাম?—ঘনাদা অজ্ঞতা যেন ক্ষমা করে বললেন, পেলাম স্বয়ং ব্যাসদেবের লেখা মূল মহাভারতে।

মূল মহাভারতে এ কথা আছে?—আমি অবজ্ঞাভরে বললাম,—তাহলে দুর্যোধনের কোনো মোসাহেব ভাঁড়-টাঁড়ের নিশ্চয়। ব্যাসদেব আবার সে কথা লিখে রেখে গেছেন, এটাই আশ্চর্য।

না, ধারণাটা দুর্যোধনের মোসাহেব কোনো ভাঁড়-টাঁড়ের নয়।—ঘনাদা গম্ভীর হয়েই জানালেন।—কিন্তু ধারণাটা যাঁরই হোক, শুনে হাসি পাবার মত খুব কি উদ্ভট আজগুবি? শল্য কি কুরুক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা নয়?

আমাদের ধাতস্থ হবার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড সময় দিয়ে ঘনাদা নিজেই আবার আরম্ভ করলেন। কৌরব পক্ষের ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ—কি পাণ্ডব পক্ষের অর্জুন তো শুধু ধনুর্ধারী বীর। আর ওদিকে দুর্যোধন আর এদিকে ভীম গদাযুদ্ধে ওস্তাদ। কিন্তু শল্যের কথা ভাবো দেখি। ধনুক বা গদা কি যে অস্ত্র হাতে দাও, তাতেই সমান ওস্তাদ। শুধু তো তাই নয়। কুরুক্ষেত্রের সবার সেরা যোদ্ধারা তো শুধু অস্ত্র চালাতেই পারতেন কিন্তু শল্য ছাড়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত রথ চালাবার ক্ষমতা ছিল আর কার? দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করায় অন্যেরা যে যাই হাসি তামাশা করুক, বিচক্ষণ সমঝদারেরা পাণ্ডব পক্ষের প্রমাদ গনেছিলেন।

তার মানে!—গৌর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল,—শল্য সেনাপতি থাকলে দুর্যোধনেরই কুরুক্ষেত্রে জিত হবার কথা।

তাই তো মনে হয়।—ঘনাদা যেন সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।—না হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অমন চিন্তিত হবেন কেন? যোদ্ধা হিসাবে শল্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে ধারণার কথা জানিয়েছি তা আর কারুর নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই।

তোয়াজ তোষামোদের বদলে প্রথমেই যাতে কাজ হয়েছে, সেই উল্টো খোঁচাই আবার একটু লাগানো উচিত মনে হল। ঘনাদার মতই নাসিকাধ্বনি করে বললাম,—হ্যাঁ! শ্রীকৃষ্ণের ধারণা! ওঁর ধারণা না ধাপ্পা।

ধাপ্পা! শ্রীকৃষ্ণের ধারণাকে বলছিস ধাপ্পা?—ঘনাদার হয়ে গৌরই তলোয়ার তুলল।

হ্যাঁ, রসিকতা করে ধাপ্পা!—রীতিমত গম্ভীর মুখে বললাম,—রসিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সেদিকে তো গুণের ঘাট নেই। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের পর শল্যকে সেনাপতি হতে দেখে যুধিষ্ঠিরের কাছে তাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছেন।

না, ঠাট্টা করেন নি! যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক সেই মত।—ঘনাদারই চাপা গর্জন শোনা গেল। রীতিমত ভাবিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে শল্য সম্বন্ধে নিজের মতটা জানিয়েছেন!

তা জানালেই বা হয়েছে কি?—আমিও পিছু হটবার পাত্র নই।—শ্রীকৃষ্ণ বললেই শল্য মহাবীর হয়ে উঠবে নাকি? যার গাড়োয়ানি করে শল্যের মহাভারতে জায়গা, সেই কর্ণ শল্য সম্বন্ধে কি বলতেন জানেন?

জানি।—ঘনাদার গলার ঝাঁজটা খুশি করবার মত—শল্য কর্ণের সারথি হতে রাজী হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার দরুন কর্ণকে উঠতে বসতে টিটকিরি দিয়ে জ্বালিয়ে মারতেন। তিতিবিরক্ত হয়ে কর্ণ তাই মাঝে মাঝে তার শোধ তুলতে চাইতেন শল্যকে

গালাগাল দিয়ে। কিন্তু সে গালাগাল তো শল্যের জাত তুলে নিন্দে। শল্য তো পাণ্ডব কৌরবদের মত সিন্ধুনদ পার হয়ে আসা আর্যবংশধর নন। তাঁকে সেকালের বেলুচি বলা যায়। এখন যেখানে বেলুচিস্থান, সেই অঞ্চলেই ছিল তাঁর রাজত্ব। আর্যয়ানার খুঁতখুঁতে গোঁড়ামি তাঁদের ছিল না। তাঁরা পোশাক-আশাকে কার্পাসের তুলোর ধার ধারতেন না। ভেড়ার উটের লোমের মিহি মোটা কম্বলেই তাঁদের পোশাক তৈরি হত আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সিন্ধু পার হওয়া আর্যদের মত গোঁড়ামির বাছবিচার তাঁদের ছিল না—গরু ভেড়া সব মাংসেই তাঁদের ছিল সমান রুচি। এ সব নিয়ে কর্ণের গালাগাল, তাই গায়ে লাগে নি শল্যের। এসব তো তাঁদের জাতের আচার-বিচার নিয়ে নিন্দে। তাঁর বীরত্বের বিষয়ে উপহাস কি ধিক্কার তো তাতে নেই।

বীরত্ব তো তাঁর ভারি। খোঁচা দিতে এখনো ছাড়লাম না।—ভীম অর্জুন এমন কি নকুল সহদেবও নয়, কুপোকাত হলেন তো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের হাতে, ভালো করে ধনুক ধরতেও যিনি জানতেন কি না সন্দেহ!

হ্যাঁ, মারা গেলেন যুধিষ্ঠিরেরই হাতে।—ঘনাদার গলা এবার জলদ্‌গম্ভীর।—একমাত্র যাঁর হাতে ছাড়া শল্যের অমন আজগুবি হার আর মরণ সম্ভবই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব তাই আর কাউকে নয়, নাছোড়বান্দা হয়ে যুধিষ্ঠিরকেই সেধেছিলেন শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে সংহার করবার জন্যে।

কেন? কেন?—এবার অবাক হওয়া প্রশ্নটা আমাদের সকলেরই—আর কারুর বদলে শুধু যুধিষ্ঠিরকেই এমন পেড়াপীড়ি কেন?

সেইটা ভেবে দেখো না!—এতক্ষণে ঘনাদার মুখে টেক্কা তুরুপের আগের মুহূর্তের হাসি,—ভীম অর্জুন থেকে শুরু করে আরো সব বাঘা বাঘা যোদ্ধা থাকতে শুধু যুধিষ্ঠিরকেই এমন সাধাসাধির কারণ কি? সারা মহাভারতে আর কারুর সঙ্গে যোঝবার জন্যে যুধিষ্ঠিরকে একবার একটু ডাক দেওয়ার কথাও কোথাও আছে কি? শুধু শল্যের বেলা যুধিষ্ঠিরকে রাজী না করাতে পারলে শ্রীকৃষ্ণের আর শান্তি নেই। কত ভাবেই না যুধিষ্ঠিরকে তাতাচ্ছেন—

কিন্তু কেন?—আমাদের সেই একই প্রশ্ন,—শল্যকে শেষ করবার জন্যে শুধু যুধিষ্ঠিরকেই দরকার কেন?

দ্রোণাচার্যকে মারবার জন্যেও তাঁকে দরকার হয়েছিল—

মানে, মিথ্যে কথা বলবার জন্যে!—আমার গলায় প্রতিবাদের ঝাঁজ—শল্যবধেও যুধিষ্ঠির মিথ্যে কথা বলেছিলেন?

না, তিনি কিছু বলেন নি,—ঘনাদা একটু বিশদ হবেন—তবে সম্মুখ সমরটা তাঁর সঙ্গে বলেই শল্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করে আনমনা হয়েছিলেন, আর সেই ফাঁকেই যুধিষ্ঠিরের আনাড়ি হাতে বাণও গিয়ে মর্মভেদ করেছিল শল্যের।

শল্যকে আনমনা করার ব্যাপারটা তাহলে কি?—আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

ব্যাপারটা নকুল সহদেবের ঠিক মওকা বুঝে করুণ আর্তনাদ!—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—শল্যবধের আগে যুধিষ্ঠিরের ভাবনাগুলো মনে করো,—

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে,
দুর্জয় দেখি যে শল্য আজিকার রণে।

নকুল সহদেবের আর্তনাদে আনমনা শল্যর বুকে যুধিষ্ঠিরের তীর গিয়ে বিঁধেছে।

হারিলে কি গতি হবে, পাব মহালাজ
এই মত ভাবি তবে কহে ধর্মরাজ।
চক্রব্যূহ করি মোরে দোঁহে বল রাখো
সহদেব ও নকুল মম বামে থাকো।

বামে নয়, নকুল সহদেব ছিলেন যুধিষ্ঠিরের দু' পাশে, প্রায় শল্য যখন বাঁ হাতে যুধিষ্ঠিরকে ঠেকিয়ে ডান হাতে পাণ্ডব সেনা ছারখার করছে তখন একবার নকুল আর তারপরে সহদেব যেন হঠাৎ শল্যের বাণে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গেছে, এমন ভাবে কাতর ডাক ছেড়েছে,—মামা! মামাগো!

শল্য যুধিষ্ঠির নিয়ে সব পাণ্ডবেরই মামা, কিন্তু হাজার হলেও নকুল সহদেব হল তাঁর নিজের মায়ের পেটের বোন মাদ্রীর ছেলে, তাই টানটা যদি তাদের ওপর একটু বেশি হয়, সেটা অন্যায় নয়। নকুল সহদেবের আর্তনাদে তাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে গেছেন শল্য আর সেই ফাঁকে যুধিষ্ঠিরের তীর গিয়ে বিঁধেছে তার বুকে। যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারুর সঙ্গে যুদ্ধ হলে নকুল সহদেবের ওই নকল আর্তনাদ শল্য কখনো সত্যি বলে ভেবে অন্যমনস্ক হবে না। শল্যকে এই ভুল করাবার জন্যেই যুধিষ্ঠিরকে এ যুদ্ধে নামাবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের অত পীড়াপীড়ি। নকুল সহদেবের আর্তনাদও অবশ্য তাঁরই শেখানো, আর সেটা যুধিষ্ঠিরের অজান্তে।

কিন্তু—কিন্তু—আমাদের দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করতে হল,—মূল মহাভারতে এ সব কথা কোথাও আছে কি?

থাকা তো উচিত।—ঘনাদা উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন,—তবে সব ভুল পুঁথি তো পণ্ডিতদের হাতে এখনো পৌঁছোয় নি!

ঘনাদা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পাশের টিপয়টার ওপরে শিশিরের সিগারেটের টিনটাও অবশ্য নাই।

———

পড়া মনে রাখার উপায়

—কুমারেশ ঘোষ

সেদিন সন্ধ্যায় দুষ্টুকে তার মা পড়াচ্ছিলেন।

ক্লাস টু-তে উঠেচে, নতুন বইও কিনেচে। তখন লোডশেডিং-এ চারধার অন্ধকার। একটা হ্যারিকেনের সামনে বসে পড়ছিলো দুষ্টু। মা তাকে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু পড়া ধরতে গেলেই ভুলে-ভুলে যাচ্ছিলো সে।

পরে পড়া বলতে না পারায় আর একবার বকুনি খেতেই দুষ্টু বিগড়ে গেল। বললো, আমি কি করবো? দেখচো না, এই লোডশেডিং-এর অন্ধকারেও পড়চি। তোমাদেরও এরকম অন্ধকারে পড়তে হয়নি।

কথাটায় যুক্তি আছে বটে!

তাই হয়তো দুষ্টুর মা একটু নরম হলেন। হয়তো হাসি চেপেই বললেন, আচ্ছা, নাও, এখন পড়ো। মনে রাখবার চেষ্টা করো।

পড়া শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল, দুষ্টু সত্যিই যেন চিন্তিত। সে তো পড়ার সময় দুষ্টুমি—না, তেমন দুষ্টুমি করেনি তো! আর পড়া মনে রাখবারও চেষ্টা করেচে, অথচ······

আর ইংরিজি কথাগুলোও কেমন দুষ্টু! আচ্ছা, বি-ইউ-টি যদি বাট হয়, তবে পি-ইউ-টি তো পাট-ই হবে! তা না, পুট। ধ্যুৎ।
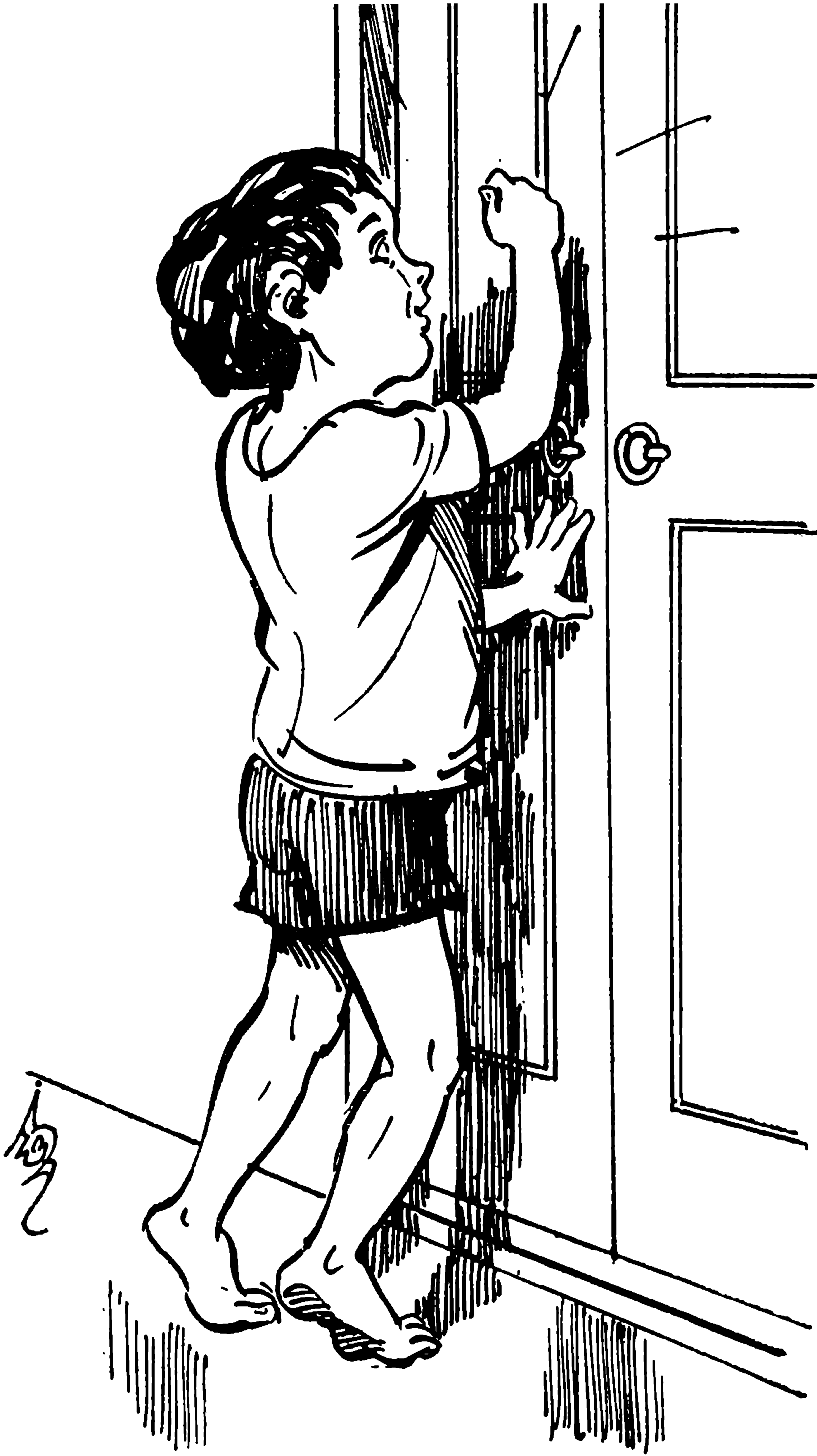
দুষ্টু তার দাদুকে এসে বললো ব্যাপারটা। সব শুনে দাদু তাঁর নিজের মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সত্যিই কথাটা ভাববার মতোই। তোমার মাথায় বোধহয় গোবর পোরা আছে।

গোবর!—দুষ্টু অবাক হলো।

আমার তো তাই মনে হয়—

তাহলে উপায়—দুষ্টুরও বুঝি ভয় হলো।

দাদু একটু ভেবে বললেন, আছে একটা উপায়। একটা অপরেশন করতে হবে।

দুষ্টু আঁতকে উঠলো! অপরেশন! তার মানে, মাথাটাকে কেটে ফেলতে হবে? তা হলে তো মরে যাবো?

না, না।—দাদু সাহস দিলেন, অতটা বড় অপরেশন না করলেও হবে। একটা ছোট্ট অপরেশন করলেই হবে।

কি রকম?—দুষ্টু কৌতুহলী হলো।

দাদু বললেন, ঐ যে ছুতোর মিস্ত্রিদের আগর নামে একটা যন্তর আছে, যা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্যাঁচ দিয়ে কাঠে বড় বড় ছেঁদা করে—সেই যন্তর হলেই হবে।

দুষ্টু ভয় পেয়ে বললে, তা দিয়ে আমার মাথায় ছেঁদা করলে তো লাগবে, রক্ত বেরুবে?

তা একটু বেরুবে, তবে সেই সঙ্গে মাথায় পোরা সব গোবরটাও বেরিয়ে আসবে। তারপর সেই ছেঁদায় পিচকিরি দিয়ে খানিকটা গাওয়া ঘি ঢুকিয়ে দিলেই হবে।

দুষ্টু দাদুর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। [পৃঃ ৩৯৯

এ ব্যবস্থাটা মন্দ লাগলো না দুষ্টুর। তবে দুটো বিষয়ের জন্যে তার অমত দেখা গেল।

সে বললো, খুব ব্যথা লাগবে যে!

দাদু বুঝিয়ে বললেন, সে এমন কিছু নয়, একটু ফুঁ দিলেই ব্যথা কমে যাবে। আর একটু টিনচার-আইডিন দিলে ঘা-টাও সেরে যাবে।

দুষ্টুর দু'নম্বরের আপত্তি! আচ্ছা দাদু, ঐ গাওয়া ঘিও তো ঐ গরুর দুধ থেকেই তৈরি! তাহলে দেখা যাচ্ছে ঐ গরু ছাড়া উপায় নেই। গরুর গোবর বার করে নিলেও ঐ গরুরই দুধের ঘি পুরতে হচ্ছে। তাহলে তো আমার বুদ্ধিটা ঐ গরুর মতই হয়ে থাকবে।

দাদু ভেবে বললেন, কথাটা তো ঠিকই বলেচো। অতটা ভেবে দেখিনি তো আমি। তবে গোবরের চাইতে ঘি-টা তো ভালই! গন্ধও ভাল, আর দামীও বটে!

তুষ্টু মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ, তা বুদ্ধির একটু প্রমোশন হতে পারে, এই আমি যেমন ক্লাসে প্রমোশন পেলাম।

হ্যাঁ। সেই রকমই।—দাদু আরো বললেন, তাছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখচিনে। গোবরটা তো বার করে দেওয়া হলো, তার বদলে ভাল কিছু মাথার মধ্যে ঢোকাতে হবে। ছাগলের দুধ দামী, তার থেকে ঘি তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে, তবে তাতে আবার তোমার উপকার না হয়ে অপকারই হয়ে যাবে। বোকা পাঁঠার মত বুদ্ধি হবে। সে আরো খারাপ।

তুষ্টু শুনেই না-না করে উঠলো, সে দাদু আরো খারাপ হবে। মাথা দিয়ে বোঁটকা গন্ধ বেরুবে। কিছু খেতে গেলেই গা গুলিয়ে উঠবে। কথাটা বলেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো তুষ্টু। তারপর বললো, আচ্ছা দাদু, এক কাজ করলে হয় না। বাঘের দুধের ঘি করলে কেমন হয়? তাতে লাফিয়ে লাফিয়ে ক্লাসে ওঠা যাবে।

ঠিক।—দাদু বললেন, এটা একটা কথার মত কথা বটে! আর পয়সা দিলে এই কলকাতা শহরেও বাঘের দুধ পাওয়া যায় শুনেচি। আমি তা হলে সেই চেষ্টাই দেখবো।

কিন্তু দাদু—তুষ্টু কেমন যেন মিইয়ে গেল। বললো, আমার কিন্তু বড্ড ভয় করচে! তুমি ঐ আগর না কি ঘর্ঘর যন্তরটা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার মাথায় ছেঁদা করবে, তাতে আমার খুবই লাগবে কিন্তু। আমি খুব চেঁচাবো বোধহয়।

দাদু বললেন, তোমার চেঁচানোর জন্যে আমি ভাবিনে। সে তোমার মুখটা কাপড় দিয়ে খুব জোরে বেঁধে দিলেই হবে। যেমন ডাকাতরা দেয়। আর জানোই তো, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না।

সে তো বটেই।—তুষ্টু হতাশ হয়েই বললো, বেশ তবে তাই হোক। মা-র বকুনি খাওয়ার চাইতে ঢের ভাল। আর তুমি যা বললে একবারই তো। তারপরই তো লাফিয়ে লাফিয়ে প্রমোশন! স্কুলের দরজা তড়াং তড়াং করে লাফিয়ে কলেজে বি-এ, এম-এ, জেড-এ। তবে দাদু একটা কথা বলবো?

কি?

ঐ অপরেশনটা না করে অন্য কিছু করা যায় না? একটু ভেবে দেখো রাত্তিরে। আমিও দেখবো।

পরদিন খুব ভোরেই তুষ্টু দাদুর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো।

দাদু—দাদু, ওঠো—ওঠো।

দাদু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বললেন, কি ব্যাপার?

তুষ্টু একেবারে লাফিয়ে দাদুর কোলে উঠে বললো, আমি কাল স্বপ্নে একটা উপায় পেয়ে গেচি।

দাদু তুষ্টুকে কোলে নিয়ে বসে জিগ্যেস করলেন, কি স্বপ্ন?

দুষ্টু বললো, একটি লোক, খুব লম্বা, আর লম্বা গোঁফ, আমাকে ডেকে বললো, খোকা, তুমি এত ভাবচো কেন? তোমার মুণ্ডুতে পাঁচ পাঁচটা ছেঁদা আছে। দুটো কানের, দুটো নাকের, একটা মুখের, তার একটার মধ্যে ঘি ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়। কথাটা তোমার দাদুকে বলো।—বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ঘুম ভাঙতেই ছুটে এলাম।

শুনে দাদু তাঁর টাক-মাথা চুলকে বললেন, ঠিকই তো! কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি।

এও একটা ভাবনার কথা। দুষ্টু উপদেশ দিলো, তুমি একটা ভিজে গামছা পাট করে মাথায় দিয়ে রেখো। তবে বেশিক্ষণ রেখো না আবার, সর্দি হবে।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, দুষ্টু বললো, মা তো কেবল বলে, এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে তোর সব বেরিয়ে যায়। তাই এক কানে তুলো দিয়ে অন্য কানে ঘি ঢেলে দিলে হয় না!

কিন্তু ঘি তো কান থেকে ফের বেরিয়ে আসবে? দাদুর প্রশ্ন।

তা হলে নাকের গর্তে ঢোকালে কেমন হয়?

নাক দিয়ে কি অতটা ঘি টানা যাবে? নস্যি হলে হতো।

তা হলে বাঘের দুধের ঘি ভাতের সঙ্গে মাখিয়ে খেলেই তো হয়!

সেটা তো পেটে চলে যাবে। ঘি-টা তো মাথায় যাওয়া দরকার।

না, দাদুর কোনটাই পছন্দ হলো না দেখে দুষ্টু ভাবলো খানিকটা। তার পরেই দাদুর গলা জড়িয়ে বললো, দাদু, আমার মাথায় আর একটা বুদ্ধি এসেচে!

কি?

তোমাকে অত দাম দিয়ে বাঘের দুধ কিনতে হবে না। আর তুমি বুড়ো মানুষ, কোন্ বাজারে পাওয়া যাবে তারও ঠিক নেই। বরং একটা কাজ করা যাক।

কি?

তুমি তো বললে নস্যিটাই ভাল।

হ্যাঁ, নস্যি তবু মাথায় মগজে গিয়ে ধাক্কা মারে।

দুষ্টু বললো, যে বইয়ের যে পাতাটার পড়া খুব শক্ত দেখবো, সে পাতাটা পুড়িয়ে ছাই করে গুঁড়িয়ে নস্যির মত করে নাকে টানলে কেমন হয়?

দাদু এতক্ষণে হাসলেন। বললেন, এই উপায়টাই ভাল। গুড।

সমাপ্ত